জন্ম শতবর্ষ স্মরণে

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

জন্ম-শতবর্ষ-স্মরণে

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

পঞ্চম খণ্ড

উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

'স্বামীজীর বাণী ও রচনা'র পঞ্চম খণ্ডে প্রথমেই উদ্বোধন হইতে প্রকাশিত 'ভারতে বিবেকানন্দ' গ্রন্থখানি সন্নিবেশিত হইল, তবে ঐ পুস্তকে স্বামীজীর বক্তৃতা ছাড়া আনুষঙ্গিক যে-সকল বিষয়—যথা বিভিন্ন স্থানের অভিনন্দন পত্র, অভ্যর্থনার বর্ণনা এবং কয়েকটি সহযাত্রীর ডায়েরী প্রভৃতি লিপিবদ্ধ ছিল, সেগুলি এখানে বাদ দেওয়া হইল। ঐগুলির প্রয়োজনীয় বিষয় তথ্যপঞ্জীতে কিছু কিছু লওয়া হইয়াছে। এগুলি সম্পূর্ণভাবে পাইতে গেলে মূল পুস্তকই পড়িতে হইবে। অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত ইংরেজী সংস্করণ Lectures from Colombo to Almora-র সহিত কোন কোন ক্ষেত্রে পার্থক্য দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে আমরা উদ্বোধন-সংস্করণই অনুসরণ করিয়াছি।

দ্বিতীয় অংশ 'ভারত-প্রসঙ্গে' ভারত সম্বন্ধে স্বামীজী কর্তৃক লিখিত কয়েকটি গভীর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধের অনুবাদ এই নূতন প্রকাশিত হইল। আমেরিকায় ভারত সম্বন্ধে প্রদত্ত কয়েকটি বক্তৃতার সারমর্ম স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলির অনুবাদও এই অংশে সন্নিবেশিত হইল। 'ভারতীয় নারী' একটি দীর্ঘ বক্তৃতা, এবং সর্বশেষ রচনাটি মাদ্রাজ অভিনন্দনের উত্তর—উহাতেও ভারতের সমস্যা, সাধনা, ইতিহাস ও হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে। তথ্যপঞ্জীতে ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক বিষয়গুলির টীকা যথাসাধ্য দেওয়া হইয়াছে।

এই গ্রন্থাবলী-প্রকাশে যে-সকল লেখক, শিল্পী ও সাহিত্যিক আমাদের নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে আমরা সাধারণভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা'-প্রকাশে আর্থিক সাহায্য করিয়া আমাদের প্রাথমিক প্রেরণা দিয়াছেন। সে জন্য আমরা তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

প্রকাশক

সূচীপত্র

ভারতে বিবেকানন্দ

কলম্বোয় স্বামীজীর বক্তৃতা

আমেরিকা ও ইওরোপে সাড়ে তিন বৎসর কাল বেদান্ত প্রচার করিয়া ১৮৯৭ খৃঃ ১৫ই জানুআরি স্বামীজী সিংহলের রাজধানী কলম্বো বন্দরে অবতরণ করেন। ঐ দিনই এক অভিনন্দনের উত্তরে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। পরদিন অপরাহ্ণে 'ফ্লোরাল হলে' স্বামীজী যে বক্তৃতা দেন, তাহাই 'কলম্বো হইতে আলমোড়া বক্তৃতাবলী'র প্রথম বক্তৃতা।

যে সামান্য কার্য আমাদ্বারা হইয়াছে, তাহা আমার নিজের কোন শক্তিবলে হয় নাই; পাশ্চাত্যদেশে পর্যটনকালে আমার এই পরম-পবিত্র প্রিয় মাতৃভূমি হইতে যে উৎসাহবাক্য, যে শুভেচ্ছা, যে আশীর্বাণী লাভ করিয়াছি, উহা সেই শক্তিতেই হইয়াছে। অবশ্য কিছু কাজ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই পাশ্চাত্যদেশ-ভ্রমণে বিশেষ উপকার হইয়াছে আমার; কারণ পূর্বে যাহা হয়তো হৃদয়ের আবেগে বিশ্বাস করিতাম, এখন তাহা আমার পক্ষে প্রমাণসিদ্ধ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্বে সকল হিন্দুর মতো আমিও বিশ্বাস করিতাম—ভারত পুণ্যভূমি, কর্মভূমি। মাননীয় সভাপতি মহাশয়ও তাহা বলিয়াছেন; আজ আমি এই সভায় দাঁড়াইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি—ইহা সত্য, সত্য, অতি সত্য। যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে, যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে—যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে পৃথিবীর সকল জীবকেই তাহার কর্মফল ভোগ করিবার জন্য আসিতে হইবে—যেখানে ঈশ্বরের অভিমুখী জীবমাত্রকেই পরিণামে আসিতে হইবে—যেখানে মনুষ্যজাতির ভিতর সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমা, দয়া, পবিত্রতা, শান্তভাব প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ হইয়াছে—যদি এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে, তবে নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই এখানে বিভিন্ন ধর্মের সংস্থাপকগণ আবির্ভূত হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে বারংবার সনাতন ধর্মের পবিত্র আধ্যাত্মিক বন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছেন। এখান হইতেই উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম—সর্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়াছে। আবার এখান হইতেই তরঙ্গ উত্থিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীর জড়বাদী সভ্যতাকে আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ করিবে। অন্যান্য

দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়দগ্ধকারী জড়বাদরূপ অনল নির্বাণ করিতে যে জীবনপ্রদ বারির প্রয়োজন, তাহা এখানেই রহিয়াছে। বন্ধুগণ, বিশ্বাস করুন ভারতই আবার পৃথিবীকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে প্লাবিত করিবে।

সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া, অনেক দেখিয়া শুনিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি; আপনাদের মধ্যেও যাঁহারা বিভিন্ন জাতির ইতিহাস মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই তথ্য অবগত আছেন। যদি বিভিন্ন দেশের ইতিহাস তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাইবে, এই সহিষ্ণু নিরীহ হিন্দু-জাতির নিকট পৃথিবী যতটা ঋণী, আর কোন জাতিরই নিকট ততটা নহে। 'নিরীহ হিন্দু' কথাটি সময়ে সময়ে তীব্র নিন্দারূপেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু যদি কোন তিরস্কারবাক্যের মধ্যে গভীর সত্য লুক্কায়িত থাকে, তবে ইহাতেই আছে। হিন্দুগণ চিরকালই ঈশ্বরের মহিমান্বিত সন্তান। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে সত্য; প্রাচীন ও বর্তমানকালে অনেক শক্তিশালী বড় বড় জাতি হইতে উচ্চ উচ্চ ভাব প্রসূত হইয়াছে সত্য; অদ্ভুত অদ্ভুত তত্ত্ব এক জাতি হইতে অপর জাতিতে প্রচারিত হইয়াছে সত্য; কোন কোন জাতির জীবন-তরঙ্গ প্রসারিত হইয়া চতুর্দিকে মহাশক্তিশালী ভাবের বীজসমূহ ছড়াইয়াছে সত্য; কিন্তু বন্ধুগণ, ইহাও দেখিবেন ঐ-সকল ভাব রণভেরীর নির্ঘোষে ও রণসাজে সজ্জিত গর্বিত সেনাকুলের পদবিক্ষেপের সহিত প্রচারিত হইয়াছিল; রক্তবন্যায় সিক্ত করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর রুধির-কর্দমের মধ্য দিয়াই ঐ-সকল ভাবকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। প্রত্যেক শক্তিপূর্ণ ভাব-প্রচারের পশ্চাতেই অগণিত মানুষের হাহাকার, অনাথের ক্রন্দন ও বিধবার অশ্রুপাত লক্ষিত হইয়াছে।

প্রধানতঃ এই উপায়েই অপর জাতিসকল পৃথিবীকে শিক্ষা দিয়াছে, ভারত কিন্তু শান্তভাবে সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া জীবিত রহিয়াছে। যখন গ্রীসের অস্তিত্বই ছিল না, রোম যখন ভবিষ্যতের অন্ধকারে লুক্কায়িত ছিল, যখন আধুনিক ইওরোপীয়দের পূর্বপুরুষেরা জার্মানির গভীর অরণ্যে অসভ্য অবস্থায় নীলবর্ণে নিজেদের রঞ্জিত করিত, তখনও ভারতের কর্মশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আরও প্রাচীনকালে—ইতিহাস যাহার কোন সংবাদ রাখে না, কিংবদন্তীও যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকারে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করে না—সেই অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভাবের পর ভাবের তরঙ্গ ভারত হইতে প্রসারিত হইয়াছে, কিন্তু উহার প্রত্যেকটি তরঙ্গই সম্মুখে শান্তি ও পশ্চাতে

আশীর্বাণী লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে কেবল আমরাই কখন অপর জাতিকে যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা জয় করি নাই, সেই শুভ কর্মের ফলেই আমরা এখনও জীবিত। এমন সময় ছিল, যখন প্রবল গ্রীকবাহিনীর বীরদর্পে বসুন্ধরা কম্পিত হইত। তাহারা এখন কোথায়? তাহাদের চিহ্নমাত্র নাই। গ্রীসের গৌরব-রবি আজ অস্তমিত! এমন সময় ছিল, যখন রোমের শ্যেনাঙ্কিত বিজয়পতাকা জগতের বাঞ্ছিত সমস্ত ভোগ্য পদার্থের উপরেই উড্ডীয়মান ছিল। রোম সর্বত্র যাইত এবং মানবজাতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিত। রোমের নামে পৃথিবী কাঁপিত। আজ ক্যাপিটোলাইন-গিরি[১] ভগ্নস্তূপমাত্রে পর্যবসিত! যেখানে সীজারগণ দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিতেন, সেখানে আজ ঊর্ণনাভ তন্তু রচনা করিতেছে! অন্যান্য অনেক জাতি এইরূপ উঠিয়াছে, আবার পড়িয়াছে, মদগর্বে স্ফীত হইয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া স্বল্পকালমাত্র অত্যাচার-কলঙ্কিত জাতীয় জীবন যাপন করিয়া তাহারা জলবুদ্‌বুদের ন্যায় বিলীন হইয়াছে!

এইরূপেই এই-সকল জাতি মনুষ্যসমাজে নিজেদের চিহ্ন এককালে অঙ্কিত করিয়া এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। আপনারা কিন্তু এখনও জীবিত, আর আজ যদি মনু এই ভারতভূমিতে পুনরাগমন করেন, তিনি এখানে আসিয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য হইবেন না; কোন অপরিচিত স্থানে আসিয়া পড়িলাম—এ-কথা তিনি মনে করিবেন না! সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী চিন্তা ও পরীক্ষার ফলস্বরূপ সেই প্রাচীন বিধানসকল এখানে এখনও বর্তমান; শত শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ সেই-সকল সনাতন আচার এখানে এখনও বর্তমান। যতই দিন যাইতেছে, ততই দুঃখ-দুর্বিপাক তাহাদের উপর আঘাতের পর আঘাত করিতেছে, তাহাতে শুধু এই ফল হইয়াছে যে, সেগুলি আরও দৃঢ়—আরও স্থায়ী আকার ধারণ করিতেছে। ঐ-সকল আচার ও বিধানের কেন্দ্র কোথায়, কোন্ হৃদয় হইতে শোণিত সঞ্চালিত হইয়া উহাদিগকে পুষ্ট রাখিতেছে, আমাদের জাতীয় জীবনের মূল উৎসই বা কোথায়—ইহা যদি জানিতে চান, তবে বিশ্বাস করুন তাহা এই ধর্মভাবেই বিদ্যমান। সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া আমি যে সামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি।

১ Capitoline Hill—রোম যে সাতটি পর্বতের উপর নির্মিত ছিল, তাহার একটি।

অন্যান্য জাতির পক্ষে ধর্ম—সংসারের অন্যান্য কাজের মতো একটা কাজ মাত্র। রাজনীতি-চর্চা আছে, সামাজিকতা আছে, ধন এবং প্রভুত্বের দ্বারা যাহা পাওয়া যায় তাহা আছে, ইন্দ্রিয়নিচয় যাহাতে আনন্দ অনুভব করে, তাহার চেষ্টা আছে। এইসব নানা কার্যের ভিতর এবং ভোগে নিস্তেজ ইন্দ্রিয়গ্রাম কিসে একটু উত্তেজিত হইবে—সেই চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে একটু আধটু ধর্মকর্মও অনুষ্ঠিত হয়। এখানে—এই ভারতে কিন্তু মানুষের সমগ্র চেষ্টা ধর্মের জন্য; ধর্মলাভই তাহার জীবনের একমাত্র কার্য।

চীন-জাপান যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, আপনাদের মধ্যে কয়জন তাহা জানেন? পাশ্চাত্য সমাজে যে-সকল গুরুতর রাজনীতিক ও সামাজিক আন্দোলন সংঘটিত হইয়া উহাকে সম্পূর্ণ নূতন আকার দিবার চেষ্টা করিতেছে, আপনাদের মধ্যে কয়জন সেই সংবাদ রাখেন? যদি রাখেন, দুই-চারি জন মাত্র। কিন্তু আমেরিকায় এক বিরাট ধর্মসভা বসিয়াছিল এবং সেখানে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী প্রেরিত হইয়াছিলেন, কি আশ্চর্য! দেখিতেছি—এখানকার সামান্য মুটে-মজুরও তাহা জানে! ইহাতে বুঝা যাইতেছে—হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে, জাতীয় জীবনের মূল কোথায়। পূর্বে দেশীয়, বিশেষতঃ বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে প্রাচ্য জনসাধারণের অজ্ঞতার গভীরতায় শোক প্রকাশ করিতে শুনিতাম, আর নিমেষে ভূপ্রদক্ষিণকারী পর্যটকগণের পুস্তকে ঐ-বিষয় পড়িতাম! এখন বুঝিতেছি, তাঁহাদের কথা আংশিক সত্য, আবার আংশিকভাবে অসত্যও বটে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি বা যে-কোন দেশের একজন কৃষককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন—'তুমি কোন্ রাজনীতিক দলভুক্ত?' সে বলিয়া দিবে—সে উদারনৈতিক বা রক্ষণশীল-দলভুক্ত,[১] এবং কাহাকেই বা ভোট দিবে। আমেরিকার কৃষক জানে, সে রিপাবলিকান না ডেমোক্রাট। এমন কি রৌপ্য-সমস্যা (Silver question) সম্বন্ধেও সে কিছু অবগত আছে। কিন্তু তাহার ধর্ম সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে বলিবে, 'বিশেষ কিছু জানি না, গির্জায় গিয়া থাকি মাত্র!' বড় জোর সে বলিবে—তাহার পিতা খৃষ্টধর্মের অমুক শাখাভুক্ত ছিলেন। সে জানে, গির্জায় যাওয়াই ধর্মের চূড়ান্ত।

অপর দিকে আবার একজন ভারতীয় কৃষককে জিজ্ঞাসা করুন, 'রাজনীতি

১ Radical or Conservative

সম্বন্ধে কিছু জানো কি?' সে আপনার প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া বলিবে, 'এটা আবার কি?' সোশ্যালিজম্ প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, পরিশ্রম ও মূলধনের সম্পর্ক এবং এইরূপ অন্যান্য কথা সে জীবনে কখনও শোনে নাই। সে কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করে,—রাজনীতি বা সমাজনীতির সে এইটুকু-মাত্র বুঝে। কিন্তু তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, 'তোমার ধর্ম কি?' সে নিজের কপালেব তিলক দেখাইয়া বলিবে, 'আমি এই সম্প্রদায়ভুক্ত।' ধর্মবিষয়ে প্রশ্ন করিলে তাহার মুখ হইতে এমন দু-একটি কথা বাহির হইবে, যাহাতে আমরাও উপকৃত হইতে পারি। নিজ অভিজ্ঞতা হইতে আমি ইহা বলিতেছি। তাই ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি।

প্রত্যেক ব্যক্তির একটা না একটা বিশেষত্ব আছে, প্রত্যেক ব্যক্তিই বিভিন্ন পথে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। আমরা হিন্দু—আমরা বলি, অনন্ত পূর্বজন্মের কর্মফলে মানুষের জীবন একটি বিশেষ নির্দিষ্ট পথে চলিয়া থাকে; কারণ অনন্ত অতীতকালের কর্মসমষ্টিই বর্তমান আকারে প্রকাশ পায়; আর আমরা বর্তমানের যেরূপ ব্যবহার করি, তদনুসারেই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইয়া থাকে। এই কারণেই দেখা যায়, পৃথিবীতে জাত প্রত্যেক ব্যক্তিরই একদিকে না একদিকে বিশেষ ঝোঁক থাকে; সেই পথে তাহাকে যেন চলিতেই হইবে; সেই ভাব অবলম্বন না করিলে সে বাঁচিতে পারিবে না। ব্যক্তি সম্বন্ধে যেমন, ব্যক্তির সমষ্টি জাতি সম্বন্ধেও ঠিক তাই। প্রত্যেক জাতির যেন একটা না একটা বিশেষ ঝোঁক থাকে। প্রত্যেক জাতিরই জীবনের যেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। সমগ্র মানবজাতির জীবনকে সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রত্যেক জাতিকেই যেন একটি বিশেষ ব্রত পালন করিতে হয়। নিজ নিজ জীবনের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিয়া প্রত্যেক জাতিকেই সেই সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। রাজনীতিক বা সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোন কালে আমাদের জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য নহে—কখন ছিলও না, আর জানিয়া রাখুন, কখন হইবেও না। তবে আমাদের জাতীয় জীবনের অন্য উদ্দেশ্য আছে। তাহা এই—সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি সংহত করিয়া যেন এক বিদ্যুদাধারে রক্ষা করা এবং যখনই সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই এই সমষ্টীভূত শক্তির বন্যায় সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত করা। যখনই পারসীক, গ্রীক, রোমক, আরব বা ইংরেজেরা তাহাদের অজেয় বাহিনী সহ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বিভিন্ন জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, তখনই

ভারতের দর্শন ও অধ্যাত্মবিদ্যা এই-সকল নূতন পথের মধ্য দিয়া জগতে বিভিন্ন জাতির শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে। সমগ্র মনুষ্যজাতির উন্নতিকল্পে শান্তিপ্রিয় হিন্দুরও কিছু দিবার আছে—আধ্যাত্মিক আলোকই পৃথিবীর কাছে ভারতের দান।

এইরূপে অতীতের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাই, যখনই কোন প্রবল দিগ্বিজয়ী জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের, অন্যান্য জাতির মিলন ঘটাইয়াছে, নিঃসঙ্গতাপ্রিয় ভারতের নিঃসঙ্গতা তখনই ভাঙিয়াছে ; যখনই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে, তখনই তাহার ফলস্বরূপ সমগ্র পৃথিবীতে ভারতের আধ্যাত্মিক তরঙ্গের বন্যা ছুটিয়াছে। বর্তমান (ঊনবিংশ) শতাব্দীর প্রারম্ভে বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার বেদের এক প্রাচীন অনুবাদ হইতে জনৈক ফরাসী যুবক-কৃত অস্পষ্ট ল্যাটিন অনুবাদ পাঠ করিয়া বলিয়াছেন, 'উপনিষদ্ ব্যতীত সারা পৃথিবীতে হৃদয়ের উন্নতিবিধায়ক আর কোন গ্রন্থ নাই। জীবৎকালে উহা আমাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, মৃত্যুকালেও উহাই আমাকে শান্তি দিবে।' অতঃপর সেই বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন, 'গ্রীক সাহিত্যের পুনরভ্যুদয়ে চিন্তাপ্রণালীতে যে পরিবর্তন আসিয়াছিল, শীঘ্রই তাহা অপেক্ষা শক্তিশালী ও ব্যাপক পরিবর্তন জগৎ প্রত্যক্ষ করিবে।' আজ তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতেছে।

যাঁহারা চক্ষু খুলিয়া আছেন, যাঁহারা পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন জাতির মনের গতি বুঝেন, যাঁহারা চিন্তাশীল এবং বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন, তাঁহারা দেখিবেন, ভারতীয় চিন্তার এই ধীর অবিরাম প্রবাহের দ্বারা জগতের ভাবগতি, চালচলন ও সাহিত্যের কি গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। তবে ভারতীয় প্রচারের একটি বিশেষত্ব আছে। আমি সে-সম্বন্ধে আপনাদিগকে পূর্বেই কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। আমরা কখনও বন্দুক ও তরবারির সাহায্যে কোন ভাব প্রচার করি নাই। যদি ইংরেজী ভাষায় কোন শব্দ থাকে, যাহা দ্বারা জগতের নিকট ভারতের দান প্রকাশ করা যাইতে পারে —যদি ইংরেজী ভাষায় এমন কোন শব্দ থাকে, যাহা দ্বারা মানবজাতির উপর ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহা হইতেছে— fascination (সম্মোহনী শক্তি)। হঠাৎ যাহা মানুষকে মুগ্ধ করে, ইহা সেরূপ কিছু নহে, বরং ঠিক তাহার বিপরীত ; উহা ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে মানবমনে

তাহার প্রভাব বিস্তার করে। অনেকের পক্ষে ভারতীয় চিন্তা, ভারতীয় প্রথা, ভারতীয় আচার-ব্যবহার, ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় সাহিত্য প্রথম দৃষ্টিতে বিসদৃশ বোধ হয়; কিন্তু যদি মানুষ অধ্যবসায়ের সহিত আলোচনা করে, মনোযোগের সহিত ভারতীয় গ্রন্থরাশি অধ্যয়ন করে, ভারতীয় আচার-ব্যবহারের মূলীভূত মহান্ তত্ত্বসমূহের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হয়, তবে দেখা যাইবে শতকরা নিরানব্বই জনই ভারতীয় চিন্তার সৌন্দর্যে, ভারতীয় ভাবে মুগ্ধ হইয়াছে। লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত, অশ্রুত অথচ মহা-ফলপ্রসূ, ঊষাকালীন শান্ত শিশির-সম্পাতের মতো এই ধীর সহিষ্ণু 'সর্বংসহ' ধর্মপ্রাণ জাতি চিন্তা-জগতে নিজ প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

আবার প্রাচীন ইতিহাসের পুনরভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। কারণ আজ যখন আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্য-আবিষ্কারের মুহুর্মুহুঃ প্রবল আঘাতে পুরাতন আপাতদৃঢ় ও অভেদ্য ধর্মবিশ্বাসগুলির ভিত্তি পর্যন্ত শিথিল হইয়া যাইতেছে, যখন বিভিন্ন সম্প্রদায় মানব-জাতিকে নিজ নিজ মতের অনুবর্তী করিবার যে বিশেষ বিশেষ দাবি করিয়া থাকে, তাহা শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে, যখন আধুনিক প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের প্রবল মুষলাঘাত প্রাচীন বদ্ধমূল সংস্কারগুলিকে ভঙ্গুর কাচ-পাত্রের মতো চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, যখন পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম কেবল অজ্ঞদিগের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, আর জ্ঞানিগণ ধর্মসম্পর্কিত সমুদয় বিষয়কে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখনই যে ভারতের অধিবাসিগণের ধর্মজীবন সর্বোচ্চ দার্শনিক সত্য দ্বারা নিয়মিত, সেই ভারতের দর্শন—ভারতীয় মনের ধর্ম-বিষয়ক সর্বোচ্চ ভাবসমূহ জগতের সমক্ষে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাই আজ এই সকল মহান্ তত্ত্ব—অসীম জগতের একত্ব, নির্গুণ ব্রহ্মবাদ, জীবাত্মার অনন্ত স্বরূপ ও বিভিন্ন জীবশরীরে তাহার অবিচ্ছেদ সংক্রমণরূপ অপূর্ব তত্ত্ব, ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত তত্ত্ব—পাশ্চাত্য জগৎকে বৈজ্ঞানিক জড়বাদ হইতে রক্ষা করিতে স্বভাবতই অগ্রসর হইয়াছে। প্রাচীন সম্প্রদায়সমূহ জগৎকে একটি ক্ষুদ্র মৃৎপিণ্ডমাত্র মনে করিত, আর ভাবিত কালও অতি অল্পদিনমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। দেশ, কাল ও নিমিত্তের অনন্তত্ব এবং সর্বোপরি মানবাত্মার অনন্ত মহিমার বিষয় কেবল আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে বর্তমান, এবং সর্বকালেই এই মহান্ তত্ত্ব সর্বপ্রকার ধর্মতত্ত্ব অনুসন্ধানের ভিত্তি। যখন ক্রমোন্নতিবাদ, শক্তির নিত্যতা (Conservation of Energy) প্রভৃতি আধুনিক প্রচণ্ড মতগুলি

সর্বপ্রকার অপরিণত ধর্মমতের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে—তখন সেই মানবাত্মার অপূর্ব স্বষ্টি, ঈশ্বরের অদ্ভুত বাণীস্বরূপ বেদান্তের অপূর্ব হৃদয়গ্রাহী, মনের উন্নতি-ও বিস্তারকারী তত্ত্বসমূহ ব্যতীত আর কিছু কি শিক্ষিত মানবজাতির শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে ?

কিন্তু ইহাও বলিতে চাই, ভারতের বাহিরে ভারতীয় ধর্মের প্রভাব বলিতে আমি ভারতীয় ধর্মের মূলতত্ত্বসমূহ—যেগুলির উপর ভারতীয় ধর্মরূপ সৌধ নির্মিত —সেগুলি মাত্র লক্ষ্য করিতেছি। উহার বিস্তারিত শাখা-প্রশাখা, শত শত শতাব্দীর সামাজিক আবশ্যকতায় যে-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৌণ বিষয় উহার সহিত জড়িত হইয়াছে, সেগুলি বিভিন্ন প্রথা, দেশাচার ও সামাজিক কল্যাণবিষয়ক খুঁটিনাটি বিচার ; এগুলি প্রকৃতপক্ষে 'ধর্ম'-সংজ্ঞার অন্তর্ভূত হইতে পারে না।

আমরা ইহাও জানি, আমাদের শাস্ত্রে দুই প্রকার সত্যের নির্দেশ করা হইয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদ করা হইয়াছে। একটি সত্য সনাতন —উহা মানুষের স্বরূপ, আত্মার স্বরূপ, ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ, ঈশ্বরের স্বরূপ, পূর্ণত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, সৃষ্টির অনন্তত্ব, জগৎ যে শূন্য হইতে প্রসূত নহে—পূর্বে অবস্থিত কোন কিছুর বিকাশমাত্র—এতদ্বিষয়ক মতবাদ, যুগ-প্রবাহসম্বন্ধীয় আশ্চর্য নিয়মাবলী এবং এইরূপ অন্যান্য তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির সর্বজনীন, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক বিষয়সমূহ এই-সকল সনাতন তত্ত্বের ভিত্তি। এগুলি ছাড়া আবার অনেকগুলি গৌণ বিধিও আমাদের শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় ; সেইগুলির দ্বারা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কার্য নিয়মিত। সেগুলিকে 'শ্রুতি'র অন্তর্গত বলিতে পারা যায় না, ঐগুলি প্রকৃতপক্ষে 'স্মৃতি'র—পুরাণের অন্তর্গত। এগুলির সহিত প্রথমোক্ত তত্ত্বসমূহের কোন সম্পর্ক নাই। আমাদের আর্যজাতির ভিতরও এগুলি ক্রমাগত পরিবর্তিত হইয়া বিভিন্ন আকারে পরিণত হইতেছে, দেখা যায়। এক যুগের যে বিধান, অন্য যুগের তাহা নহে। যখন এ যুগের পর অন্য যুগ আসিবে, তখন ঐগুলি আবার অন্য আকার ধারণ করিবে। মহামনা ঋষিগণ আবির্ভূত হইয়া নূতন দেশের ও কালের উপযোগী নূতন নূতন আচার প্রবর্তন করিবেন।

জীবাত্মা, পরমাত্মা এবং ব্রহ্মাণ্ডের এই-সকল অপূর্ব অনন্ত চিত্তোন্নতিবিধায়ক ক্রমবিকাশশীল ধারণার ভিত্তিস্বরূপ মহান তত্ত্বসমূহ ভারতেই প্রসূত হইয়াছে। ভারতেই কেবল মানুষ ক্ষুদ্র জাতীয় দেবতার (tribal gods) জন্য 'আমার

ঈশ্বর সত্য, তোমার ঈশ্বর মিথ্যা ; এস, যুদ্ধের দ্বারা ইহার মীমাংসা করি' বলিয়া প্রতিবেশীর সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয় নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার জন্য যুদ্ধরূপ সঙ্কীর্ণ ভাব কেবল এই ভারতেই কখন দেখা দিতে পারে নাই। মানুষের অনন্ত স্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই মহান্ মূলতত্ত্বগুলি সহস্র বর্ষ পূর্বের ন্যায় আজও মানবজাতির কল্যাণসাধনে সক্ষম। যতদিন এই পৃথিবী থাকিবে, যতদিন কর্মফল থাকিবে, যতদিন আমরা ব্যষ্টি জীবরূপে জন্মগ্রহণ করিব এবং যতদিন স্বীয় শক্তির দ্বারা আমাদিগকে নিজেদের অদৃষ্ট গঠন করিতে হইবে, ততদিন উহাদের ঐরূপ শক্তি বর্তমান থাকিবে।

সর্বোপরি, ভারত জগৎকে কোন্ তত্ত্ব শিখাইবে, তাহা বলিতেছি। যদি আমরা বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধর্মের উৎপত্তি ও পরিণতির প্রণালী লক্ষ্য করি, তবে আমরা সর্বত্র দেখিব যে, প্রথমে প্রত্যেক জাতিরই পৃথক পৃথক দেবতা ছিল। এই সকল জাতির মধ্যে যদি পরস্পর বিশেষ সম্বন্ধ থাকিত, তবে সেই সকল দেবতার আবার একটি সাধারণ নাম হইত---যেমন বেবিলোনীয় দেবতাগণ। যখন বেবিলোনীয়েরা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন; তখন তাঁহাদের দেবতাসকলের সাধারণ নাম ছিল 'বল' (Baal)। এইরূপ য়াহুদী জাতিরও বিভিন্ন দেবগণের সাধারণ নাম ছিল 'মোলক' (Moloch)। আরও দেখিতে পাইবেন, এই-সকল বিভিন্ন জাতির মধ্যে জাতিবিশেষ যখন অপরগুলি হইতে বড় হইয়া উঠিত; তখন তাহারা আপন রাজাকে সকলের রাজা বলিয়া দাবি করিত। এই ভাব হইতে আবার স্বভাবতই এইরূপ ঘটিত যে, সেই জাতি নিজের দেবতাকেও অপর সকলের দেবতা করিয়া তুলিতে চাহিত। বেবিলন-বাসিগণ বলিত, 'বল মেরোডক' দেবতা সর্বশ্রেষ্ঠ—অন্যান্য দেবগণ তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। 'মোলক য়াভে' অন্যান্য মোলক হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আর দেবগণের এই শ্রেষ্ঠতা-নিকৃষ্টতা যুদ্ধের দ্বারা স্থিরীকৃত হইত। ভারতেও দেবগণের মধ্যে এই সংঘর্ষ—এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী দেবগণ শ্রেষ্ঠত্বলাভের জন্য পরস্পরের প্রতিযোগিতা করিতেন। কিন্তু ভারতের ও সমগ্র জগতের সৌভাগ্যক্রমে এই অশান্তি-কোলাহলের মধ্য হইতে 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'[১]—একমাত্র সৎস্বরূপই আছেন, জ্ঞানী ঋষিগণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে

১ ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬

বর্ণনা করিয়া থাকেন—এই মহাবাণী উত্থিত হইয়াছিল। শিব বিষ্ণু অপেক্ষা বড় নহেন, অথবা বিষ্ণুই সব, শিব কিছুই নহেন—তাহাও নহে। এক ভগবানকেই কেহ শিব, কেহ বিষ্ণু, আবার অপরে অন্যান্য নানা নামে ডাকিয়া থাকে। নাম বিভিন্ন, কিন্তু বস্তু এক। পূর্বোক্ত কয়েকটি কথার মধ্যে ভারতের সমগ্র ইতিহাস পাঠ করিতে পারা যায়। সমগ্র ভারতের বিস্তারিত ইতিহাস ওজস্বী ভাষায় সেই এক মূল তত্ত্বের পুনরুক্তিমাত্র। এই দেশে এই তত্ত্ব বার বার উচ্চারিত হইয়াছে; পরিশেষে উহা এই জাতির রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, এই জাতির ধমনীতে প্রবাহিত প্রতিটি শোণিতবিন্দুতে উহা মিশ্রিত হইয়া শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—জাতীয় জীবনের উপাদানস্বরূপ হইয়া গিয়াছে, যে উপাদানে এই বিরাট জাতীয় শরীর নির্মিত, তাহার অংশস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। এইরূপে এই ভারতভূমি পরধর্ম-সহিষ্ণুতার এক অপূর্ব লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই শক্তিবলেই আমরা আমাদের এই প্রাচীন মাতৃভূমিতে সকল ধর্মকে, সকল সম্প্রদায়কে সাদরে ক্রোড়ে স্থান দিবার অধিকার লাভ করিয়াছি।

এই ভারতে আপাতবিরোধী বহু সম্প্রদায় বর্তমান, অথচ সকলেই নির্বিরোধে বাস করিতেছে। এই অপূর্ব ব্যাপারের একমাত্র ব্যাখ্যা—পরমধর্ম-সহিষ্ণুতা। তুমি হয়তো দ্বৈতবাদী, আমি হয়তো অদ্বৈতবাদী। তোমার হয়তো বিশ্বাস—তুমি ভগবানের নিত্য দাস, আবার আর একজন হয়তো বলিতে পারে, সে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন; কিন্তু উভয়েই খাঁটি হিন্দু। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? সেই মহাবাক্য পাঠ কর, তাহা হইলেই বুঝিবে ইহা কিরূপে সম্ভব—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—সৎস্বরূপ এক, ঋষিগণ তাঁহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন।

হে আমার স্বদেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দ! সর্বোপরি পৃথিবীকে এই মহান্ সত্যটি আমাদের শিখাইতে হইবে। অন্যান্য দেশের বড় বড় শিক্ষিত ব্যক্তিগণও নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া আমাদের ধর্মকে পৌত্তলিকতা বলেন। আমি তাঁহাদিগকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা স্থির হইয়া কখনও ভাবেন না যে, তাঁহাদের মস্তিষ্কে কি ঘোর কুসংস্কাররাশি বর্তমান! এখনও সর্বত্র এই ভাব—এই ঘোর সাম্প্রদায়িকতা, মনের এই নীচ সঙ্কীর্ণতা! তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের নিজেদের যাহা আছে, তাহাই মহা মূল্যবান্; অর্থোপার্জনই তাঁহাদের

মতে জীবনের একমাত্র সদ্ব্যবহার। তাঁহাদের যাহা আছে তাহাই একমাত্র কাম্য বস্তু, আর বাকি সব কিছুই নহে। যদি তিনি মৃত্তিকা দ্বারা কোন অসার বস্তু নির্মাণ করিতে পারেন, অথবা কোন যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন, তবে সব কিছু ফেলিয়া দিয়া ঐগুলিকেই ভাল বলিতে হইবে। শিক্ষা ও বিদ্যার বহুল প্রচার সত্ত্বেও সমগ্র পৃথিবীর এই অবস্থা! কিন্তু বাস্তবিক পৃথিবীতে এখনও শিক্ষার প্রয়োজন—এখনও সভ্যতার প্রয়োজন। বলিতে কি, এখনও কোথাও সভ্যতার আরম্ভমাত্র হয় নাই, এখনও মনুষ্যজাতির শতকরা নিরানব্বই জন অল্প-বিস্তর অসভ্য অবস্থায় রহিয়াছে। বিভিন্ন পুস্তকে এই সব কথা পড়িতে পারো, পরধর্ম-সাহিষ্ণুতা ও এরূপ তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু নিজ অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতেছি, এখনও পৃথিবীতে এই ভাবগুলি নাই বলিলেই হয়; শতকরা নিরানব্বই জন এ-সকল বিষয় চিন্তাও করে না। পৃথিবীর যে-কোন দেশে আমি গিয়াছি, সেখানেই দেখিয়াছি—এখনও পরধর্মাবলম্বীর উপর দারুণ নির্যাতন বর্তমান; নূতন বিষয় শিক্ষা করা সম্বন্ধে পূর্বেও যে-সকল আপত্তি উঠিত, এখনও সেই পুরানো আপত্তিগুলিই উত্থাপিত হইয়া থাকে। জগতে যতটুকু পরধর্ম-সহিষ্ণুতা ও ধর্মভাবের প্রতি সহানুভূতি আছে, কার্যতঃ তাহা এইখানেই—এই আর্যভূমিতেই বিদ্যমান, অপর কোথাও নাই। কেবল এখানেই হিন্দুরা মুসলমানদের জন্য মসজিদ ও খৃষ্টানদের জন্য গির্জা নির্মাণ করিয়া দেয়, আর কোথাও নহে। যদি তুমি অন্য কোন দেশে গিয়া মুসলমানদিগকে বা অন্য ধর্মাবলম্বিগণকে তোমার জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দিতে বলো, দেখিবে তাহারা কিরূপ সাহায্য করে। তৎপরিবর্তে তোমার মন্দির এবং পারে তো সেই সঙ্গে তোমার দেহমন্দিরটিও তাহারা ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে। এই কারণেই পৃথিবীর পক্ষে এই শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন—ভারতের নিকট পৃথিবীকে এখনও এই পরধর্ম-সহিষ্ণুতা—শুধু তাহাই নহে, পরধর্মের প্রতি গভীর সহানুভূতি শিক্ষা করিতে হইবে। শিবমহিম্নঃস্তোত্রে কথিত হইয়াছেঃ

> ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
> প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
> রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
> নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥

—বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত ও বৈষ্ণব মত—এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতসম্বন্ধে কেহ একটিকে শ্রেষ্ঠ, কেহ অপরটিকে হিতকর বলে। সমুদ্র যেমন নদীসকলের একমাত্র গম্যস্থান, রুচিভেদে সরল-কুটিল নানাপথগামী জনগণেরও তুমিই সেরূপ একমাত্র গম্য।

ভিন্ন ভিন্ন পথে যাইলেও সকলেই কিন্তু একই লক্ষ্যে চলিয়াছে। কেহ একটু বক্রপথে ঘুরিয়া, কেহ বা সরল পথে যাইতে পারে; কিন্তু অবশেষে সকলেই সেই এক প্রভুর নিকট পৌঁছিবে। যখন তোমরা শুধু তাঁহাকে শিবলিঙ্গে নয়, সর্বত্র দেখিবে, তখনই তোমাদের শিব-ভক্তি এবং তোমাদের শিবদর্শন সম্পূর্ণ হইবে। তিনিই যথার্থ সাধু, তিনিই যথার্থ হরিভক্ত, যিনি সেই হরিকে সর্বজীবে ও সর্বভূতে দেখিয়া থাকেন। যদি তুমি শিবের যথার্থ ভক্ত হও, তবে তুমি তাঁহাকে সর্বজীবে ও সর্বভূতে দেখিবে। যে নামে, যে রূপে তাঁহাকে উপাসনা করা হউক না কেন, তোমাকে বুঝিতে হইবে যে, সব তাঁহারই উপাসনা। কাবা-র[১] দিকে মুখ করিয়াই কেহ জানু অবনত করুক অথবা খ্রীষ্টীয় গীর্জায় বা বৌদ্ধ চৈত্যেই উপাসনা করুক, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে তাঁহারই উপাসনা করিতেছে। যে-কোন নামে যে-কোন মূর্তির উদ্দেশে যে-ভাবেই পুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হউক না কেন, তাহা ভগবানের পাদপদ্মে পৌঁছায়, কারণ তিনি সকলের একমাত্র প্রভু, সকল আত্মার অন্তরাত্মা। পৃথিবীতে কি অভাব, তাহা তিনি আমাদের অপেক্ষা অনেক ভালরূপে জানেন। সর্ববিধ ভেদ দূরীভূত হইবে, ইহা অসম্ভব। ভেদ থাকিবেই। বৈচিত্র্য ব্যতীত জীবন অসম্ভব। চিন্তা-রাশির এই সংঘর্ষ ও বৈচিত্র্যই জ্ঞান উন্নতি প্রভৃতি সকলের মূলে। পৃথিবীতে অসংখ্য পরস্পরবিরোধী ভাবসমূহ থাকিবেই। কিন্তু তাই বলিয়া যে পরস্পরকে ঘৃণা করিতে হইবে, পরস্পর বিরোধ করিতে হইবে, তাহার কোন প্রয়োজন নাই।

অতএব সেই মূল সত্য আমাদিগকে পুনরায় শিক্ষা করিতে হইবে, যাহা কেবলমাত্র এখান হইতে আমাদের মাতৃভূমি হইতেই প্রচারিত হইয়াছিল। আর একবার ভারতকে জগতের সমক্ষে এই সত্য প্রচার করিতে হইবে। কেন আমি এ-কথা বলিতেছি? কারণ এই সত্য শুধু যে আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থেই

১ মক্কায় অবস্থিত পবিত্র প্রস্তরখণ্ড-সমন্বিত উপাসনাস্থল।

নিবদ্ধ, তাহা নহে; আমাদের জাতীয় সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগে, আমাদের জাতীয় জীবনে ইহা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এখানে—কেবল এখানেই ইহা প্রাত্যহিক জীবনে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, আর চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, এখানে ছাড়া আর কোথাও ইহা কার্যে পরিণত করা হয় নাই। এইভাবে আমাদিগকে জগৎকে ধর্মশিক্ষা দিতে হইবে। ভারত ইহা অপেক্ষাও অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা দিতে সমর্থ বটে, কিন্তু সেগুলি কেবল পণ্ডিতদের জন্য। এই নম্রতা, শান্তভাব, তিতিক্ষা, পরধর্ম-সহিষ্ণুতা, সহানুভূতি ও ভ্রাতৃভাবের মহতী শিক্ষা আবালবৃদ্ধবনিতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সর্বজাতি, সর্ববর্ণ শিক্ষা করিতে পারে। 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।'

জাফনায় বক্তৃতা—বেদান্ত

কলম্বো হইতে কাণ্ডি, অনুরাধাপুর ও ভাভোনিয়া হইয়া স্বামীজী জাফনা শহরে পদার্পণ করেন। সর্বত্র তিনি বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। জাফনায় অভিনন্দনের উত্তরে ২৩শে জানুআরি হিন্দু কলেজ প্রাঙ্গণে তিনি 'বেদান্ত' সম্বন্ধে এই সুদীর্ঘ বক্তৃতাটি দেন।

বিষয় অতি বৃহৎ, কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ত; একটি বক্তৃতায় হিন্দুদিগের ধর্মের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ অসম্ভব। সুতরাং আমি তোমাদের নিকট আমাদের ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি যত সহজ ভাষায় পারি, বর্ণনা করিব। যে 'হিন্দু' নামে পরিচয় দেওয়া এখন আমাদের প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এখন কিন্তু তাহার আর সার্থকতা নাই; কারণ ঐ শব্দের অর্থ—'যাহারা সিন্ধুনদের পারে বাস করিত'। প্রাচীন পারসীকদের বিকৃত উচ্চারণে 'সিন্ধু' শব্দই 'হিন্দু'রূপে পরিণত হয়; তাঁহারা সিন্ধুনদের অপরতীর-বাসী সকলকেই হিন্দু বলিতেন। এইরূপে 'হিন্দু' শব্দ আমাদের নিকট আসিয়াছে; মুসলমান-শাসনকাল হইতে আমরা ঐ শব্দ নিজেদের উপর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। অবশ্য এই শব্দ-ব্যবহারে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়াছি, এখন ইহার সার্থকতা নাই; কারণ তোমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, বর্তমানকালে সিন্ধুনদের এই দিকে সকলে আর প্রাচীনকালের মতো এক ধর্ম মানেন না। সুতরাং ঐ শব্দে শুধু খাঁটি হিন্দু বুঝায় না; উহাতে মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন এবং ভারতের

অন্যান্য অধিবাসিগণকেও বুঝাইয়া থাকে। অতএব আমি 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহার করিব না। তবে কোন্ শব্দ ব্যবহার করিব? আমরা 'বৈদিক' শব্দ ব্যবহার করিতে পারি, অথবা 'বৈদান্তিক' শব্দ ব্যবহার করিলে আরও ভাল হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ প্রধান প্রধান ধর্মই বিশেষ বিশেষ কতকগুলি গ্রন্থকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস, এই গ্রন্থগুলি ঈশ্বর অথবা কোন অতিপ্রাকৃত পুরুষবিশেষের বাক্য; সুতরাং ঐ গ্রন্থগুলিই তাহাদের ধর্মের ভিত্তি। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে ঐ-সকল গ্রন্থের মধ্যে হিন্দুদের বেদই প্রাচীনতম। অতএব বেদ সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক।

বেদ-নামক শব্দরাশি কোন পুরুষের উক্তি নহে। উহার সন-তারিখ এখনও নির্দিষ্ট হয় নাই, কখনও নির্দিষ্ট হইতে পারে না। আর আমাদের (হিন্দুদের) মতে বেদ অনাদি অনন্ত। একটি বিশেষ কথা তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত, পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম—ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বর অথবা ভগবানের দূত বা প্রেরিত পুরুষের বাণী বলিয়া তাহাদের শাস্ত্রের প্রামাণ্য দেখায়। হিন্দুরা কিন্তু বলেন, বেদের অন্য কোন প্রমাণ নাই, বেদ স্বতঃপ্রমাণ; কারণ বেদ অনাদি অনন্ত, উহা ঈশ্বরের জ্ঞানরাশি। বেদ কখনও লিখিত হয় নাই, উহা কখনও সৃষ্ট হয় নাই, অনন্তকাল ধরিয়া উহা রহিয়াছে। যেমন সৃষ্টি অনাদি অনন্ত, তেমনি ঈশ্বরের জ্ঞানও অনাদি অনন্ত। 'বেদ' অর্থে এই ঐশ্বরিক জ্ঞানরাশি; বিদ্-ধাতুর অর্থ—জানা। বেদান্ত-নামক জ্ঞানরাশি ঋষিগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত। ঋষি-শব্দের অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা; পূর্ব হইতেই অবস্থিত জ্ঞানকে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন মাত্র, ঐ জ্ঞান ও ভাবরাশি তাঁহার নিজের চিন্তাপ্রসূত নহে। যখনই তোমরা শুনিবে, বেদের অমুক অংশের ঋষি অমুক, তখন ভাবিও না যে, তিনি উহা লিখিয়াছেন অথবা নিজের মন হইতে উহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি পূর্ব হইতে অবস্থিত ভাবরাশির দ্রষ্টামাত্র। ঐ ভাবরাশি অনন্ত কাল হইতেই এই জগতে বিদ্যমান ছিল—ঋষি উহা আবিষ্কার করিলেন মাত্র। ঋষিগণ আধ্যাত্মিক আবিষ্কর্তা।

বেদ-নামক গ্রন্থরাশি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডের মধ্যে নানাবিধ যাগযজ্ঞের কথা আছে; উহাদের মধ্যে অধিকাংশই বর্তমান যুগের অনুপযোগী বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং কতকগুলি এখনও কোন না কোন আকারে বর্তমান। কর্মকাণ্ডের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি, যথা সাধারণ মানবের কর্তব্য—ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এই-সকল বিভিন্ন

আশ্রমীর বিভিন্ন কর্তব্য এখনও পর্যন্ত অল্প-বিস্তর অনুসৃত হইতেছে। দ্বিতীয় ভাগ জ্ঞানকাণ্ড—আমাদের ধর্মের আধ্যাত্মিক অংশ। ইহার নাম 'বেদান্ত' অর্থাৎ বেদের শেষ ভাগ—বেদের চরম লক্ষ্য। বেদজ্ঞানের এই সারভাগের নাম বেদান্ত বা উপনিষদ্। আর ভারতের সকল সম্প্রদায়—দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী অথবা সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব—যে-কেহ হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে চাহে, তাহাকেই বেদের এই উপনিষদ্‌ভাগকে মানিয়া চলিতে হইবে। তাহারা নিজ নিজ রুচি-অনুযায়ী উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করিতে পারে; কিন্তু তাহাদিগকে উহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হইবে। এই কারণেই আমরা 'হিন্দু' শব্দের পরিবর্তে 'বৈদান্তিক' শব্দ ব্যবহার করিতে চাই। ভারতে সকল প্রাচীনপন্থী দার্শনিককেই বেদান্তের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইয়াছে—আর আজকাল ভারতে হিন্দুধর্মের যত শাখাপ্রশাখা আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে যতই বিসদৃশ বোধ হউক না কেন, উহাদের উদ্দেশ্য যতই জটিল বোধ হউক না কেন, যিনি বেশ ভাল করিয়া উহাদের আলোচনা করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন—উপনিষদ্ হইতেই উহাদের ভাবরাশি গৃহীত হইয়াছে। এই-সকল উপনিষদের ভাব আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় এতদূর প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, যাঁহারা হিন্দুধর্মের খুব অমার্জিত শাখাবিশেষেরও রূপকতত্ত্ব আলোচনা করিবেন, তাঁহারা সময়ে সময়ে দেখিয়া আশ্চর্য হইবেন যে, উপনিষদে রূপকভাবে বর্ণিত তত্ত্ব দৃষ্টান্তরূপে পরিণত হইয়া ঐ-সকল ধর্মে স্থান লাভ করিয়াছে। উপনিষদেরই সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক রূপকগুলি আজকাল স্থূলভাবে পরিণত হইয়া আমাদের গৃহে পূজার বস্তু হইয়া রহিয়াছে। অতএব আমাদের পূজার যতপ্রকার যন্ত্র-প্রতিমাদি আছে, সকলই বেদান্ত হইতে আসিয়াছে, কারণ বেদান্তে ঐগুলি রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্রমশঃ ঐ ভাবগুলি জাতির মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া পরিশেষে যন্ত্র-প্রতিমাদিরূপে প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে।

বেদান্তের পরই স্মৃতির প্রামাণ্য। এগুলি ঋষি-লিখিত গ্রন্থ, কিন্তু ইহাদের প্রামাণ্য বেদান্তের অধীন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বিগণের পক্ষে তাহাদের শাস্ত্র যেরূপ, আমাদের পক্ষে স্মৃতিও তদ্রূপ। আমরা স্বীকার করিয়া থাকি যে, বিশেষ বিশেষ মুনি এই-সকল স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন; এই অর্থে অন্যান্য ধর্মের শাস্ত্রসমূহের প্রামাণ্য যেরূপ, স্মৃতির প্রামাণ্যও সেইরূপ; তবে স্মৃতিই আমাদের

চরম প্রমাণ নহে। স্মৃতির কোন অংশ যদি বেদান্তের বিরোধী হয়, তবে উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, উহার কোন প্রামাণ্য থাকিবে না। আবার এই-সকল স্মৃতি যুগে যুগে ভিন্ন। আমরা শাস্ত্রে পাঠ করি—সত্যযুগে এই এই স্মৃতির প্রামাণ্য; ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই-সকল যুগের প্রত্যেক যুগে আবার অন্যান্য স্মৃতির প্রামাণ্য। দেশ-কাল-পাত্রের পরিবর্তন অনুসারে আচার প্রভৃতির পরিবর্তন হইয়াছে, আর স্মৃতি প্রধানতঃ এই আচারের নিয়ামক বলিয়া সময়ে সময়ে উহাদেরও পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। আমি এই বিষয়টি তোমাদিগকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে বলি।

বেদান্তে ধর্মের যে মূল তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা অপরিবর্তনীয়। কেন?—কারণ মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে অপরিবর্তনীয় তত্ত্বসমূহ রহিয়াছে, ঐগুলি তাহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐগুলির কখনও পরিবর্তন হইতে পারে না। আত্মা, স্বর্গ প্রভৃতির তত্ত্ব কখনও পরিবর্তিত হইতে পারে না। সহস্র বৎসর পূর্বে ঐ-সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, এখনও তাহাই আছে, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরেও তাহাই থাকিবে।

কিন্তু যে-সকল ধর্মকার্য আমাদের সামাজিক অবস্থা ও সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে, সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সেইগুলিও পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। সুতরাং সময়-বিশেষে কোন বিশেষ বিধি সত্য ও ফলপ্রদ হইবে, অপর সময়ে নহে। তাই আমরা দেখিতে পাই, কোন সময়ে কোন খাদ্য-বিশেষের বিধান রহিয়াছে, অন্য সময়ে তাহা আবার নিষিদ্ধ। সেই খাদ্য সেই সময়-বিশেষের উপযোগী ছিল, কিন্তু ঋতুপরিবর্তন ও অন্যান্য কারণে উহা তৎকালের অনুপযোগী হওয়ায় স্মৃতি তখন ঐ খাদ্য-ব্যবহার নিষেধ করিয়াছেন। এই কারণে স্বভাবতই প্রতীত হইতেছে যে, যদি বর্তমানকালে আমাদের সমাজের কোন পরিবর্তন আবশ্যক হয়, তবে ঐ পরিবর্তন করিতেই হইবে; কিভাবে ঐ-সকল পরিবর্তন করিতে হইবে—ঋষিরা আসিয়া তাহা দেখাইয়া দিবেন। আমাদের ধর্মের মূল সত্যগুলি বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হইবে না, উহারা সমভাবে থাকিবে।

তারপর পুরাণ। পুরাণ পঞ্চলক্ষণান্বিত। উহাতে ইতিহাস, সৃষ্টিতত্ত্ব, নানাবিধ রূপকের দ্বারা দার্শনিক-তত্ত্বসকলের বিবৃতি প্রভৃতি বহু বিষয় আছে। বৈদিক ধর্ম সর্বসাধারণে প্রচার করিবার জন্য পুরাণ লিখিত হয়। বেদ যে-ভাষায় লিখিত তাহা অতি প্রাচীন। অতি অল্পসংখ্যক পণ্ডিতই ঐ-সকল গ্রন্থের সময়-

নিরূপণে সমর্থ। পুরাণ সমসাময়িক লোকের ভাষায় লিখিত—উহাকে আধুনিক সংস্কৃত বলা যায়। ঐগুলি পণ্ডিতদিগের জন্য নহে, সাধারণ লোকের জন্য ; কারণ সাধারণ লোক দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম। তাহাদিগকে ঐ-সকল তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য স্থূলভাবে সাধু, রাজা ও মহাপুরুষগণের জীবনচরিত এবং ঐ জাতির মধ্যে যে-সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, সেগুলির মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত। ঋষিরা যে-কোন বিষয় পাইয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু প্রত্যেকটিই ধর্মের নিত্য সত্য বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

তারপর তন্ত্র। এইগুলি কতক কতক বিষয়ে প্রায় পুরাণের মতো এবং তাহাদের মধ্যে কতকগুলিতে কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত প্রাচীন যাগযজ্ঞকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এইগুলি হিন্দুদের শাস্ত্র। আর যে জাতির মধ্যে এত অধিকসংখ্যক ধর্মশাস্ত্র বিদ্যমান এবং যে জাতি অগণিত বর্ষ ধরিয়া দর্শন ও ধর্মের চিন্তায় তাহার শক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছে, সে-জাতির মধ্যে এত অধিক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় অতি স্বাভাবিক। আরও সহস্র সহস্র সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় কেন হইল না, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। কোন কোন বিষয়ে এই-সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিশয় বিভিন্নতা বিদ্যমান। সম্প্রদায়গুলির এই-সকল খুঁটিনাটির বিভিন্নতা বুঝিবার সময় এখন আমাদের নাই। সুতরাং যে-সকল মতে, যে-সকল তত্ত্বে হিন্দুমাত্রেরই বিশ্বাস থাকা আবশ্যক, সম্প্রদায়সমূহের সেই সাধারণ তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ সৃষ্টিতত্ত্ব। হিন্দুদের সকল সম্প্রদায়েরই মত—এই সৃষ্টি, এই প্রকৃতি, এই মায়া অনাদি অনন্ত। জগৎ কোন বিশেষ দিনে সৃষ্ট হয় নাই। একজন ঈশ্বর আসিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন, তারপর তিনি ঘুমাইতেছেন, ইহা হইতে পারে না। সৃষ্টিকারিণী শক্তি এখনও বর্তমান। ঈশ্বর অনন্তকাল ধরিয়া সৃষ্টি করিতেছেন, তিনি কখনই বিশ্রাম করেন না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন : যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ। * * * উপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥—যদি আমি ক্ষণকাল কর্ম না করি, তবে জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে।

জগতে এই যে সৃষ্টিশক্তি দিবারাত্র কার্য করিতেছে, ইহা যদি ক্ষণকালের জন্য বন্ধ থাকে, তবে এই জগৎ ধ্বংস হইয়া যায়। এমন সময়ই ছিল না, যখন সমগ্র জগতে এই শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল না ; তবে অবশ্য যুগশেষে প্রলয় হইয়া

থাকে। আমাদের সৃষ্টি ইংরেজী 'creation' নহে। 'Creation' বলিতে ইংরেজীতে 'কিছু না হইতে কিছু হওয়া, অসৎ হইতে সতের উদ্ভব'—এই অপরিণত মতবাদ বুঝাইয়া থাকে। এরূপ অসঙ্গত কথা বিশ্বাস করিতে বলিয়া আমি তোমাদের বুদ্ধি ও বিচার-শক্তির অবমাননা করিতে চাহি না। সমগ্র প্রকৃতিই বিদ্যমান থাকে, কেবল প্রলয়ের সময় উহা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, শেষে একেবারে অব্যক্তভাব ধারণ করে। পরে কিছুকাল যেন বিশ্রামের পর আবার ব্যক্ত হইয়া যেন উহা সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হয়; তখন পূর্বের মতোই সংযোগ; পূর্বের মতোই ক্রমবিকাশ, পূর্বের মতোই প্রকাশ হইতে থাকে। কিছুকাল এইরূপ খেলা চলিয়া আবার ঐ খেলা ভাঙিয়া যায়—ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, শেষে সমুদয় আবার অব্যক্তে লীন হইয়া যায়। আবার বাহিরে আসে; অনন্তকাল এইরূপ তরঙ্গের মতো একবার সম্মুখে আর-বার পশ্চাতে আন্দোলিত হইতেছে। দেশ, কাল এবং অন্যান্য সর্ব কিছুই এই প্রকৃতির অন্তর্গত। এই কারণেই 'সৃষ্টির আরম্ভ আছে' বলা সম্পূর্ণ পাগলামি। সৃষ্টির আরম্ভ বা শেষ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এই জন্য যখনই আমাদের শাস্ত্রে সৃষ্টির আদি বা অন্তের উল্লেখ করা হইয়াছে, তখনই কোন যুগবিশেষের আদি-অন্ত বুঝিতে হইবে; উহার অন্য কোন অর্থ নাই।

কে এই সৃষ্টি করিতেছেন?—ঈশ্বর। ইংরেজীতে সাধারণতঃ God শব্দে যাহা বুঝায়, আমার অভিপ্রায় তাহা নহে। সংস্কৃত 'ব্রহ্ম' শব্দ ব্যবহার করাই সর্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত। তিনিই এই জগৎপ্রপঞ্চের সাধারণ কারণস্বরূপ। ব্রহ্মের স্বরূপ কি? ব্রহ্ম নিত্য নিত্যশুদ্ধ নিত্যজাগ্রত সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞ দয়াময় সর্বব্যাপী নিরাকার অখণ্ড। তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেন। এক্ষণে প্রশ্ন এই, যদি এই ব্রহ্ম জগতের নিত্য স্রষ্টা ও বিধাতা হন, তাহা হইলে দুইটি আপত্তি উপস্থিত হয়। জগতে তো যথেষ্ট বৈষম্য রহিয়াছে—এখানে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী; কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র; এরূপ বৈষম্য কেন? আবার এখানে নিষ্ঠুরতাও বর্তমান। কারণ এখানে একের জীবন অন্যের মৃত্যুর উপর নির্ভর করিতেছে। এক প্রাণী আর এক প্রাণীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেছে, প্রত্যেক মানবই নিজ ভ্রাতার গলা টিপিবার চেষ্টা করিতেছে। এই প্রতিযোগিতা, এই নিষ্ঠুরতা, এই উৎপাত, এই দিবা-রাত্রি গগনবিদারী দীর্ঘশ্বাস—ইহাই আমাদের এই জগতের অবস্থা! ইহাই যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়, তবে সেই ঈশ্বর ঘোরতর নিষ্ঠুর!

মানুষের কল্পিত নিষ্ঠুরতম দানব অপেক্ষা এই ঈশ্বর আরও নিষ্ঠুর। বেদান্ত বলেন, ঈশ্বর এই বৈষম্য ও প্রতিযোগিতার কারণ নহেন। তবে কে ইহা করিল?—আমরা নিজেরাই করিয়াছি। মেঘ সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করে। কিন্তু যে ক্ষেত্র উত্তমরূপে কর্ষিত, তাহাই শস্যশালী হয়; যে ভূমি ভালভাবে কর্ষিত নহে, তাহা ঐ বৃষ্টির ফল লাভ করিতে পারে না। ইহা মেঘের অপরাধ নহে। তাঁহার দয়া অনন্ত অপরিবর্তনীয়—আমরাই কেবল এই বৈষম্য সৃষ্টি করিতেছি। কিরূপে আমরা এই বৈষম্য সৃষ্টি করিলাম? কেহ জগতে সুখী হইয়া জন্মাইল, কেহ বা অসুখী—তাহারা তো এই বৈষম্য সৃষ্টি করে নাই? করিয়াছে বই কি! পূর্বজন্মকৃত কর্মের দ্বারা এই ভেদ—এই বৈষম্য হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা সেই দ্বিতীয় তত্ত্বের আলোচনায় আসিলাম—যাহাতে শুধু আমরা হিন্দুরা নহি, বৌদ্ধ ও জৈনগণও একমত। আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি, সৃষ্টির মতো জীবনও অনন্ত। শূন্য হইতে যে জীবনের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নহে—তাহা হইতেই পারে না। এইরূপ জীবনে কোন প্রয়োজনই নাই। কালে যাহার আরম্ভ, কালে তাহার অন্ত হইবে। গতকল্য যদি জীবনের আরম্ভ হইয়া থাকে, তবে আগামী কল্য উহার শেষ হইবে—পরে উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস হইবে। জীবন অবশ্য পূর্বেও বর্তমান ছিল। আজকাল ইহা বেশী বুঝাইবার আবশ্যক নাই; কারণ আধুনিক বিজ্ঞান এই বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করিতেছে—জড়-জগতের আবিষ্কারগুলির সাহায্যে আমাদের শাস্ত্রনিহিত তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করিতেছে। তোমরা সকলেই পূর্ব হইতেই অবগত আছ যে, আমাদের প্রত্যেকেই অনন্ত অতীতের কর্মসমষ্টির ফলস্বরূপ। কবিগণের বর্ণনানুযায়ী কোন শিশুকেই প্রকৃতি স্বহস্তে জগৎ-রঙ্গমঞ্চে লইয়া আসেন না, তাহার স্কন্ধে অনন্ত অতীতের কর্মসমষ্টি রহিয়াছে। ভালই হউক আর মন্দই হউক, সে নিজ অতীত কর্মের ফল ভোগ করিতে আসে। ইহা হইতেই বৈষম্যের উৎপত্তি। ইহাই কর্মবিধান; আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অদৃষ্টের নিয়ামক। এই মতবাদের দ্বারা অদৃষ্টবাদ খণ্ডিত হয় এবং ইহা দ্বারাই 'ঈশ্বরের বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য-দোষ' নিরাকৃত হয়। আমরা যাহা কিছু ভোগ করি, তাহার জন্য আমরাই দায়ী, অপর কেহ নহে। আমরাই কার্য, আমরাই কারণস্বরূপ; সুতরাং আমরা স্বাধীন। যদি আমরা অসুখী হই, তবে বুঝিতে হইবে আমিই

আমাকে অসুখী করিয়াছি। আর ইহাও প্রতীয়মান হইবে যে, আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে সুখীও হইতে পারি। যদি আমি অপবিত্র হই, তবে তাহাও আমার নিজকৃত; আর ইহাও বুঝিতে হইবে যে, আমি ইচ্ছা করিলে আবার পবিত্র হইতে পারি। এইরূপ সকল বিষয়ে বুঝিতে হইবে। মানুষের ইচ্ছা কোন ঘটনার অধীন নহে। মানুষের অনন্ত ইচ্ছাশক্তি ও মুক্ত স্বভাবের সম্মুখে সকল শক্তি, এমন কি, প্রাকৃতিক শক্তিগুলি পর্যন্ত মাথা নত করিবে—দাস হইয়া থাকিবে।

এইবার স্বভাবতই এই প্রশ্ন আসিবে—আত্মা কি? আত্মাকে না জানিলে আমাদের শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরকেও জানিতে পারি না। ভারতে ও অন্যান্য দেশে বহিঃপ্রকৃতির আলোচনা দ্বারা সেই সর্বাতীত সত্তার আভাস পাইবার চেষ্টা হইয়াছে। আমরা জানি, ইহার ফলও অতি শোচনীয় হইয়াছে। সেই সত্তার আভাস পাওয়া দূরে থাক্, আমরা যতই জড-জগতের আলোচনা করি, ততই অধিক জড়বাদী হইতে থাকি। যদি বা একটু-আধটু ধর্মভাব পূর্বে থাকে, জড়-জগতের আলোচনা করিতে করিতে তাহাও দূর হইয়া যায়। অতএব আধ্যাত্মিকতা ও সেই পরমপুরুষের জ্ঞান বাহ্যজগৎ হইতে পাওয়া যায় না। অন্তরমধ্যে—আত্মার মধ্যে উহার অন্বেষণ করিতে হইবে। বাহ্যজগৎ আমাদিগকে সেই অনন্তের কোন সংবাদ দিতে পারে না, অন্তর্জগতে অন্বেষণ করিলেই উহার সংবাদ পাওয়া যায়। অতএব কেবল আত্মতত্ত্বের অন্বেষণেই, আত্মতত্ত্বের বিশ্লেষণেই পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব। জীবাত্মার স্বরূপসম্বন্ধে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মতভেদ আছে বটে, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে সকলে একমত। যথা—সকল জীবাত্মা অনাদি অনন্ত, স্বরূপতঃ অবিনাশী। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক আত্মায় সর্ববিধ শক্তি আনন্দ পবিত্রতা সর্বব্যাপিতা ও সর্বজ্ঞত্ব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এই গুরুতর তত্ত্বটি সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মানবে, প্রত্যেক প্রাণীতে—সে যতই দুর্বল বা মন্দ হউক, সে বড় বা ছোট হউক—সেই সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ আত্মা রহিয়াছেন। আত্মা হিসাবে কোন প্রভেদ নাই—প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। আমার ও ঐ ক্ষুদ্রতম প্রাণীর মধ্যে প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে—স্বরূপতঃ তাহার সহিত আমার কোন ভেদ নাই; সে আমার ভ্রাতা; তাহারও যে আত্মা, আমারও সেই আত্মা। ভারত এই মহত্তম তত্ত্ব জগতে প্রচার করিয়াছে। অন্যান্য দেশে সমগ্র 'মানবের ভ্রাতৃভাব'

প্রচারিত হইয়া থাকে—ভারতে উহা 'সর্বপ্রাণীর ভ্রাতৃভাব' এই আকার ধারণ করিয়াছে। অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণী, এমন কি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত আমার ভাই—তাহারা আমার দেহস্বরূপ। 'এবং তু পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্বভূতময়ং হরিম্' ইত্যাদি—এইরূপে পণ্ডিতগণ সেই প্রভুকে সর্বভূতময় জানিয়া সকল প্রাণীকে ঈশ্বরজ্ঞানে উপাসনা করিবেন। সেই কারণেই ভারতে ইতরপ্রাণী ও দরিদ্রগণের প্রতি এত দয়ার ভাব বর্তমান; সকল বস্তু সম্বন্ধেই, সকল বিষয়েই ঐ দয়ার ভাব। আত্মায় সমুদয় শক্তি বর্তমান, এই মত ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মিলনভূমি।

স্বভাবতই এইবার আমাদের ঈশ্বরতত্ত্ব-আলোচনার সময় আসিয়াছে। কিন্তু তৎপূর্বেই 'আত্মা' সম্বন্ধে একটি কথা বলিতে চাই। যাঁহারা ইংরেজী ভাষা চর্চা করেন, তাঁহারা অনেক সময় Soul ও Mind এই দুইটি শব্দে বড় গোলযোগে পড়িয়া যান। সংস্কৃত 'আত্মা' ও ইংরেজী 'Soul' শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্নার্থবাচক। আমরা যাহাকে 'মন' বলি, পাশ্চাত্যেরা তাহাকে 'Soul' বলেন। পাশ্চাত্য দেশে আত্মা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান কোন কালে ছিল না। প্রায় বিশ বৎসর হইল সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের সাহায্যে ঐ জ্ঞান পাশ্চাত্য দেশে আসিয়াছে। আমাদের এই স্থূল শরীরের পশ্চাতে মন; কিন্তু মন আত্মা নহে। উহা সূক্ষ্ম শরীর—সূক্ষ্ম তন্মাত্রায় নির্মিত। উহাই জন্মজন্মান্তরে বিভিন্ন শরীর আশ্রয় করে, উহার পশ্চাতে মানুষের আত্মা রহিয়াছে। এই 'আত্মা' শব্দ Soul বা Mind শব্দের দ্বারা অনূদিত হইতে পারে না—সুতরাং আমাদিগকে সংস্কৃত 'আত্মা' অথবা আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতানুযায়ী 'Self' শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। যে শব্দই আমরা ব্যবহার করি না কেন, আত্মা যে মন ও স্থূল-শরীর—উভয় হইতেই পৃথক, এই ধারণাটি মনের মধ্যে পরিষ্কারভাবে রাখিতে হইবে। আর এই আত্মাই মন বা সূক্ষ্ম শরীরকে সঙ্গে লইয়া এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে; কালে যখন সর্বজ্ঞত্ব ও পূর্ণত্ব লাভ করে, তখন উহার আর জন্মমৃত্যু হয় না—তখন উহা মুক্ত হইয়া যায়; ইচ্ছা করিলে এই মন বা সূক্ষ্ম শরীরকে রাখিতেও পারে অথবা উহাকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্তকালের জন্য স্বাধীন ও মুক্ত হইয়া যাইতে পারে। মুক্তিই আত্মার লক্ষ্য। ইহাই আমাদের ধর্মের বিশেষত্ব।

আমাদের ধর্মেও স্বর্গ-নরক আছে, কিন্তু উহারা চিরস্থায়ী নহে। স্বর্গ-নরকের

স্বরূপ বিচার করিলে সহজেই প্রতীত হয় যে, উহারা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। যদি স্বর্গ বলিয়া কিছু থাকে, তবে তাহা এই মর্ত্যলোকেরই পুনরাবৃত্তিমাত্র হইবে—একটু না হয় বেশী সুখ, একটু না হয় বেশী ভোগ। তাহাতে বরং আরও মন্দই হইবে। এইরূপ স্বর্গ অনেক। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ইহলোকে কোন সৎকর্ম করে, তাহারা মৃত্যুর পর এইরূপ কোন স্বর্গে ইন্দ্রাদি দেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই দেবত্ব বিশেষ বিশেষ পদমাত্র। এই দেবতারাও এক সময়ে মানুষ ছিলেন; সৎকর্মবশে ইঁহাদের দেবত্বপ্রাপ্তি হইয়াছে। ইন্দ্র-বরুণাদি কোন দেব-বিশেষের নাম নহে। সহস্র সহস্র ইন্দ্র হইবেন। রাজা নহুষ মৃত্যুর পর ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রত্ব পদমাত্র। কোন ব্যক্তি সৎকর্মের ফলে উন্নত হইয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিলেন, কিছুদিন সেই পদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন, আবার সেই দেবদেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। মনুষ্যজন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম। কোন কোন দেবতা স্বর্গসুখের বাসনা ত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু যেমন এই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ ধন মান ঐশ্বর্য লাভ করিলে উচ্চতত্ত্ব ভুলিয়া যায়, সেইরূপ অধিকাংশ দেবতাই ঐশ্বর্যমদে মত্ত হইয়া মুক্তির চেষ্টা করেন না, তাঁহাদের শুভ কর্মের ফলভোগ শেষ হইয়া গেলে তাঁহারা পুনরায় এই পৃথিবীতে আসিয়া মনুষ্যদেহ ধারণ করেন। অতএব এই পৃথিবীই কর্মভূমি; এই পৃথিবী হইতেই আমরা মুক্তি লাভ করিতে পারি। সুতরাং এই-সকল স্বর্গেও আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে কোন্ বস্তুলাভের জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত?—মুক্তি। আমাদের শাস্ত্র বলেন, 'শ্রেষ্ঠ স্বর্গেও তুমি প্রকৃতির দাসমাত্র। বিশ হাজার বৎসর তুমি রাজত্ব ভোগ করিলে—তাহাতে কি হইল? যতদিন তোমার শরীর থাকে, ততদিন তুমি সুখের দাসমাত্র। যতদিন দেশ-কাল তোমার উপর কার্য করিতেছে, ততদিন তুমি ক্রীতদাসমাত্র।' এই কারণেই আমাদিগকে বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি—উভয়কে জয় করিতে হইবে। প্রকৃতি যেন তোমার পদতলে থাকে—প্রকৃতিকে পদদলিত করিয়া, তাহাকে অতিক্রম করিয়া স্বাধীন মুক্তভাবে তোমাকে নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। তখন তুমি জন্মের অতীত হইলে—সুতরাং তুমি মৃত্যুরও পারে যাইলে। তখন তোমার সুখ চলিয়া গেল, সুতরাং তুমি দুঃখেরও অতীত হইলে। তখনই তুমি সর্বাতীত অব্যক্ত অবিনাশী আনন্দের অধিকারী হইলে। আমরা যাহাকে এখানে সুখ ও

কল্যাণ বলি, তাহা সেই অনন্ত আনন্দের এক কণামাত্র। ঐ অনন্ত আনন্দই আমাদের লক্ষ্য।

আত্মা অনন্ত আনন্দস্বরূপ, উহা লিঙ্গবর্জিত। আত্মাতে নরনারী-ভেদ নাই। দেহ সম্বন্ধেই নরনারী-ভেদ। অতএব আত্মাতে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আরোপ করা ভ্রমমাত্র—শরীর সম্বন্ধেই উহা সত্য। আত্মার সম্বন্ধে কোনরূপ বয়সও নির্দিষ্ট হইতে পারে না, সেই প্রাচীন পুরুষ সর্বদাই একরূপ।

এই আত্মা কিরূপে সংসারে বদ্ধ হইলেন? একমাত্র আমাদের শাস্ত্রই ঐ প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকেন। অজ্ঞানই বন্ধনের কারণ। আমরা অজ্ঞানেই বদ্ধ হইয়াছি—জ্ঞানোদয়েই উহার নাশ হইবে, জ্ঞানই আমাদিগকে এই অজ্ঞানের পারে লইয়া যাইবে। এই জ্ঞানলাভের উপায় কি? ভক্তিপূর্বক ঈশ্বরের উপাসনা এবং ভগবানের মন্দিরজ্ঞানে সর্বভূতে প্রেম দ্বারা সেই জ্ঞানলাভ হয়। ঈশ্বরে পরানুরক্তিবলে জ্ঞানের উদয় হইবে, অজ্ঞান দূরীভূত হইবে, সকল বন্ধন খসিয়া যাইবে এবং আত্মা মুক্তিলাভ করিবেন।

আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরের দ্বিবিধ স্বরূপের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে—সগুণ ও নির্গুণ। সগুণ ঈশ্বর অর্থে সর্বব্যাপী, জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়-কর্তা—জগতের শাশ্বত জনক-জননী। তাঁহার সহিত আমাদের ভেদ নিত্য। মুক্তির অর্থ তাঁহার সামীপ্য ও সালোক্য-প্রাপ্তি। নির্গুণ ব্রহ্মের বর্ণনায় সগুণ ঈশ্বরের প্রতি সচরাচর প্রযুক্ত সর্বপ্রকার বিশেষণ অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। সেই নির্গুণ সর্বব্যাপী পুরুষকে জ্ঞানবান্ বলা যাইতে পারে না; কারণ জ্ঞান মনের ধর্ম। তাঁহাকে চিন্তাশীল বলা যাইতে পারে না; কারণ চিন্তা সসীম জীবের জ্ঞানলাভের উপায়মাত্র। তাঁহাকে বিচারপরায়ণ বলা যাইতে পারে না; কারণ বিচারও সসীমতা—দুর্বলতার চিহ্নস্বরূপ। তাঁহাকে সৃষ্টিকর্তা বলা যাইতে পারে না; কারণ বদ্ধ ভিন্ন মুক্ত পুরুষের সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাঁহার আবার বন্ধন কি? প্রয়োজন ভিন্ন কেহই কোন কার্য করে না। তাঁহার আবার প্রয়োজন কি? অভাব না থাকিলে কেহ কোন কার্য করে না।—তাঁহার আবার অভাব কি? বেদে তাঁহার প্রতি 'সঃ' শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। 'সঃ' শব্দের দ্বারা নয়, নির্গুণ ভাব বুঝাইবার জন্য 'তৎ' শব্দের দ্বারা তাঁহার নির্দেশ করা হইয়াছে। 'সঃ' শব্দের দ্বারা নির্দিষ্ট হইলে ব্যক্তিবিশেষ বুঝাইত, তাহাতে জীবজগতের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ পার্থক্য সূচিত হইত। তাই

নির্গুণবাচক 'তৎ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, 'তৎ'-শব্দবাচ্য নির্গুণ ব্রহ্ম প্রচারিত হইয়াছে। ইহাকেই অদ্বৈতবাদ বলে।

এই নৈর্ব্যক্তিক সত্তার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি?—তাঁহার সহিত আমরা অভিন্ন। আমরা প্রত্যেকেই সকল জীবের মূল ভিত্তিস্বরূপ সেই সত্তার বিভিন্ন বিকাশমাত্র। যখনই আমরা এই অনন্ত নির্গুণ সত্তা হইতে আমাদিগকে পৃথক্ ভাবি, তখনই আমাদের দুঃখের উৎপত্তি; আর এই অনির্বচনীয় নির্গুণ সত্তার সহিত আমাদের একত্ব-জ্ঞানেই মুক্তি। সংক্ষেপতঃ আমাদের শাস্ত্রে আমরা ঈশ্বরের এই দ্বিবিধ ভাবের উল্লেখ দেখিতে পাই। এখানে বলা আবশ্যক যে, নির্গুণ ব্রহ্মবাদই সর্বপ্রকার নীতিবিজ্ঞানের ভিত্তি। অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রত্যেক জাতির ভিতর এই সত্য প্রচারিত হইয়াছে—সকলকে নিজের মতো ভালবাসিবে। ভারতবর্ষে আবার মনুষ্য ও ইতরপ্রাণীতে কোন প্রভেদ করা হয় নাই, প্রাণি-নির্বিশেষে সকলকেই নিজের মতো প্রীতি করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অপর প্রাণিগণকে নিজের মতো ভালবাসিলে কেন কল্যাণ হইবে, কেহই তাহার কারণ নির্দেশ করেন নাই। একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মবাদই ইহার কারণ নির্দেশ করিতে সমর্থ। যখন সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে এক ও অখণ্ড বলিয়া বোধ করিবে, যখন জানিবে অপরকে ভালবাসিলে নিজেকেই ভালবাসা হইল, তখনই বুঝিবে—অপরের ক্ষতি করিলে নিজেরই ক্ষতি করা হইল, তখনই আমরা বুঝিব, কেন অপরের অনিষ্ট করা উচিত নয়। সুতরাং এই নির্গুণ ব্রহ্মবাদেই নীতিবিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের যুক্তি পাওয়া যায়।

অদ্বৈতবাদের কথা বলিতে গিয়া আরও অনেক কথা আসিয়া পড়ে। সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্ হইলে হৃদয়ে কি অপূর্ব প্রেমের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা আমি জানি। বিভিন্ন সময়ের প্রয়োজন অনুসারে লোকের উপর ভক্তির প্রভাব ও কার্যকারিতার বিষয় আমি বিশেষভাবে অবগত আছি। কিন্তু আমাদের দেশে এখন আর কাঁদিবার সময় নাই—এখন কিছু বীর্যের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই নির্গুণ ব্রহ্মে বিশ্বাস হইলে—সর্বপ্রকার কুসংস্কার-বর্জিত হইয়া 'আমিই সেই নির্গুণ ব্রহ্ম' এই জ্ঞানসহায়ে নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইলে হৃদয়ে কি অপূর্ব শক্তির বিকাশ হয়, তাহা বলা যায় না! ভয়?—কাহাকে ভয়? আমি প্রকৃতির নিয়ম পর্যন্ত গ্রাহ্য করি না। মৃত্যু আমার নিকট উপহাসের বস্তু। মানুষ নিজ আত্মার মহিমায় অবস্থিত—সেই আত্মা অনাদি অনন্ত ও অবিনাশী, তাঁহাকে কোন অস্ত্র

ভেদ করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, জল গলাইতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, তিনি অনন্ত জন্মরহিত মৃত্যুহীন, তাঁহার মহিমার সম্মুখে সূর্য-চন্দ্রসমূহ—এমন কি, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সিন্ধুতে বিন্দুতুল্য প্রতীয়মান হয়, তাঁহার মহিমার সম্মুখে দেশকালের অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যায়। আমাদিগকে এই মহিমময় আত্মায় বিশ্বাসবান্ হইতে হইবে—তবেই বীর্য আসিবে। তুমি যাহা চিন্তা করিবে, তাহাই হইয়া যাইবে। যদি তুমি আপনাকে দুর্বল ভাবো, তবে দুর্বল হইবে; তেজস্বী ভাবিলে তেজস্বী হইবে। যদি তুমি আপনাকে অপবিত্র ভাবো, তবে তুমি অপবিত্র; আপনাকে বিশুদ্ধ ভাবিলে বিশুদ্ধই হইবে। অদ্বৈতবাদ আমাদের নিজেকে দুর্বল ভাবিতে শিক্ষা দেয় না, পরন্তু নিজেদের তেজস্বী সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞ ভাবিতে উপদেশ দেয়। আমার ভিতরে ঐ ভাব এখনও প্রকাশিত নাও হইতে পারে, কিন্তু উহা তো আমার ভিতরে রহিয়াছে। আমার মধ্যে সকল জ্ঞান, সকল শক্তি, পূর্ণ পবিত্রতা ও স্বাধীনতার ভাব রহিয়াছে। তবে আমি ঐ-গুলি জীবনে প্রকাশিত করিতে পারি না কেন? কারণ, উহাতে আমি বিশ্বাস করি না। যদি আমি উহাতে বিশ্বাসী হই, তবে উহা এখনই প্রকাশিত হইবে—নিশ্চয়ই হইবে। অদ্বৈতবাদ ইহাই শিক্ষা দেয়।

অতি শৈশবাবস্থা হইতেই তোমাদের সন্তানগণ তেজস্বী হউক, তাহাদিগকে কোনরূপ দুর্বলতা, কোনরূপ বাহ্য অনুষ্ঠান শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। তাহারা তেজস্বী হউক, নিজের পায়ে নিজেরা দাঁড়াক,—সাহসী সর্বজয়ী সর্বংসহ হউক। সর্বপ্রথমে তাহারা আত্মার মহিমা সম্বন্ধে জানুক। এই শিক্ষা বেদান্তে—কেবল বেদান্তেই পাইবে; অন্যান্য ধর্মের মতো ভক্তি উপাসনা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ বেদান্তে আছে—যথেষ্ট পরিমাণই আছে; কিন্তু আমি যে আত্মতত্ত্বের কথা বলিতেছি, তাহাই জীবনপ্রদ এবং অতি অপূর্ব। কেবল বেদান্তেই সেই মহান্ তত্ত্ব নিহিত, যাহা সমগ্র জগতের ভাবরাশিকে আমূল পরিবর্তিত করিয়া ফেলিবে এবং বিজ্ঞানের সহিত ধর্মের সামঞ্জস্য বিধান করিবে।

আমি তোমাদের নিকট আমাদের ধর্মের প্রধান তত্ত্বগুলি বলিলাম। ঐগুলি কিভাবে কার্যে পরিণত করিতে হইবে, এখন সে-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতে যে-সকল কারণ বর্তমান, তাহাতে এখানে অনেক সম্প্রদায় থাকিবারই কথা। কার্যতও দেখিতেছি—এখানে অনেক সম্প্রদায়।

আরও একটি আশ্চর্য ব্যাপার এখানে দেখা যাইতেছে যে, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়েব সহিত বিরোধ করে না। শৈব এ কথা বলে না যে, বৈষ্ণবমাত্রেই অধঃপাতে যাইবে, অথবা বৈষ্ণবও শৈবকে এ কথা বলে না। শৈব বলে, 'আমি আমার পথে চলিতেছি, তুমি তোমার পথে চল ; পরিণামে আমরা একই স্থানে পৌঁছিব।' ভারতের সকল সম্প্রদায়ই এ কথা স্বীকার করিয়া থাকে। ইহাকেই 'ইষ্টতত্ত্ব' বলে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এ কথা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে যে, ঈশ্বরোপাসনার বিভিন্ন প্রণালী আছে। ইহাও স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে যে, বিভিন্ন প্রকৃতির পক্ষে বিভিন্ন সাধনপ্রণালীর প্রয়োজন। তুমি যে-প্রণালীতে ঈশ্বর লাভ করিবে, সে-প্রণালী আমার নাও হইতে পারে, হয়তো তাহাতে আমার ক্ষতি হইতে পারে। সকলকেই এক পথে যাইতে হইবে—এ কথার কোন অর্থ নাই, ইহাতে বরং ক্ষতিই হইয়া থাকে ; সুতরাং সকলকে এক পথ দিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা একেবারে পরিত্যাজ্য। যদি কখন পৃথিবীর সব লোক একধর্মমতালম্বী হইয়া এক পথে চলে, তবে বড়ই দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। তাহা হইলে লোকের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও প্রকৃত ধর্মভাব একেবারে বিলুপ্ত হইবে। বৈচিত্র্যই আমাদের জীবনযাত্রার মূলমন্ত্র। বৈচিত্র্য সম্পূর্ণরূপে চলিয়া গেলে সৃষ্টিও লোপ পাইবে। যতদিন চিন্তাপ্রণালীর এই বিভিন্নতা থাকিবে, ততদিন আমাদের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব থাকিবে। বৈচিত্র্য আছে বলিয়া বিরোধের প্রয়োজন নাই। তোমার পথ তোমার পক্ষে ভাল বটে, কিন্তু আমার পক্ষে নহে। আমার পথ আমার পক্ষে ঠিক, কিন্তু তোমার পক্ষে নহে। প্রত্যেকেরই ইষ্ট ভিন্ন—এ কথায় এই বুঝায় যে, প্রত্যেকের পথ ভিন্ন।

এটি মনে রাখিও, কোন ধর্মের সহিত আমাদের বিবাদ নাই। আমাদের প্রত্যেকেরই ইষ্টদেবতা ভিন্ন। কিন্তু যখন দেখি কেহ আসিয়া বলিতেছে, 'ইহাই একমাত্র পথ' এবং ভারতের ন্যায় অসাম্প্রদায়িক দেশে জোর করিয়া আমাদিগকে ঐ-মতাবলম্বী করিতে চায়, তখন আমরা তাহাদের কথা শুনিয়া হাসিয়া থাকি। যাহারা ঈশ্বরলাভের উদ্দেশে ভিন্নপথাবলম্বী ভ্রাতাদের বিনাশ-সাধন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের মুখে প্রেমের কথা বড়ই অসঙ্গত ও অশোভন। তাহাদের প্রেমের বিশেষ কিছু মূল্য নাই। অপরে অন্য পথের অনুসরণ করিতেছে, ইহা যে সহ্য করিতে পারে না, সে আবার প্রেমের কথা বলে! ইহাই যদি প্রেম হয়, তবে দ্বেষ বলিব কাহাকে? খ্রীষ্ট বুদ্ধ বা মহম্মদ—জগতের যে-কোন অবতারেরই

উপাসনা করুক না, কোন ধর্মাবলম্বীর সহিত আমাদের বিবাদ নাই। হিন্দু বলেন, 'এস ভাই, তোমার যে-সাহায্য আবশ্যক, তাহা আমি করিতেছি ; কিন্তু আমি আমার পথে চলিব, তাহাতে কিছু বাধা দিও না।' আমি আমার ইষ্টের উপাসনা করিব। তোমার পথ খুব ভাল, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার পক্ষে হয়তো উহাতে ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিতে পারে। কোন্ খাদ্য আমার শরীরের উপযোগী, তাহা আমার নিজ অভিজ্ঞতা হইতে আমিই বুঝিতে পারি, কোটি কোটি ডাক্তার সে-সম্বন্ধে আমাকে কিছু শিক্ষা দিতে পারে না। এইরূপ কোন্ পথ আমার উপযোগী হইবে, তাহা আমার অভিজ্ঞতা হইতে আমিই ঠিক বুঝিতে পারি ;—ইহাই ইষ্টনিষ্ঠা। এই কারণেই আমরা বলিয়া থাকি যে, যদি কোন মন্দিরে গিয়া অথবা কোন প্রতীক বা প্রতিমার সাহায্যে তুমি তোমার অন্তরে অবস্থিত ভগবানকে উপলব্ধি করিতে পারো, তবে তাহাই কর ; প্রয়োজন হয় দুইশত প্রতিমা গড় না কেন ? যদি কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের দ্বারা তোমার ঈশ্বর-উপলব্ধির সাহায্য হয়, তবে শীঘ্র ঐ-সকল অনুষ্ঠান অবলম্বন কর। যে-কোন ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান তোমাকে ভগবানের নিকট লইয়া যায়, তাহাই অবলম্বন কর ; যদি কোন মন্দিরে যাইলে তোমার ঈশ্বরলাভের সহায়তা হয়, সেখানে গিয়াই উপাসনা কর। কিন্তু বিভিন্ন পথ লইয়া বিবাদ করিও না। যে-মুহূর্তে তুমি বিবাদ কর, সেই মুহূর্তে তুমি ধর্ম পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ—তুমি সম্মুখে অগ্রসর না হইয়া পিছু হটিতেছ, ক্রমশঃ পশুস্তরে উপনীত হইতেছ।

আমাদের ধর্ম কাহাকেও বাদ দিতে চায় না, উহা সকলকেই নিজের কাছে টানিয়া লইতে চায়। আমাদের জাতিভেদ ও অন্যান্য নিয়মাবলী আপাততঃ ধর্মের সহিত সংসৃষ্ট বলিয়া বোধ হইলেও বাস্তবিক তাহা নহে। সমগ্র হিন্দু-জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য এই-সকল নিয়মের আবশ্যক ছিল। যখন এই আত্মরক্ষার প্রয়োজন থাকিবে না, তখন ঐ-গুলি আপনা হইতেই উঠিয়া যাইবে।

যতই বয়োবৃদ্ধি হইতেছে, ততই এই প্রাচীন প্রথাগুলি আমার ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে। এক সময়ে আমি ঐ-গুলির অধিকাংশই অনাবশ্যক ও বৃথা মনে করিতাম। কিন্তু যতই আমার বয়স হইতেছে, ততই আমি ঐ-গুলির একটিরও বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। কারণ শত শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলে ঐ-গুলি গঠিত হইয়াছে। গতকালের শিশু—যে

আগামীকালই হয়তো মৃত্যুমুখে পতিত হইবে—সে যদি আসিয়া আমাকে আমার অনেক দিনের সংকল্পিত বিষয়গুলি পরিত্যাগ করিতে বলে এবং আমিও যদি সেই শিশুর কথা শুনিয়া তাহার মতানুসারে আমার কার্যপ্রণালীর পরিবর্তন করি, তবে আমিই আহাম্মক হইলাম, অপর কেহ নহে। ভারতের বাহিরে নানাদেশ হইতে আমরা সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে যে-সকল উপদেশ পাইতেছি, তাহারও অধিকাংশ ঐ ধরনের। তাহাদিগকে বলো—তোমরা যখন একটি স্থায়ী সমাজ গঠন করিতে পারিবে, তখন তোমাদের কথা শুনিব। তোমরা দুদিন একটা ভাব ধরিয়া রাখিতে পার না, বিবাদ করিয়া উহা ছাড়িয়া দাও; ক্ষুদ্র পতঙ্গের ন্যায় তোমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী! বুদ্বুদের ন্যায় তোমাদের উৎপত্তি, বুদ্বুদের ন্যায় লয়! আগে আমাদের মতো স্থায়ী সমাজ গঠন কর; প্রথমে এমন কতকগুলি সামাজিক নিয়ম ও প্রথার প্রবর্তন কর, যেগুলির শক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া অব্যাহত থাকিতে পারে—তখন তোমাদের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিবার সময় হইবে। কিন্তু যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন তোমরা চঞ্চল বালকমাত্র।

আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলা শেষ হইয়াছে। এখন আমি বর্তমান যুগের যাহা বিশেষ প্রয়োজন, এমন একটি বিষয় তোমাদিগকে বলিব। মহাভারত-কার বেদব্যাসের জয় হউক! তিনি বলিয়া গিয়াছেন, 'কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম'। অন্যান্য যুগে যে-সকল কঠোর তপস্যা ও যোগাদি প্রচলিত ছিল, তাহা আর এখন চলিবে না। এ যুগে বিশেষ প্রয়োজন দান—অপরকে সাহায্য করা। দান শব্দে কি বুঝায়? ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ দান, তারপর বিদ্যাদান, তারপর প্রাণদান; অন্নবস্ত্রদান সর্বনিম্নে। যিনি ধর্মজ্ঞান প্রদান করেন, তিনি আত্মাকে অনন্ত জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। যিনি বিদ্যাদান করেন, তিনিও আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের সহায়তা করেন। অন্যান্য দান, এমন কি প্রাণদান পর্যন্ত তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ। অতএব তোমাদের এইটুকু জানা উচিত যে, এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান অপেক্ষা অন্যান্য সব কাজ নিম্নস্তরের। আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিস্তার করিলেই মনুষ্যজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্য করা হয়। আমাদের শাস্ত্র আধ্যাত্মিক ভাবের অনন্ত উৎস.

এই ত্যাগের দেশ—ভারত ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোথায়, ধর্মের অপরোক্ষানুভূতির এরূপ দৃষ্টান্ত পাইবে? পৃথিবী সম্বন্ধে আমার একটু

অভিজ্ঞতা আছে। আমায় বিশ্বাস কর—অন্যান্য দেশে অনেক বড বড় কথা শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এখানে—কেবল এখানেই এমন মানুষ পাওয়া যায়, যিনি ধর্মকে জীবনে পরিণত করিয়াছেন। বড বড় কথা বলাই ধর্ম নয়; তোতাপাখিও কথা কয়, আজকাল কলেও কথা বলে; কিন্তু এমন জীবন দেখাও দেখি, যাহার মধ্যে ত্যাগ আধ্যাত্মিকতা তিতিক্ষা ও অনন্ত প্রেম বিদ্যমান। এই সকল গুণ থাকিলে তবে তুমি ধার্মিক পুরুষ। যখন আমাদের শাস্ত্রে এই-সকল সুন্দর সুন্দর ভাব রহিয়াছে এবং আমাদের দেশে এমন মহৎ জীবনসমূহ উদাহরণস্বরূপ রহিয়াছে, তখন যদি আমাদের যোগিশ্রেষ্ঠগণের হৃদয় ও মস্তিষ্ক-প্রসূত চিন্তা-রত্নগুলি সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া ধনি-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ সকলের সম্পত্তি না হয়, তবে বড়ই দুঃখের বিষয়। ঐ-সকল তত্ত্ব শুধু ভারতেই প্রচার করিতে হইবে তাহা নহে, সমগ্র জগতে ছড়াইতে হইবে। ইহাই আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। আর যতই তুমি অপরকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে, ততই দেখিবে তুমি নিজেরই কল্যাণ করিতেছ। যদি তোমরা যথার্থই তোমাদের ধর্মকে ভালবাসো, যদি তোমরা যথার্থই তোমাদের দেশকে ভালবাসো, তবে তোমাদিগকে সাধারণের নিকট দুর্বোধ্য শাস্ত্রাদি হইতে এই রত্নরাজি উদ্ধার করিয়া প্রকৃত উত্তরাধিকারিগণকে দিতে হইবে—এই মহাব্রত-সাধনে প্রাণপণ করিতে হইবে।

সর্বোপরি আমাদিগকে একটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। হায়! শত শত শতাব্দী ধরিয়া আমরা ঘোরতর ঈর্ষাবিষে জর্জরিত হইতেছি—আমরা সর্বদাই পরস্পরকে হিংসা করিতেছি। অমুক কেন আমা অপেক্ষা বড় হইল, আমি কেন তাহা অপেক্ষা বড় হইলাম না—অহরহঃ আমাদের এই চিন্তা! এমন কি, ধর্মকর্মেও আমরা এই শ্রেষ্ঠত্বের অভিলাষী—আমরা এমন ঈর্ষার দাস হইয়াছি! ইহা ত্যাগ করিতে হইবে। যদি ভারতে ভয়ানক কোন পাপ রাজত্ব করিতে থাকে, তবে তাহা এই ঈর্ষাপরতা। সকলেই আদেশ করিতে চায়, আদেশপালন করিতে কেহই প্রস্তুত নহে! প্রথমে আজ্ঞাপালন করিতে শিক্ষা কর, আজ্ঞা দিবার শক্তি আপনা হইতেই আসিবে। সর্বদাই দাস হইতে শিক্ষা কর, তবেই প্রভু হইতে পারিবে। প্রাচীনকালের সেই অদ্ভুত ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের অভাবেই ইহা ঘটিয়াছে। ঈর্ষাদ্বেষ পরিত্যাগ কর, তবেই তুমি এখনও যে-সব বড় বড় কাজ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা করিতে পারিবে।

আমাদের পূর্বপুরুষগণ অতি বিস্ময়কর কাজ করিয়াছিলেন—আমরা ভক্তি ও স্পর্ধার সহিত তাঁহাদের কার্যকলাপের আলোচনা করিয়া থাকি। কিন্তু এখন আমাদের কাজ করিবার সময়—আমাদের ভবিষ্যদ্বংশধরগণ যেন গৌরবের সহিত আমাদের কার্যকলাপের আলোচনা করে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ যতই শ্রেষ্ঠ ও মহিমান্বিত হউন না কেন, প্রভুর আশীর্বাদে আমরা প্রত্যেকেই এমন সব কাজ করিব, যাহা দ্বারা তাঁহাদেরও গৌরব-রবি ম্লান হইয়া যাইবে।

পাম্বান-অভিনন্দনের উত্তর

জাফনা হইতে জলপথে যাত্রা করিয়া স্বামীজী ২৬শে জানুআরি ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে পাম্বান দ্বীপে পৌঁছিলেন। জেটির নিম্নে এক চন্দ্রাতপতলে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়। রামনাদের রাজাও হৃদয়ের আবেগে স্বামীজীকে এক স্বতন্ত্র অভিনন্দন প্রদান করিলেন। পাশ্চাত্যদেশে ধর্মপ্রচারের পর স্বামীজী ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথম পাম্বানে পদার্পণ করেন। এই ঘটনা স্মরণার্থ রামনাদের রাজা সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া দেন। স্বামীজী এখানে নিম্নোক্তভাবে উত্তর প্রদান করিলেন:

আমাদের পুণ্য মাতৃভূমিতেই ধর্ম ও দর্শনের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি। এখানেই বড় বড় ধর্মবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এখানে—কেবল এখানেই ত্যাগধর্ম প্রচারিত হইয়াছে; এখানে—কেবল এখানেই অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের সম্মুখে উচ্চতম আদর্শসমূহ স্থাপিত হইয়াছে।

আমি পাশ্চাত্যদেশের অনেক স্থানে ঘুরিয়াছি—অনেক দেশ পর্যটন করিয়াছি, অনেক জাতি দেখিয়াছি। আমার বোধ হয় প্রত্যেক জাতিরই এক একটি মুখ্য আদর্শ আছে। সেই আদর্শই যেন তাহার জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। রাজনীতি, যুদ্ধ, বাণিজ্য বা যন্ত্রবিজ্ঞান ভারতের মেরুদণ্ড নহে; ধর্ম—কেবল ধর্মই ভারতের মেরুদণ্ড। ধর্মের প্রাধান্য ভারতে চিরকাল।

শারীরিক শক্তিবলে অনেক অদ্ভুত কার্য সম্পন্ন হইতে পারে সত্য; বুদ্ধিবলে বিজ্ঞানসাহায্যে যন্ত্রাদি নির্মাণ করিয়া তাহা দ্বারা অনেক অদ্ভুত কার্য দেখানো যায়, ইহাও সত্য; কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তির যেরূপ প্রভাব, এগুলির প্রভাব তাহার তুলনায় কিছুই নহে।

ভারতের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়, ভারত বরাবরই কর্মকুশল। আজকাল আমরা শিখিয়া থাকি—হিন্দুরা হীনবীর্য ও নিষ্কর্মা ; যে-সকল ব্যক্তির নিকট এই শিক্ষা পাই, তাঁহাদের নিকট অধিকতর জ্ঞানের প্রত্যাশা করি। তাঁহাদের শিক্ষায় এই ফল ফলিয়াছে যে, অন্যান্য দেশের লোকের নিকট হিন্দুরা হীনবীর্য ও নিষ্কর্মা—ইহা একটি কিংবদন্তী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারত যে কোন কালে নিষ্ক্রিয় ছিল, এ-কথা আমি কোনমতেই স্বীকার করি না। আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমি যেরূপ কর্মপরায়ণ, অন্য কোন দেশই সেরূপ নহে। তাহার প্রমাণ—এই অতি প্রাচীন মহান্ জাতি এখনও জীবিত রহিয়াছে। আর ইহার মহামহিমময় জীবনের প্রতি সন্ধিক্ষণে ইহা যেন অবিনাশী অক্ষয় নবযৌবন লাভ করিতেছে। ভারতে কর্মপরায়ণতা যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু উহা অপরের লক্ষ্যে না পড়িবার কারণ—যে যে-কাজটি করে বা ভাল বোঝে, সে সেটিকে মাপকাঠি করিয়া অপরকে বিচার করে, ইহাই মনুষ্য-প্রকৃতি! মুচি জুতাশেলাই বোঝে, মিস্ত্রী গাঁথনিই বোঝে—পৃথিবীতে যে আর কিছু করিবার বা জানিবার আছে, তাহা তাহাদের বুঝিবার অবসর হয় না। যখন আলোকের স্পন্দন অতি তীব্র হয়, তখন আমরা আলোক দেখিতে পাই না ; কারণ আমাদের দর্শনশক্তির একটা সীমা আছে—সীমার বাহিরে আর আমরা দেখিতে পাই না। যোগী কিন্তু তাঁহার আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিবলে সাধারণ অজ্ঞলোকের জড়দৃষ্টি ভেদ করিয়া ভিতরের জিনিস দেখিতে সমর্থ হন।

এক্ষণে সমগ্র পৃথিবী আধ্যাত্মিকতার জন্য ভারতভূমির দিকে তাকাইয়া আছে। ভারতকে পৃথিবীর সকল জাতির জন্য এই আধ্যাত্মিক খাদ্য যোগাইতে হইবে। এখানেই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলি বিদ্যমান। পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী এখন আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে নিবদ্ধ ভারতবাসীর সনাতন বিশেষত্বের পরিচায়ক এই আদর্শকে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে আলোচনা করিলে দেখা যায়, কোন প্রচারকই হিন্দুধর্মের মতবাদ-প্রচারের জন্য ভারতের বাহিরে যান নাই। কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন আসিতেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি জগতের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হইয়া থাকি।' ধর্মের ইতিহাস গবেষণা করিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, যে-কোন জাতির ভিতর উত্তম নীতিশাস্ত্র প্রচলিত, সে-জাতিই উহার কতক

অংশ আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে, আর যে-সকল ধর্মে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান পরিস্ফুট, তাহারাও মুখ্য বা গৌণভাবে উহা আমাদের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দুর্বলের উপর প্রবলের যেরূপ অত্যাচার দস্যুতা জুলুম প্রভৃতি হইতেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও এরূপ হয় নাই। সকলেই জানেন, বাসনা-জয় না করিলে মুক্তি নাই। যে প্রকৃতির দাস, সে কখনও মুক্ত হইতে পারে না। পৃথিবীর সব জাতিই এখন এই মহাসত্য বুঝিয়া উহার আদর করিতে শিখিতেছে। শিষ্য যখন এই সত্য ধারণা করিবার উপযুক্ত হয়, তখনই তাহার উপর গুরুর কৃপা হয়। ভগবান অনন্ত কাল সকল ধর্মের লোকদের প্রতি প্রভূত দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদের জন্য সাহায্য প্রেরণ করিতেছেন। আমাদের প্রভু সকল ধর্মেরই ঈশ্বর—এই উদার ভাব কেবল ভারতেই বর্তমান। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে এরূপ উদার ভাব দেখাও তো!

বিধির বিধানে আমরা হিন্দুগণ বড় সঙ্কটময় ও দায়িত্বপূর্ণ অবস্থায় পড়িয়াছি। পাশ্চাত্য জাতিগুলি আমাদের নিকট আধ্যাত্মিক সহায়তার জন্য আসিতেছে। ভারতসন্তানগণের এখন কর্তব্য—সমগ্র পৃথিবীকে মানব-জীবনের সমস্যাগুলির প্রকৃষ্ট সমাধান শিক্ষা দিবার জন্য নিজদিগকে উপযুক্ত ভাবে গড়িয়া তোলা। ভারতবাসীরা সমগ্র পৃথিবীকে ধর্ম শিখাইতে ন্যায়তঃ বাধ্য। একটি বিষয় আমরা গৌরবের সহিত স্মরণ করিতে পারি। অন্যান্য দেশের শ্রেষ্ঠ ও বড় লোকেরা পার্বত্যদুর্গনিবাসী, পথিকের সর্বস্বলুণ্ঠনকারী দস্যু ব্যারনগণ হইতে তাঁহাদের বংশাবলীর উৎপত্তি হইয়াছে—এইরূপ দেখাইতে পারিলে বড় আনন্দ ও গৌরব অনুভব করেন। আমরা হিন্দুগণ কিন্তু পর্বতগুহানিবাসী ফলমূলাহারী ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ মুনিঋষির বংশধর বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করি। আমরা এখন অবনত ও হীন হইয়া পড়িতে পারি, কিন্তু যদি আমাদের ধর্মের জন্য আমরা প্রাণ পণ করি, তবে আবার আমরা মহৎপদবীতে উন্নীত হইতে পারিব।

আপনারা আমাকে যে আন্তরিকতার সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছেন, সেজন্য আমার হৃদয়ের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। রামনাদের রাজা আমার প্রতি যে-ভালবাসা দেখাইয়াছেন, সেজন্য আমি যে তাঁহার নিকট কত কৃতজ্ঞ, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। যদি আমাদ্বারা কিছু সৎকার্য হইয়া থাকে,

তবে তাহার প্রত্যেকটির জন্য ভারত এই মহানুভব রাজার নিকট ঋণী ; কারণ আমাকে চিকাগোয় পাঠাইবার কল্পনা তাঁহার মনেই প্রথম উদিত হয়, তিনিই আমার মাথায় ঐ ভাব প্রবেশ করাইয়া দেন এবং উহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য আমাকে বার বার উৎসাহিত করেন। তিনি এখন আমার পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহে আরও অধিক কাজের আশা করিতেছেন। যদি তাঁহার মতো আরও কয়েকজন রাজা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির কল্যাণে আগ্রহান্বিত হইয়া ইহার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, তবে বড়ই ভাল হয়।

রামেশ্বর-মন্দিরে বক্তৃতা

মহাসমারোহে পাম্বান হইতে স্বামীজীকে রামেশ্বরে লইয়া যাওয়া হয় ; সেখানে তিনি একদিন রামেশ্বর-মন্দির দর্শন করিলেন। অবশেষে তাঁহাকে সমবেত জনগণের সমক্ষে বক্তৃতা দিতে বলা হইল। স্বামীজী ইংরেজীতে বক্তৃতা দিলেন, নাগলিঙ্গম্ মহাশয় তামিল ভাষায় অনুবাদ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইতে লাগিলেন।

ধর্ম অনুরাগে,—বাহ্য অনুষ্ঠানে নহে। হৃদয়ের পবিত্র ও অকপট প্রেমেই ধর্ম। যদি দেহ মন শুদ্ধ না হয়, তবে মন্দিরে গিয়া শিবপূজা করা বৃথা। যাহাদের দেহ মন পবিত্র, শিব তাহাদেরই প্রার্থনা শুনেন। আর যাহারা অশুদ্ধস্বভাব হইয়াও অপরকে ধর্মশিক্ষা দিতে যায়, তাহারা অসদ্গতি প্রাপ্ত হয়। বাহ্য পূজা মানস পূজার বহিরঙ্গমাত্র—মানস পূজা ও চিত্তশুদ্ধিই আসল জিনিস। এইগুলি না থাকিলে বাহ্য পূজায় কোন ফললাভ হয় না। এই কলিযুগে লোকে এত হীনস্বভাব হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা মনে করে—তাহারা যাহা খুশি করুক না কেন, তীর্থস্থানে গমন করিবামাত্র তাহাদের পাপ ক্ষয় হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি কেহ অপবিত্রভাবে কোন তীর্থে গমন করে, তবে সেখানে অপরাপর ব্যক্তির যত পাপ, সব তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে—তখন তাহাকে আরও গুরুতর পাপের বোঝা লইয়া গৃহে ফিরিতে হয়। তীর্থে সাধুগণ বাস করেন, সেখানে পবিত্রভাবোদ্দীপক অন্যান্য বস্তুও থাকে। কিন্তু যদি কোন স্থানে

কেবল কতকগুলি সাধু ব্যক্তি বাস করেন, অথচ সেখানে একটিও মন্দির না থাকে, তবে সেই স্থানকেই তীর্থ বলিতে হইবে। যদি কোন স্থানে শত শত মন্দির থাকে, অথচ যদি সেখানে অনেক অসাধু লোক বাস করে, তবে সেই স্থানের আর তীর্থত্ব থাকে না। আবার তীর্থে বাস করাও বড় কঠিন ব্যাপার ; কারণ অন্য স্থানের পাপ তীর্থে খণ্ডিত হয়, কিন্তু তীর্থে কৃত পাপ কিছুতেই দূরীভূত হয় না। সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণ সাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন। আর যে-ব্যক্তি কেবল প্রতিমার মধ্যে শিব উপাসনা করে, সে প্রবর্তকমাত্র। যে-ব্যক্তি কেবল মন্দিরেই শিব দর্শন করে, তাহার অপেক্ষা যে-ব্যক্তি জাতি-ধর্মনির্বিশেষে একটি দরিদ্রকেও শিববোধে সেবা করে, তাহার প্রতি শিব অধিকতর প্রসন্ন হন।

কোন ধনী ব্যক্তির একটি বাগান ছিল, এবং দুইটি মালী ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন খুব অলস, সে কোন কাজ করিত না ; কিন্তু প্রভু আসিবামাত্র করজোড়ে 'প্রভুর কিবা রূপ, কিবা গুণ!' বলিয়া তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিত। অপর মালীটি বেশী কথা জানিত না—সে খুব পরিশ্রম করিয়া প্রভুর বাগানে সকল প্রকার ফল ও শাকসবজি উৎপন্ন করিত ও সেইগুলি মাথায় করিয়া অনেক দূরে প্রভুর বাটীতে লইয়া যাইত। বলো দেখি, এই দুই জন মালীর মধ্যে প্রভু কাহাকে অধিকতর ভালবাসিবেন? এইরূপে শিব আমাদের সকলের প্রভু, জগৎ তাঁহার উদ্যানস্বরূপ, আর এখানে দুই প্রকার মালী আছে। এক প্রকার মালী অলস কপট, কিছুই করিবে না, কেবল শিবের রূপের—তাঁহার চোখ নাক ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা করিবে ; আর এক প্রকার মালী আছেন, যাঁহারা শিবের দরিদ্র দুর্বল সন্তানগণের জন্য, তাঁহার সৃষ্ট সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন। এই দ্বিবিধপ্রকৃতিবিশিষ্ট ভক্তের মধ্যে কে শিবের প্রিয়তর হইবে? নিশ্চয়ই যিনি শিবের সন্তানগণের সেবা করেন। যিনি পিতার সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে আগে তাঁহার সন্তানগণের সেবা করিতে হইবে। যিনি শিবের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাঁহার সন্তানগণের সেবা সর্বাগ্রে করিতে হইবে—জগতের জীবগণের সেবা আগে করিতে হইবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা ভগবানের দাসগণের সেবা করেন, তাঁহারাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ দাস। অতএব এইটি সর্বদা স্মরণ রাখিবে।

পুনরায় বলিতেছি, তোমাদিগকে শুদ্ধচিত্ত হইতে হইবে, এবং যে-কেহ তোমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়, যথাসাধ্য তাহার সেবা করিতে হইবে। এইভাবে পরের সেবা শুভ কর্ম। এই সৎকর্মবলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সকলের ভিতরে যে শিব রহিয়াছেন, তিনি প্রকাশিত হন। তিনি সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। যদি দর্পণের উপর ধূলি ও ময়লা থাকে, তবে তাহাতে আমরা আমাদের চেহারা দেখিতে পাই না। আমাদের হৃদয়-দর্পণেও এইরূপ অজ্ঞান ও পাপের ময়লা রহিয়াছে। সবচেয়ে বড় পাপ এই স্বার্থপরতা—আগে নিজের ভাবনা ভাবা। যে মনে করে, আমি আগে খাইব, আমি অপরের চেয়ে অধিক ঐশ্বর্যশালী হইব, আমি সর্বসম্পদের অধিকারী হইব ; যে মনে করে, আমি অপরের আগে স্বর্গে যাইব, আমি অপরের আগে মুক্তিলাভ করিব, সে ব্যক্তিই স্বার্থপর। স্বার্থশূন্য ব্যক্তি বলেন, আমি সকলের আগে যাইতে চাই না, সকলের শেষে যাইব ; আমি স্বর্গে যাইতে চাই না—যদি আমার ভ্রাতৃবর্গকে সাহায্য করিবার জন্য নরকে যাইতে হয়, তাহাতেও প্রস্তুত আছি। কেহ ধার্মিক কি অধার্মিক পরীক্ষা করিতে হইলে দেখিতে হইবে, সে ব্যক্তি কতদূর নিঃস্বার্থ। যে অধিক নিঃস্বার্থ, সে-ই অধিক ধার্মিক। সে-ই শিবের সামীপ্য লাভ করে। সে পণ্ডিতই হউক, মূর্খই হউক, সে শিবের বিষয় কিছু জানুক বা না জানুক, সে অপর ব্যক্তি অপেক্ষা শিবের অধিকতর নিকটবর্তী। আর যদি কেহ স্বার্থপর হয়, সে যদি পৃথিবীতে যত দেবমন্দির আছে, সব দেখিয়া থাকে, সব তীর্থ দর্শন করিয়া থাকে, সে যদি চিতাবাঘের মতো সাজিয়া বসিয়া থাকে, তাহা হইলেও সে শিব হইতে অনেক দূরে অবস্থিত।

রামনাদ অভিনন্দনের উত্তর

সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়া বোধ হইতেছে। মহাদুঃখ অবসানপ্রায় প্রতীত হইতেছে। মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগ্রত হইতেছে। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিংবদন্তী পর্যন্ত যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার ভেঁদে অসমর্থ, সেখান হইতে এক অপূর্ব বাণী যেন শ্রুতিগোচর হইতেছে। জ্ঞান ভক্তি কর্মের অনন্ত হিমালয়স্বরূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের প্রতিশৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন ঐ বাণী মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন্ অপূর্ব রাজ্যের সংবাদ বহন করিতেছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন উহা স্পষ্টতর, গভীরতর হইতেছে। যেন হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ুস্পর্শ মৃতদেহের শিথিলপ্রায় অস্থিমাংসে পর্যন্ত প্রাণসঞ্চার করিতেছে—নিদ্রিত শব জাগ্রত হইতেছে। তাহার জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অন্ধ যে, সে দেখিতেছে না; বিকৃতমস্তিষ্ক যে, সে বুঝিতেছে না—আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এখন ইঁহার গতিরোধে সমর্থ নহে, ইনি আর নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃশক্তিই এখন আর ইঁহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না, কুম্ভকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙিতেছে।

হে রাজন্, হে রামনাদবাসী ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যে দয়া প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের সহিত আমাকে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন, সেজন্য আপনারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনারা আমার প্রতি যে আন্তরিক ভালবাসা প্রকাশ করিতেছেন, তাহা আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি। কারণ, মুখের ভাষা অপেক্ষা হৃদয়ে হৃদয়ে ভাববিনিময় অতি অপূর্ব—আত্মা নীরবে অথচ অভ্রান্ত ভাষায় অপর আত্মার সহিত আলাপ করেন,—তাই আমি আপনাদের ভাব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি। হে রামনাদাধিপ, আমাদের ধর্ম ও মাতৃভূমির জন্য যদি এই দীনজনের দ্বারা পাশ্চাত্যদেশে কোন কার্য কৃত হইয়া থাকে, যদি আমাদের স্বদেশবাসীর চিত্ত তাহাদের গৃহেই অজ্ঞাত ও গুপ্তভাবে রক্ষিত অমূল্য রত্নরাজির প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য কোন কার্য কৃত হইয়া থাকে, যদি তাহারা অজ্ঞতাবশে তৃষ্ণার তাড়নায় প্রাণত্যাগ না করিয়া বা অপর স্থানের মলিন পয়ঃপ্রণালীর জল পান না করিয়া তাহাদের

গৃহের নিকটবর্তী অফুরন্ত নির্ঝরের নির্মল জল পান করিতে আহূত হইয়া থাকে, যদি আমাদের স্বদেশবাসীকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে কর্মপরায়ণ করিবার জন্য, রাজনীতিক উন্নতি, সমাজসংস্কার বা কুবেরের ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও ধর্মই যে ভারতের প্রাণ, ধর্ম লুপ্ত হইলে যে ভারতও মরিয়া যাইবে, ইহা বুঝাইবার জন্য যদি কিছু করা হইয়া থাকে, হে রামনাদাধিপ, ভারত অথবা ভারতেতর দেশে আমা দ্বারা কৃত কার্যের জন্য প্রশংসার ভাগী আপনি। কারণ, আপনিই আমার মাথায় প্রথম এই ভাব প্রবেশ করাইয়া দেন এবং আপনিই পুনঃ পুনঃ আমাকে—কার্যের জন্য উত্তেজিত করেন। আপনি যেন অন্তর্দৃষ্টিবলে ভবিষ্যৎ জানিতে পারিয়া আমাকে বরাবর সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, কখনই আমাকে উৎসাহ দিতে বিরত হন নাই। অতএব আপনি যে আমার সফলতায় প্রথম আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন এবং আমি যে ভারতে আসিয়া প্রথম আপনার রাজ্যে নামিলাম, ইহা ঠিকই হইয়াছে।

হে ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের রাজা পূর্বেই বলিয়াছেন—আমাদিগকে বড় বড় কাজ করিতে হইবে, অদ্ভুত শক্তির বিকাশ দেখাইতে হইবে, অপর জাতিকে অনেক বিষয় শিখাইতে হইবে। দর্শন ধর্ম বা নীতিবিজ্ঞানই বলুন অথবা মধুরতা কোমলতা বা মানবজাতির প্রতি অকপট প্রীতিরূপ সদ্‌গুণরাজিই বলুন, আমাদের মাতৃভূমি এ-সব কিছুরই প্রসূতি। এখনও ভারতে এইগুলি বিদ্যমান আছে আর পৃথিবীর সম্বন্ধে যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমি এখন দৃঢ়ভাবে সাহসের সহিত বলিতে পারি, এখনও ভারত এই-সকল বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই আশ্চর্য ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া দেখুন। গত চার-পাঁচ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীতে অনেক গুরুতর রাজনীতিক পরিবর্তন ঘটিতেছে। পাশ্চাত্যদেশের সর্বত্রই বড় বড় সম্প্রদায় উঠিয়া বিভিন্ন দেশের প্রচলিত নিয়মপদ্ধতিগুলিকে একেবারে বিপর্যস্ত করিবার চেষ্টায় কতক পরিমাণে কৃতকার্য হইতেছে। আমাদের দেশের লোককে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা এ-সকলের কথা কিছু শুনিয়াছে কি না। তাহারা কিছুই শুনে নাই। কিন্তু চিকাগোয় ধর্মমহাসভা বসিয়াছিল, ভারত হইতে সেই মহাসভায় একজন সন্ন্যাসী প্রেরিত হইয়া সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন এবং সেই অবধি পাশ্চাত্যদেশে কার্য করিতেছিলেন—এখানকার অতি দরিদ্র ভিক্ষুকও তাহা জানে। লোকে বলিয়া থাকে, আমাদের দেশের সাধারণ লোক বড় স্থূলবুদ্ধি, তাহারা দুনিয়ার

কোন প্রকার সংবাদ রাখে না, সংবাদ চাহেও না। পূর্বে আমারও ঐ মতের দিকে একটা ঝোঁক ছিল; কিন্তু এখন বুঝিতেছি, কাল্পনিক গবেষণা অথবা ত্বরিতদৃষ্টিতে দেশদর্শকগণের লিখিত পুস্তক-পাঠ অপেক্ষা অভিজ্ঞতা অনেক বেশী শিক্ষাপ্রদ।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই জ্ঞানলাভ করিয়াছি যে, আমাদের দেশের সাধারণ লোক নির্বোধও নহে অথবা তাহারা যে জগতের সংবাদ লইতে কম ব্যাকুল, তাহাও নহে; পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোক যেমন সংবাদ-সংগ্রহে আগ্রহান্বিত, ইহারাও সেইরূপ। তবে প্রত্যেক জাতিরই জীবনের এক একটি উদ্দেশ্য আছে। প্রত্যেক জাতিই প্রাকৃতিক নিয়মে কতকগুলি বিশেষত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সকল জাতি মিলিয়া যেন এক মহা ঐকতান বাদ্যের সৃষ্টি করিয়াছে—প্রত্যেক জাতিই যেন উহাতে এক একটি পৃথক পৃথক স্বর দিতেছে। উহাই তাহার জীবনীশক্তি। উহাই উহার জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, মূলভিত্তি। আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমির মূলভিত্তি, মেরুদণ্ড বা জীবনকেন্দ্র একমাত্র ধর্ম। অপরে রাজনীতির কথা বলুক, বাণিজ্যবলে অগাধ ধনরাশি উপার্জনের গৌরব, বাণিজ্যনীতির শক্তি ও উহার প্রচার, বাহ্য স্বাধীনতালাভের অপূর্ব সুখের কথা বলুক। হিন্দু এ-সকল বুঝে না, বুঝিতে চাহেও না। তাহাদের সহিত ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মা, মুক্তি—এ-সকল সম্বন্ধে কথা বলুন। আমি আপনাদিগকে নিশ্চয় বলিতেছি, অন্যান্য দেশের অনেক তথাকথিত দার্শনিক অপেক্ষা আমাদের দেশের সামান্য কৃষক পর্যন্ত এ-সকল তত্ত্বসম্বন্ধে অধিকতর অভিজ্ঞ। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদিগকে বলিয়াছি, এখনও আমাদের জগৎকে শিখাইবার কিছু আছে। এই জন্যই শত শত বর্ষের অত্যাচার এবং প্রায় সহস্র বর্ষের বৈদেশিক শাসনের পীড়নেও এই জাতি এখনও জীবিত রহিয়াছে। এই জাতি এখনও জীবিত, কারণ এখনও এই জাতি ঈশ্বর ও ধর্মরূপ মহারত্নকে পরিত্যাগ করে নাই।

আমাদের এই মাতৃভূমিতে এখনও ধর্ম ও অধ্যাত্মবিদ্যারূপ যে নির্ঝরিণী বহিতেছে, এখনও তাহা হইতে মহাবন্যা প্রবাহিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে ভাসাইবে এবং রাজনীতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রতিদিন নূতন ভাবে সমাজগঠনের চেষ্টায় প্রায় অর্ধমৃত হীনদশাগ্রস্ত পাশ্চাত্য ও অন্যান্য জাতিকে নূতন জীবন প্রদান করিবে। নানাবিধ মত-মতান্তরের বিভিন্ন সুরে ভারতগগন প্রতিধ্বনিত

হইতেছে সত্য, কোন স্বর ঠিক তালে মানে বাজিতেছে, কোনটি বা বেতালা ; কিন্তু বেশ বুঝা যাইতেছে, উহাদের মধ্যে একটি প্রধান স্বর যেন ভৈরবরাগে সপ্তমে উঠিয়া অপরগুলিকে আর শ্রুতিবিবরে পৌছিতে দিতেছে না। ত্যাগের ভৈরবরাগের নিকট অন্যান্য রাগরাগিণী যেন লজ্জায় মুখ লুকাইয়াছে। 'বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ'—ভারতীয় সকল শাস্ত্রেরই এই কথা, ইহাই সকল শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব। দুনিয়া দুদিনের একটা মায়ামাত্র। জীবন তো ক্ষণিক। ইহার পশ্চাতে দূরে—অতি দূরে সেই অনন্ত অপার রাজ্য ; যাও, সেখানে চলিয়া যাও। এ রাজ্য মহাবীর মনীষিগণের হৃদয়জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ; তাঁহারা এই তথা-কথিত অনন্ত জগৎকেও একটি ক্ষুদ্র মৃত্তিকাস্তূপ মাত্র জ্ঞান করেন ; তাঁহারা ক্রমশঃ সে রাজ্য ছাড়াইয়া আরও দূরে—দূরতম রাজ্যে চলিয়া যান। কালের—অনন্ত কালেরও অস্তিত্ব সেখানে নাই ; তাঁহারা কালের সীমা ছাড়াইয়া দূরে—অতি দূরে চলিয়া যান। তাঁহাদের পক্ষে দেশেরও অস্তিত্ব নাই—তাঁহারা তাহারও পারে যাইতে চান। ইহাই ধর্মের গূঢ়তম রহস্য। প্রকৃতিকে এইরূপে অতিক্রম করিবার চেষ্টা, যেরূপেই হউক—যতই ক্ষতিস্বীকার করিয়া হউক—সাহস করিয়া প্রকৃতির অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়া অন্ততঃ একবারও চকিতের মতো সেই দেশকালাতীত সত্তার দর্শনচেষ্টাই আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্য। তোমরা যদি আমাদের জাতিকে উৎসাহ-উদ্দীপনায় মাতাইতে চাও—তাহাদিগকে এই রাজ্যের কোন সংবাদ দাও, তাহারা মাতিয়া উঠিবে। তোমরা তাহাদের নিকট রাজনীতি, সমাজসংস্কার, ধনসঞ্চয়ের উপায়, বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি যাহাই বলো না, তাহারা এক কান দিয়া শুনিবে, অপর কান দিয়া তাহা বাহির হইয়া যাইবে। অতএব পৃথিবীকে তোমাদের এই ধর্ম শিক্ষা দিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন এই, পৃথিবীর নিকট আমাদের কিছু শিখিবার আছে কি ? সম্ভবতঃ অপর জাতির নিকট হইতে আমাদিগকে কিছু বহির্বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে ; কিরূপে সঙ্ঘ গঠন করিয়া পরিচালন করিতে হয়, বিভিন্ন শক্তি প্রণালী-বদ্ধভাবে কাজে লাগাইয়া কিরূপে অল্প চেষ্টায় অধিক ফললাভ করিতে হয়, তাহাও শিখিতে হইবে। ত্যাগ আমাদের সকলের লক্ষ্য হইলেও দেশের সকল লোক যতদিন না সম্পূর্ণ ত্যাগ-স্বীকারে সমর্থ হইতেছে, ততদিন সম্ভবতঃ পাশ্চাত্যের নিকট পূর্বোক্ত বিষয়গুলি কিছু কিছু শিখিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখা উচিত—ত্যাগই আমাদের সকলের আদর্শ। যদি কেহ ভারতে ভোগসুখকেই পরম-

পুরুষার্থ বলিয়া প্রচার করে, যদি কেহ জড়জগৎকেই ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করে, তবে সে মিথ্যাবাদী। এই পবিত্র ভারতভূমিতে তাহার স্থান নাই—ভারতের লোক তাহার কথা শুনিতে চায় না। পাশ্চাত্য সভ্যতার যতই চাকচিক্য ও ঔজ্জ্বল্য থাকুক না কেন, উহা যতই অদ্ভুত ব্যাপারসমূহ প্রদর্শন করুক না কেন, আমি এই সভায় দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, ও-সব মিথ্যা, ভ্রান্তি—ভ্রান্তিমাত্র। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, আত্মাই একমাত্র সত্য, ধর্মই একমাত্র সত্য। ঐ সত্য ধরিয়া থাকো।

তথাপি আমাদের যে-সব ভ্রাতারা এখনও উচ্চতম সত্যের অধিকারী হয় নাই, তাহাদের পক্ষে হয়তো এক প্রকার জড়বাদ কল্যাণের কারণ হইতে পারে—অবশ্য উহাকে আমাদের প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। সকল দেশেই, সকল সমাজেই একটি বিষম ভ্রম চলিয়া আসিতেছে। আর বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে-ভারতে পূর্বে এই ভ্রম কখনও হয় নাই, কিছুদিন যাবৎ সেখানেও এই ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে। সেই ভ্রম এই: অধিকারী বিচার না করিয়া সকলের জন্য একই ধরনের ব্যবস্থা-প্রদান। প্রকৃতপক্ষে সকলের পথ এক নহে। তুমি যে সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছ, আমারও সেই একই প্রণালী হইতে পারে না। তোমরা সকলে জানো, সন্ন্যাস-আশ্রমই হিন্দু-জীবনের চরম লক্ষ্য। আমাদের শাস্ত্র সকলকে সন্ন্যাসী হইতে আদেশ করিতেছেন। সংসারের সুখসমুদয় ভোগ করিয়া প্রত্যেক হিন্দুকেই জীবনের শেষভাগে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। যে তাহা না করে, সে হিন্দু নহে; তাহার নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার নাই, সে শাস্ত্র অমান্য করে। যখন ভোগের দ্বারা প্রাণে প্রাণে বুঝিবে যে, সংসার অসার—তখন তোমাকে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। আমরা জানি—ইহাই হিন্দুর আদর্শ। যখন ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া বুঝিবে, সংসার-ফলের ভিতরটা ভুয়ামাত্র—আমড়ার মতো উহার 'আঁটি ও চামড়া'ই সার, তখন সংসার ত্যাগ করিয়া যেখান হইতে আসিয়াছ, সেখানে ফিরিবার চেষ্টা কর। মন যেন চক্রগতিতে সম্মুখে ইন্দ্রিয়ের দিকে ধাবমান হইতেছে—উহাকে আবার ফিরিয়া পশ্চাতে আসিতে হইবে। প্রবৃত্তিমার্গ ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে—ইহাই আদর্শ। কিন্তু কিছু পরিমাণ অভিজ্ঞতা হইলে তবে এই আদর্শ ধরিতে পারা যায়। শিশুকে ত্যাগের তত্ত্ব শেখানো যায় না। সে জন্মাবধি আশার স্বপ্ন দেখিতেছে। ইন্দ্রিয়েই তাহার

জীবনের অনুভূতি, তাহার জীবন কতকগুলি ইন্দ্রিয়সুখের সমষ্টিমাত্র। প্রত্যেক সমাজে শিশুর মতো অবোধ মানুষ আছে। সংসারের অসারতা বুঝিতে হইলে প্রথমে তাহাদিগকে কিছু সুখভোগের অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইবে—তবেই তাহারা বৈরাগ্যলাভে সমর্থ হইবে। আমাদের শাস্ত্রে ইহার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরবর্তী কালে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে সন্ন্যাসীদের নিয়মে বাঁধিবার একটা বিশেষ ঝোঁক দেখা গিয়াছে। ইহা মহা ভুল। ভারতে যে দুঃখদারিদ্র্য দেখা যাইতেছে, তাহা অনেকটা এই কারণেই হইয়াছে। দরিদ্র ব্যক্তিকে নানাবিধ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক নিয়মে বাঁধা হইয়াছে; তাহার পক্ষে এগুলির কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। তাহার কার্যের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া হাত গুটাইয়া লও দেখি। বেচারা একটু সুখভোগ করিয়া লউক। দেখিবে, সে ক্রমশঃ উন্নত হইবে—ক্রমশঃ তাহার মধ্যে ত্যাগের ভাব আপনাআপনি আসিবে।

হে ভদ্রমহোদয়গণ, ভোগের ব্যাপারে কিরূপে সফলতা লাভ করা যায়, আমরা পাশ্চাত্য জাতির নিকট সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিখিতে পারি। কিন্তু অতি সাবধানে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে, আজকাল আমরা পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত যে-সকল ব্যক্তি দেখিতে পাই, তাহাদের প্রায় কাহারও জীবন বড় আশাপ্রদ নহে। এখন আমাদের একদিকে প্রাচীন হিন্দু-সমাজ, অপর দিকে আধুনিক ইওরোপীয় সভ্যতা। এই দুইটির মধ্যে আমি প্রাচীন হিন্দু-সমাজকেই বাছিয়া লইব। কারণ সেকেলে হিন্দু অজ্ঞ হইলেও, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইলেও তাহার একটা বিশ্বাস আছে—সেই জোরে সে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে; কিন্তু পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরুদণ্ডহীন, সে চারিদিক হইতে কতকগুলি এলোমেলো ভাব পাইয়াছে—তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই, শৃঙ্খলা নাই; সেগুলিকে সে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই, কতকগুলি ভাবের বদহজম হইয়া সামঞ্জস্যহীন হইয়াছে। সে নিজের পায়ের উপর দণ্ডায়মান নয়—তাহার মাথা বোঁ বোঁ করিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছে। সে যাহা কিছু করে, তাহার প্রেরণা-শক্তি কোথায়? ইংরেজ কিসে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দুটা 'বাহবা' দিবে, ইহাই তাহার সকল কাজের অভিসন্ধির মূলে! সে যে সমাজসংস্কারে অগ্রসর হয়, সে যে আমাদের কতকগুলি সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে, তাহার কারণ—

ঐ-সকল আচার সাহেবদের মতবিরুদ্ধ! আমাদের কতকগুলি প্রথা দোষাবহ কেন?—কারণ সাহেবরা এরূপ বলিয়া থাকে! এরূপ ভাব আমি চাহি না। বরং নিজের যাহা আছে, তাহা লইয়া নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া মরিয়া যাও। জগতে যদি কিছু পাপ থাকে, তবে দুর্বলতাই সেই পাপ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা ত্যাগ কর—দুর্বলতাই মৃত্যু, দুর্বলতাই পাপ। এই প্রাচীন পন্থাবলম্বী ব্যক্তিগণ 'মানুষ' ছিলেন—তাঁহাদের একটা দৃঢ়তা ছিল; কিন্তু এই সামঞ্জস্যহীন—ভারসাম্যহীন জীবগণ এখনও কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব লাভ করিতে পারে নাই। তাহাদিগকে কি বলিব—পুরুষ না স্ত্রী, না পশু? তবে তাহাদের মধ্যেও কয়েকজন আদর্শ-স্থানীয় ব্যক্তি আছেন। তোমাদের রাজা তাহার একটি দৃষ্টান্ত। সমগ্র ভারতে ইঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান হিন্দু দেখিতে পাইবে না; আবার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল বিষয়েই বিশেষ সংবাদ রাখেন, এমন রাজা ভারতে আর বাহির করিতে পারিবে না। ইনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয়েরই সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন—উভয় জাতির যাহা ভাল, তাহাই ইনি গ্রহণ করিয়াছেন। মনু মহারাজ তৎকৃত সংহিতায় বলিয়াছেন:

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥[১]

—শ্রদ্ধাপূর্বক নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও উত্তম বিদ্যা গ্রহণ করিবে। অতি নীচ জাতির নিকট হইতেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম, অর্থাৎ মুক্তিমার্গের উপদেশ লইবে। নীচকুল হইতেও বিবাহের জন্য উত্তমা স্ত্রী গ্রহণ করিবে।

মনু মহারাজ যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক কথা। আগে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াও, তারপর সকল জাতির নিকট হইতেই শিক্ষা গ্রহণ কর, যাহা কিছু পারো আপনার করিয়া লও; যাহা কিছু তোমার কাজে লাগিবে, তাহা গ্রহণ কর। তবে একটি কথা মনে রাখিও—তোমরা যখন হিন্দু, তখন তোমরা যাহা কিছু শিক্ষা কর না কেন, তাহাই যেন তোমাদের জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্রস্বরূপ ধর্মের নিম্নে স্থান গ্রহণ করে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবনে এক বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। অতীত জন্মের কর্মফলে তাহার জীবনের এই নির্দিষ্ট গতি নিয়মিত হইয়া থাকে। তোমরাও প্রত্যেকে এক বিশেষ ব্রতসাধনের জন্য জন্মগ্রহণ

১ মনুসংহিতা, ২।২৩৮

করিয়াছ। মহামহিমময় হিন্দুজাতির অনন্ত অতীত জীবনের সমুদয় কর্মসমষ্টি তোমাদের এই জীবনব্রতের নির্দেশক। সাবধান, তোমাদের লক্ষ লক্ষ পিতৃপুরুষ তোমাদের প্রত্যেক কার্য লক্ষ্য করিতেছেন! কি সেই ব্রত, যাহা সাধন করিবার জন্য প্রত্যেক হিন্দুসন্তানের জন্ম? মনু মহারাজ অতি স্পর্ধার সহিত ব্রাহ্মণের জন্মের যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা কি তোমরা পড় নাই?—

ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥[১]

'ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে'—ধর্মরূপ ধনভাণ্ডারের রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণের জন্ম। আমি বলি, এই পবিত্র ভারতভূমিতে যে-কোন নরনারী জন্মগ্রহণ করে, তাহারই জন্মগ্রহণের কারণ—'ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে'। অন্যান্য সকল বিষয়কেই আমাদের জীবনের সেই মূল উদ্দেশ্যের অধীন করিতে হইবে। সঙ্গীতে যেমন একটি প্রধান সুর থাকে—অন্যান্য সুরগুলি তাহারই অধীন, তাহারই অনুগত হইলে তবে সঙ্গীতে 'লয়' ঠিক হইয়া থাকে, এখানেও সেইরূপ করিতে হইবে। এমন জাতি থাকিতে পারে, যাহাদের মূলমন্ত্র রাজনীতিক প্রাধান্য; ধর্ম ও অন্যান্য সমুদয় বিষয় অবশ্যই তাহাদের এই মূল উদ্দেশ্যের নিম্নস্থান অধিকার করিবে। কিন্তু এই আর এক জাতি রহিয়াছে, যাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম ও বৈরাগ্য; যাহাদের একমাত্র মূলমন্ত্র—এ জগৎ অসার, দু-দিনের ভ্রমমাত্র; ধর্ম ব্যতীত আর যাহা কিছু—জ্ঞান-বিজ্ঞান ভোগ-ঐশ্বর্য নাম-যশ ধন দৌলত—সব কিছুরই স্থান উহার নিম্নে।

তোমাদের রাজার চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব, তিনি তাঁহার পাশ্চাত্য বিদ্যা ধনমান পদমর্যাদা সবই ধর্মের অধীন—ধর্মের সহায়ক করিয়াছেন; এই ধর্ম আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতা হিন্দুজাতির—প্রত্যেক হিন্দুর জন্মগত সংস্কার। সুতরাং পূর্বোক্ত দুই প্রকার লোকের মধ্যে একজন পাশ্চাত্য শিক্ষায় অশিক্ষিত প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত, যাহার মধ্যে হিন্দুজাতির জীবনের মূলশক্তিস্বরূপ আধ্যাত্মিকতা বিদ্যমান, যাহার মধ্যে আর কিছু নাই;—আর একজন, যে পাশ্চাত্য সভ্যতার কতকগুলি নকল হীরা জহরত লইয়া বসিয়া আছে, অথচ যাহার ভিতর সেই জীবনপ্রদ শক্তিসঞ্চারী আধ্যাত্মিকতা নাই; এই উভয়

১ মনুসংহিতা, ১।৯৯

সম্প্রদায়ের যদি তুলনা করা যায়, তবে আমার বিশ্বাস—সমবেত শ্রোতৃবর্গ সকলে একমত হইয়া প্রথমোক্ত সম্প্রদায়েরই পক্ষপাতী হইবেন। কারণ এই প্রাচীন সম্প্রদায়ের উন্নতির কতকটা আশা করিতে পারা যায়—তাহার একটা অবলম্বন আছে, জাতীয় মূলমন্ত্র তাহার প্রাণে জাগিতেছে, সুতরাং তাহার বাঁচিবার আশা আছে; শেষোক্ত সম্প্রদায়ের কিন্তু মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; যেমন ব্যক্তিগত ভাবে বলা চলে—যদি মর্মস্থানে কোন আঘাত না লাগিয়া থাকে, জীবনের গতি যদি অব্যাহত থাকে, তবে অন্য কোন অঙ্গে যতই আঘাত লাগুক না, তাহাকে সাংঘাতিক বলা হয় না, কারণ অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা তাহাদের ক্রিয়া জীবন-ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে; সেইরূপ মর্মস্থানে আঘাত না লাগিলে আমাদের জাতির বিনাশের কোন আশঙ্কা নাই। সুতরাং এইটি বেশ স্মরণ রাখিবে, তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্যজাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। ধর্ম ছাড়িয়া দিলে হিন্দুর জাতীয় মেরুদণ্ডই ভাঙিয়া যাইবে—যে ভিত্তির উপর জাতীয় সুবিশাল সৌধ নির্মিত হইয়াছিল, তাহাই ভাঙিয়া যাইবে; সুতরাং ফল দাঁড়াইবে—সম্পূর্ণ ধ্বংস।

অতএব হে বন্ধুগণ, ইহাই আমাদের জাতীয় উন্নতির পথ—আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে আমরা যে অমূল্য ধর্মসম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি, তাহাকে প্রাণপণে ধরিয়া থাকাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। তোমরা কি এমন দেশের কথা শুনিয়াছ, যে দেশে বড় বড় রাজারা নিজদিগকে প্রাচীন রাজগণের অথবা পুরাতন-দুর্গনিবাসী, পথিকদের সর্বস্বলুণ্ঠনকারী দস্যু-ব্যারনগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরববোধ না করিয়া অরণ্যবাসী অর্ধনগ্ন মুনিঋষির বংশধর বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে গৌরবান্বিত মনে করেন? তোমরা কি এমন দেশের কথা শুনিয়াছ? যদি না শুনিয়া থাকো, শোন—আমাদের মাতৃভূমিই সেই দেশ। অন্যান্য দেশে বড় বড় ধর্মাচার্যগণ নিজেদের কোন প্রাচীন রাজার বংশধর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, এখানে বড় বড় রাজারা নিজেদের কোন প্রাচীন ঋষির বংশধর বলিয়া প্রমাণ করিতে সচেষ্ট। এই কারণেই আমি বলিতেছি, তোমরা ধর্মে বিশ্বাস কর বা নাই কর, যদি জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখিতে চাও, তবে তোমাদিগকে এই ধর্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে। এক হস্তে দৃঢ়ভাবে ধর্মকে ধরিয়া অপর হস্ত প্রসারিত

করিয়া অন্যান্য জাতির নিকট যাহা শিখিবার, তাহা শিখিয়া লও; কিন্তু মনে রাখিও যে, সেইগুলিকে হিন্দুজীবনের সেই মূল আদর্শের অনুগত রাখিতে হইবে, তবেই ভবিষ্যৎ ভারত অপূর্বমহিমামণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হইবে। আমার দৃঢ় ধারণা—শীঘ্রই সে শুভদিন আসিতেছে; আমার বিশ্বাস—ভারত শীঘ্রই অভূতপূর্ব শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইবে। প্রাচীন ঋষিগণ অপেক্ষা মহত্তর ঋষিগণের অভ্যুদয় হইবে, আর তোমাদের পূর্বপুরুষগণ তাঁহাদের বংশধরদের এই অপূর্ব অভ্যুদয়ে শুধু যে সন্তুষ্ট হইবেন তাহা নহে, আমি বলিতেছি নিশ্চয় তাঁহারা পরলোকে নিজ নিজ স্থান হইতে তাঁহাদের বংশধরগণের এরূপ মহিমা, ঐরূপ মহত্ত্ব দেখিয়া নিজদিগকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত মনে করিবেন।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের সকলকেই এখন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, এখন ঘুমাইবার সময় নহে। আমাদের কার্যকলাপের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ঐ দেখ, ভারতমাতা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতেছেন। তিনি কিছুকাল নিদ্রিতা ছিলেন মাত্র। উঠ, তাঁহাকে জাগাও—আর নূতন জাগরণে নূতন প্রাণে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর গৌরবমণ্ডিতা করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে তাঁহার শাশ্বত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর।

যিনি শৈবদের শিব, বৈষ্ণবদের বিষ্ণু, কর্মীদের কর্ম, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, জৈনদের জিন, ঈশাহি ও যাহুদীদের য়াভে, মুসলমানদের আল্লা, বৈদান্তিকদের ব্রহ্ম—যিনি সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের প্রভু, সেই সর্বব্যাপী পুরুষের সম্পূর্ণ মহিমা কেবল ভারতই জানিয়াছিল, প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব কেবল ভারতই লাভ করিয়াছিল, আর কোন জাতিই প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ করিতে পারে নাই। তোমরা হয়তো আমার এ কথায় আশ্চর্য হইতেছ, কিন্তু অন্য কোন শাস্ত্র হইতে প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব বাহির কর দেখি। অন্যান্য জাতির এক একজন জাতীয় ঈশ্বর বা জাতীয় দেবতা—যাহুদির ঈশ্বর, আরবের ঈশ্বর ইত্যাদি; আর সেই ঈশ্বর আবার অন্যান্য জাতির ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত। কিন্তু ঈশ্বরের করুণা, তিনি যে পরম দয়াময়, তিনি যে আমাদের পিতা মাতা সখা, প্রাণের প্রাণ, আত্মার অন্তরাত্মা—এ তত্ত্ব কেবল ভারতই জানিত। সেই দয়াময় প্রভু আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন, আমাদিগকে সাহায্য করুন, আমাদিগকে শক্তি দিন, যাহাতে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিতে পারি।

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ ॥

তেজস্বি নাবধীতমস্তু বা বিদ্বিষাবহৈ ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরি ওঁ ॥

—আমরা যাহা শ্রবণ করিলাম, তাহা যেন ভুক্ত দ্রব্যের মতো আমাদের পুষ্টিবিধান করে, উহা আমাদের বলস্বরূপ হউক, উহা দ্বারা আমাদের এমন শক্তি উৎপন্ন হউক যে, আমরা যেন পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারি। আমরা—আচার্য ও শিষ্য যেন কখনও পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ।

পরমকুডি অভিনন্দনের উত্তর

[পরমকুডিতে স্বামীজী যাহা বলেন, তাহার কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল।]

আপনারা আমাকে যেরূপ যত্নসহকারে আন্তরিক অভ্যর্থনা করিয়াছেন, সেজন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিবার ভাষা আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। তবে যদি আমাকে অনুমতি করেন তো বলিতে চাই—লোকে আমাকে পরম যত্নের সহিত অভ্যর্থনাই করুক অথবা অবজ্ঞা করিয়া এখান হইতে তাড়াইয়াই দিক, তাহাতে স্বদেশের প্রতি, বিশেষতঃ আমার স্বদেশবাসীর প্রতি ভালবাসার কিছু তারতম্য হইবে না; কারণ আমরা গীতায় পাঠ করিয়াছি যে, কর্ম নিষ্কামভাবে করা উচিত; আমাদের ভালবাসাও নিষ্কাম হওয়া উচিত। পাশ্চাত্যদেশে যে কাজ করিয়াছি, তাহা অতি সামান্যই; এখানে এমন কোন ব্যক্তিই উপস্থিত নাই, যিনি আমা অপেক্ষা শতগুণ অধিক কাজ করিতে না পারিতেন। আমি আগ্রহের সহিত সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি, যে-দিন মহামনীষী ধর্মবীরগণ আবির্ভূত হইয়া ভারতের অরণ্যরাজি হইতে সমুত্থিত ও ভারতভূমির নিজস্ব সেই আধ্যাত্মিকতা ও ত্যাগের বাণী ভারতের বাহিরে জগতের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত প্রচার করিবেন।

মানবজাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে দেখা যায়, সময়ে সময়ে সব জাতির মধ্যেই যেন একটা সংসার-বিরক্তির ভাব আসিয়া থাকে। তাহারা দেখে, তাহারা যে-কোন পরিকল্পনা করিতেছে, তাহাই যেন হাত ফসকাইয়া যাইতেছে

—প্রাচীন আচার-প্রথাগুলি সব যেন ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সব আশা-ভরসা নষ্ট হইয়া যাইতেছে, সবই যেন শিথিল হইয়া যাইতেছে !

পৃথিবীতে দুই প্রকার বিভিন্ন ভিত্তির উপর সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে: এক—ধর্মভিত্তির উপর; আর এক—সামাজিক প্রয়োজনের উপর। একটির ভিত্তি—আধ্যাত্মিকতা, অপরটির—জড়বাদ; একটির ভিত্তি—অতীন্দ্রিয়বাদ, অপরটির প্রত্যক্ষবাদ। একটি এই ক্ষুদ্র জড়-জগতের সীমার বাহিরে দৃষ্টিপাত করে এবং এমন কি, অপরটির সহিত কোন সংস্রব না রাখিয়া কেবল আধ্যাত্মিক ভাব লইয়াই জীবন যাপন করিতে সাহসী হয়; অপরটি নিজের চতুষ্পার্শ্বে যাহা দেখিতে পায়, তাহার উপর জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াই তৃপ্ত; সে আশা করে, ইহারই উপর সে জীবনের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিতে কৃতকার্য হইবে।

আশ্চর্যের বিষয়, কখন কখন অধ্যাত্মবাদ প্রবল হয়, তাহার পরই আবার জড়বাদ প্রাধান্য লাভ করে, যেন তরঙ্গের গতিতে একটির পর আর একটি আসিয়া থাকে! এক দেশেই আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের তরঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে জড়বাদ পূর্ণপ্রতাপে রাজত্ব করিতে থাকে—ধন-ঐশ্বর্যই গৌরবের অধিকারী হয়; যে-শিক্ষায় অধিক অন্নাগমের উপায় হয়, যাহাতে অধিক সুখলাভের উপায় হয়, তাহারই আদর হইতে থাকে। ক্রমে এই অবস্থা হইতে আবার অবনতি আরম্ভ হয়। সৌভাগ্যসম্পদ হইলেই মানবজাতির অন্তর্নিহিত ঈর্ষাদ্বেষও প্রবল আকার ধারণ করে—পরস্পর প্রতিযোগিতা ও ঘোর নিষ্ঠুরতাই যেন তখন যুগধর্ম হইয়া পড়ে। 'চাচা আপন বাঁচা'—ইহাই তখন সকলের মূলমন্ত্র হইয়া পড়ে। এই অবস্থা কিছুদিন চলিবার পর মানুষ চিন্তা করিতে থাকে—জীবনের সমগ্র পরিকল্পনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত। ধর্ম সহায় না হইলে, জড়বাদের গভীর আবর্তে ক্রমশঃ-মজ্জমান পৃথিবীর সাহায্যে ধর্ম অগ্রসর না হইলে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। তখন মানুষ নূতন আশায় সঞ্জীবিত হইয়া নব অনুরাগে নূতন ভাবে নূতন গৃহ প্রস্তুত করিবার জন্য নূতন ভিত্তির পত্তন করে। তখন ধর্মের আর এক বন্যা আসে। কালে আবার উহারও অবনতি হয়।

প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়মে ধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এমন একদল লোকের অভ্যুদয় হয়, যাহারা পার্থিব ব্যাপারে বিশেষ ক্ষমতার একচেটিয়া দাবি করে। ইহার অব্যবহিত ফল—পুনরায় জড়বাদের দিকে প্রতিক্রিয়া। জড়বাদের

দিকে গতি একবার আরম্ভ হইলে বিভিন্ন প্রকার শত শত বিষয়ে একচেটিয়া দাবি আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ এমন সময় আসে, যখন সমগ্র জাতির শুধু আধ্যাত্মিক ক্ষমতাগুলি নয়, সর্বপ্রকার লৌকিক ক্ষমতা ও অধিকারগুলি অল্পসংখ্যক কয়েকটি ব্যক্তির করায়ত্ত হয়। এই অল্পসংখ্যক লোক সর্বসাধারণের ঘাড়ে চড়িয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। তখন সমাজকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হয়। এই সময় জড়বাদ দ্বারা বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে।

যদি আপনারা আমাদের মাতৃভূমি ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, দেখিবেন এখানে এখন সেই ব্যাপারই ঘটিতেছে। ইওরোপে আপনাদের ধর্ম প্রচারের জন্য একজন গিয়াছিলেন; আজ যে আপনারা তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সমবেত হইয়াছেন, ইহা অসম্ভব হইত, যদি না ইওরোপীয় জড়বাদ ইহার পথ করিয়া দিত। সুতরাং এক হিসাবে জড়বাদ যথার্থই ভারতের কিছু কল্যাণ সাধন করিয়াছে, উহা সকলেরই উন্নতির দ্বার খুলিয়া দিয়াছে, উচ্চ বর্ণের একচেটিয়া অধিকার দূর করিয়া দিয়াছে—অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির নিকট যে-অমূল্য রত্ন গুপ্তভাবে ছিল এবং যাহার ব্যবহার তাহারা নিজেরাও ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহা সর্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ঐ অমূল্য রত্নের অর্ধভাগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অপরার্ধ এমন সব লোকের হাতে আছে, যাহারা গরুর জাবপাত্রে শয়ান সেই কুকুরের মতো নিজেরাও খাইবে না, অপরকেও খাইতে দিবে না!

অপর দিকে আবার আমরা ভারতে যে-সকল রাজনীতিক অধিকার-লাভের চেষ্টা করিতেছি, সেগুলি ইওরোপে যুগ যুগ ধরিয়া রহিয়াছে, শত শতাব্দী ধরিয়া ঐগুলি পরীক্ষিত হইয়াছে; আর সেগুলি যে সামাজিক প্রয়োজন-সাধনে অসমর্থ, তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইওরোপের রাজনীতিক প্রশাসনিক প্রণালীগুলি এক এক করিয়া অনুপযোগী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে, আর এখন ইওরোপ অশান্তি-সাগরে ভাসিতেছে—কি করিবে, কোথায় যাইবে বুঝিতে পারিতেছে না। ঐহিক ব্যাপারে অত্যাচার প্রচণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের সব ধন, সব ক্ষমতা অল্পসংখ্যক কয়েকটি লোকের হাতে; তাহারা নিজেরা কোন কাজ করে না, কিন্তু লক্ষ লক্ষ নরনারী দ্বারা কাজ করাইয়া লইবার ক্ষমতা রাখে। এই ক্ষমতাবলে তাহারা সমগ্র পৃথিবী রক্তস্রোতে প্লাবিত করিতে পারে। ধর্ম ও অন্যান্য যাহা কিছু, সবই তাহাদের পদতলে। তাহারাই

সর্বেসর্বা শাসনকর্তা। পাশ্চাত্য জগৎ মুষ্টিমেয় 'শাইলকের' শাসনে পরিচালিত হইতেছে। আপনারা যে প্রণালীবদ্ধ শাসন, স্বাধীনতা, পার্লামেণ্ট মহাসভা প্রভৃতির কথা শোনেন—সেগুলি বাজে কথামাত্র। পাশ্চাত্য দেশ শাইলকগণের অত্যাচারে আর্তনাদ করিতেছে; প্রাচ্যদেশ আবার পুরোহিতদের অত্যাচারে কাতরভাবে ক্রন্দন করিতেছে। ধনী ও পুরোহিত পরস্পরকে শাসনে রাখিবে।

মনে করিবেন না, ইহাদের মধ্যে মাত্র একটি দ্বারা জগতের কল্যাণ হইবে। নিরপেক্ষ ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্টিতে সকলকেই সমান করিয়াছেন। অতি অধম অসুরপ্রকৃতি মানুষেরও এমন কিছু গুণ আছে, যাহা একজন বড় সাধুর নাই। নগণ্য কীটের এমন কিছু গুণ থাকিতে পারে, যাহা হয়তো মহাপুরুষের নাই।

—অতি দরিদ্র শ্রমজীবী, যাহার জীবনে ভোগ করিবার কিছু নাই, যাহার তোমার মতো বুদ্ধি নাই, যে বেদান্তদর্শনাদি বুঝিতে পারে না, মনে করিতেছ, তাহারও শরীর কিন্তু তোমার মতো কষ্টে অত কাতর হয় না। দারুণভাবে ক্ষতবিক্ষত হইলে তোমা অপেক্ষা শীঘ্র সে সুস্থ হইয়া উঠিবে। তাহার প্রাণশক্তি ইন্দ্রিয়গত; সেখানেই তাহার সুখভোগ। সুতরাং তাহার জীবনে যেমন একপ্রকার সুখের অভাব, অপর দিকে তেমনি অন্যপ্রকার সুখের আধিক্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে তাহার জীবনেও সামঞ্জস্য রহিয়াছে। সুতরাং ভগবান্ সকলকেই নিরপেক্ষভাবে ইন্দ্রিয়জ মানসিক বা আধ্যাত্মিক সুখ দিয়াছেন। অতএব মনে করিও না, আমরাই পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা।

আমরা—ভারতবাসীরা পৃথিবীকে অনেক বিষয় শিক্ষা দিতে পারি বটে, পৃথিবীর নিকট আমরা অনেক বিষয় শিক্ষাও করিতে পারি। আমরা পৃথিবীকে যে-বিষয়ে শিক্ষা দিতে সমর্থ, পৃথিবী তাহার জন্য এখন অপেক্ষা করিতেছে। যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয়, তবে উহা আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সমূলে বিনষ্ট হইবে। মানবজাতিকে তরবারি-বলে শাসন করিবার চেষ্টা বৃথা ও অনাবশ্যক। আপনারা দেখিবেন, যে-সকল স্থান হইতে পশুবলে জগৎশাসন করিবার নীতির উদ্ভব, সেই-সকল স্থানেই প্রথমে অবনতি আরম্ভ হয়, সেই-সকল সমাজ শীঘ্রই ধ্বংস হইয়া যায়। জড়শক্তির লীলাভূমি ইওরোপ যদি নিজ সমাজের ভিত্তি পরিবর্তন করিয়া আধ্যাত্মিকতার

উপর স্থাপিত না করে, তবে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। উপনিষদের ধর্মই ইওরোপকে রক্ষা করিবে।

আমাদের দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন শাস্ত্র ও বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক—এই-সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এমন একটি সাধারণ ভিত্তি আছে, যাহা দ্বারা সমগ্র জগতের ভাবস্রোত পরিবর্তিত হইতে পারে। সেই সাধারণ ভিত্তি—জীবাত্মার সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস। ভারতের সর্বত্র হিন্দু জৈন বৌদ্ধ—সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, আত্মা সর্বশক্তির আধার। আর তোমরা বেশ জানো, ভারতে এমন কোন সম্প্রদায় নাই, যাহারা বিশ্বাস করে যে, শক্তি পবিত্রতা বা পূর্ণতা বাহির হইতে লাভ করিতে হয়। এগুলি আমাদের জন্মগত অধিকার—আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। তোমার প্রকৃত স্বরূপ অপবিত্রতার আবরণে আবৃত রহিয়াছে। প্রকৃত 'তুমি' কিন্তু অনাদিকাল হইতেই পূর্ণ অচল অটল সুমেরুবৎ। আত্মসংযমের জন্য বাহিরের সাহায্য কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। অনাদিকাল হইতেই তুমি আত্মনিয়ন্ত্রিত, শুধু জানা এবং না জানাতেই অবস্থার তারতম্য, এই জন্য শাস্ত্রে অবিদ্যাকেই সর্বপ্রকার অনিষ্টের মূল বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। ভগবান ও মানুষে, সাধু ও পাপীতে প্রভেদ কিসে?—কেবল অজ্ঞানে। অজ্ঞানেই প্রভেদ হয়। সর্বোচ্চ মানুষ এবং তোমার পদতলে অতি কষ্টে বিচরণকারী ঐ ক্ষুদ্র কীটের মধ্যে প্রভেদ কিসে?—অজ্ঞানই এই প্রভেদ করিয়াছে। কারণ অতি কষ্টে বিচরণশীল ঐ ক্ষুদ্র কীটের মধ্যেও অনন্ত শক্তি, জ্ঞান ও পবিত্রতা—এমন কি সাক্ষাৎ অনন্ত ব্রহ্ম রহিয়াছেন। এখন উহা অব্যক্তভাবে রহিয়াছে—উহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। ভারত জগৎকে এই এক মহাসত্য শিখাইবে, কারণ ইহা আর কোথাও নাই। ইহাই আধ্যাত্মিকতা—ইহাই আত্মবিজ্ঞান।

কিসের জোরে মানুষ উঠিয়া দাঁড়ায় ও কাজ করে?—শক্তির জোরে; এই বল-বীর্যই ধার্মিকতা, দুর্বলতাই পাপ। যদি উপনিষদে এমন কোন শব্দ থাকে, যাহা বজ্রবেগে অজ্ঞানরাশির উপর পতিত হইয়া উহাকে একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে, তবে তাহা—'অভীঃ'। যদি জগৎকে কোন ধর্ম শিখাইতে হয়, তবে তাহা এই 'অভীঃ'। কি ঐহিক, কি আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই 'অভীঃ'—এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ ভয়ই পাপ ও অধঃপতনের নিশ্চিত কারণ। ভয় হইতেই মৃত্যু, ভয় হইতেই সর্বপ্রকার অবনতি

আসে। এখন প্রশ্ন—এই ভয়ের উদ্ভব কোথা হইতে? আত্মার স্বরূপজ্ঞানের অভাব হইতেই ভয়ের উদ্ভব। যিনি রাজাধিরাজ, তাঁহার তুমি উত্তরাধিকারী—তুমি সেই ঈশ্বরের অংশ। শুধু তাহাই নহে, অদ্বৈত মতে তুমিই স্বয়ং ব্রহ্ম—তুমি স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া নিজেকে ক্ষুদ্র মানুষ ভাবিতেছ। আমরা স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি—আমরা ভেদজ্ঞানে অভিনিবিষ্ট হইয়াছি; আমি তোমা অপেক্ষা বড়, তুমি আমা অপেক্ষা বড়—আমরা কেবল এই দ্বন্দ্ব করিতেছি।

'আত্মায় সকল শক্তি নিহিত'—ভারত জগৎকে এই মহাশিক্ষা দিবে। এই তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করিলে তোমার নিকট জগৎ আর একভাবে প্রতিভাত হইবে এবং পূর্বে তুমি নরনারী ও প্রাণীকে যে দৃষ্টিতে দেখিতে, তখন তাহাদিগকে অন্য দৃষ্টিতে দেখিবে। তখন এই পৃথিবী আর দ্বন্দ্বক্ষেত্ররূপে প্রতীয়মান হইবে না; তখন আর মনে হইবে না, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া দুর্বলের উপর বলবানের জয়লাভের জন্য এ পৃথিবীতে নরনারীর জন্ম; তখন বোধ হইবে, এ পৃথিবী আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্র; স্বয়ং ভগবান শিশুর মতো এখানে খেলিতেছেন, আর আমরা তাঁহার খেলার সঙ্গী, তাঁহার কাজের সহায়ক। যতই ভয়ানক, যতই বীভৎস মনে হউক—ইহা খেলামাত্র! আমরা ভ্রান্তিবশতঃ এই ক্রীড়াকে একটা ভয়ানক ব্যাপার মনে করিতেছি। আত্মার স্বরূপ জানিতে পারিলে অতি দুর্বল অধঃপতিত হতভাগ্য পাপীর হৃদয়েও আশার সঞ্চার হয়। শাস্ত্র কেবল বলিতেছেন—নিরাশ হইও না; তুমি যাহাই কর না কেন, তোমার স্বরূপের কখনও পরিবর্তন হয় না; তুমি কখন তোমার প্রকৃতির পরিবর্তন করিতে পার না, প্রকৃতি কখন প্রকৃতির বিনাশসাধন করিতে পারে না। তোমার প্রকৃতি শুদ্ধ। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া তোমার এই স্বরূপ অব্যক্তভাবে থাকিতে পারে, কিন্তু পরিণামে উহা আপন তেজে ফুটিয়া বাহির হইবে। এই কারণেই অদ্বৈত-বাদ সকলের নিকট আশার বাণী বহন করিয়া আনে, নৈরাশ্যের নয়। বেদান্ত কখনও ভয়ে ধর্ম আচরণ করিতে বলে না। বেদান্ত বলে না যে, শয়তান সর্বদা তোমার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছে; যদি তুমি একবার পদস্খলিত হও, অমনি তোমার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে!

বেদান্তে শয়তানের প্রসঙ্গই নাই; বেদান্ত বলেন, তোমার অদৃষ্ট তোমার নিজের হাতে—তোমার কর্মই তোমার এই শরীর গঠন করিয়াছে, অপর কেহ তোমার হইয়া এ শরীর গঠন করে নাই। সেই সর্বব্যাপী ভগবান তোমার

অজ্ঞানবশতঃ অব্যক্ত রহিয়াছেন ; আর তুমি যে-সব সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছ, এগুলির জন্য তুমিই দায়ী। ভাবিও না তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তুমি এই ভয়াবহ জগতে আনীত হইয়াছ। তুমি জানো—তুমিই ধীরে ধীরে তোমার জগৎ রচনা করিয়াছ এবং এখনও করিতেছ। তুমি নিজেই আহার করিয়া থাকো, অপর কেহ তোমার হইয়া আহার করে না। তুমি যাহা খাও, তাহার সারভাগ তুমিই শরীরে শোষণ করিয়া লও—অপর কেহই তোমার হইয়া উহা করে না। তুমিই ঐ খাদ্য হইতে রক্ত-মাংসের দেহ প্রস্তুত করিয়া থাকো, অপর কেহ তোমার হইয়া উহা করে না। তুমি বরাবরই ইহা করিতেছ। একটি দীর্ঘ শৃঙ্খলের এক অংশের গঠনপ্রণালী জানিতে পারিলে সমুদয় শৃঙ্খলটিকেই জানিতে পারা যায়। যদি ইহা সত্য হয় যে, এক মুহূর্তে তুমি নিজ শরীর গঠন করিয়াছ, তবে ইহাও সত্য যে, পূর্বেও প্রতি মুহূর্তে তুমি নিজ শরীর গঠন করিয়াছ, পরেও করিবে। আর ভাল-মন্দ সব কিছুরই দায়িত্ব তোমার। ইহা বড় আশার কথা যে আমি যাহা করিয়াছি, আমিই আবার তাহা নাশ করিতে পারি।

যদিও আমাদের শাস্ত্রে এই কঠোর কর্মবাদ রহিয়াছে, তথাপি আমাদের ধর্ম ভগবৎকৃপা অস্বীকার করেন না। আমাদের শাস্ত্র বলেন, শুভাশুভরূপ এই ঘোর সংসার-প্রবাহের পরপারে ভগবান রহিয়াছেন। তিনি বন্ধনশূন্য নিত্যকৃপাময়, সর্বদাই জগতের ত্রিতাপে অভিভূত নরনারীকে সংসার-সাগরের পারে লইয়া যাইবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার কৃপার সীমা নাই ; আর রামানুজ বলেন, বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির নিকটই এই কৃপা আবির্ভূত হয়।

অতএব আপনারা দেখিতেছেন, সমাজের নূতন ভিত্তি স্থাপন করিতে ধর্ম কিভাবে আপনাদের সাহায্য করিতে পারে। যদি আমার সময় থাকিত, তবে আমি দেখাইতে পারিতাম—পাশ্চাত্যদেশ অদ্বৈতবাদের কতকগুলি সিদ্ধান্ত হইতে এখনও কিরূপ শিক্ষা পাইতে পারে। কারণ এই জড়বিজ্ঞানের দিনে সগুণ ঈশ্বর, দ্বৈতবাদ—এ সকলের বড় একটা মূল্য নাই। তবে যদি কেহ খুব অমার্জিত অনুন্নত ধর্মপ্রণালীতেও বিশ্বাস করে, আমাদের ধর্মে তাহাদেরও স্থান আছে। যদি কেহ এত মন্দির ও প্রতিমাদি চায়, যাহাতে পৃথিবীর সকল লোকেরই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইতে পারে, যদি কেহ সগুণ ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে চায়, তবে আমাদের শাস্ত্র তাহাদিগকে বিশেষ সাহায্যই করিবে। বলিতে কি, সগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে যে-সকল উচ্চ উচ্চ

ভাব ও তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও সেরূপ দেখিতে পাইবে না। যদি কেহ আবার খুব যুক্তিবাদী হইতে চায়, নিজের তর্কবুদ্ধিকে পরিতৃপ্ত করিতে চায়, তবে আমরা তাহাকেও নির্গুণ ব্রহ্মবাদরূপ প্রবল যুক্তিসহ মতবাদ শিক্ষা দিতে পারি।

মনমাদুরা অভিনন্দনের উত্তর

আপনারা আমাকে যে-আন্তরিক অভিনন্দন জানাইয়াছেন, সেজন্য আপনাদের নিকট যে কি গভীর কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ হইয়াছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে আমি অক্ষম। দুঃখের বিষয়, প্রবল ইচ্ছাসত্ত্বেও আমার শরীরের অবস্থা এখন এমন নয় যে, আমি দীর্ঘ বক্তৃতা করি। আমাদের সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধুটি আমার প্রতি অনুগ্রহপূর্বক সুন্দর সুন্দর বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছে বটে, তথাপি আমার একটা স্থূল শরীর আছে—হইতে পারে শরীরধারণ বিড়ম্বনা, কিন্তু উপায় নাই। আর স্থূল শরীর জড়ের নিয়মানুসারেই চালিত হইয়া থাকে, তাহার ক্লান্তি অবসাদ প্রভৃতি সবই হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্যদেশে আমার দ্বারা যে সামান্য কাজ হইয়াছে, সেজন্য ভারতের প্রায় সর্বত্র লোকে যেরূপ অপূর্ব আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন, তাহা দেখিবার জিনিস বটে। তবে আমি ঐ আনন্দ ও সহানুভূতি কেবল এইভাবে গ্রহণ করিতেছি; কারণ ভাবী মহাপুরুষদের উপর ঐগুলি প্রয়োগ করিতে চাই। আমার মনে হয়, আমার দ্বারা যে সামান্য কার্য হইয়াছে, যদি তাহার জন্য সমগ্র জাতি এত অধিক প্রশংসা করে, তবে আমাদের পরে যে-সব বড় বড় দিগ্বিজয়ী ধর্মবীর মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিবেন, তাঁহারা এই জাতির নিকট হইতে না জানি আরও কত অধিক প্রশংসা ও সম্মান লাভ করিবেন।

ভারত ধর্মভূমি। হিন্দুগণ ধর্ম—কেবল ধর্মই বুঝে। শত শত শতাব্দী ধরিয়া হিন্দু কেবল এই শিক্ষাই পাইয়াছে। সেই শিক্ষার ফলও এই হইয়াছে যে, ধর্মই তাহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপনারা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে, ইহা সত্য। সকলেরই দোকানদার বা স্কুলমাষ্টার বা যোদ্ধা

হইবার কোন প্রয়োজন নাই; এই সামঞ্জস্যপুর্ণ জগতে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাব লইয়া এক মহাসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিবে।

সম্ভবতঃ আমরা বিভিন্ন জাতির এই ঐকতানে আধ্যাত্মিক সুর বাজাইবার জন্য বিধাতা কর্তৃক নিযুক্ত। আমাদের মহামহিমান্বিত পূর্বপুরুষদের—যাঁহাদের বংশধর বলিয়া যে-কোন জাতি গৌরব অনুভব করিতে পারে—তাঁহাদের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা যে মহান্ তত্ত্বরাশি পাইয়াছি, সেগুলি যে আমরা এখনও হারাই নাই, ইহা দেখিয়াই আমার আনন্দ হইতেছে। ইহাতে আমাদের জাতির ভাবী উন্নতি সম্বন্ধে আমার আশা—শুধু আশা নয়, দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে। আমার প্রতি যত্নের জন্যই আমার আনন্দ হয় নাই, আমাদের জাতির হৃদয় যে এখনও অটুট রহিয়াছে, ইহাতেই আমার পরমানন্দ। এখনও ভারতের জাতীয় হৃদয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। ভারত এখনও বাঁচিয়া আছে; কে বলে সে মরিয়াছে? পাশ্চাত্যেরা আমাদিগকে কর্মকুশল দেখিতে চায়, কিন্তু ধর্ম ব্যতীত অন্য বিষয়ে আমাদের জাতীয় চেষ্টা নাই বলিয়া আমরা তাহাদিগকে তাহাদের মনের মতো কর্মকুশলতা দেখাইতে পারি না। যদি কেহ আমাদিগকে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিতে চায়, সে নিরাশ হইবে; আমরাও যদি আবার কোন যুদ্ধপ্রিয় জাতিকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে সক্রিয় দেখিতে চাই, আমরাও সেইরূপ নিরাশ হইব। পাশ্চাত্যেরা আসিয়া দেখুক, আমরা তাহাদেরই মতো কর্মশীল; দেখিয়া যাক, জাতি কিভাবে বাঁচিয়া রহিয়াছে, পূর্বের মতোই প্রাণবন্ত রহিয়াছে। আমরা যে অধঃপতিত হইয়াছি—এই ধারণাই দূর করিয়া দাও।

আমাদের জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি যে অক্ষুণ্ণ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তথাপি আমাকে এখন গোটাকতক রূঢ় কথা বলিতে হইবে। আশা করি, আপনারা সেগুলি ভাল ভাবেই গ্রহণ করিবেন। এইমাত্র আপনারা অভিযোগ করিলেন যে, ইওরোপীয় জড়বাদ আমাদিগকে একেবারে মাটি করিয়া ফেলিয়াছে। আমি বলি, দোষ শুধু ইওরোপীয়দের নয়, দোষ প্রধানতঃ আমাদের। আমরা যখন বৈদান্তিক, তখন আমাদিগকে সর্বদাই সকল বিষয় ভিতরের দিক হইতে—আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা যখন বৈদান্তিক, তখন নিশ্চয়ই জানি, যদি আমরা নিজের অনিষ্ট নিজেরা না করি, তবে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা আমাদের কোন অনিষ্ট

করিতে পারে। ভারতের এক-পঞ্চমাংশ অধিবাসী মুসলমান হইয়াছে। যেমন সুদূর অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী প্রাচীনকালে বৌদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ ভারতের এক-পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান হইয়াছে। এখনই প্রায় দশ লক্ষের অধিক খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে।

ইহা কাহার দোষ? আমাদের একজন ঐতিহাসিক চিরস্মরণীয় ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন, 'যখন অফুরন্ত নির্ঝর নিকটেই বহিয়া যাইতেছে, তখন এই দরিদ্র হতভাগ্যগণই বা তৃষ্ণায় মরিবে কেন?' প্রশ্ন এই: ইহাদের জন্য আমরা কি করিয়াছি? কেন তাহারা মুসলমান হইবে না? আমি ইংলণ্ডে এক সরলা বালিকার সম্বন্ধে শুনিয়াছিলাম, সে অসৎ পথে পদার্পণ করিবার—বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিবার পূর্বে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা তাহাকে উক্ত পথে যাইতে নিষেধ করেন। তাহাতে সেই বালিকা উত্তর দেয়, 'কেবল এই উপায়েই আমি লোকের সহানুভূতি পাইতে পারি। এখন আমায় কেহই সাহায্য করিবে না; কিন্তু আমি যদি পতিতা হই, তবে সেই দয়াবতী মহিলারা আসিয়া আমাকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া যাইবেন, আমার জন্য সব করিবেন, কিন্তু এখন তাঁহারা কিছুই করিবেন না।' আমরা এখন তাহাদের জন্য কাঁদিতেছি, কিন্তু ইহার পূর্বে আমরা তাহাদের জন্য কি করিয়াছি? আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বুকে হাত রাখিয়া নিজেকে জিজ্ঞাসা করুক দেখি—আমরা কি শিখিয়াছি; আর নিজেদের হাতে জ্ঞানের মশাল লইয়া কতদূর উহার আলোক-বিস্তারের সহায়তা করিয়াছি। আমরা যে উহা করি নাই, তাহা আমাদেরই দোষ—আমাদেরই কর্ম। কাহারও দোষ দিও না, দোষ দাও নিজেদের কর্মকে। যদি তোমরা আসিতে না দিতে, তবে কি জড়বাদ, মুসলমান ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম, পৃথিবীর অন্য কোন মতবাদ—কিছুই কি স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইত? পাপ, দূষিত খাদ্য ও নানাবিধ অনিয়মের দ্বারা দেহ পূর্ব হইতেই যদি হীনবীর্য না হইয়া থাকে, তবে কোন প্রকার জীবাণু মনুষ্যদেহ আক্রমণ করিতে পারে না। সুস্থ ব্যক্তি সর্বপ্রকার বিষাক্ত জীবাণুর মধ্যে বাস করিয়াও নিরাপদ থাকিবে। আমরা তো তাহাদিগকে পূর্বে সাহায্য করি নাই, সুতরাং অপর জাতির উপর সমুদয় দোষ নিক্ষেপ করিবার পূর্বে প্রথমেই নিজেকেই প্রশ্ন করা উচিত; আর এখনও প্রতীকারের সময় আছে।

প্রথমেই, ঐ যে অর্থহীন বিষয়গুলি লইয়া প্রাচীনকাল হইতেই বাদানুবাদ চলিতেছে, তাহা পরিত্যাগ কর। গত ছয়-সাত শত বৎসর ধরিয়া কি ঘোর অবনতি হইয়াছে দেখ! বড় বড় কর্তা-ব্যক্তিরা শত শত বর্ষ ধরিয়া এই মহাবিচারে ব্যস্ত যে, একঘটি জল ডানহাতে কি বাঁহাতে খাইব; হাত তিনবার ধুইব না চারিবার; কুলকুচা করিব পাঁচবার কি ছয়বার! যাহারা সারা জীবন এইরূপ দুরূহ প্রশ্নসমূহের মীমাংসায় ও এই-সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে মহাপাণ্ডিত্যপূর্ণ বড় বড় দর্শন লিখিতে ব্যস্ত, তাহাদিগের নিকট আর কি আশা করিতে পারা যায়? আমাদের ধর্মটা যে রান্নাঘরে ঢুকিয়া সেইখানেই আবদ্ধ থাকিবে—এইরূপ এক আশঙ্কা রহিয়াছে। আমরা এখন বৈদান্তিকও নই, পৌরাণিকও নই, তান্ত্রিকও নই; আমরা এখন কেবল 'ছুঁৎমার্গী', আমাদের ধর্ম এখন রান্নাঘরে। ভাতের হাঁড়ি আমাদের ঈশ্বর, আর ধর্মমত—'আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, আমি মহাপবিত্র!' যদি আমাদের দেশে আর এক শতাব্দী ধরিয়া এই ভাব চলে, তবে আমাদের প্রত্যেককেই পাগলা গারদে যাইতে হইবে!

মন যখন জীবনের উচ্চতম তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে অসমর্থ হয়, তখন ইহা মস্তিষ্কের দুর্বলতার নিশ্চিত লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। এই অবস্থায় মৌলিক তত্ত্বের গবেষণা করিতে মানুষ একেবারে অসমর্থ হয়; নিজের সমুদয় তেজ, কার্যকরী শক্তি ও চিন্তাশক্তি হারাইয়া ফেলে; আর যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্রতম গণ্ডির মধ্যেই তাহার কার্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়, তাহার বাহিরে সে আর যাইতে পারে না। প্রথমে এইগুলি একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে। মহাবীর্যের সহিত কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। ঐগুলি বাদ দিলেও যে-ধনভাণ্ডার আমরা পূর্বপুরুষদিগের নিকট উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি, তাহা অফুরন্ত থাকিবে। সমগ্র পৃথিবী যেন এই ধনভাণ্ডার হইতে সাহায্য পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে। উহা হইতে ধনরাশি বিতরণ না করিলে সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হইবে। অতএব বিতরণে আর বিলম্ব করিও না। ব্যাস বলিয়াছেন, কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম—তাহার মধ্যে আবার ধর্মদান শ্রেষ্ঠ; বিদ্যাদান তাহার নিম্নে; তারপর প্রাণদান; সর্বনিম্নে অন্নদান। অন্নদান আমরা যথেষ্ট করিয়াছি; আমাদের ন্যায় দানশীল জাতি আর নাই। এখানে ভিক্ষুকের নিকটও যতক্ষণ পর্যন্ত একখানা রুটি থাকিবে, সে তাহার অর্ধেক দান করিবে। এইরূপ ব্যাপার কেবল ভারতেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যথেষ্ট অন্নদান করিয়াছি, এক্ষণে

আমাদিগকে অপর দুইপ্রকার দানে অগ্রসর হইতে হইবে—ধর্ম ও বিদ্যা-দান। যদি আমরা সকলেই অকুতোভয় হইয়া, হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া, ভাবের ঘরে এক বিন্দু চুরি না করিয়া কাজে লাগিয়া যাই, তবে আগামী পঁচিশ বৎসরের মধ্যে আমাদের সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে –বিরুদ্ধমতাবলম্বী আর কেহ থাকিবে না এবং সমগ্র ভারতবাসী আবার প্রাচীন আর্যগণের ন্যায় উন্নত হইবে।

এখন আমার যেটুকু বলিবার ছিল, বলিলাম। আমার সঙ্কল্পিত কার্যপ্রণালী বলিয়া বেড়াইতে আমি ভালবাসি না। কি করিতে ইচ্ছা করি না করি, মুখে না বলিয়া কাজে দেখানোই পছন্দ করি। অবশ্য আমি একটা নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী স্থির করিয়াছি; যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, যদি আমার শরীর থাকে, তবে সঙ্কল্পিত বিষয়গুলি কার্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা আছে। জানি না, আমি কৃতকার্য হইব কিনা; তবে একটা মহান্ আদর্শ লইয়া তাহাতেই মনপ্রাণ নিয়োগ করা—ইহাই জীবনের এক মহান্ আদর্শ। তাহা না হইলে হীন পশুজীবন যাপন করিয়া লাভ কি? এক মহান্ আদর্শের অনুগামী হওয়াই জীবনের একমাত্র সার্থকতা। ভারতে এই মহৎকার্য সাধন করিতে হইবে। এই কারণে ভারতের বর্তমান পুনরুজ্জীবনে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। যদি বর্তমান শুভমুহূর্তের সুযোগ গ্রহণ না করি, তবে মহামূর্খের মতো কাজ করিব।

মাদুরা অভিনন্দনের উত্তর

মনমাদুরা হইতে মাদুরায় আসিয়া স্বামীজী রামনাদের রাজার সুন্দর বাঙ্গলায় অবস্থান করিলেন। অপরাহ্ণে একটি মখমলের খাপে পুরিয়া স্বামীজীকে অভিনন্দন প্রদত্ত হয়—উত্তরে স্বামীজী বলেন :

আমার খুব ইচ্ছা যে, কয়েকদিন তোমাদের নিকট থাকিয়া সুযোগ্য সভাপতি মহাশয়ের আদেশমত আমার পাশ্চাত্যদেশের সমুদয় অভিজ্ঞতা ও বিগত চার-বৎসর-ব্যাপী প্রচারকার্যের বিবরণ দিই। দুঃখের বিষয়, সন্ন্যাসিগণকেও দেহভার বহন করিতে হয়। গত তিন সপ্তাহ যাবৎ ক্রমাগত নানাস্থানে ভ্রমণ ও বক্তৃতা করিয়া এত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, আজ সন্ধ্যাকালে দীর্ঘ বক্তৃতা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। তোমরা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ

প্রকাশ করিয়াছ, সেজন্য তোমাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়াই আমাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে; আর অন্যান্য বিষয় ভবিষ্যতের জন্য রাখিতে হইবে। স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল হইলে এবং আর একটু অবকাশ পাইলে আমাদের অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে। আজ এই অল্প সময়ের মধ্যে সব কথা বলিবার সুযোগ হইবে না। একটি কথা বিশেষভাবে আমার মনে উদিত হইতেছে। আমি এখন মাদুরায় তোমাদের স্বদেশবাসী স্বনামখ্যাত উদারচেতা রামনাদাধিপের অতিথি। তোমরা বোধ হয় অনেকেই জানো, উক্ত রাজাই আমার মাথায় চিকাগো-সভায় যাইবার ভাব প্রবেশ করাইয়া দেন এবং বরাবরই যতদূর সম্ভব আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। সুতরাং অভিনন্দন-পত্রে আমাকে যে-সকল প্রশংসা করা হইয়াছে, অধিকাংশই দাক্ষিণাত্যবাসী এই মহাপুরুষের প্রাপ্য। কেবল আমার মনে হয়, তিনি রাজা না হইয়া সন্ন্যাসী হইলে আরও ভাল হইত, কারণ তিনি সন্ন্যাসেরই উপযুক্ত।

যখনই পৃথিবীর অংশবিশেষে কোন কিছুর আবশ্যক হয়, তখনই তাহা এক অংশ হইতে অপরাংশে গিয়া সেখানে নূতন জীবন প্রদান করে। কি ভৌতিক, কি আধ্যাত্মিক—উভয় রাজ্যেই ইহা সত্য। যদি জগতের কোন অংশে ধর্মের অভাব হয় এবং অপর কোথাও সেই ধর্ম থাকে, তবে আমরা জ্ঞাতসারে চেষ্টা করি বা না করি, যেখানে সেই ধর্মের অভাব সেখানে ধর্মস্রোত আপনা-আপনি প্রবাহিত হইয়া উভয় স্থানের সামঞ্জস্য বিধান করিবে। মানবজাতির ইতিহাসে দেখিতে পাই—একবার নয়, দুইবার নয়, বার বার এই প্রাচীন ভারতকে যেন বিধাতার নিয়মে পৃথিবীকে ধর্মশিক্ষা দিতে হইয়াছে। দেখিতে পাই—যখনই কোন জাতির দিগ্বিজয় বা বাণিজ্যে প্রাধান্য উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে এবং যখনই এক জাতির অপর জাতিকে কিছু দিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তখনই প্রত্যেক জাতি অপর জাতিকে রাজনীতিক, সামাজিক বা আধ্যাত্মিক যাহার যাহা আছে, তাহাই দিয়াছে। ভারত সমগ্র পৃথিবীকে ধর্ম ও দর্শন শিখাইয়াছে। পারস্য-সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের অনেক পূর্বেই ভারত পৃথিবীকে আপন আধ্যাত্মিক সম্পদ দান করিয়াছে। পারস্য-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়কালে আর একবার এই ঘটনা ঘটে। গ্রীকদিগের অভ্যুদয়কালে তৃতীয়বার। আবার ইংরেজের প্রাধান্যকালে এই চতুর্থবার সে বিধাতৃ-নির্দিষ্ট ব্রতপালনে নিযুক্ত হইতেছে। যেমন আমরা ইচ্ছা করি বা না

করি, পাশ্চাত্ত্যদিগের সংঘবদ্ধ কার্যপ্রণালী ও বাহ্য সভ্যতার ভাব আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়া সমগ্র দেশকে ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে, সেইরূপ ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন পাশ্চাত্য দেশকে প্লাবিত করিবার উপক্রম করিতেছে। কেহই ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে। আমরাও পাশ্চাত্য জড়বাদপ্রধান সভ্যতার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ। সম্ভবতঃ কিছু কিছু বাহ্য সভ্যতা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর, পাশ্চাত্যদেশের পক্ষে আবার সম্ভবতঃ একটু আধ্যাত্মিকতা আবশ্যক। তাহা হইলেই উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে; আমাদিগকে যে পাশ্চাত্যদেশ হইতে সব কিছু শিখিতে হইবে অথবা পাশ্চাত্যকে আমাদের নিকট সব কিছু শিখিতে হইবে, তাহা নহে। সমগ্র পৃথিবী যুগযুগান্তর ধরিয়া যে আদর্শ-জগতের কল্পনা করিয়া আসিতেছে, যাহাতে শীঘ্র তাহা রূপায়িত হয়, যাহাতে সকল জাতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়, তদুদ্দেশ্যে প্রত্যেকেরই যতটুকু সাধ্য ততটুকু ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে দেওয়া উচিত। এই আদর্শ-জগতের আবির্ভাব কখনও হইবে কি না, তাহা জানি না; এই সামাজিক সম্পূর্ণতা কখনও আসিবে কি না, এ-সম্বন্ধে আমার নিজেরই সন্দেহ আছে; কিন্তু জগতের এই আদর্শ-অবস্থা কখন আসুক বা না আসুক, এই অবস্থা আনিবার জন্য আমাদের প্রত্যেককে চেষ্টা করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে, কালই জগতের এই অবস্থা আসিবে, আর আমার—কেবল আমার কাজের উপরই ইহা নির্ভর করিতেছে। আমাদের প্রত্যেককেই বিশ্বাস করিতে হইবে যে, জগতের অপর সকলে নিজ নিজ কাজ শেষ করিয়া বসিয়া আছে—একমাত্র আমারই কেবল কাজ করার বাকি আছে; আর আমি যদি নিজের কাজ সম্পন্ন করি, তবেই জগতের সম্পূর্ণতা সাধিত হইবে। আমাদের নিজেদের এই দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হইবে।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে—ভারতে ধর্মের এক প্রবল পুনরুত্থান হইয়াছে। ইহাতে খুব আনন্দের কারণ আছে বটে, কিন্তু আবার বিপদেরও আশঙ্কা আছে। কারণ ধর্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক গোঁড়ামিও আসিয়া থাকে। কখন কখন লোকে এত বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে যে, অনেক সময় যাঁহাদের চেষ্টায় এই পুনরভ্যুত্থান সাধিত হয়, কিছুদূর অগ্রসর হইলে তাঁহারাও উহা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন না। অতএব পূর্ব হইতেই সাবধান হওয়া ভাল। আমাদের মধ্যপথ অবলম্বন করিতে হইবে। এক দিকে কুসংস্কারপূর্ণ প্রাচীন

সমাজ, অপর দিকে জড়বাদ—ইওরোপীয় ভাব, নাস্তিকতা, তথাকথিত সংস্কার, যাহা পাশ্চাত্য জগতের উন্নতির মূল ভিত্তিতে পর্যন্ত প্রবিষ্ট। এই দুইটি হইতেই সাবধান থাকিতে হইবে। প্রথমতঃ আমরা কখনও পাশ্চাত্য জাতি হইতে পারিব না, সুতরাং উহাদের অনুকরণ বৃথা। মনে কর, তোমরা পাশ্চাত্য জাতির হুবহু অনুকরণ করিতে সমর্থ হইলে, কিন্তু যে মুহূর্তে সমর্থ হইবে সেই মুহূর্তেই তোমাদের মৃত্যু ঘটিবে—তোমাদের জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব আর থাকিবে না; ইহা অসম্ভব। কালের প্রারম্ভ হইতে মানবজাতির ইতিহাসের লক্ষ লক্ষ বর্ষ ধরিয়া একটি নদী হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে; তুমি কি উহাকে উৎপত্তিস্থান হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চাও? তাহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি তোমাদের পক্ষে ইওরোপীয়ভাবাপন্ন হইয়া যাওয়া অসম্ভব। ইওরোপীয়গণের পক্ষে যদি কয়েক শতাব্দীর শিক্ষাসংস্কার পরিত্যাগ করা অসম্ভব বোধ হয়, তবে তোমাদের পক্ষে শত শত শতাব্দীর সংস্কার পরিত্যাগ করা কিরূপে সম্ভব হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা সচারাচর যেগুলিকে আমাদের ধর্মবিশ্বাস বলি, সেগুলি আমাদের নিজ নিজ ক্ষুদ্র গ্রাম্যদেবতা-সম্বন্ধীয় এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র কুসংস্কারপূর্ণ দেশাচারমাত্র। এইরূপ দেশাচার অসংখ্য ও পরস্পরবিরোধী। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি মানিব, আর কোন্‌টি মানিব না? উদাহরণ-স্বরূপ দেখ, দাক্ষিণাত্যের একজন ব্রাহ্মণ অপর ব্রাহ্মণকে এক টুকরা মাংস খাইতে দেখিলে ভয়ে দুই শত হাত পিছাইয়া যাইবে; আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণ কিন্তু মহাপ্রসাদের অতিশয় ভক্ত, পূজার জন্য তিনি শত শত ছাগবলি দিতেছেন। তুমি তোমার দেশাচারের দোহাই দিবে, তিনি তাঁহার দেশাচারের দোহাই দিবেন। ভারতের বিভিন্ন দেশে নানাবিধ দেশাচার আছে, কিন্তু প্রত্যেক দেশাচারই স্থানবিশেষে আবদ্ধ; কেবল অজ্ঞ ব্যক্তিরাই তাহাদের নিজ নিজ পল্লীতে প্রচলিত আচারকে ধর্মের সার বলিয়া মনে করে, ইহাই তাহাদের মহাভুল।

ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি মুশকিল আছে। আমাদের শাস্ত্রে দুই প্রকার সত্য উপদিষ্ট হইয়াছে। এক প্রকার সত্য মানুষের নিত্যস্বরূপ-বিষয়ক—ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতির পরস্পর সম্বন্ধ-বিষয়ক; আর এক প্রকার সত্য কোন বিশেষ দেশ-কাল-অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রথম প্রকার সত্য

প্রধানতঃ আমাদের শাস্ত্র বেদে রহিয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার সত্য স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতিতে রহিয়াছে। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, চিরকালের জন্য বেদই আমাদের চরম লক্ষ্য ও চরম প্রমাণ! আর যদি কোন পুরাণ বেদের বিরোধী হয়, তবে পুরাণের সেই অংশ নির্মমভাবে ত্যাগ করিতে হইবে। আমরা স্মৃতিতে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, বিভিন্ন স্মৃতির উপদেশ বিভিন্ন প্রকার। এক স্মৃতি বলিতেছেন—ইহাই দেশাচার, এই যুগে ইহারই অনুসরণ করিতে হইবে। অপর স্মৃতি আবার ঐ যুগের জন্যই অন্যপ্রকার আচার সমর্থন করিতেছেন। কোন স্মৃতি আবার সত্য-ত্রেতা প্রভৃতি যুগভেদে বিভিন্ন আচার সমর্থন করিয়াছেন। এখন দেখ, তোমাদের শাস্ত্রের এই মতটি কি উদার ও মহান্। সনাতন সত্যসমূহ মানব-প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যতদিন মানুষ আছে, ততদিন উহাদের পরিবর্তন হইবে না—অনন্তকাল ধরিয়া সর্বদেশে সর্ব অবস্থায় ঐগুলি ধর্ম। স্মৃতি অপর দিকে বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অনুষ্ঠেয় কর্তব্যসমূহের কথাই অধিক বলিয়া থাকেন, সুতরাং কালে কালে সেগুলির পরিবর্তন হয়। এইটি সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—কোন সামান্য সামাজিক প্রথা বদলাইতেছে বলিয়া তোমাদের ধর্ম গেল, মনে করিও না। মনে রাখিও, চিরকালই এই সকল প্রথা ও আচারের পরিবর্তন হইতেছে। এই ভারতেই এমন সময় ছিল, যখন গোমাংস ভোজন না করিলে কোন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকিত না। বেদপাঠ করিলে দেখিতে পাইবে, কোন বড় সন্ন্যাসী বা রাজা বা অন্য কোন বড়লোক আসিলে ছাগ ও গোহত্যা করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করানোর প্রথা ছিল। ক্রমশঃ সকলে বুঝিল—আমাদের জাতি প্রধানতঃ কৃষিজীবী, সুতরাং ভাল ভাল ষাঁড়গুলি হত্যা করিলে সমগ্র জাতি বিনষ্ট হইবে। এই কারণেই গোহত্যা-প্রথা রহিত করা হইল—গোহত্যা মহাপাতক বলিয়া পরিগণিত হইল। প্রাচীন শাস্ত্রপাঠে আমরা দেখিতে পাই, তখন হয়তো এমন সব আচার প্রচলিত ছিল যেগুলিকে এখন আমরা বীভৎস বলিয়া মনে করি। ক্রমশঃ সেগুলির পরিবর্তে অন্য সব বিধি প্রবর্তন করিতে হইয়াছে। ঐগুলি আবার পরিবর্তিত হইবে, তখন নূতন নূতন স্মৃতির অভ্যুদয় হইবে। এইটিই বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বেদ চিরকাল একরূপ থাকিবে, কিন্তু কোন স্মৃতির প্রাধান্য যুগ-পরিবর্তনেই শেষ হইয়া যাইবে। সময়স্রোত যতই চলিবে, ততই পূর্ব পূর্ব স্মৃতির প্রামাণ্য লোপ পাইবে,

আর মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া সমাজকে পূর্বাপেক্ষা ভাল পথে পরিচালিত করিবেন; সেই যুগের পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যক, যাহা ব্যতীত সমাজ বাঁচিতেই পারে না—তাঁহারা আসিয়া সেই-সকল কর্তব্য ও পথ সমাজকে দেখাইয়া দিবেন।

এইরূপে আমাদিগকে এই উভয় বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে; আমি আশা করি, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই একদিকে যেমন উদার ভাব—হৃদয়ের প্রশস্ততা আসিবে, অপর দিকে তেমনি দৃঢ় নিষ্ঠা ও বিশ্বাস থাকিবে; তাহা হইলেই তোমরা আমার কথার মর্ম বুঝিবে—বুঝিবে আমার উদ্দেশ্য সকলকেই আপনার করিয়া লওয়া, কাহাকেও বর্জন করা নয়। আমি চাই গোঁড়ার নিষ্ঠাটুকু, ও তাহার সহিত জড়বাদীর উদার ভাব। হৃদয় সমুদ্রবৎ গভীর অথচ আকাশবৎ প্রশস্ত হওয়া চাই। আমাদিগকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল জাতির মতো উন্নত হইতে হইবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আবহমান-কালের সঞ্চিত সংস্কারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে হইবে; আর হিন্দুই কেবল প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন প্রথার সম্মান করিতে জানে। সহজ কথায় বলি—সর্ব বিষয়েই আমাদিগকে মুখ্য ও গৌণ উভয়ের বিভিন্নতা কোথায়, তাহা শিখিতে হইবে। মুখ্য বিষয়গুলি সর্বকালের জন্য, আর গৌণ তত্ত্বগুলি কোন বিশেষ সময়ের উপযোগী মাত্র। যদি যথা সময়ে সেইগুলির পরিবর্তে অন্য প্রথা প্রবর্তিত না হয়, তবে সেগুলি দ্বারা নিশ্চয় অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। আমার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, তোমাদিগকে প্রাচীন আচারপদ্ধতিসমূহের নিন্দা করিতে হইবে। কখনই নহে, অতিশয় কুৎসিত আচারগুলিরও নিন্দা করিও না। নিন্দা কিছুরই করিও না; এখন যে প্রথাগুলিকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনিষ্টকর বলিয়া বোধ হইতেছে, সেইগুলিই অতীত কালে প্রত্যক্ষভাবে জীবনপ্রদ ছিল। এখন যদি সেগুলিকে উঠাইয়া দিতে হয়, তবে উঠাইয়া দিবার সময়ও সেইগুলির নিন্দা করিও না; বরং উহাদের দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনরক্ষারূপ যে মহৎ কার্য সাধিত হইয়াছে, সেজন্য ঐগুলির প্রশংসা কর—ঐগুলির প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

আর আমাদিগকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে, কোন সেনাপতি বা রাজা কোনকালে আমাদের সমাজের নেতা ছিলেন না, ঋষিগণই চিরকাল আমাদের সমাজের নেতা। ঋষি কাহারা? তিনিই ঋষি, যিনি ধর্মকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, যাঁহার নিকট ধর্ম কেবল পুঁথিগত বিদ্যা, বাগ বিতণ্ডা বা তর্কযুক্তি

নহে—সাক্ষাৎ উপলব্ধি, অতীন্দ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎকার। উপনিষদ্ বলিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি সাধারণ মানবতুল্য নহেন, তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা। ইহাই ঋষিত্ব। আর এই ঋষিত্বলাভ কোনরূপ দেশ কাল জাতি বা সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করে না। বাৎস্যায়ন ঋষি বলিয়াছেন—সত্যের সাক্ষাৎকার করিতে হইবে, আর আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তোমাকে আমাকে—আমাদের সকলকেই ঋষি হইতে হইবে, অগাধ আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন হইতে হইবে; আমরাই সমগ্র জগতে শক্তিসঞ্চার করিব। কারণ সব শক্তি আমাদের ভিতরে রহিয়াছে। আমাদিগকে ধর্ম প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, উপলব্ধি করিতে হইবে; তবেই ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের সকল সন্দেহ দূরীভূত হইবে; তখনই ঋষিত্বের উজ্জ্বল জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া আমরা প্রত্যেকেই মহাপুরুষত্ব লাভ করিব। তখনই আমাদের মুখ হইতে যে বাণী নির্গত হইবে, তাহা অব্যর্থ অমোঘ ও শক্তিসম্পন্ন হইবে; তখনই আমাদের সম্মুখ হইতে মন্দ যাহা কিছু, তাহা আপনিই পলায়ন করিবে, আর কাহাকেও নিন্দা বা অভিসম্পাত করিতে হইবে না, অথবা কাহারও সহিত বিরোধ করিতে হইবে না। এখানে আজ যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককেই নিজের ও অপরের মুক্তির জন্য ঋষিত্ব লাভ করিতে শ্রীভগবান সাহায্য করুন।

কুম্ভকোণম্ বক্তৃতা

মাদুরা হইতে ত্রিচিনপল্লী ও তাঞ্জোর হইয়া স্বামীজী কুম্ভকোণম্ আসেন। সেখানে অভিনন্দনের উত্তরে বেদান্ত সম্বন্ধে তিনি এক সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

গীতাকার বলিয়াছেন: 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'—অল্পমাত্রও ধর্ম-কর্ম করিলে তাহাতে অতি মহৎ ফল লাভ হয়। যদি এই বাক্যের সমর্থনের জন্য কোন উদাহরণের আবশ্যক হয়, তবে আমি বলিতে পারি, আমার ক্ষুদ্র জীবনে প্রতিপদে এই মহাবাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতেছি।

হে কুম্ভকোণম্-নিবাসী ভদ্রমহোদয়গণ, আমি অতি সামান্য কাজ করিয়াছি; কিন্তু কলম্বোয় নামিয়া অবধি এ পর্যন্ত যেখানেই গিয়াছি, সেখানেই যেরূপ

আন্তরিক অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছি, তাহা আমার স্বপ্নের অতীত। সেই সঙ্গে ইহাও বলি যে, ইহা হিন্দুজাতির পূর্বাপর সংস্কার ও ভাবের উপযুক্তই হইয়াছে। কারণ ধর্মই হিন্দুজাতির প্রকৃত জীবনীশক্তি, ধর্মই তাহার মূলমন্ত্র।

আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশে অনেক ঘুরিয়াছি, জগতের সম্বন্ধে আমার কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে। দেখিলাম সকল জাতিরই এক-একটি প্রধান আদর্শ আছে—তাহাই সেই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। রাজনীতিই কোন কোন জাতির জীবনের মূলভিত্তি; কাহারও বা সামাজিক উন্নতি, কাহারও বা মানসিক উন্নতিবিধান, কাহারও বা অন্য কিছু। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম—শুধু ধর্মই। উহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, উহারই উপর আমাদের জীবনরূপ প্রাসাদের মূলভিত্তি স্থাপিত।

তোমাদের মধ্যে অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে, মাদ্রাজবাসীরা অনুগ্রহ-পূর্বক আমাকে আমেরিকায় যে অভিনন্দন পাঠাইয়াছিলেন, তাহার উত্তরে আমি একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, পাশ্চাত্যদেশের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অপেক্ষা ভারতের কৃষকগণ ধর্মবিষয়ে অধিকতর শিক্ষিত। আজ আমি সেই বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পাইতেছি, ঐ বিষয়ে এখন আমার আর কোন সন্দেহ নাই। এমন সময় ছিল, যখন ভারতের সাধারণ লোকের মধ্যে পৃথিবীর সংবাদ জানিবার এবং ঐ সংবাদ সংগ্রহ করিবার আগ্রহের অভাব দেখিয়া আমার দুঃখ হইত। এখন আমি উহার রহস্য বুঝিয়াছি। আমাদের দেশের লোকও সংবাদ-সংগ্রহে খুব উৎসুক, তবে অবশ্য যে-বিষয়ে তাহার বিশেষ অনুরাগ, সেই বিষয়ের সংবাদই সে চাহিয়া থাকে; এ বিষয়ে বরং অন্যান্য যে-সকল দেশ আমি দেখিয়াছি বা পর্যটন করিয়াছি, সেখানকার সাধারণলোক অপেক্ষা তাহাদের আগ্রহ আরও বেশী। আমাদের কৃষকগণকে ইওরোপের গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক পরিবর্তনগুলির সংবাদ জিজ্ঞাসা কর, ইওরোপীয় সমাজে যে-সব গুরুতর পরিবর্তন হইতেছে, সেগুলির বিষয় জিজ্ঞাসা কর—তাহারা সে-সব কিছুই জানে না, জানিতে চাহেও না। কিন্তু সিংহলেও—যে সিংহল ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন, ভারতের স্বার্থের সহিত যাহার বিশেষ সংস্রব নাই—দেখিলাম সেখানকার কৃষকেরাও জানিয়াছে যে, আমেরিকায় ধর্মমহাসভা বসিয়াছিল, আর তাহাদেরই একজন সেখানে গিয়াছিলেন, এবং কিছুটা পরিমাণে কৃতকার্যও হইয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে; যে-বিষয়ে তাহাদের মনের

আগ্রহ, সেই বিষয়ে তাহারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলির মতোই সংবাদ-সংগ্রহে উৎসুক। আর ধর্মই ভারতবাসীর একমাত্র প্রাণের বস্তু—আগ্রহের বস্তু।

জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম হওয়া উচিত, অথবা রাজনীতি—এ বিষয়ে এখন আমি বিচার করিতে চাহি না; তবে ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ভালই হউক, আর মন্দই হউক—ধর্মেই আমাদের জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি স্থাপিত। তুমি কখনও ইহা পরিবর্তন করিতে পার না, একটা জিনিস নষ্ট করিয়া তাহার বদলে অপর জিনিস বসাইতে পার না। একটি বৃহৎ বৃক্ষকে এক স্থান হইতে উপড়াইয়া অন্য স্থানে পুঁতিয়া দিলে উহা যে সেখানে জীবিত থাকিবে, তাহা কখনই আশা করিতে পার না। ভালই হউক, আর মন্দই হউক—সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ ভারতে ধর্মই জীবনের চরম আদর্শরূপে পরিগণিত হইতেছে; ভালই হউক আর মন্দই হউক—শত শত শতাব্দী ধরিয়া ভারতের পরিবেশ ধর্মের মহান্ আদর্শে পূর্ণ রহিয়াছে; ভালই হউক আর মন্দই হউক—ধর্মের এই-সকল আদর্শের মধ্যেই আমরা পরিবর্ধিত হইয়াছি; এখন ঐ ধর্মভাব আমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে—আমাদের শিরায় শিরায় প্রতি রক্ত-বিন্দুর সহিত প্রবাহিত হইতেছে, আমাদের প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে, আমাদের জীবনীশক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সহস্র বৎসর যাবৎ যে-মহানদী নিজের খাত রচনা করিয়াছে, তাহাকে না বুজাইয়া, মহাশক্তি প্রয়োগ না করিয়া তোমরা কি সেই ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পারো? তোমরা কি গঙ্গাকে তাহার উৎপত্তিস্থান হিমালয়ে ঠেলিয়া লইয়া গিয়া আবার নূতন খাতে প্রবাহিত করাইতে ইচ্ছা কর? ইহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি এই দেশের পক্ষে তাহার বিশেষত্বসূচক ধর্মজীবন পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতি অথবা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। স্বল্পতম বাধার পথেই তোমরা কাজ করিতে পারো; ধর্মই ভারতের পক্ষে সেই স্বল্পতম বাধার পথ। এই ধর্মপথের অনুসরণ করাই ভারতের জীবন, ভারতের উন্নতি ও ভারতের কল্যাণের একমাত্র উপায়।

অন্যান্য দেশে পাঁচ রকম প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে ধর্ম একটি। একটি উদাহরণ দিই। আমি সচরাচর এই দৃষ্টান্তটি দিয়া থাকি—অমুক সম্ভ্রান্ত মহিলার ঘরে নানা জিনিস আছে; এখনকার ফ্যাশন—একটি জাপানী পাত্র (vase) ঘরে রাখা, না রাখিলে ভাল দেখায় না, সুতরাং তাঁহাকে একটা

জাপানী পাত্র রাখিতেই হইবে। এইরূপ আমাদের কর্তার ’বা গিন্নীর অনেক কাজ, তার মধ্যে একটু ধর্মও চাই—তবেই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইল। এই কারণেই তাঁহাদের একটু আধটু ‘ধর্ম’ করা চাই। জগতের অধিকাংশ লোকের জীবনের উদ্দেশ্য—রাজনীতিক বা সামাজিক উন্নতির চেষ্টা, এক কথায় সংসার। তাহাদের নিকট ঈশ্বর ও ধর্মের প্রয়োজন সংসারেরই একটু সুখবিধানের জন্য—তাহাদের নিকট ঈশ্বরের প্রয়োজন শুধু এইটুকু। তোমরা কি শোন নাই, গত দুই শত বৎসর যাবৎ কতকগুলি অজ্ঞ অথচ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির নিকট হইতে ভারতীয় ধর্মের বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ শোনা যাইতেছে যে, ধর্ম দ্বারা সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-লাভের সুবিধা হয় না, ‘কাঞ্চন’লাভ হয় না, উহা সমগ্র জাতিকে দস্যুতে পরিণত করে না,—বলবানকে গরীবের ঘাড়ে পড়িয়া তাহার রক্তপান করিতে সাহায্য করে না! সত্যই, আমাদের ধর্ম এরূপ করে না। ইহাতে অন্যান্য জাতির সর্বস্ব লুণ্ঠন ও সর্বনাশ করিবার জন্য পদভরে ভূকম্পকারী সৈন্য-প্রেরণের ব্যবস্থা নাই। অতএব তাঁহারা বলেন—এ ধর্মে আছে কি? উহা চল্‌তি কলে শস্য যোগাইয়া কাজ আদায় করিতে জানে না, অথবা উহা দ্বারা শারীরিক শক্তি লাভ হয় না। তবে এ ধর্মে আছে কি? তাহারা স্বপ্নেও ভাবে না যে, ঐ যুক্তির দ্বারাই আমাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। আমাদের ধর্মে সাংসারিক সুখ হয় না, সুতরাং আমাদের ধর্ম শ্রেষ্ঠ। আমাদের ধর্মই একমাত্র সত্যধর্ম, কারণ আমাদের ধর্ম এই দু-তিন দিনের ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে না। এই স্বল্প বিস্তৃত ক্ষুদ্র পৃথিবীতেই আমাদের ধর্মের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ নহে। আমাদের ধর্ম এই জগতের সীমার বাহিরে—দূরে, অতি দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে; সেই রাজ্য অতীন্দ্রিয়—সেখানে দেশ নাই, কাল নাই, সংসারের কোলাহল হইতে দূরে, অতি দূরে—সেখানে গেলে আর সংসারের সুখ-দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না, সমগ্র জগৎই সেই মহিমময় ভূমা আত্মারূপ মহাসমুদ্রে বিন্দুতুল্য হইয়া যায়। আমাদের ধর্মই সত্য ধর্ম, কারণ ইহা ‘ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা’—এই উপদেশ দিয়া থাকে; আমাদের ধর্ম বলে—‘কাঞ্চন লোষ্ট্র বা ধূলির তুল্য; তোমরা যতই ক্ষমতা-লাভ কর না কেন, সবই ক্ষণিক, এমন কি, জীবনধারণই অনেক সময় বিড়ম্বনামাত্র; এই জন্যই আমাদের ধর্ম সত্য। আমাদের ধর্মই সত্যধর্ম—কারণ সর্বোপরি ইহা ত্যাগ শিক্ষা দেয়। শত শত যুগের সঞ্চিত জ্ঞানবলে দণ্ডায়মান হইয়া উহা আমাদের মহাজ্ঞানী

প্রাচীন পূর্বপুরুষগণের তুলনায় যাহারা সেদিনের শিশুমাত্র, সেই-সকল জাতির নিকট সুদৃঢ় অথচ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া থাকে : বালক ! তুমি ইন্দ্রিয়ের দাস; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের ভোগ অস্থায়ী—বিনাশই উহার পরিণাম। এই তিনদিনের ক্ষণস্থায়ী বিলাসের ফল—সর্বনাশ। অতএব ইন্দ্রিয়সুখের বাসনা ত্যাগ কর—ইহাই ধর্মলাভের উপায়। ত্যাগই আমাদের চরম লক্ষ্য, মুক্তির সোপান—ভোগ আমাদের লক্ষ্য নহে। এই জন্য আমাদের ধর্মই একমাত্র সত্যধর্ম। বিস্ময়ের বিষয়, এক জাতির পর আর এক জাতি সংসার-রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া কয়েক মুহূর্ত পরাক্রমের সহিত নিজ নিজ অংশ অভিনয় করিয়াছে, কিন্তু পরমুহূর্তেই তাহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে ! কালসমুদ্রে তাহারা একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গও সৃষ্টি করিতে পারে নাই—নিজেদের কিছু চিহ্ন পর্যন্ত রাখিয়া যাইতে পারে নাই। আমরা কিন্তু অনন্তকাল কাক-ভূশণ্ডীর মতো বাঁচিয়া আছি—আমাদের যে কখন মৃত্যু হইবে, তাহার লক্ষণও দেখা যাইতেছে না।

আজকাল লোকে 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' (Survival of the fittest)-রূপ নূতন মতবাদ লইয়া অনেক কথা বলিয়া থাকে। তাহারা মনে করে—যাহার গায়ের জোর যত বেশী, সেই তত অধিক দিন জীবিত থাকিবে। যদি তাহাই সত্য হইত, তবে প্রাচীনকালের যে-সকল জাতি কেবল অন্যান্য জাতির সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে কাটাইয়াছে, তাহারাই মহাগৌরবের সহিত আজও জীবিত থাকিত এবং এই দুর্বল হিন্দুজাতি, যাহারা কখনও অপর একটি জাতিকে জয় করে নাই, তাহারাই এতদিন বিনষ্ট হইয়া যাইত। জনৈকা ইংরেজ মহিলা আমাকে এক সময় বলেন, হিন্দুরা কি করিয়াছে? তাহারা কোন একটা জাতিকেও জয় করিতে পারে নাই! পরন্তু এই জাতি এখনও ত্রিশকোটি প্রাণী লইয়া সদর্পে জীবিত রহিয়াছে ! আর ইহা সত্য নহে যে, উহার সমুদয় শক্তি নিঃশেষিত হইয়াছে; ইহাও কখন সত্য নহে যে, এই জাতির শরীর পুষ্টির অভাবে ক্ষয় পাইতেছে। এই জাতির এখনও যথেষ্ট জীবনীশক্তি রহিয়াছে। যখনই উপযুক্ত সময় আসে, যখনই প্রয়োজন হয়, তখনই এই জীবনীশক্তি মহাবন্যার মতো প্রবাহিত হইয়া থাকে।

আমরা যেন অতি প্রাচীনকাল হইতে সমগ্র পৃথিবীকে এক মহাসমস্যা সমাধানের জন্য আহ্বান করিয়াছি। পাশ্চাত্যদেশে সকলে চেষ্টা করিতেছে কিরূপে তাহারা জগতের সর্বাপেক্ষা অধিক দ্রব্যসামগ্রীর অধিকারী হইবে;

আমরা কিন্তু এখানে আর এক সমস্যার মীমাংসায় নিযুক্ত যে, কত অল্প জিনিস লইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যায়। উভয় জাতির মধ্যে এই সংঘর্ষ ও প্রভেদ এখনও কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চলিবে। কিন্তু ইতিহাসে যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে, যদি বর্তমান লক্ষণসমূহ দেখিয়া ভবিষ্যৎ অনুমান করা বিন্দুমাত্র সম্ভব হয়, তবে বলা যায়, যাহারা স্বল্পের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে ও কঠোর আত্মসংযম অভ্যাস করিতে চেষ্টা করে, তাহারাই পরিণামে জয়ী হইবে; আর যাহারা ভোগসুখ ও বিলাসের দিকেই ধাবমান, তাহারা আপাততঃ যতই তেজস্বী ও বীর্যবান বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, পরিণামে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে।

মনুষ্যজীবনে, এমন কি জাতীয় জীবনেও সময়ে সময়ে সংসারের উপর বিতৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল হয়। বোধ হয়, সমগ্র পাশ্চাত্যদেশে এইরূপ একটা সংসার-বিরক্তির ভাব আসিয়াছে। পাশ্চাত্যদেশের বড় বড় মনীষিগণ ইতিমধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ঐশ্বর্য-সম্পদের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা—সবই বৃথা। সেখানকার অধিকাংশ শিক্ষিত নরনারীই তাঁহাদের বাণিজ্য-প্রধান সভ্যতার এই প্রতি-যোগিতায়, এই সংঘর্ষে, এই পাশব ভাবে অতিশয় বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহারা আশা করিতেছেন—এই অবস্থা পরিবর্তিত হইবে এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা আসিতেছে। এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহাদের এখনও দৃঢ় ধারণা—রাজনীতিক ও সামাজিক পরিবর্তনই ইওরোপের সমুদয় অশুভ-প্রতিকারের একমাত্র উপায়। কিন্তু তাঁহাদের বড় বড় মনীষীদের মধ্যে অন্য এক আদর্শ বিকাশ লাভ করিতেছে; তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, রাজনীতিক বা সামাজিক পরিবর্তন যতই হউক না কেন, মনুষ্যজীবনের দুঃখকষ্ট কিছুতেই দূর হইবে না। কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধান করিতে পারিলেই সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট ঘুচিবে। যতই শক্তিপ্রয়োগ, যতই শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন, যতই আইনের কড়াকড়ি কর না কেন, কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারিবে না। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষাই কেবল অসৎ প্রবৃত্তি পরিবর্তিত করিয়া জাতিকে সৎপথে চালিত করিতে পারে। অতএব পাশ্চাত্য জাতিগুলি কিছু নূতন ভাব—কোন নূতন দর্শনের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা যে-ধর্ম মানেন, সেই খৃষ্টধর্ম অনেক বিষয়ে মহৎ ও সুন্দর হইলেও উহার মর্ম তাঁহারা ভাল করিয়া বোঝেন নাই। আর এতদিন তাঁহারা খৃষ্টধর্মকে যেভাবে বুঝিয়া আসিতেছিলেন,

তাহা আর তাঁহাদের নিকট পর্যাপ্ত বোধ হইতেছে না। পাশ্চাত্যদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আমাদের প্রাচীন দর্শনসমূহ, বিশেষতঃ বেদান্তেই—এতদিন তাঁহারা যাহা খুঁজিতেছেন—সেই চিন্তাপ্রবাহ, সেই আধ্যাত্মিক খাদ্যপানীয়ের সন্ধান পাইতেছেন। আর ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

জগতে যতপ্রকার ধর্ম আছে, তাহার প্রত্যেকটিরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য সেই সেই ধর্মাবলম্বিগণ নানাবিধ অপূর্ব যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া থাকেন। সে-সব শুনিয়া শুনিয়া অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। অতি অল্প দিনের কথা, আমার বিশেষ বন্ধু ব্যারোজ সাহেব—'খৃষ্টধর্মই যে একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম' ইহা প্রমাণ করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন, আপনারা তাহা নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন। এখন বাস্তবিক সার্বভৌম ধর্ম কোন্‌টি হইতে পারে, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাক।

আমার ধারণা, বেদান্ত—কেবল বেদান্তই সার্বভৌম ধর্ম হইতে পারে, আর কোন ধর্মই নয়। আমি আপনাদের নিকট আমার এই বিশ্বাসের যুক্তিপরম্পরা উপস্থাপিত করিব। আমাদের ধর্ম ব্যতীত পৃথিবীর প্রধান প্রধান প্রায় সকল ধর্মই তাহাদের নিজ নিজ প্রবর্তক মহাপুরুষের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সেই সকল ধর্মের মত, শিক্ষা, নীতিতত্ত্ব প্রভৃতি সেই সেই মহাপুরুষের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাঁহাদের বাক্য বলিয়াই সেই মতাদির প্রামাণ্য, তাঁহাদের বাক্য বলিয়াই সেইগুলি সত্য, তাঁহাদের বাক্য বলিয়াই ঐ উপদেশগুলি লোকের মনে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। আর আশ্চর্যের বিষয়, ধর্মপ্রবর্তকদের ঐতিহাসিকতার উপরই যেন সেই-সকল ধর্মের সব কিছুর ভিত্তি স্থাপিত। যদি তাঁহাদের জীবনের ঐতিহাসিকতায় কিছুমাত্র আঘাত করা যায়, যদি তাঁহাদের তথাকথিত ঐতিহাসিকতার ভিত্তি একবার ভাঙিয়া দেওয়া যায়, তবে সমুদয় ধর্ম-প্রাসাদটিই একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে—পুনরুদ্ধারের আর কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। বাস্তবিক বর্তমানকালে তথাকথিত প্রায় সকল ধর্মপ্রবর্তকের জীবন সম্বন্ধে তাহাই ঘটিতেছে। আমরা জানি, তাঁহাদের জীবনের অর্ধেক ঘটনা লোকে ঠিক ঠিক বিশ্বাস করে না, আর বাকী অর্ধেকও সন্দেহ করে। আমাদের ধর্ম ব্যতীত জগতের অন্যান্য সকল বড় বড় ধর্মই এইরূপ ঐতিহাসিক জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত; আমাদের ধর্ম কিন্তু কতকগুলি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন পুরুষ বা নারী নিজেকে বেদের প্রণেতা বলিয়া দাবি করিতে পারেন না। বেদে সনাতন তত্ত্বসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

ঋষিগণ উহার আবিষ্কর্তা মাত্র। স্থানে স্থানে এই ঋষিগণের নামের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সেগুলি নামমাত্র। তাঁহারা কে ছিলেন, কি করিতেন, তাহাও আমরা জানি না। অনেক স্থলে তাঁহাদের পিতা কে ছিলেন, তাহাও জানা যায় না; আর প্রায় সকলেরই জন্মস্থান ও জন্মকাল আমাদের অজ্ঞাত। বাস্তবিক এই ঋষিগণ নামের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না; তাঁহারা সনাতন তত্ত্ব-সমূহের প্রচারক ছিলেন এবং নিজেরা জীবনে সেই-সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া আদর্শ জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করিতেন।

আবার যেমন আমাদের ঈশ্বর নির্গুণ অথচ সগুণ, সেইরূপ আমাদের ধর্মও কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে না, অথচ ইহাতে অনন্ত অবতার ও অসংখ্য মহাপুরুষের স্থান হইতে পারে। আমাদের ধর্মে যত অবতার, মহাপুরুষ, ঋষি আছেন, আর কোন্ ধর্মে এত আছেন? শুধু তাহাই নহে, আমাদের ধর্ম বলে—বর্তমানে ও ভবিষ্যতে আরও অনেক মহাপুরুষ অবতারদিগের অভ্যুদয় হইবে। ভাগবতে আছে—'অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ'। সুতরাং এই ধর্মে নূতন নূতন ধর্মপ্রবর্তক, অবতার ইত্যাদিকে গ্রহণ করিবার কোন বাধা নাই। এই হেতু ভারতের ধর্মেতিহাসে যে-সকল অবতার ও মহাপুরুষের বিষয় বর্ণিত আছে, যদি প্রমাণিত হয় যে, তাঁহারা ঐতিহাসিক নহেন, তাহা হইলেও আমাদের ধর্ম বিন্দুমাত্র আঘাত পাইবে না; উহা পূর্বের মতোই দৃঢ় থাকিবে; কারণ কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত নহে—সনাতন সত্যসমূহের উপরই ইহা স্থাপিত। পৃথিবীর সকল লোককে জোর করিয়া কোন ব্যক্তিবিশেষকে মানাইবার চেষ্টা করা বৃথা; এমন কি সনাতন ও সার্বভৌম তত্ত্বসমূহ দ্বারাও অনেককে একমতাবলম্বী করা কঠিন। তবে যদি কখন পৃথিবীর অধিকাংশ লোককে ধর্মসম্বন্ধে একমতাবলম্বী করা সম্ভব হয়, তবে কোন ব্যক্তিবিশেষকে সকলে মানুক—এরূপ চেষ্টা করিলে তাহা হইবে না, বরং সনাতন তত্ত্বসমূহে বিশ্বাসী হইয়া অনেকের একমতাবলম্বী হওয়া সম্ভব। অথচ আমাদের ধর্ম ব্যক্তিবিশেষের কথার প্রামাণ্য ও প্রভাব সম্পূর্ণরূপেই স্বীকার করিয়া থাকে—এ বিষয়ে আমি পূর্বেই বলিয়াছি।

'ইষ্টনিষ্ঠা'রূপ যে অপূর্ব মত আমাদের দেশে প্রচলিত, তাহাতে এই-সকল অবতারগণের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা আদর্শ করিতে সকলকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। যে-কোন অবতারকে তোমার জীবনের আদর্শরূপে ও বিশেষ

উপাস্যরূপে গ্রহণ করিতে পারো ; এমন কি তাঁহাকে সকল অবতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারো, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই ; কিন্তু সনাতন তত্ত্বসমূহই যেন তোমার ধর্মসাধনের মূলভিত্তি হয়। এই বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে আশ্চর্য হইবে—যে-কোন অবতারই হউন না কেন, বৈদিক সনাতন তত্ত্বসমূহের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ বলিয়াই তিনি আমাদের মান্য। শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য এই যে, তিনি সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক এবং বেদান্তের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাতা।

পৃথিবীর সকলেরই বেদান্তের চর্চা করা কেন উচিত, তাহার প্রথম কারণ এই যে, বেদান্তই একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম। দ্বিতীয় কারণ, জগতে যত শাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে কেবল বেদান্তের উপদেশের সহিত বহিঃপ্রকৃতির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে লব্ধ জ্ঞানের পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। অতি প্রাচীনকালে আকৃতি, বংশ ও ভাবের দিক হইতে সমতুল্য দুইটি বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন পথে জগতের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। আমি প্রাচীন হিন্দু ও প্রাচীন গ্রীকজাতির কথা বলিতেছি। শেষোক্ত জাতি বাহ্য জগতের বিশ্লেষণ করিয়া সেই চরম লক্ষ্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং প্রথমোক্ত জাতি অগ্রসর হইয়াছিল অন্তর্জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া। আর তাহাদের এই বিশ্লেষণের ইতিহাসের বিভিন্ন অবস্থা আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই দুই ভিন্ন প্রকার চিন্তাপ্রণালী সেই সুদূর চরমলক্ষ্যের একই প্রকার প্রতিধ্বনি করিয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কেবল বেদান্তীই—যাহারা নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, তাহাদের ধর্মের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করিতে পারে ; ইহাতে বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান জড়বাদ নিজের সিদ্ধান্তগুলি পরিত্যাগ না করিয়া কেবল বেদান্তের সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করিলেই আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে। আমাদের নিকট এবং যাঁহারা এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, তাহাদেরও নিকট ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আধুনিক বিজ্ঞান যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছে, বেদান্ত অনেক শতাব্দী পূর্বেই সেই-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল ; কেবল আধুনিক বিজ্ঞানে সেগুলি জড়শক্তিরূপে উল্লিখিত হইতেছে মাত্র।

আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিগণের পক্ষে বেদান্তের আলোচনার দ্বিতীয় হেতু—ইহার অদ্ভুত যুক্তিসিদ্ধতা। আমাকে পাশ্চাত্যদেশের অনেক ভাল ভাল

বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি অপূর্ব যুক্তিপূর্ণ। আমার সহিত ইঁহাদের একজনের বিশেষ পরিচয় আছে। এদিকে তাঁহার খাইবার বা গবেষণাগার হইতে বাহিরে যাইবার অবকাশ নাই, অথচ তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার বেদান্তবিষয়ক বক্তৃতা শুনিতেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন —বেদান্তের উপদেশগুলি এতদূর বিজ্ঞানসম্মত, বর্তমান যুগের অভাব ও আকাঙ্ক্ষাগুলি বেদান্ত এত সুন্দরভাবে পূরণ করিয়া থাকে, আর আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমশঃ যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছে, সেগুলির সহিত বেদান্তের এত সামঞ্জস্য যে, আমি ইহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারি না।

ধর্মগুলির তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া দুইটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়; সেই দুটির প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। প্রথম তত্ত্বটি এই : সকল ধর্মই সত্য। আর দ্বিতীয়টি : জগতের সকল বস্তু আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন বলিয়া মনে হইলেও সবই এক বস্তুর বিকাশমাত্র। বেবিলোনিয়ান ও য়াহুদীদের ধর্মেতিহাস আলোচনা করিলে আমরা একটি বিশেষ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া থাকি। আমরা দেখিতে পাই—বেবিলোনীয় ও য়াহুদী জাতির মধ্যে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা ও প্রত্যেকের পৃথক পৃথক দেবতা ছিল। এই সমুদয় পৃথক্ পৃথক্ দেবতার আবার একটি সাধারণ নাম ছিল। বেবিলোনীয় দেবতাদের সাধারণ নাম ছিল 'বল'। তাহাদের মধ্যে 'বল মেরোদক' প্রধান। কালে এই একটি শাখাজাতি সেই জাতির অন্তর্গত অন্যান্য শাখাজাতিগুলিকে জয় করিয়া নিজের সহিত মিশাইয়া লয়। ইহার স্বাভাবিক ফল এই হয় যে, বিজেতা জাতির দেবতা অন্যান্য শাখাজাতির দেবতাগুলির শীর্ষস্থান অধিকার করে। সেমাইট জাতি যে তথাকথিত একেশ্বরবাদ লইয়া গৌরব করিয়া থাকে, তাহা এইরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। য়াহুদী জাতির দেবতাদের সাধারণ নাম ছিল 'মোলক'। ইঁহাদের মধ্যে ইস্রায়েল জাতির দেবতার নাম ছিল 'মোলক-য়াভা'। এই ইস্রায়েল জাতি ক্রমশঃ উহার সমশ্রেণীস্থ অন্যান্য কতকগুলি জাতিকে জয় করিয়া নিজেদের মোলককে অন্যান্য মোলকগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রধান বলিয়া ঘোষণা করিল। এইরূপ ধর্মযুদ্ধে যে-পরিমাণ রক্তপাত ও পাশবিক অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা আপনারা অনেকেই জানেন। পরবর্তী কালে বেবিলোনীয়েরা মোলক-য়াভার এই প্রাধান্য লোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য হয় নাই।

আমার বোধ হয়, ধর্মবিষয়ে পৃথক পৃথক জাতির প্রাধান্যলাভের চেষ্টা ভারতের সীমান্ত-প্রদেশেও ঘটিয়াছিল। এখানেও সম্ভবতঃ আর্যজাতির বিভিন্ন শাখা পরস্পরের পৃথক পৃথক দেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু বিধির বিধানে ভারতীয় ইতিহাস য়াহুদীদের ইতিহাসের মতো হইল না। বিধাতা যেন অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতকে পরধর্মে বিদ্বেষশূন্য ও ধর্মসাধনায় গরিষ্ঠ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সেই কারণেই এখানে ঐ-সকল বিভিন্ন জাতি ও তাহাদের বিভিন্ন দেবতার মধ্যে দ্বন্দ্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। সেই প্রাগৈতিহাসিক সুদূর অতীত যুগে—কিংবদন্তীও যে-যুগের ঘনান্ধকার ভেদ করিতে অসমর্থ, সেই অতি প্রাচীনকালে ভারতে একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের অভ্যুদয় হয় ; জগতে এইরূপ মহাপুরুষের সংখ্যা অতি অল্প। এই মহাপুরুষ সেই প্রাচীনকালেই এই সত্য উপলব্ধি করিয়া প্রচার করেন, 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—সত্যবস্তু একটিই আছেন, ঋষিগণ তাঁহাকে নানাভাবে বর্ণনা করেন। এইরূপ চিরস্মরণীয় বাণী আর কখনও উচ্চারিত হয় নাই, এইরূপ মহান্ সত্য আর কখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। আর এই সত্যই আমাদের হিন্দুর জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শত শত শতাব্দী ধরিয়া এই তত্ত্ব— 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবনকে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত ও প্রভাবিত করিয়াছে, আমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, আমাদের জীবনের সহিত যেন সর্বাংশে একীভূত হইয়া গিয়াছে। আমরা ঐ মহত্তম সত্যটিকে সর্বতোভাবে ভালবাসি—তাই আমাদের দেশ পরধর্মে দ্বেষরাহিত্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ মহিমময় ভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে—কেবল এইখানেই লোকে তাহাদের ধর্মে ঘোরতর বিদ্বেষসম্পন্ন অপর ধর্মাবলম্বীর জন্যও মন্দির গির্জাদি নির্মাণ করিয়া দেয়। পৃথিবীর লোককে আমাদের নিকট এই পরধর্মে সহিষ্ণুতা-রূপ মহতী শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

আমাদের দেশের বাহিরে এখনও কি ভয়ানক পরধর্মবিদ্বেষ রহিয়াছে, তাহা আপনারা কিছুই জানেন না। পরধর্মবিদ্বেষ অনেক স্থানে এরূপ প্রবল যে, অনেক সময় মনে হইয়াছে, আমাকে হয়তো বিদেশে হাড়-কখানা দিয়া যাইতে হইবে। ধর্মের জন্য একজনকে মারিয়া ফেলা এত তুচ্ছ কথা যে, আজ না হউক, কালই এই মহাদৃপ্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে এরূপ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতে পারে। পাশ্চাত্যদেশে কেহ প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু

বলিতে সাহস করিলে তাহাকে সমাজচ্যুতি ও তাহার আনুষঙ্গিক যত প্রকার গুরুতর নির্যাতন সবই সহ্য করিতে হয়। আপনারাও যদি আমার মতো পাশ্চাত্যদেশে গিয়া কিছুদিন বাস করেন, তবে জানিতে পারিবেন যে, এখানে পাশ্চাত্যের লোকেরা খুব সহজে স্বচ্ছন্দে আমাদের জাতিভেদের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু সেখানকার বড় বড় অধ্যাপকেরা পর্যন্ত—যাঁহাদের কথা আপনারা এখানে খুব শুনিতে পান, তাঁহারাও অত্যন্ত কাপুরুষ ; এবং ধর্মসম্বন্ধে তাঁহারা যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, সাধারণের সমালোচনার ভয়ে তাহার শতাংশের একাংশও মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস করেন না।

এই কারণেই পৃথিবীকে এই পরধর্মসহিষ্ণুতারূপ মহান্ সত্য শিক্ষা করিতে হইবে। আধুনিক সভ্যতার ভিতরে এই ভাব প্রবেশ করিলে বিশেষ কল্যাণ হইবে। বাস্তবিকই এই ভাবে ভাবিত না হইলে কোন সভ্যতাই অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে না। গোঁড়ামি, রক্তপাত, পাশব অত্যাচার—যতদিন না এগুলি বন্ধ হয়, ততদিন সভ্যতার বিকাশই হইতে পারে না ; যতদিন না আমরা পরস্পরের প্রতি মৈত্রীসম্পন্ন হই, ততদিন কোনরূপ সভ্যতাই মাথা তুলিতে পারে না ; আর এই মৈত্রীভাব-বিকাশের প্রথম সোপান—পরস্পরের ধর্মবিশ্বাসের উপর সহানুভূতি প্রকাশ করা। শুধু তাহাই নহে, প্রকৃতপক্ষে এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিতে হইলে পরস্পরের প্রতি শুধু মৈত্রীভাবাপন্ন হইলেই চলিবে না—পরস্পরের ধর্মমত ও বিশ্বাস যতই পৃথক হউক না কেন, পরস্পরকে সকল বিষয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে হইবে। আমরা ভারতে ঠিক তাহাই করিয়া থাকি, এইমাত্র আপনাদিগকে আমি তাহা বলিয়াছি। এই ভারতেই কেবল হিন্দুরা খ্রীষ্টানদের জন্য চার্চ ও মুসলমানদের জন্য মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। এইরূপই করিতে হইবে। তাহারা আমাদিগকে যতই ঘৃণা করুক, তাহারা যতই পাশব ভাব প্রকাশ করুক, তাহারা যতই নিষ্ঠুর হউক ও অত্যাচার করুক, তাহারা সচরাচর যেমন করিয়া থাকে, সেইরূপ আমাদের প্রতি যতই কুৎসিত ভাষার প্রয়োগ করুক, আমরা ঐ খ্রীষ্টানদের জন্য গির্জা ও মুসলমানদের জন্য মসজিদ নির্মাণ করিতে বিরত হইব না, যতদিন পর্যন্ত না প্রেমবলে উহাদিগকে জয় করিতে পারি ; যতদিন পর্যন্ত না আমরা জগতের সমক্ষে প্রমাণ করিতে পারি যে, ঘৃণা ও বিদ্বেষপরায়ণ জাতি কখন দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে না—ভালবাসার বলেই জাতীয় জীবন স্থায়ী হইতে পারে,

কেবল পশুত্ব ও শারীরিক শক্তি কখন জয়লাভ করিতে পারে না, শান্ত স্বভাবই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হয়, সফল হয়।

পৃথিবীকে ইওরোপ এবং সমগ্র জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে আমাদের আর এক মহান্ তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইবে। সমগ্র জগতের আধ্যাত্মিক একত্বরূপ এই সনাতন মহান্ তত্ত্ব সম্ভবতঃ উচ্চজাতি অপেক্ষা নিম্নজাতির, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তিগণের, বলবান অপেক্ষা দুর্বলের পক্ষেই অধিকতর প্রয়োজনীয়।

হে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, আপনাদিগের নিকট আর বিস্তারিতভাবে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই যে, ইওরোপের আধুনিক গবেষণা জড়বিজ্ঞানের প্রণালীতে কিরূপে সমগ্র জগতের একত্ব প্রমাণ করিয়াছে—পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তুমি আমি সূর্য চন্দ্র তারা প্রভৃতি সবই অনন্ত জড়সমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গস্বরূপ। আবার শত শত শতাব্দী পূর্বে ভারতীয় মনোবিজ্ঞানও জড়বিজ্ঞানের ন্যায় প্রমাণ করিয়াছে যে, শরীর ও মন উভয়ই জড়সমুদ্রে বা সমষ্টির মধ্যে কতকগুলি পৃথক পৃথক সংজ্ঞা অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমাত্র। আবার আর এক পদ অগ্রসর হইয়া বেদান্তে দেখানো হইয়াছে—এই আপাত-প্রতীয়মান জগতের একত্বভাবেরও পশ্চাতে যে যথার্থ আত্মা রহিয়াছেন, তিনিও 'এক'। জগদ্-ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া একমাত্র আত্মাই রহিয়াছেন—সবই সেই এক সত্তামাত্র। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মূলে বাস্তবিক যে এই একত্ব রহিয়াছে—এই মহান্ তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া অনেকে ভয় পাইয়া থাকেন! অন্যান্য দেশের কথা দূরে থাকুক, এদেশেও অনেকে এই অদ্বৈতবাদ হইতে ভয় পাইয়া থাকেন! এখনও এই মতের অনুগামী অপেক্ষা বিরোধীর সংখ্যাই অধিক! তথাপি আমি বলিতেছি, যদি জগৎকে আমাদের কিছু জীবনপ্রদ তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হয়, তবে তাহা এই অদ্বৈতবাদ। ভারতের মূক জনসাধারণের উন্নতিবিধানের জন্য এই অদ্বৈতবাদের প্রচার আবশ্যক। এই অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত না হইলে আমাদের এই মাতৃভূমির পুনরুজ্জীবনের আর উপায় নাই।

যুক্তিবাদী পাশ্চাত্যজাতি নিজেদের সমুদয় দর্শন-নীতিবিজ্ঞানের মূলভিত্তি অনুসন্ধান করিতেছে। কিন্তু কোন ব্যক্তিবিশেষ, তিনি যতই বড় বা ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তি হউন না কেন, যখন কাল জন্মগ্রহণ করিয়া আজই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন, তখন তাঁহার অনুমোদিত বলিয়াই কোন দর্শন বা নীতিবিজ্ঞান

প্রামাণিক হইতে পারে না। দর্শন বা নীতির প্রমাণের এইমাত্র কারণ নির্দেশ করিলে তাহা কখন জগতের উচ্চশ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না ; কোন মানুষের অনুমোদিত বলিয়া উহার প্রামাণ্য না মানিয়া তাঁহারা দেখিতে চাহেন, সনাতন তত্ত্বসমূহের উপরই উহার ভিত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। একমাত্র অনন্ত সত্য তোমাতে—আমাতে—আমাদের সকলের আত্মায় বর্তমান রহিয়াছেন—সেই সনাতন আত্মতত্ত্ব ব্যতীত নীতিবিজ্ঞানের এই সনাতন ভিত্তি আর কি হইতে পারে? আত্মার অনন্ত একত্বই সর্বপ্রকার নীতির মূলভিত্তি ; তোমাতে আমাতে শুধু 'ভাই ভাই' সম্বন্ধ নহে,—মানবের দাসত্বশৃঙ্খল মোচন-চেষ্টার বর্ণনাপূর্ণ সকল গ্রন্থেই এই 'ভাই ভাই'-ভাবের কথা আছে এবং শিশুতুল্য ব্যক্তিরাই তোমাদের নিকট উহার প্রচার করিয়াছে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি আমি এক—ভারতীয় দর্শনের ইহাই সিদ্ধান্ত। সর্বপ্রকার নীতি ও ধর্ম-বিজ্ঞানের মূলভিত্তি এই একত্ব।

আমাদের দেশের সামাজিক অত্যাচারে পদদলিত সাধারণ লোকেরা যেমন এই মতের দ্বারা উপকৃত হইতে পারে, ইওরোপের পক্ষেও তেমনি ইহার প্রয়োজন। বাস্তবিকপক্ষে ইংলণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স ও আমেরিকায় আজকাল যেভাবে রাজনীতিক ও সামাজিক উন্নতিবিধানের চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, অজ্ঞাতসারে এখনই তাহারা এই মহান তত্ত্বকে সকল উন্নতির মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করিতেছে। আর হে বন্ধুগণ, আপনারা ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে, সাহিত্যের মধ্যে যেখানে মানুষের স্বাধীনতা—অনন্ত স্বাধীনতার চেষ্টা অভিব্যক্ত, সেইখানেই ভারতীয় বৈদান্তিক আদর্শসমূহ পরিস্ফুট। কোন কোন ক্ষেত্রে লেখকগণ তাঁহাদের প্রচারিত ভাবসমূহের মূল ভিত্তিসম্বন্ধে অজ্ঞ, কোন কোন স্থলে তাঁহারা নিজদিগকে মৌলিকগবেষণাশীল বলিয়া প্রমাণ করিতে সচেষ্ট। কিন্তু কেহ কেহ আবার নির্ভয়ে কৃতজ্ঞহৃদয়ে কোথা হইতে তাঁহারা ঐ-সকল তত্ত্ব পাইয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিয়া নিজদিগকে উহার নিকট ঋণী বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

বন্ধুগণ, আমেরিকায় আমি অদ্বৈতবাদই অধিক প্রচার করিতেছি, দ্বৈতবাদ প্রচার করিতেছি না—একবার এইরূপ অভিযোগ শুনিয়াছিলাম। দ্বৈতবাদের প্রেম ভক্তি ও উপাসনায় যে কি অসীম আনন্দ লাভ হয়, তাহা আমি জানি ; উহার অপূর্ব মহিমা আমি সম্পূর্ণ অবগত। কিন্তু বন্ধুগণ, এখন আমাদের

আনন্দে ক্রন্দন করিবারও সময় নাই। আমরা যথেষ্ট কাঁদিয়াছি। এখন আর আমাদের কোমলভাব অবলম্বন করিবার সময় নাই। এইরূপে কোমলতার সাধন করিতে করিতে আমরা এখন জীবন্মৃত হইয়া পড়িয়াছি—আমরা রাশীকৃত তূলার মতো কোমল হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের দেশের পক্ষে এখন প্রয়োজন—লৌহবৎ দৃঢ় মাংসপেশী ও ইস্পাতের মতো স্নায়ু; এমন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি চাই, কেহই যেন উহাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ না হয়, উহা যেন ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় রহস্যভেদে সমর্থ হয়—যদি বা এই কার্যসাধনে সমুদ্রের অতল তলে যাইতে হয়, যদি বা সর্বদা সর্বপ্রকার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত থাকিতে হয়! ইহাই এখন আমাদের আবশ্যক; আর অদ্বৈতবাদের মহান্ আদর্শ ধারণা করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলেই ঐ ভাবের আবির্ভাব, প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তাসাধন হইতে পারে।

বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস—নিজের উপর বিশ্বাস—ঈশ্বরে বিশ্বাস—ইহাই উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়। যদি তোমার পুরাণের তেত্রিশ কোটি দেবতার এবং বৈদেশিকেরা মধ্যে মধ্যে যে-সকল দেবতার আমদানি করিয়াছে, তাহার সবগুলিতেই বিশ্বাস থাকে, অথচ যদি তোমার আত্মবিশ্বাস না থাকে, তবে তোমার কখনই মুক্তি হইবে না। নিজের উপর বিশ্বাস-সম্পন্ন হও—সেই বিশ্বাসবলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও ও বীর্যবান্ হও। ইহাই এখন আমাদের আবশ্যক। আমরা এই ত্রিশ কোটি লোক সহস্র বৎসর যাবৎ যে-কোন মুষ্টিমেয় বিদেশী আমাদের ভূলুণ্ঠিত দেহকে পদদলিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছে, তাহাদেরই পদানত হইয়াছি, কেন? কারণ উহাদের নিজেদের উপর বিশ্বাস আছে—আমাদের তাহা নাই।

আমি পাশ্চাত্যদেশে যাইয়া কি শিখিলাম? খ্রীষ্টীয় ধর্মসম্প্রদায়গুলি যে মানুষকে পতিত ও নিরুপায় পাপী বলিয়া নির্দেশ করে, এই-সকল বাজে কথার অন্তরালে উহাদের জাতীয় উন্নতির কি কারণ দেখিলাম?—দেখিলাম ইওরোপ ও আমেরিকা উভয়ত্র জাতীয় হৃদয়ের অভ্যন্তরে মহান্ আত্মবিশ্বাস নিহিত রহিয়াছে। একজন ইংরেজ বালক তোমাকে বলিবে, 'আমি একজন ইংরেজ—আমি সব করিতে পারি।' আমেরিকান বালকও এই কথা বলিবে—প্রত্যেক ইওরোপীয় বালকই এই কথা বলিবে। আমাদের বালকগণ এই কথা বলিতে পারে কি? না, পারে না; বালকগণ কেন, তাহাদের পিতারা

পর্যন্ত পারে না। আমরা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছি। এই জন্যই বেদান্তের অদ্বৈত-ভাব প্রচার করা আবশ্যক, যাহাতে লোকের হৃদয় জাগ্রত হয়, যাহাতে তাহারা নিজ আত্মার মহিমা জানিতে পারে। এই জন্যই আমি অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া থাকি; আর আমি সাম্প্রদায়িক ভাবে উহা প্রচার করি না—সার্বভৌম ও সর্বজনগ্রাহ্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আমি উহা প্রচার করিয়া থাকি।

এই অদ্বৈতবাদ এমনভাবে প্রচার করা যাইতে পারে—যাহাতে দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরও কোন আপত্তির কারণ থাকিবে না; আর এই-সকল মতের সামঞ্জস্যসাধনও বড় কঠিন নহে। ভারতে এমন কোন ধর্ম নাই—যাহা বলে না যে, ভগবান সকলের ভিতরে রহিয়াছেন। বিভিন্ন মতের বৈদান্তিকগণ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, জীবাত্মার মধ্যে পূর্ব হইতেই পবিত্রতা, বীর্য ও পূর্ণত্ব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে! তবে কাহারও কাহারও মতে এই পূর্ণত্ব যেন কখন কখন সঙ্কুচিত হইয়া যায়, আবার অন্য সময়ে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। তাহা হইলেও সেই পূর্ণত্ব যে আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অদ্বৈতবাদমতে উহা সঙ্কুচিতও হয় না, বিকাশপ্রাপ্তও হয় না, তবে সময়ে সময়ে অপ্রকাশিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে মাত্র। তাহা হইলেও কার্যতঃ দ্বৈতবাদের সহিত ইহা একরূপই দাঁড়াইল। একটি মত অপরটি অপেক্ষা অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু উভয় মতই কার্যতঃ প্রায় একই দাঁড়ায়। এই মূল তত্ত্বটি প্রচার করা জগতের পক্ষে অতি আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে; আর আমাদের এই মাতৃভূমিতে ইহার যত অভাব, আর কোথাও তত নহে।

বন্ধুগণ, আমি তোমাদিগকে গোটাকতক রূঢ় অপ্রিয় সত্য শুনাইতে চাই। সংবাদপত্রে পড়া যায়, আমাদের একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে কোন ইংরেজ খুন করিয়াছে, অথবা কাহারও প্রতি অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করিয়াছে। অমনি সমগ্র দেশে হইচই পড়িয়া গেল; সংবাদপত্রে এই সংবাদ পড়িয়া অশ্রু বিসর্জন করিলাম, কিন্তু পর মুহূর্তেই আমার মনে প্রশ্ন উদিত হইল—এ-সকলের জন্য দায়ী কে? যখন আমি একজন বেদান্তবাদী, তখন আমি নিজেকে ঐ প্রশ্ন না করিয়া থাকিতে পারি না। হিন্দু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন; সে নিজের মধ্যেই সকল বিষয়ের কারণ অনুসন্ধান করে। আমি যখনই আমার মনকে এ বিষয়

জিজ্ঞাসা করি—কে ইহার জন্য দায়ী ? তখন প্রত্যেক বারই আমি এই উত্তর পাইয়া থাকি যে, ইহার জন্য ইংরেজ দায়ী নয়; আমরাই আমাদের দুর্দশা অবনতি ও দুঃখকষ্টের জন্য দায়ী—একমাত্র আমরাই দায়ী।

আমাদের অভিজাত পূর্বপুরুষগণ দেশের সাধারণ লোককে পদদলিত করিতে লাগিলেন—ক্রমশঃ তাহারা একেবারে অসহায় হইয়া পড়িল; অত্যাচারে এই দরিদ্র ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ ভুলিয়া গেল যে তাহারা মানুষ। শত শত শতাব্দী যাবৎ তাহারা বাধ্য হইয়া কেবল কাঠ কাটিয়াছে, আর জল তুলিয়াছে। ক্রমশঃ তাহাদের মনে এই বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা গোলাম হইয়া জন্মিয়াছে—কাঠ কাটিবার ও জল তুলিবার জন্যই তাহাদের জন্ম। আর যদি কেহ তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া দু-একটা কথা বলিতে চায়, তবে আমি দেখিতে পাই, আধুনিক কালের শিক্ষিতাভিমানী আমাদের স্বজাতীয়গণ এই পদদলিত জাতির উন্নতি-সাধনরূপ কর্তব্য কর্মে সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন।

শুধু তাহাই নহে, আরও দেখিতে পাই, উহারা পাশ্চাত্যদেশের বংশানুক্রমিক সংক্রমণ (hereditary transmission) ও সেই ধরনের অন্যান্য কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর মতসহায়ে এমন সব পাশব ও আসুরিক যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে, যাহাতে দরিদ্রগণের উপর অত্যাচার করিবার ও উহাদিগকে আরও পশুপ্রকৃতি করিয়া ফেলিবার অধিকতর সুবিধা হয়। আমেরিকার ধর্মমেলায় অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত একজন নিগ্রো যুবকও আসিয়াছিল, সে খাঁটি আফ্রিকার নিগ্রো। একটি সুন্দর বক্তৃতাও সে দিয়াছিল। ঐ যুবকটির সম্বন্ধে আমার কৌতূহল হইল, আমি তাহার সহিত মধ্যে মধ্যে কথাবার্তা বলিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারিলাম না। কিছুদিন পরে ইংলণ্ডে কয়েকটি আমেরিকানের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়; তাহারা আমাকে ঐ যুবকটির এইরূপ ইতিহাস দিল: এই যুবক মধ্য আফ্রিকার জনৈক নিগ্রো দলপতির পুত্র; কোন কারণে অপর একজন দলপতি ইহার পিতার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হয় এবং তাহাকে ও তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়া তাহাদের মাংস রাঁধিয়া খাইয়া ফেলে। সে এই বালকটিকেও হত্যা করিয়া খাইয়া ফেলিবার আদেশ দিয়াছিল। বালকটি কোনক্রমে পলায়ন করিয়া অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া শত শত ক্রোশ ভ্রমণের পর

সমুদ্রতীরে উপস্থিত হয়, সেখান হইতে একটি আমেরিকান জাহাজে করিয়া আমেরিকায় আসিয়াছে। সেই বালকটি এমন সুন্দর বক্তৃতা করিল! এইরূপ ঘটনা দেখিবার পর বংশানুক্রমিক-সংক্রমণ মতবাদে আর কিরূপে আস্থা থাকিতে পারে?

হে ব্রাহ্মণগণ! যদি বংশানুক্রমিক ভাবসংক্রমণের নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশিক্ষার অধিকতর উপযুক্ত হয়, তবে ব্রাহ্মণের শিক্ষায় অর্থব্যয় না করিয়া চণ্ডালজাতির শিক্ষায় সমুদয় অর্থ ব্যয় কর। দুর্বলকে আগে সাহায্য কর; কারণ দুর্বলকে সাহায্য করাই প্রথম আবশ্যক। যদি ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমান্ হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তবে সে কোনরূপ সাহায্য ছাড়াই শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। যদি অপর জাতি সেইরূপ বুদ্ধিমান্ না হয়, তবে কেবল তাহাদিগকেই শিক্ষা দিতে থাকো—তাহাদিগেরই জন্য শিক্ষক নিযুক্ত কর। আমার তো মনে হয়, ইহাই ন্যায়-ও যুক্তি-সঙ্গত।

এই দরিদ্রগণকে—ভারতের এই পদদলিত জনসাধারণকে তাহাদের স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। জাতিবর্ণনির্বিশেষে সবলতা-দুর্বলতার বিচার না করিয়া প্রত্যেক নরনারীকে, প্রত্যেক বালকবালিকাকে শুনাও শিখাও—সবল-দুর্বল, উচ্চ-নীচনির্বিশেষে সকলেরই ভিতর সেই অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন; সুতরাং সকলেই মহৎ হইতে পারে, সকলেই সাধু হইতে পারে। সকলেরই সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলো—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য-বরান্ নিবোধত'। উঠ, জাগো—যতদিন না চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতেছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না। উঠ জাগো—আপনাদিগকে দুর্বল ভাবিয়া তোমরা যে মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আছ, তাহা দূর করিয়া দাও। কেহই প্রকৃতপক্ষে দুর্বল নহে—আত্মা অনন্ত, সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞ। উঠ, নিজের স্বরূপ প্রকাশিত কর—তোমার ভিতর যে ভগবান রহিয়াছেন, তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কর, তাঁহাকে অস্বীকার করিও না। আমাদের জাতির ভিতর ঘোর আলস্য, দুর্বলতা ও মোহ আসিয়া পড়িয়াছে। হে আধুনিক হিন্দুগণ, মোহজাল ছিন্ন কর। ইহার উপায় তোমাদের শাস্ত্রেই রহিয়াছে। তোমরা নিজ নিজ স্বরূপের চিন্তা কর এবং সর্বসাধারণকে তাহা শিক্ষা দাও। ঘোর মোহনিদ্রায় অভিভূত জীবাত্মার নিদ্রাভঙ্গ কর। আত্মা প্রবুদ্ধ হইলে শক্তি আসিবে, মহিমা আসিবে, সাধুত্ব আসিবে, পবিত্রতা আসিবে—যাহা কিছু ভাল সকলই আসিবে। যদি গীতার মধ্যে কিছু আমার

ভাল লাগে, তবে তাহা এই দুইটি মহাবলপ্রদ শ্লোক—শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের সারস্বরূপ :

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি ॥
সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥[১]

—বিনাশশীল সর্বভূতের মধ্যে অবিনাশী পরমেশ্বরকে যিনি সমভাবে অবস্থিত দেখেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। কারণ, ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া তিনি নিজে নিজেকে হিংসা করেন না, সুতরাং পরমগতি প্রাপ্ত হন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বেদান্ত-প্রচারের দ্বারা এদেশে ও অন্যান্য দেশে যথেষ্ট লোকহিতকর কার্যের প্রবর্তন করা যাইতে পারে। এদেশে এবং অন্যত্র সমগ্র মনুষ্যজাতির দুঃখমোচন ও উন্নতিবিধানের জন্য পরমাত্মার সর্বব্যাপিত্ব ও সর্বত্র সমভাবে অবস্থিতিরূপ অপূর্ব তত্ত্বদ্বয় প্রচার করিতে হইবে। যেখানেই অশুভ, যেখানেই অজ্ঞান দেখা যায়—আমি আমার অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছি এবং আমাদের শাস্ত্রও সে-কথা বলিয়া থাকেন যে, ভেদবুদ্ধি হইতেই সমুদয় অশুভ আসে এবং অভেদবুদ্ধি হইলে, সকল বিভিন্নতার মধ্যে বাস্তবিক এক সত্তা রহিয়াছে—ইহা বিশ্বাস করিলে সর্ববিধ কল্যাণ হইয়া থাকে। ইহাই বেদান্তের মহোচ্চ আদর্শ।

তবে সকল বিষয়েই শুধু আদর্শে বিশ্বাস করা এক কথা, আর দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে সেই আদর্শ অনুযায়ী চলা আর এক কথা। একটি উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া দেওয়া অতি উত্তম, কিন্তু ঐ আদর্শে পৌঁছিবার কার্যকর উপায় কই? এখানে স্বভাবতঃ সেই কঠিন প্রশ্নটি আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহা আজ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া সর্বসাধারণের মনে বিশেষভাবে জাগিতেছে; সেই প্রশ্ন আর কিছুই নহে—জাতিভেদ ও সমাজ-সংস্কার-বিষয়ক সেই পুরাতন সমস্যা। আমি সমাগত শ্রোতৃবর্গের নিকট খোলাখুলি বলিতে চাই যে, আমি একজন জাতিভেদলোপকারী বা সমাজসংস্কারক মাত্র নহি। জাতিভেদ বা

১ গীতা, ১৩।২৮-২৯

সমাজসংস্কার-বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার কিছু করিবার নাই। তুমি যে-কোন জাতির হও, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, তবে তাই বলিয়া তুমি অপর জাতির কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারো না। প্রেম—একমাত্র প্রেমই আমি প্রচার করিয়া থাকি; আর আমার এই উপদেশ বিশ্বাত্মার সর্বব্যাপিত্ব ও সমত্বরূপ বেদান্তের সেই মহান্ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিগত প্রায় একশত বৎসর যাবৎ আমাদের দেশ সমাজ-সংস্কারকগণ ও তাঁহাদের নানাবিধ সমাজসংস্কারসম্বন্ধীয় প্রস্তাবে আচ্ছন্ন হইয়াছে। এই সংস্কারকগণের চরিত্রের বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই। ইঁহাদের অধিকাংশেরই উদ্দেশ্য খুব ভাল এবং কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের উদ্দেশ্য অতি প্রশংসনীয়। কিন্তু ইহাও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এই শতবর্ষব্যাপী সমাজ-সংস্কার-আন্দোলনের ফলে সমগ্র দেশে কোন স্থায়ী শুভ ফল হয় নাই। বক্তৃতামঞ্চ হইতে সহস্র সহস্র বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে—হিন্দুজাতি ও হিন্দু-সভ্যতার মস্তকে অজস্র নিন্দাবাদ ও অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি সমাজের বাস্তবিক কোন উপকার হয় নাই। ইহার কারণ কি? কারণ বাহির করা শক্ত নহে। নিন্দাবাদ ও গালিবর্ষণই—ইহার কারণ। প্রথমতঃ তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদিগকে আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে হইবে। আমি স্বীকার করি, অন্যান্য জাতির নিকট হইতে আমাদিগকে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে; কিন্তু দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে যে, আমাদের অধিকাংশ আধুনিক সংস্কারই পাশ্চাত্য কার্য-প্রণালীর বিচারশূন্য অনুকরণমাত্র। ভারতে ইহা দ্বারা কাজ হইবে না। এই কারণেই আমাদের বর্তমান সংস্কার-আন্দোলনগুলি দ্বারা কোন ফল হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ কাহারও কল্যাণ সাধন করিতে হইলে নিন্দা বা গালিবর্ষণের দ্বারা কোন কাজ হয় না। আমাদের সমাজে যে অনেক দোষ আছে, সামান্য বালকেও তাহা দেখিতে পায়; আর কোন্ সমাজেই বা দোষ নাই?

হে আমার স্বদেশবাসিগণ, এই অবসরে তোমাদিগকে বলিয়া রাখি যে, আমি পৃথিবীর যে-সকল জাতি দেখিয়াছি, সেই বিভিন্ন জাতির সহিত তুলনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি যে, আমাদের 'জাতিই মোটের উপর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর নীতিপরায়ণ ও ধার্মিক'; এবং আমাদের

সামাজিক বিধানগুলির উদ্দেশ্য ও কার্য-প্রণালী বিচার করিলে দেখা যায় যে, সেগুলিই মানবজাতিকে সুখী করিবার সর্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত। এই জন্যই আমি কোন সংস্কার চাহি না; আমার আদর্শ—জাতীয় আদর্শে সমাজের উন্নতি, বিস্তৃতি ও পরিণতি। যখন আমি আমার দেশের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তখন সমগ্র পৃথিবীতে এমন আর একটি দেশ দেখিতে পাই না, যাহা মানব-মনের উন্নতির জন্য এত অধিক কাজ করিয়াছে। এই কারণেই আমি আমার জাতিকে কোনরূপ নিন্দা বা গালাগালি দিই না। আমি বলি—'যাহা করিয়াছ, বেশ হইয়াছে; আরও ভাল করিবার চেষ্টা কর।' এদেশে প্রাচীন কালে অনেক বড় বড় কাজ হইয়াছে, কিন্তু মহত্তর কার্য করিবার এখনও যথেষ্ট সময় ও অবকাশ রহিয়াছে। তোমরা নিশ্চয় জানো, আমরা নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। যদি একস্থানে বসিয়া থাকি, তবে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য। আমাদিগকে হয় সম্মুখে, নয় পশ্চাতে যাইতে হইবে, হয় আমাদিগকে উন্নতি সাধন করিতে হইবে, নতুবা আমাদের অবনতি হইবে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ প্রাচীনকালে বড় বড় কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদিগকে তাঁহাদের অপেক্ষা উচ্চতর জীবনের বিকাশ করিতে হইবে এবং তাঁহাদের অপেক্ষা মহত্তর কর্মের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। এখন পশ্চাতে হটিয়া গিয়া অবনত হওয়া কিরূপে সম্ভব? তাহা হইতেই পারে না; তাহা কখনই হইতে দেওয়া হইবে না। পশ্চাতে হটিলে জাতির অধঃপতন ও মৃত্যু হইবে; অতএব 'অগ্রসর হও এবং মহত্তর কর্মসমূহের অনুষ্ঠান কর'—ইহাই তোমাদের নিকট আমার বক্তব্য।

আমি কোনরূপ সাময়িক সমাজসংস্কারের প্রচারক নহি। আমি সমাজের দোষ-সংশোধনের চেষ্টা করিতেছি না; আমি তোমাদিগকে বলিতেছি—তোমরা অগ্রসর হও এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ সমগ্র মানবজাতির উন্নতির জন্য যে সর্বাঙ্গসুন্দর প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য নিখুঁতভাবে কার্যে পরিণত কর। তোমাদের নিকট আমার কেবল ইহাই বক্তব্য যে, তোমরা সমগ্র মনুষ্যজাতির একত্ব ও মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্ব—এই বৈদান্তিক আদর্শ উত্তরোত্তর অধিকতর উপলব্ধি করিতে থাকো। যদি আমার সময় থাকিত, তবে আমি তোমাদিগকে আনন্দের সহিত দেখাইয়া দিতাম যে, এখন আমাদিগকে যাহা করিতে হইবে,

তাহার প্রত্যেকটি আমাদের প্রাচীন স্মৃতিকারেরা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বেই বলিয়া গিয়াছেন, এবং এখন আমাদের জাতীয় আচার-ব্যবহারে যে-সকল পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও ঘটিবে, সেগুলিও তাঁহারা যথার্থই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারাও জাতিভেদলোপকারী ছিলেন, তবে আধুনিকদিগের মতো নহে। তাঁহারা জাতিভেদরাহিত্য অর্থে বুঝিতেন না যে, শহরের সব লোক মিলিয়া একত্র মদ্যমাংস আহার করুক, অথবা যত আহাম্মক ও পাগল মিলিয়া যখন যেখানে যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করুক, আর দেশটাকে একটা পাগলা-গারদে পরিণত করুক; অথবা তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করিতেন না যে, বিধবাগণের পতির সংখ্যানুসারে কোন জাতির উন্নতির পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে। এরূপ করিয়া উন্নত হইয়াছে—এমন জাতি তো আমি আজ পর্যন্ত দেখি নাই।

ব্রাহ্মণই আমাদের পূর্বপুরুষগণের আদর্শ ছিলেন। আমাদের সকল শাস্ত্রেই এই ব্রাহ্মণের আদর্শ চরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। ইওরোপের শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যগণ পর্যন্ত নিজেদের পূর্বপুরুষগণ যে সম্ভ্রান্ত বংশের ছিলেন, ইহা প্রমাণ করিতে সহস্রমুদ্রা ব্যয় করিতেছেন, এবং যতক্ষণ না তাঁহারা প্রমাণ করিতে পারেন যে, পর্বতনিবাসী পথিকের সর্বস্ব-লুণ্ঠনকারী কোন ভয়ঙ্কর অত্যাচারী ব্যক্তি তাঁহাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহারা কিছুতেই শান্তি পান না। অপর দিকে আবার ভারতের বড় বড় রাজবংশধরগণ কৌপীনধারী অরণ্যবাসী ফলমূলাহারী বেদাধ্যায়ী কোন প্রাচীন ঋষি হইতে তাঁহাদের বংশের উৎপত্তি—ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। এখানে যদি তুমি কোন প্রাচীন ঋষিকে তোমার পূর্বপুরুষরূপে প্রতিপন্ন করিতে পারো, তবে তুমি উচ্চজাতীয় হইলে, নতুবা নহে। সুতরাং আমাদের আভিজাত্যের আদর্শ অন্যান্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। আধ্যাত্মিক-সাধনসম্পন্ন ও মহাত্যাগী ব্রাহ্মণই আমাদের আদর্শ। 'ব্রাহ্মণ আদর্শ' আমি কি অর্থে বুঝিতেছি?—যাহাতে সাংসারিকতা একেবারে নাই এবং প্রকৃত জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে বর্তমান, তাহাই আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব। ইহাই হিন্দুজাতির আদর্শ। তোমরা কি শোন নাই যে, শাস্ত্রে লিখিত আছে—ব্রাহ্মণের পক্ষে কোন বিধিনিষেধ নাই, তিনি রাজার শাসনাধীন নহেন, তাঁহার বধদণ্ড নাই? এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য। স্বার্থপর অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে-ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছে, অবশ্য সে-ভাবে বুঝিও না;

প্রকৃত মৌলিক বৈদান্তিক ভাবে ইহা বুঝিবার চেষ্টা কর। যদি ব্রাহ্মণ বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি স্বার্থপরতা একেবারে বিসর্জন দিয়াছেন, যাঁহার জীবন জ্ঞান-প্রেম লাভ করিতে ও উহা বিস্তার করিতেই নিযুক্ত—কেবল এইরূপ ব্রাহ্মণ ও সংস্বভাব ধর্মপরায়ণ নরনারীদের দ্বারা যে-দেশ অধ্যুষিত, সে-জাতি ও সে-দেশ যে সর্বপ্রকার বিধিনিষেধের অতীত হইবে, এ আর আশ্চর্য কথা কি! এবংবিধ জনগণের শাসনের জন্য আর সৈন্যসামন্ত পুলিস প্রভৃতির কি প্রয়োজন? তাঁহাদিগকে কাহারও শাসন করিবার কি প্রয়োজন? তাঁহাদের কোন প্রকার শাসনতন্ত্রের অধীনে বাস করিবারই বা কি প্রয়োজন?

তাঁহারা সাধুপ্রকৃতি মহাত্মা—তাঁহারা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গস্বরূপ। আর আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই—সত্যযুগে একমাত্র এই ব্রাহ্মণ-জাতিই ছিলেন। আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই—প্রথমে পৃথিবীর সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন; ক্রমে যতই তাঁহাদের অবনতি হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন; আবার যখন যুগচক্র ঘুরিয়া সেই সত্যযুগের অভ্যুদয় হইবে, তখন আবার সকলেই ব্রাহ্মণ হইবেন। সম্প্রতি যুগচক্র ঘুরিয়া সত্যযুগের অভ্যুদয় সূচিত হইতেছে—আমি তোমাদের দৃষ্টি এ-বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি। সুতরাং উচ্চবর্ণকে নিম্ন করিয়া, আহার-বিহারে যথেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়া, কিঞ্চিৎ ভোগ-সুখের জন্য স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া জাতিভেদ-সমস্যার মীমাংসা হইবে না; পরন্তু আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যদি বৈদান্তিক ধর্মের নির্দেশ পালন করে, প্রত্যেকেই যদি ধার্মিক হইবার চেষ্টা করে, প্রত্যেকেই যদি আদর্শ ব্রাহ্মণ হয়, তবেই এই জাতিভেদ-সমস্যার সমাধান হইবে। তোমরা আর্য, অনার্য, ঋষি, ব্রাহ্মণ অথবা অতি নীচ অন্ত্যজ জাতি—যাহাই হও, ভারতবাসী সকলেরই প্রতি তোমাদের পূর্বপুরুষগণের এক মহান্ আদেশ রহিয়াছে। তোমাদের সকলের প্রতিই এই এক আদেশ, সে আদেশ এই—'চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, ক্রমাগত উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। উচ্চতম জাতি হইতে নিম্নতম পারিয়া (চণ্ডাল) পর্যন্ত সকলকেই আদর্শ ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।' বেদান্তের এই আদর্শ শুধু যে ভারতেই খাটিবে তাহা নহে—সমগ্র পৃথিবীকে এই আদর্শ অনুযায়ী গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের জাতিভেদের ইহাই লক্ষ্য। ইহার উদ্দেশ্য—ধীরে ধীরে সমগ্র মানবজাতি যাহাতে আদর্শ ধার্মিক হয়—অর্থাৎ ক্ষমা ধৃতি শৌচ শান্তিতে

পূর্ণ হয়, উপাসনা ও ধ্যান-পরায়ণ হয়। এই আদর্শ অবলম্বন করিলেই মানব-জাতি ক্রমশঃ ঈশ্বর লাভ করিতে পারে।

এই উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার উপায় কি? তোমাদিগকে আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, অভিশাপ নিন্দা ও গালিবর্ষণের দ্বারা কোন সৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। অনেক বর্ষ ধরিয়া তো ঐরূপ চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন সুফল হয় নাই। কেবল ভালবাসা ও সহানুভূতি দ্বারাই সুফলপ্রাপ্তির আশা করা যাইতে পারে। কি উপায়ে এই মহান্ উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করা যায়, ইহা একটি গুরুতর সমস্যা। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আমি যাহা করিতে চাই এবং ঐ-বিষয়ে দিন দিন আমার মনে যে-সকল নূতন নূতন ভাব উদিত হইতেছে, সেগুলি বিস্তারিতভাবে বলিতে গেলে আমাকে একাধিক বক্তৃতা দিতে হইবে। অতএব আজ এখানেই বক্তৃতার উপসংহার করিব।

হিন্দুগণ! তোমাদিগকে কেবল ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমাদের এই মহান্ জাতীয় অর্ণবপোত শত শতাব্দী যাবৎ হিন্দুজাতিকে পারাপার করিতেছে। সম্ভবতঃ আজকাল উহাতে কয়েকটি ছিদ্র হইয়াছে—হয়তো উহা কিঞ্চিৎ জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে আমাদের ভারতমাতার সকল সন্তানেরই এই ছিদ্রগুলি বন্ধ করিয়া পোতের জীর্ণসংস্কার করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। আমাদের স্বদেশবাসী সকলকে এই বিপদের কথা জানাইতে হইবে—তাহারা জাগ্রত হউক, তাহারা এদিকে মনঃসংযোগ করুক। আমি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে দেশবাসীকে ডাকিয়া জাগ্রত করিব, নিজেদের অবস্থা বুঝিয়া কর্তব্য সাধন করিতে তাহাদিগকে আহ্বান করিব। মনে কর, লোকে আমাব কথা অগ্রাহ্য করিল, তথাপি আমি তাহাদিগকে গালি বা অভিশাপ দিব না। আমাদের জাতি অতীতকালে মহৎ কর্মসমূহ সম্পাদন করিয়াছে। যদি ভবিষ্যতে আমরা মহত্তর কার্য করিতে না পারি, তবে এই সান্ত্বনা লাভ করিব যে, আমরা যেন একসঙ্গে শান্তিতে ডুবিয়া মরিতে পারি।

স্বদেশহিতৈষী হও—যে-জাতি অতীতকালে আমাদের জন্য এত বড় বড় কাজ করিয়াছে, সেই জাতিকে প্রাণের সহিত ভালবাসো। আমার স্বদেশবাসিগণ! যতই আমাদের জাতির সহিত অপর জাতির তুলনা করি, ততই তোমাদের প্রতি আমার অধিকতর ভালবাসার সঞ্চার হয়। তোমরা শুদ্ধ, শান্ত,

সৎস্বভাব। আর তোমরাই চিরকাল অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াছ—এই মায়াময় জগতে ইহাই মহা প্রহেলিকা। তাহা হউক, তোমরা উহা গ্রাহ্য করিও না—পরিণামে আধ্যাত্মিকতার জয় হইবেই হইবে। ইত্যবসরে আমাদিগকে কার্য করিতে হইবে, কেবল দেশবাসীর নিন্দা করিলে চলিবে না। আমাদের এই পরম পবিত্র মাতৃভূমির কালজীর্ণ আচার ও প্রথাসকলের নিন্দা করিও না; অতি কুসংস্কারপূর্ণ ও অযৌক্তিক প্রথাগুলির বিরুদ্ধেও একটি নিন্দাসূচক কথা বলিও না, কারণ সেগুলি দ্বারাও অতীতে আমাদের কিছু না কিছু কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। সর্বদা মনে রাখিও, আমাদের সামাজিক প্রথাগুলির উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, পৃথিবীর আর কোন দেশের প্রথাই সেরূপ নহে। আমি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই জাতিভেদ দেখিয়াছি, কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, অন্য কোথাও সেরূপ নহে। অতএব যখন জাতিভেদ অনিবার্য, তখন অর্থগত জাতিভেদ অপেক্ষা পবিত্রতাসাধন ও আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদ বরং ভাল বলিতে হইবে।

অতএব নিন্দাবাদ একেবারে পরিত্যাগ কর। তোমাদের মুখ বন্ধ হউক, হৃদয় খুলিয়া যাক। এই দেশের এবং সমগ্র জগতের উদ্ধারসাধন কর। তোমাদের প্রত্যেককেই ভাবিতে হইবে যে, সমুদয় ভার তোমারই উপর। বেদান্তের আলোক প্রতি গৃহে লইয়া যাও, প্রতি গৃহে বেদান্তের আদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠিত হউক—প্রত্যেক জীবাত্মায় যে ঈশ্বরত্ব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহা জাগ্রত কর। তাহা হইলেই—তোমার সফলতার পরিমাণ যতটুকুই হউক না কেন—তোমার মনে এই সন্তোষ আসিবে যে, তুমি মহৎকার্যের জন্য জীবনযাপন করিয়াছ এবং মহৎকার্যে প্রাণ দিয়াছ। যেরূপেই হউক, এই মহৎকার্য সাধিত হইলেই ইহলোকে মানবজাতির কল্যাণ হইবে।

মাদ্রাজ অভিনন্দনের উত্তর

মাদ্রাজের জনসাধারণ, বিশেষভাবে যুবকগণ, স্বামীজীকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করেন। গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া দিয়া যুবকগণ নিজেরাই গাড়ি টানিয়া লইয়া যায়। 'কার্নান ক্যাসলে' স্বামীজী কয়েকদিন অবস্থান করেন। মাদ্রাজ অভ্যর্থনা সমিতির এবং খেতড়ি-মহারাজার পক্ষ হইতে দুইটি পৃথক্ অভিনন্দন-পত্র প্রদত্ত হয়। এইগুলির উত্তরে স্বামীজী বিভিন্ন দিবসে ছয়টি বক্তৃতা দেন।

ভদ্রমহোদয়গণ,

একটা কথা আছে—মানুষ নানাবিধ সঙ্কল্প করে, কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে যাহা ঘটিবার, তাহাই ঘটিয়া থাকে। ব্যবস্থা হইয়াছিল, অভ্যর্থনা ইংরেজী ধরনে হইবে। কিন্তু এখানে ঈশ্বরের বিধানে কার্য হইতেছে—গীতার ধরনে আমি রথ হইতে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে বক্তৃতা করিতেছি। এরূপ ঘটনার জন্য, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি। ইহাতে বক্তৃতার জোর হইবে, তোমাদিগকে যাহা বলিতে যাইতেছি, সেই কথাগুলির ভিতর একটা শক্তি আসিবে। জানি না, আমার কণ্ঠস্বর তোমাদের সকলের নিকট পৌঁছিবে কি না, তবে আমি যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিব। ইহার পূর্বে আর কখনও আমার খোলা ময়দানে এত বড় সভায় বক্তৃতা করিবার সুযোগ হয় নাই।

কলম্বো হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত লোকে আমার প্রতি যেরূপ অপূর্ব সহৃদয়তা দেখাইয়াছে, যেরূপ পরম আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে আমার অভ্যর্থনা করিয়াছে এবং সমগ্র ভারতবাসীই যেরূপ অভ্যর্থনা করিবে বলিয়া বোধ হইতেছে, আমি কল্পনায়ও এরূপ আশা করি নাই। কিন্তু ইহাতে আমার আনন্দই হইতেছে; কারণ ইহা দ্বারা পূর্বে বার বার আমি যাহা বলিয়াছি, সেই কথারই সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে,—প্রত্যেক জাতিরই জীবনীশক্তি এক একটি বিশেষ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক জাতিই একটি বিশেষ নির্দিষ্ট পথে চলিয়া থাকে, আর ধর্মই ভারতবাসীর সেই বিশেষত্ব। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বহু কার্যের মধ্যে ধর্ম একটি; প্রকৃতপক্ষে উহা জীবনের অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র অধিকার করিয়া থাকে। যথা ইংলণ্ডে ধর্ম জাতীয় জীবন-নীতির অংশ মাত্র। ইংলিশ চার্চ ইংলণ্ডের রাজবংশের অধিকারভুক্ত, সুতরাং ইংরেজরা

উহাতে বিশ্বাস করুক বা নাই করুক, নিজেদের চার্চ মনে করিয়া তাহারা উহার পোষকতা ও ব্যয়নির্বাহ করিয়া থাকে। প্রত্যেক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারই উক্ত চার্চের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক, উহা ভদ্রতার পরিচায়ক। অন্যান্য দেশ সম্বন্ধেও একই কথা। যেখানেই কোন প্রবল জাতীয় শক্তি দেখা যায়, উহা—হয় রাজনীতি অথবা বিদ্যাচর্চা অথবা সমরনীতি অথবা বাণিজ্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর যাহার উপর সেই শক্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহাতেই সেই জাতির প্রাণস্পন্দন অনুভূত হইয়া থাকে। সেইটিই তাহার মুখ্য জিনিস; ইহা ছাড়া তাহার অনেক গৌণ পোশাকী জিনিস আছে—ধর্ম ঐগুলির অন্যতম।

এখানে—এই ভারতে ধর্ম জাতীয় হৃদয়ের মর্মস্থল। এই ভিত্তির উপরই জাতীয় প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতি, ক্ষমতা, এমন কি বিদ্যাবুদ্ধির চর্চাও এখানে গৌণমাত্র; সুতরাং ধর্মই এখানকার একমাত্র কার্য, একমাত্র চিন্তা। ভারতীয় জনসাধারণ জগতের কোন সংবাদ রাখে না, শত শতবার আমি এ কথা শুনিয়াছি—কথাটি সত্য। কলম্বোয় যখন নামিলাম তখন দেখিলাম, ইওরোপে যে-সকল গুরুতর রাজনীতিক পরিবর্তন ঘটিতেছে, যথা মন্ত্রিসভার পতন প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণ লোক কোন সংবাদ রাখে না। তাহাদের মধ্যে একজনও সোশ্যালিজম্ (Socialism) এনার্কিজম্ (Anarchism) প্রভৃতি শব্দের এবং ইওরোপে রাজনীতিক ক্ষেত্রে যে বিশেষ বিশেষ পরিবর্তন ঘটিতেছে, সেই সেই পরিবর্তনসূচক শব্দগুলির অর্থ জানে না। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে চিকাগোর ধর্ম-মহাসভায় একজন সন্ন্যাসী প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং তিনি কতকটা কৃতকার্যও হইয়াছেন, এ-কথা সিংহলের আবালবৃদ্ধবনিতা শুনিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, তাহাদের সংবাদ সংগ্রহ করিবার আগ্রহের অভাব নাই, তবে সেই সংবাদ তাহাদের উপযোগী হওয়া চাই, তাহাদের জীবনযাত্রায় যে-সকল বিষয় অত্যাবশ্যক, তদনুযায়ী কিছু হওয়া চাই। রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় কখনও ভারতীয় জীবনের অত্যাবশ্যক বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয় নাই, কেবল ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বলেই ভারত চিরকাল বাঁচিয়া আছে ও উন্নতি করিয়াছে এবং উহারই সাহায্যে ভবিষ্যতে বাঁচিয়া থাকিবে।

পৃথিবীর সকল জাতি দুইটি বড় সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত। ভারত উহার মধ্যে একটির এবং অন্যান্য জাতি অপরটির মীমাংসায় নিযুক্ত। এখন প্রশ্ন

এই—এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি জয়ী হইবে? কিসে জাতিবিশেষ দীর্ঘ জীবন লাভ করে, কিসেই বা কোন জাতি অতি শীঘ্র বিনাশপ্রাপ্ত হয়? জীবনসংগ্রামে প্রেমের জয় হইবে, না ঘৃণার?—ভোগের জয় হইবে, না ত্যাগের?—জড় জয়ী হইবে, না চৈতন্য জয়ী হইবে? এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক যুগের অনেক পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, আমাদেরও বিশ্বাস সেইরূপ। ঐতিহ্যও যে অতীতের ঘনান্ধকার ভেদ করিতে অসমর্থ, সেই অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের মহিমময় পূর্ব-পুরুষগণ এই সমস্যাপূরণে অগ্রসর হইয়াছেন এবং পৃথিবীর নিকট তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া উহার সত্যতা খণ্ডন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। আমাদের সিদ্ধান্ত এই—ত্যাগ, প্রেম ও অপ্রতিকারই জগতে জয়ী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইন্দ্রিয়সুখের বাসনা যে-জাতি ত্যাগ করিয়াছে, সেই জাতিই দীর্ঘজীবী হইতে পারে। প্রমাণস্বরূপ দেখ—ইতিহাস প্রতি শতাব্দীতেই অসংখ্য নূতন নূতন জাতির উৎপত্তি ও বিনাশের কথা আমাদিগকে জানাইতেছে,—শূন্য হইতে উহাদের উদ্ভব, কিছুদিনের জন্য পাপের খেলা খেলিয়া আবার তাহারা শূন্যে বিলীন হইতেছে। কিন্তু এই মহান্‌ জাতি অনেক দুরদৃষ্ট বিপদ ও দুঃখের ভার, যাহা পৃথিবীর অপর কোন জাতিকে ভোগ করিতে হয় নাই, তাহা সত্ত্বেও জীবিত রহিয়াছে; কারণ এই জাতি ত্যাগের পথ অবলম্বন করিয়াছে; আর ত্যাগ ব্যতীত ধর্ম কি করিয়া থাকিতে পারে?

ইওরোপ এই সমস্যার অপর দিকটি মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছে—মানুষ কতদূর ভোগ করিতে পারে, ভালমন্দ যে-কোন উপায়ে মানুষ কত অধিক ক্ষমতা লাভ করিতে পারে। নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, সহানুভূতিশূন্য প্রতিযোগিতাই ইওরোপের মূলমন্ত্র। আমরা কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম দ্বারা এই সমস্যা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছি—এই বর্ণাশ্রমধর্ম প্রতিযোগিতা নষ্ট করে, তাহার শক্তিকে খর্ব করে, উহার নিষ্ঠুরতা হ্রাস করে; বর্ণাশ্রম দ্বারাই এই রহস্যময় জীবনের মধ্য দিয়া মানবাত্মার গমনপথ সরল ও মসৃণ হইয়া থাকে।

এই সময় জনতা নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে, সকলে স্বামীজীর কথা শুনিতে না পাওয়ায় তিনি এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন:

বন্ধুগণ, আমি তোমাদের অদ্ভুত উৎসাহ দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। মনে করিও না, আমি তোমাদের প্রতি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইতেছি ; বরং তোমাদের উৎসাহ-প্রকাশে আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি ; ইহাই চাই—প্রবল উৎসাহ। তবে ইহাকে স্থায়ী করিতে হইবে—সযত্নে ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে ; এই উৎসাহাগ্নি যেন কখনও নিবিয়া না যায়। আমাদিগকে ভারতে বড় বড় কাজ করিতে হইবে। তাহার জন্য আমি তোমাদের সাহায্য চাই। এইরূপ উৎসাহ আবশ্যক। আর সভার কার্য চলা অসম্ভব। তোমাদের সদয় ব্যবহার ও সাগ্রহ অভ্যর্থনার জন্য আমি তোমাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। আমরা অন্য সময় ধীর-স্থিরভাবে পরস্পর চিন্তা-বিনিময় করিব। বন্ধুগণ, এখন বিদায়।

তোমরা সকলে শুনিতে পাও, এইভাবে বক্তৃতা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং আজ অপরাহ্নে আমাকে দেখিয়াই তোমাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। বক্তৃতা সুবিধামত অন্য সময়ে—ভবিষ্যতে হইবে। তোমাদের উৎসাহ ও অভ্যর্থনার জন্য তোমাদিগকে আবার ধন্যবাদ দিতেছি।

আমার সমরনীতি

[মাদ্রাজের ভিক্টোরিয়া হলে প্রদত্ত]

সেদিন অত্যধিক লোকসমাগমের দরুন বক্তৃতায় বেশী অগ্রসর হইতে পারি নাই, সুতরাং আজ এই অবসরে আমি মাদ্রাজবাসিগণের নিকট বরাবর যে সদয় ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছি, সেজন্য তাঁহাদিগেকে ধন্যবাদ দিতেছি। অভিনন্দন-পত্রগুলিতে আমার প্রতি যে-সকল সুন্দর সুন্দর বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার জন্য আমি কিভাবে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব জানি না, তবে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে ঐ বিশেষণগুলির যোগ্য করেন, আর আমি যেন সারা জীবন আমাদের ধর্ম ও মাতৃভূমির সেবা করিতে পারি। প্রভু যেন আমাকে এই কার্যের যোগ্য করেন।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার মনে হয়, অনেক দোষ-ত্রুটিসত্ত্বেও আমার কিছুটা সাহস আছে। ভারত হইতে পাশ্চাত্যদেশে আমার কিছু বার্তা বহন করিবার ছিল—আমি নির্ভীকচিত্তে মার্কিন ও ইংরেজ জাতির নিকট সেই বার্তা বহন

করিয়াছি। অগ্যকার বিষয় আরম্ভ করিবার পূর্বে আমি তোমাদের সকলের নিকট সাহসপূর্বক গোটাকতক কথা বলিতে চাই। কিছুদিন যাবৎ কতকগুলি ব্যাপার এমন দাঁড়াইতেছে যে, ঐ-গুলির জন্য আমার কাজে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিতেছে। এমন কি, সম্ভব হইলে আমাকে একেবারে পিষিয়া ফেলিয়া আমার অস্তিত্ব উড়াইয়া দিবার চেষ্টাও চলিয়াছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই-সব চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে—আর এইরূপ চেষ্টা চিরদিনই বিফল হইয়া থাকে। গত তিন বৎসর যাবৎ দেখিতেছি, জনকয়েক ব্যক্তির আমার ও আমার কার্য সম্বন্ধে কিছুটা ভ্রান্ত ধারণা হইয়াছে। যতদিন বিদেশে ছিলাম ততদিন চুপ করিয়াছিলাম, এমন কি একটি কথাও বলি নাই। কিন্তু এখন মাতৃভূমিতে দাঁড়াইয়া এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বুঝাইয়া বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। এ কথাগুলির কি ফল হইবে, তাহা আমি গ্রাহ্য করি না, এ কথাগুলি বলার দরুন তোমাদের হৃদয়ে কি ভাবের উদ্রেক হইবে, তাহাও গ্রাহ্য করি না। লোকের মতামত আমি কমই গ্রাহ্য করিয়া থাকি। চার বৎসর পূর্বে দণ্ড-কমণ্ডলু-হস্তে সন্ন্যাসিবেশে তোমাদের শহরে প্রবেশ করিয়াছিলাম—আমি সেই সন্ন্যাসীই আছি। সারা দুনিয়া আমার সামনে এখনও পড়িয়া আছে। আর অধিক ভূমিকার প্রয়োজন নাই—এখন আমার বক্তব্য বিষয় বলিতে আরম্ভ করি।

প্রথমতঃ থিওজফিক্যাল সোসাইটি (Theosophical Society) সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। বলাই বাহুল্য যে, উক্ত সোসাইটির দ্বারা ভারতে কিছু কাজ হইয়াছে। এ কারণে প্রত্যেক হিন্দুই ইহার নিকট, বিশেষতঃ মিসেস বেস্যান্টের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। মিসেস বেস্যাণ্ট সম্বন্ধে যদিও আমার অল্পই জানা আছে, তথাপি আমি যতটুকু জানি, তাহাতেই নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে, তিনি আমাদের মাতৃভূমির একজন অকপট শুভাকাঙ্ক্ষিণী, আর সাধ্যানুসারে তিনি প্রাণপণ আমাদের দেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ইহার জন্য প্রত্যেক যথার্থ ভারতসন্তান তাঁহার প্রতি চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ; তাঁহার ও তৎসম্পর্কীয় সকলের উপরেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ চিরকাল বর্ষিত হউক। কিন্তু এ এক কথা, আর থিওজফিস্টদের সোসাইটিতে যোগ দেওয়া আর এক কথা। ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসা এক কথা, আর কোন ব্যক্তি যাহা কিছু বলিবে তর্কযুক্তি না করিয়া, বিচার না করিয়া বিনা বিশ্লেষণে সবই গিলিয়া ফেলা আর এক কথা।

একটা কথা চারিদিকে প্রচারিত হইতেছে যে, আমি আমেরিকা ও ইংলণ্ডে যে সামান্য কাজ করিয়াছি, থিওজফিস্টগণ তাহাতে আমার সহায়তা করিয়াছিলেন। আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, এ-কথা সর্বৈব মিথ্যা। এই জগতে উদার ভাব এবং 'মতভেদ সত্ত্বেও সহানুভূতি'-সম্বন্ধে আমরা অনেক লম্বা লম্বা কথা শুনিতে পাই। বেশ কথা, কিন্তু আমরা কার্যতঃ দেখিতে পাই, যতক্ষণ একজন অপর ব্যক্তির সব কথায় বিশ্বাস করে, ততক্ষণই ঐ ব্যক্তি তাহার প্রতি সহানুভূতি করিয়া থাকে। যখনই সে তাহার সহিত কোন বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী হইতে সাহসী হয়, তখনই সেই সহানুভূতি চলিয়া যায়, ভালবাসা উড়িয়া যায়।

আরও অনেকে আছে, তাহাদের নিজেদের এক একটা স্বার্থ আছে। যদি কোন দেশে এমন কিছু ব্যাপার ঘটে, যাহাতে তাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগে, তবে তাহাদের ভিতর প্রভূত ঈর্ষা ও ঘৃণার আবির্ভাব হয়; তাহারা তখন কি করিবে, কিছুই ভাবিয়া পায় না। হিন্দুরা নিজেদের ঘর নিজেরা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে খ্রীষ্টান মিশনরীদের ক্ষতি কি? হিন্দুরা প্রাণপণে নিজেদের সংস্কারসাধনের চেষ্টা করিতেছে—তাহাতে ব্রাহ্মসমাজ ও অন্যান্য সংস্কার-সভাগুলির কি অনিষ্ট হইবে? ইঁহারা কেন হিন্দুদের সংস্কার-চেষ্টার বিরোধী হইবেন? ইঁহারা কেন এইসব আন্দোলনের প্রবলতম শত্রু হইয়া দাঁড়াইবেন? 'কেন?'—আমি এই প্রশ্ন করিতেছি। আমার বোধ হয়, তাঁহাদের ঘৃণা ও ঈর্ষার পরিমাণ এত অধিক যে, এ-বিষয়ে তাঁহাদের নিকট কোনরূপ প্রশ্ন করা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

প্রথমে থিওজফিস্টদের কথা বলি। চার বৎসর পূর্বে যখন থিওজফিক্যাল সোসাইটির নেতার নিকট গমন করি—তখন আমি একজন দরিদ্র অপরিচিত সন্ন্যাসী মাত্র, একজনও বন্ধু-বান্ধব নাই, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আমাকে আমেরিকায় যাইতে হইবে, কিন্তু কাহারও নামে লিখিত কোন প্রকার পরিচয়পত্র নাই। আমি স্বভাবতই ভাবিয়াছিলাম, ঐ নেতা যখন একজন মার্কিন এবং ভারতপ্রেমিক, তখন সম্ভবতঃ তিনি আমাকে আমেরিকায় কাহারও নিকট পরিচয়পত্র দিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার নিকট গিয়া ঐরূপ পরিচয়পত্র প্রার্থনা করায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি আমাদের সোসাইটিতে যোগ দিবে?' আমি উত্তর দিলাম, 'না, আমি কিরূপে আপনাদের সোসাইটিতে

যোগ দিতে পারি? আমি আপনাদের অনেক মতই যে বিশ্বাস করি না।' 'তবে যাও, তোমার জন্য আমি কিছু করিতে পারিব না।' ইহাই কি আমার পথ করিয়া দেওয়া? আমার থিওজফিস্ট বন্ধুগণের কেহ যদি এখানে থাকেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ইহাই কি আমার পথ করিয়া দেওয়া?

যাহা হউক, আমি মাদ্রাজের কয়েকটি বন্ধুর সাহায্যে আমেরিকায় পৌঁছিলাম। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখানে উপস্থিত আছেন, কেবল একজনকে অনুপস্থিত দেখিতেছি—বিচারপতি সুব্রহ্মণ্য আয়ার। আর আমি এই সভায় উক্ত ভদ্রমহোদয়ের প্রতি আমার গভীরতম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি, তাঁহার মধ্যে প্রতিভাশালী পুরুষের অন্তর্দৃষ্টি বিদ্যমান, আর এ জীবনে তাঁহার ন্যায় বিশ্বাসী বন্ধু আমি পাই নাই—তিনি ভারতমাতার একজন যথার্থ সুসন্তান। যাহা হউক, আমি আমেরিকায় পৌঁছিলাম। টাকা আমার নিকট অতি অল্পই ছিল—আর ধর্মমহাসভা বসিবার পূর্বেই সব খরচ হইয়া গেল। এদিকে শীত আসিতেছে। আমার শুধু গ্রীষ্মোপযোগী পাতলা বস্ত্রখানি ছিল। একদিন আমার হাত হিমে আড়ষ্ট হইয়া গেল। এই ঘোরতর শীতপ্রধান দেশে আমি যে কি করিব, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। কারণ যদি রাস্তায় ভিক্ষায় বাহির হই, তবে আমাকে জেলে পাঠাইয়া দিবে। তখন আমার নিকট শেষ সম্বল কয়েকটি ডলার মাত্র ছিল। আমি মাদ্রাজে কয়েকটি বন্ধুর নিকট তার করিলাম। থিওজফিস্টরা এই ব্যাপারটি জানিতে পারিলেন; তাঁহাদের মধ্যে একজন লিখিয়াছিলেন, 'শয়তানটা শীঘ্র মরিবে—ঈশ্বরেচ্ছায় বাঁচা গেল।' ইহাই কি আমার জন্য পথ করিয়া দেওয়া?

আমি এখন এ-সব কথা বলিতাম না, কিন্তু হে আমার স্বদেশবাসিগণ, আপনারা জোর করিয়া ইহা বাহির করিলেন। আমি তিন বৎসর এ-বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করি নাই। নীরবতাই আমার মূলমন্ত্র ছিল, কিন্তু আজ ইহা বাহির হইয়া পড়িল। শুধু তাহাই নহে, আমি ধর্মমহাসভায় কয়েকজন থিওজফিস্টকে দেখিলাম। আমি তাঁহাদের সহিত কথা কহিতে—তাঁহাদের সহিত মিশিতে চেষ্টা করিলাম। তাঁহারা প্রত্যেকেই যে-অবজ্ঞাদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন, তাহা এখনও আমার স্মরণ আছে। তাঁহাদের সেই অবজ্ঞা-দৃষ্টিতে যেন প্রকাশ পাইতেছিল—'এ একটা ক্ষুদ্র কীট; এ আবার দেবতার

মধ্যে কিরূপে আসিল ?' ইহাতে কি আমার পথ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল —বলুন, হইয়াছিল কি ?

অতঃপর ধর্মমহাসভায় আমার নামযশ হইল। তখন হইতে প্রচণ্ড কার্যের সূত্রপাত হইল। যে-শহরেই আমি যাই, সেখানেই এই থিওজফিস্টরা আমাকে দাবাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সদস্যগণকে আমার বক্তৃতা শুনিতে আসিতে নিষেধ করা হইত, আমার বক্তৃতা শুনিতে আসিলেই তাহারা সোসাইটির সহানুভূতি হারাইবে। কারণ ঐ সোসাইটির এসোটেরিক (গুপ্ত-সাধনা) বিভাগের মত এই—যে-কেহ উহাতে যোগ দিবে, তাহাকে কেবলমাত্র কুথুমি ও মোরিয়াঁর—তাঁহারা যাহাই হউন, তাঁহাদের নিকট হইতেই শিক্ষা লইতে হইবে। অবশ্য ইঁহারা অপ্রত্যক্ষ, আর ইঁহাদের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি—মিঃ জজ্ ও মিসেস বেস্যান্ট। সুতরাং এসোটেরিক বিভাগে যোগ দেওয়ার অর্থ এই যে, নিজের স্বাধীন চিন্তা একেবারে বিসর্জন দিয়া সম্পূর্ণভাবে ইঁহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করা। অবশ্য আমি কখনই এরূপ করিতে পারিতাম না, আর যে-ব্যক্তি এরূপ করে, তাহাকেও হিন্দু বলিতে পারি না।

তারপর থিওজফিস্টদের নিজেদের ভিতরই গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। পরলোকগত মিঃ জজের উপর আমার খুব শ্রদ্ধা আছে। তিনি একজন গুণবান্, সরল, অকপট প্রতিপক্ষ ছিলেন; আর লোকটি থিওজফিস্টদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তাঁহার সহিত মিসেস বেস্যান্টের যে বিরোধ হইয়াছিল, তাহাতে আমার কোনরূপ রায় দিবার অধিকার নাই, কারণ উভয়েই নিজ নিজ 'মহাত্মা'র বাক্যকে সত্য বলিয়া দাবি করিতেছেন। আর ইহার মধ্যে আশ্চর্যের বিষয় এইটুকু যে, উভয়েই একই মহাত্মাকে দাবি করিতেছেন। ঈশ্বর জানেন, সত্য কি; তিনিই একমাত্র বিচারক, আর যেখানে উভয়ের পক্ষেই যুক্তি প্রমাণ সমতুল্য, সেখানে একদিকে বা অন্যদিকে ঝুঁকিয়া রায় দিবার অধিকার কাহারও নাই। এইরূপে তাঁহারা দুই বৎসর ধরিয়া সমগ্র আমেরিকায় আমার জন্য পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন! তার পর তাঁহারা অপর বিরুদ্ধ পক্ষ খ্রীষ্টান মিশনরীদের সহিত যোগ দিলেন। এই শেষোক্তেরা আমার বিরুদ্ধে এরূপ ভয়ানক মিথ্যা সংবাদ রটাইয়াছিল, যাহা কল্পনাতেও আনিতে পারা যায় না। তাহারা আমাকে প্রত্যেক বাড়ি হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং যে-কেহ আমার বন্ধু হইল, তাহাকেই আমার শত্রু করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

আমাকে তাড়াইয়া দিতে এবং অনশনে মারিয়া ফেলিতে তাহারা আমেরিকাবাসী সকলকে বলিতে লাগিল।

আর আমার বলিতে লজ্জা হইতেছে যে, আমার একজন স্বদেশবাসী ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন—তিনি ভারতের সংস্কারকদলের একজন নেতা। ইনি প্রতিদিনই প্রচার করিতেছেন, খ্রীষ্ট ভারতে আসিয়াছেন। খ্রীষ্ট কি এইরূপেই ভারতে আসিবেন? ইহাই কি ভারত-সংস্কারের উপায়? আমি ইঁহাকে অতি বাল্যকাল হইতেই জানিতাম, তিনি আমার একজন পরম বন্ধু ছিলেন। অনেক বৎসর যাবৎ আমার সহিত এই স্বদেশবাসীর সাক্ষাৎ হয় নাই, সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল, আমি যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম। কিন্তু তাঁহারই নিকট আমি এই ব্যবহার পাইলাম! যেদিন ধর্ম-মহাসভায় আমি প্রশংসা পাই, যেদিন চিকাগোয় আমি সকলের প্রিয় হই, সেই দিন হইতে তাঁর সুর বদলাইয়া গেল; তিনি অপ্রকাশ্যে আমার অনিষ্ট করিতে, আমাকে অনশনে মারিয়া ফেলিতে, আমেরিকা হইতে তাড়াইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করি, খ্রীষ্ট কি এইরূপেই ভারতে আসিবেন? জিজ্ঞাসা করি, বিশ বৎসর খ্রীষ্টের পদতলে বসিয়া কি তিনি এই শিক্ষা পাইয়াছেন? আমাদের বড় বড সংস্কারকগণ যে বলিয়া থাকেন, খ্রীষ্টধর্ম এবং খ্রীষ্টশক্তি ভারতবাসিগণের উন্নতিবিধান করিবে, তাহা কি এইরূপে হইবে? অবশ্য যদি উক্ত ভদ্রলোককে উহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যায়, তবে বড় আশা আছে বলিয়া বোধ হয় না।

আর এক কথা। আমি সমাজ-সংস্কারকগণের মুখপত্রে পড়িলাম যে, তাঁহারা বলিতেছেন আমি শূদ্র, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—শূদ্রের সন্ন্যাসী হইবার কি অধিকার আছে? ইহাতে আমার উত্তর এই: যদি তোমরা তোমাদের পুরাণ বিশ্বাস কর, তবে জানিও আমি সেই মহাপুরুষের বংশধর, যাঁহার পদে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ 'যমায় ধর্মরাজায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণসহকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন, আর যাঁহার বংশধরগণ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। এই বাঙালী সংস্কারকগণ জানিয়া রাখুন, আমার জাতি অন্যান্য নানা উপায়ে ভারতের সেবা ব্যতীত শত শত শতাব্দী ধরিয়া ভারতের অর্ধাংশ শাসন করিয়াছিল। যদি আমার জাতিকে বাদ দেওয়া যায়, তবে ভারতের আধুনিক সভ্যতার কতটুকু অবশিষ্ট থাকে? কেবল বাঙলা দেশেই আমার জাতি

হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারকগণের অভ্যুদয় হইয়াছে। আমার জাতি হইতেই আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের অভ্যুদয় হইয়াছে। উক্ত সম্পাদকের আমাদের দেশের ইতিহাস কতকটা জানা উচিত ছিল। আমাদের তিন বর্ণ সম্বন্ধে তাঁহার কিছু জ্ঞান থাকা উচিত ছিল; তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—তিন বর্ণেরই সন্ন্যাসী হইবার সমান অধিকার, ত্রৈবর্ণিকেরই বেদে সমান অধিকার। এ-সব কথা প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত হইল বলিয়াই বলিলাম। আমি পূর্বোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছি মাত্র, কিন্তু আমাকে শূদ্র বলিলে আমার বাস্তবিক কোন দুঃখ নাই। আমার পূর্বপুরুষগণ দরিদ্রগণের উপর যে অত্যাচার করিয়াছেন, ইহা তাহারই কিঞ্চিৎ প্রতিশোধস্বরূপ হইবে।

যদি আমি অতি নীচ চণ্ডাল হইতাম, তাহা হইলে আমার আরও অধিক আনন্দ হইত; কারণ আমি যাঁহার শিষ্য, তিনি একজন অতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলেও এক অস্পৃশ্য মেথরের গৃহ পরিষ্কার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি অবশ্যই ইহাতে সম্মত হয় নাই—কি করিয়াই বা হইবে? এই ব্রাহ্মণ আবার সন্ন্যাসী, তিনি আসিয়া তাহার ঘর পরিষ্কার করিবেন—ইহাতে কি সে কখনও সম্মত হইতে পারে? সুতরাং তিনি গভীর রাত্রে অজ্ঞাতভাবে তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া পায়খানা পরিষ্কার করিতেন এবং তাঁহার বড় বড় চুল দিয়া সেই স্থান মুছিতেন। দিনের পর দিন এইরূপ করিতেন, যাহাতে তিনি নিজেকে সকলের দাস—সকলের সেবক করিয়া তুলিতে পারেন। সেই ব্যক্তির শ্রীচরণ আমি মস্তকে ধারণ করিয়া আছি। তিনিই আমার আদর্শ—আমি সেই আদর্শ পুরুষের জীবন অনুকরণ করিতে চেষ্টা করি।

হিন্দুরা এইরূপেই তোমাদিগকে ও সর্বসাধারণকে উন্নত করিবার চেষ্টা করেন এবং তাঁহারা ইহাতে বৈদেশিক ভাবের কিছুমাত্র সহায়তা গ্রহণ করেন না। বিশ বৎসর পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এমন চরিত্র গঠিত হইয়াছে যে, কেবল বন্ধুর কিছু মানযশ হইয়াছে বলিয়া, সে তাহার অর্থোপার্জনের বিঘ্নস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে মনে করিয়া বিদেশে তাহাকে অনাহারে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে! আর খাঁটি পুরাতন হিন্দুধর্ম কিরূপে কাজ করে, অপরটি তাহার উদাহরণ। আমাদের সংস্কারকগণের মধ্যে কেহ সেই জীবন দেখান, নীচজাতির পায়খানা সাফ ও চুল দিয়া উহা মুছিয়া ফেলিতে প্রস্তুত হউন, তবেই আমি

তাঁহার পদতলে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিব, তাহার পুর্বে নহে ! হাজার হাজার লম্বা কথার চেয়ে এতটুকু কাজের দাম ঢের বেশী।

এখন আমি মাদ্রাজের সংস্কার-সভাগুলির কথা বলিব। তাঁহারা আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহারা আমার প্রতি অনেক সহৃদয় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন এবং বাঙলা দেশের ও মাদ্রাজের সংস্কারকগণের মধ্যে যে একটা প্রভেদ আছে, সেই বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, আর আমি এ-বিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত। তোমাদের মধ্যে অনেকের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, তোমাদিগকে আমি অনেকবার বলিয়াছি—মাদ্রাজের এখন বড়ই সুন্দর অবস্থা। বাঙলায় যেমন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিয়াছে, এখানে সেরূপ হয় নাই। এখানে বরাবর ধীর অথচ নিশ্চিতভাবে সর্ববিষয়ে উন্নতি হইয়াছে, এখানে সমাজের ক্রমশঃ বিকাশ হইয়াছে, কোনরূপ প্রতিক্রিয়া হয় নাই। অনেক স্থলে এবং কতক পরিমাণে বাঙলা দেশে পুরাতনের পুনরুত্থান হইয়াছে বলা যাইতে পারে, কিন্তু মাদ্রাজের উন্নতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে হইতেছে। সুতরাং এখানকার সংস্কারকগণ যে জাতিদ্বয়ের প্রভেদ দেখান, সে-বিষয়ে আমি তাঁহাদের সহিত সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু আমার সহিত তাঁহাদের এক বিষয়ে মতভেদ আছে—সেটি তাঁহারা বুঝেন না।

আমার আশঙ্কা হয়, কতকগুলি সংস্কার-সমিতি আমাকে ভয় দেখাইয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের পক্ষে এরূপ চেষ্টা বড় আশ্চর্যের বিষয় বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি চতুর্দশ বৎসর ধরিয়া অনাহারে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, যে-ব্যক্তির এতদিন ধরিয়া কাল কি খাইবে, কোথায় শুইবে তাহার কিছু ঠিক ছিল না, তাহাকে এত সহজে ভয় দেখানো যাইতে পারে না। যে-ব্যক্তি [বিদেশে] একরূপ বিনা পরিচ্ছদে হিমাঙ্কের ৩০ ডিগ্রি নীচে বাস করিতে সাহসী হইয়াছিল, যাহার সেখানেও কাল কি খাইবে কিছুই ঠিক ছিল না, তাহাকে ভারতে এত সহজে ভয় দেখানো যাইতে পারে না। আমি তাঁহাদিগকে প্রথমেই বলিতে চাই যে, তাঁহারা জানিয়া রাখুন—আমার নিজের একটু দৃঢ়তা আছে, আমার নিজের একটু অভিজ্ঞতাও আছে, আর জগতের নিকট আমার কিছু বার্তা বহন করিবার আছে; আমি নির্ভয়ে ও ভবিষ্যতের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া সেই বার্তা বহন করিব।

সংস্কারকগণকে আমি বলিতে চাই, আমি তাঁহাদের অপেক্ষা একজন বড় সংস্কারক। তাঁহারা একটু আধটু সংস্কার করিতে চান—আমি চাই আমূল সংস্কার। আমাদের প্রভেদ কেবল সংস্কারের প্রণালীতে। তাঁহাদের প্রণালী—ভাঙিয়া-চুরিয়া ফেলা, আমার পদ্ধতি—সংগঠন। আমি সাময়িক সংস্কারে বিশ্বাসী নহি, আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী। আমি নিজেকে ঈশ্বরের স্থানে বসাইয়া সমাজকে 'তোমায় এদিকে চলিতে হইবে, ওদিকে নয়' বলিয়া আদেশ করিতে সাহস করি না। আমি কেবল সেই কাঠবিড়ালের মতো হইতে চাই, যে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সময় যথাসাধ্য এক অঞ্জলি বালুকা বহন করিয়াই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিল – ইহাই আমার ভাব।

এই অদ্ভুত জাতীয় যন্ত্র শত শতাব্দী যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছে, এই অদ্ভুত জাতীয় জীবন-নদী আমাদের সম্মুখে প্রবাহিত হইতেছে—কে জানে, কে সাহস করিয়া বলিতে পারে, উহা ভাল কি মন্দ বা কিরূপে উহার গতি নিয়মিত হওয়া উচিত? সহস্র ঘটনাচক্র উহাকে বিশেষরূপে বেগবিশিষ্ট করিয়াছে, তাই সময়ে সময়ে উহা মৃদু ও সময়ে সময়ে দ্রুত-গতিবিশিষ্ট হইতেছে। কে উহার গতি নিয়মিত করিতে সাহস করে? গীতার উপদেশ অনুসারে আমাদিগকে কেবল কর্ম করিয়া যাইতে হইবে, ফলাফলের চিন্তা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া শান্তচিত্তে অবস্থান করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের পুষ্টির জন্য যাহা আবশ্যক তাহা উহাকে দিয়া যাও, কিন্তু উহা নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী বিকশিত হইবে; কাহারও সাধ্য নাই 'এইরূপে বিকশিত হও' বলিয়া উপদেশ দিতে পারে।

আমাদের সমাজে যথেষ্ট দোষ আছে; অন্যান্য সমাজেও আছে। এখানে বিধবার অশ্রুপাতে সময় সময় ধরিত্রী সিক্ত হয়, সেখানে—পাশ্চাত্যদেশে অনূঢ়া কুমারীগণের দীর্ঘনিঃশ্বাসে বায়ু বিষাক্ত। এখানে জীবন দারিদ্র্যবিষে জর্জরিত, সেখানে বিলাসিতার অবসাদে সমগ্র জাতি জীবন্মৃত; এখানে লোক না খাইতে পাইয়া আত্মহত্যা করিতে যায়, সেখানে খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্যে লোকে আত্মহত্যা করিয়া থাকে। দোষ সর্বত্র বিদ্যমান। ইহা পুরাতন বাতরোগের মতো, পা হইতে দূর করিলে মাথায় ধরে; মাথা হইতে তাড়াইলে উহা আবার অন্যত্র আশ্রয় লয়। কেবল এখান হইতে ওখানে তাড়াইয়া বেড়ানো মাত্র—এই পর্যন্ত করা যায়।

হে বালকগণ, অনিষ্টের মূলোচ্ছেদই প্রকৃত উপায়। আমাদের দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দেয়—ভাল ও মন্দ নিত্যসংযুক্ত, এক জিনিসেরই এপিঠ ওপিঠ। একটি লইলে অন্যটিকে লইতেই হইবে। সমুদ্রে একটা ঢেউ উঠিল—বুঝিতে হইবে কোথাও না কোথাও জল খানিকটা নামিয়াছে। শুধু তাই নয়, সমুদয় জীবনই দুঃখময়। কাহারও প্রাণনাশ না করিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ পর্যন্ত অসম্ভব; এক টুকরা খাবার খাইতে হইলেও কাহাকে না কাহাকে বঞ্চিত করিতে হয়। ইহাই প্রকৃতির বিধান, ইহাই জীবন-দর্শন।

এই কারণে আমাদিগকে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার বাহিরের চেষ্টা দ্বারা হইবে না, মনের উপর কার্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা যতই লম্বা লম্বা কথা বলি না কেন, বুঝিতে হইবে সমাজের দোষ সংশোধন করিতে হইলে প্রত্যক্ষভাবে চেষ্টা না করিয়া শিক্ষাদানের দ্বারা পরোক্ষভাবে উহার চেষ্টা করিতে হইবে। সমাজের দোষ-সংশোধন সম্বন্ধে প্রথমে এই তত্ত্বটি বুঝিতে হইবে; এই তত্ত্ব বুঝিয়া আমাদের মনকে শান্ত করিতে হইবে, ইহা বুঝিয়া আমাদের রক্ত হইতে ধর্মান্ধতা একেবারে দূর করিয়া আমাদিগকে শান্ত—উত্তেজনাশূন্য হইতে হইবে। পৃথিবীর ইতিহাসও আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে যে, যেখানেই এইরূপ উত্তেজনার সহায়তায় কোন সংস্কার করিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে এই মাত্র ফল দাঁড়াইয়াছে যে, যে-উদ্দেশ্যে সংস্কার-চেষ্টা, সেই উদ্দেশ্যই বিফল হইয়াছে। আমেরিকায় দাস-ব্যবসায় রহিত করিবার জন্য যে যুদ্ধ হইয়াছিল, মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর আন্দোলন কল্পনা করা যাইতে পারে না; তোমাদের সকলেরই উহা জানা আছে। কিন্তু ইহার ফল কি হইয়াছে? দাস-ব্যবসায় রহিত হইবার পূর্বে দাসদের যে অবস্থা ছিল, পরে তাহাদের অবস্থা উহার অপেক্ষা শতগুণ মন্দ হইয়াছে। দাস-ব্যবসায় রহিত হইবার পূর্বে এই হতভাগ্য নিগ্রোগণ ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইত—নিজ সম্পত্তি-নাশের আশঙ্কায় অধিকারিগণকে দেখিতে হইত, যাহাতে তাহারা দুর্বল ও অকর্মণ্য হইয়া না পড়ে। কিন্তু এখন তাহারা কাহারও সম্পত্তি নহে, তাহাদের জীবনের এখন কিছুমাত্র মূল্য নাই; এখন তাহাদিগকে সামান্য ছুতা করিয়া জীবন্ত পুড়াইয়া ফেলা হয়, তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হয়; কিন্তু হত্যাকারীদের জন্য কোন আইন নাই, কারণ ইহারা 'নিগার'—

ইহারা মানুষ নহে, এমন কি পশু-নামেরও যোগ্য নহে। আইনের দ্বারা অথবা প্রবল উত্তেজনাপূর্ণ আন্দোলনের দ্বারা কোন সামাজিক দোষ প্রতিকার করিবার চেষ্টার ফল এইরূপই হয়।

কোনরূপ কল্যাণসাধনের জন্যও এইরূপ উত্তেজনাপ্রসূত আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইতিহাসের এই সাক্ষ্য বিদ্যমান। আমি ইহা দেখিয়াছি, নিজ অভিজ্ঞতা হইতে আমি ইহা শিখিয়াছি। এই কারণেই আমি এইরূপ দোষারোপকারী কোন সমিতির সহিত যোগ দিতে পারি না। দোষারোপ বা নিন্দাবাদের প্রয়োজন কি? সকল সমাজেই দোষ আছে। সকলেই তাহা জানে। আজ-কালকার ছোট ছেলে পর্যন্ত তাহা জানে। সেও মঞ্চে দাঁড়াইয়া হিন্দুসমাজের গুরুতর দোষগুলি সম্বন্ধে আমাদিগকে রীতিমত একটি বক্তৃতা শুনাইয়া দিতে পারে। যে-কোন অশিক্ষিত বৈদেশিক এক নিঃশ্বাসে ভূপ্রদক্ষিণ করিবার জন্য ভারতে আসিয়া থাকেন; তিনিই তাড়াতাড়ি রেলভ্রমণের পর ভারতবর্ষের মোটামুটি একটা ধারণা করিয়া লইয়া ভারতের ভয়াবহ অনিষ্টকর প্রথাসম্বন্ধে খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের কথা স্বীকার করিয়া থাকি। সকলেই দোষ দেখাইয়া দিতে পারে; কিন্তু যিনি এই সমস্যা হইতে উত্তীর্ণ হইবার পথ দেখাইয়া দিতে পারেন, তিনিই মানবজাতির যথার্থ বন্ধু। সেই জলমগ্ন বালক ও দার্শনিকের গল্পে—দার্শনিক যখন বালককে গম্ভীরভাবে উপদেশ দিতেছিলেন, তখন সেই বালক যেমন বলিয়াছিল, 'আগে আমাকে জল হইতে তুলুন, পরে আপনার উপদেশ শুনিব,' সেইরূপ এখন আমাদের দেশের লোক চীৎকার করিয়া বলিতেছে, 'আমরা যথেষ্ট বক্তৃতা শুনিয়াছি, অনেক সমিতি দেখিয়াছি, ঢের কাগজ পড়িয়াছি; এখন আমরা এমন লোক চাই, যিনি আমাদের হাত ধরিয়া এই মহাপঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিতে পারেন। এমন লোক কোথায়? এমন লোক কোথায়, যিনি আমাদিগকে যথার্থ ভালবাসেন? এমন লোক কোথায়, যিনি আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন?' এইরূপ লোক চাই। এইখানেই আমার এই-সকল সংস্কার-আন্দোলনের সহিত সম্পূর্ণ মতভেদ। প্রায় শত বর্ষ ধরিয়া এই সংস্কার-আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু উহার দ্বারা অতিশয় নিন্দা ও বিদ্বেষপূর্ণ সাহিত্যবিশেষের সৃষ্টি ব্যতীত আর কি কল্যাণ হইয়াছে? ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা না হইলেই ভাল ছিল। তাঁহারা প্রাচীন সমাজের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন, উহার উপর যথাসাধ্য দোষারোপ করিয়াছেন,

উহার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন; শেষে প্রাচীন সমাজের লোকেরা তাঁহাদের সুর ধরিয়াছেন, ঢিলটি খাইয়া পাটকেলটি মারিয়াছেন; আর তাহার ফল হইয়াছে এই যে, প্রত্যেকটি দেশীয় ভাষায় এমন এক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে সমগ্র জাতির—সমগ্র দেশের লজ্জিত হওয়া উচিত! ইহাই কি সংস্কার? ইহাই কি সমগ্র জাতির গৌরবের পথ? ইহা কাহার দোষ?

অতঃপর আর একটি গুরুতর বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। এখানে—ভারতে আমরা বরাবর রাজ-শাসনাধীনে কাটাইয়াছি—রাজারাই আমাদের জন্য চিরদিন বিধান প্রস্তুত করিয়াছেন। এখন সেই রাজারা নাই, এখন আর এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়া পথ দেখাইবার কেহ নাই। সরকার সাহস করেন না। সরকারকে সাধারণের মতামতের গতি দেখিয়া নিজ কার্যপ্রণালী স্থির করিতে হয়। কিন্তু নিজেদের সমস্যাপূরণে সমর্থ, সাধারণের কল্যাণকর, প্রবল জনমত গঠিত হইতে সময় লাগে—অনেক সময় লাগে। এই মত গঠিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং সমুদয় সমাজসংস্কার-সমস্যাটি এইরূপ দাঁড়ায়—সংস্কার যাহারা চায়, তাহারা কোথায়? আগে তাহাদিগকে প্রস্তুত কর। সংস্কারপ্রার্থী লোক কই? অল্পসংখ্যক কয়েকটি লোকের নিকট কোন বিষয় দোষযুক্ত বলিয়া বোধ হইয়াছে, অধিকাংশ ব্যক্তি কিন্তু তাহা এখনও বোঝে নাই। এখন এই অল্পসংখ্যক ব্যক্তি যে জোর করিয়া অপর সকলের উপর নিজেদের মনোমত সংস্কার চালাইবার চেষ্টা করেন, তাহা তো অত্যাচার; ইহার মতো প্রবল অত্যাচার পৃথিবীতে আর নাই। অল্প কয়েকজন লোকের নিকট কতকগুলি বিষয় দোষযুক্ত হইলেই সমগ্র জাতির হৃদয় স্পর্শ করে না। সমগ্র জাতি নড়ে-চড়ে না কেন? প্রথমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষা দাও, ব্যবস্থা-প্রণয়নে সমর্থ একটি দল গঠন কর; বিধান আপনা-আপনি আসিবে। প্রথমে যে শক্তিবলে—যাহার অনুমোদনে বিধান গঠিত হইবে, তাহা সৃষ্টি কর। এখন রাজারা নাই; যে নূতন শক্তিতে—যে নূতন সম্প্রদায়ের সম্মতিতে নূতন ব্যবস্থা প্রণীত হইবে, সে লোকশক্তি কোথায়? প্রথমে সেই লোকশক্তি গঠন কর। সুতরাং সমাজসংস্কারের জন্য প্রথম কর্তব্য—লোকশিক্ষা। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইবে।

গত শতাব্দীতে যে সকল সংস্কারের জন্য আন্দোলন হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই পোশাকী ধরনের। এই সংস্কার-চেষ্টাগুলি কেবল প্রথম দুই

বর্ণ (জাতি)কে স্পর্শ করে, অন্য বর্ণকে নহে। বিধবাবিবাহ-আন্দোলনে শতকরা সত্তর জন ভারতীয় নারীর কোন স্বার্থই নাই। আর সর্বসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া যে-সকল ভারতীয় উচ্চবর্ণ শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই জন্য এ ধরনের সকল আন্দোলন। তাঁহারা নিজেদের ঘর সাফ করিতে এবং বৈদেশিকগণের নিকট নিজদিগকে সুন্দর দেখাইতে কিছুমাত্র চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ইহাকে তো সংস্কার বলা যাইতে পারে না। সংস্কার করিতে হইলে উপর উপর দেখিলে চলিবে না, ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে, মূলদেশ পর্যন্ত যাইতে হইবে। ইহাকেই আমি 'আমূল সংস্কার' বা প্রকৃত সংস্কার বলিয়া থাকি। মূল দেশে অগ্নিসংযোগ কর, অগ্নি ক্রমশঃ উর্ধ্বে উঠিতে থাকুক, [আবর্জনা পুড়িয়া যাক] এবং একটি অখণ্ড ভারতীয় জাতি গঠিত হউক।

আর সমস্যা বড় সহজও নহে। ইহা অতি গুরুতর সমস্যা; সুতরাং ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই! এটিও জানিয়া রাখো যে, গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ এই সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের দেশের মহাপুরুষগণ অবহিত ছিলেন। আজকাল বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের অজ্ঞেয়বাদ সম্বন্ধে আলোচনা একটা ঢঙ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আলোচনাকারীরা স্বপ্নেও কখন ভাবে না যে, আমাদের সমাজে যে-সকল বিশেষ দোষ রহিয়াছে, সেগুলি বৌদ্ধধর্মকৃত। বৌদ্ধধর্মই আমাদিগকে তাহার উত্তরাধিকারস্বরূপ এই অবনতির ভাগী করিয়াছে। যাঁহারা বৌদ্ধধর্মের উন্নতি ও অবনতির ইতিহাস কখনও পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের লিখিত পুস্তকে তোমরা পড়িয়া থাকো যে, গৌতমবুদ্ধ-প্রচারিত অপূর্ব নীতি ও তাঁহার লোকোত্তর চরিত্র-গুণে বৌদ্ধধর্ম এরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ভগবান বুদ্ধদেবের প্রতি আমার যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু আমার বাক্য অবহিত হইয়া শ্রবণ কর: বৌদ্ধধর্মের বিস্তার উহার মত বা উক্ত মহাপুরুষের চরিত্রগুণে ততটা হয় নাই—বৌদ্ধগণ যে-সকল মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, যে-সকল প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সমগ্র জাতির সমক্ষে যে-সকল আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ ধরিয়াছিলেন, এগুলির দরুন যতটা হইয়াছিল। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করে। এই-সকল বড় বড় মন্দির ও ক্রিয়াকলাপের সহিত সংগ্রামে গৃহে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র হোমকুণ্ডগুলি দাঁড়াইতে পারিল না। পরিশেষে ঐ-সকল ক্রিয়াকলাপ-অনুষ্ঠান ক্রমশঃ অধঃপতিত হইল। ঐগুলি এরূপ ঘৃণিত ভাব ধারণ করে যে, শ্রোতৃবর্গের নিকট

আমি তাহা বলিতে অক্ষম। যাঁহারা এ সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নানাপ্রকার কারুকার্যপূর্ণ দক্ষিণভারতের বড় বড় মন্দিরগুলি দেখিয়া আসিবেন।

আমরা বৌদ্ধগণের নিকট হইতে ইহাই মাত্র দায়স্বরূপ পাইয়াছি। অতঃপর সেই মহান্ সংস্কারক শঙ্করাচার্য ও তাঁহার অনুবর্তিগণের অভ্যুদয় হইল, আর তাঁহার অভ্যুদয় হইতে আজ পর্যন্ত কয়েক শত বর্ষ যাবৎ ভারতের সর্বসাধারণকে ধীরে ধীরে সেই মৌলিক বিশুদ্ধ বৈদান্তিক ধর্মে লইয়া আসিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই সংস্কারকগণ সমাজের দোষগুলি বিলক্ষণ জানিতেন, তথাপি তাঁহারা সমাজকে নিন্দা করেন নাই। তাঁহারা এ-কথা বলেন নাই—তোমাদের যাহা আছে সব ভুল, তোমাদিগকে সব ফেলিয়া দিতে হইবে। তাহা কখনই হইতে পারে না। আমি সম্প্রতি পড়িতেছিলাম—আমার বন্ধু ব্যারোজ সাহেব বলিতেছেন, ৩০০ বৎসরে খ্রীষ্টধর্ম গ্রীক ও রোমক প্রভাবকে একেবারে উলটাইয়া দিয়াছিল। যিনি ইওরোপ, গ্রীস ও রোম দেখিয়াছেন, তিনি কখন এ-কথা বলিতে পারেন না। রোমক ও গ্রীক ধর্মের প্রভাব—এমন কি প্রোটেস্টাণ্ট দেশসমূহে পর্যন্ত রহিয়াছে, নামটুকু বদলাইয়াছে মাত্র; প্রাচীন দেবগণই নূতন বেশে বিদ্যমান—কেবল নাম বদলানো। দেবীগণ হইয়াছেন মেরী, দেবগণ হইয়াছেন সাধুবৃন্দ (Saints) এবং নূতন নূতন অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। এমন কি, প্রাচীন উপাধি 'পন্টিফেক্স্ ম্যাক্সিমাস'[১] পর্যন্ত রহিয়াছে। সুতরাং সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইতেই পারে না। ইহা বড় সহজ নহে—আর শঙ্করাচার্য এ তত্ত্ব জানিতেন, রামানুজও জানিতেন, এরূপ পরিবর্তন হইতে পারে না। সুতরাং তদানীন্তন প্রচলিত ধর্মকে ধীরে ধীরে উচ্চতম আদর্শের অভিমুখে গড়িয়া তোলা ব্যতীত তাঁহাদের আর কোন পথ ছিল না। যদি তাঁহারা অন্য প্রণালী অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিতেন, অর্থাৎ যদি তাঁহারা একেবারে সব উলটাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন, তবে তাঁহাদিগকে কপট হইতে হইত; কারণ তাঁহাদের ধর্মের প্রধান মতই ক্রমোন্নতিবাদ—এই-সকল নানাবিধ সোপানের মধ্য দিয়া আত্মা তাঁহার উচ্চতম

১ রোমকদিগের পুরোহিত-বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ এই নামে অভিহিত হইতেন। ইহার অর্থ প্রধান পুরোহিত, পোপ এখন এই নামে অভিহিত।

লক্ষ্যে পৌঁছিবেন—ইহাই তাঁহাদের মূল মত। সুতরাং এই সোপানগুলি সবই আবশ্যক এবং আমাদের সহায়ক। কে এই সোপানগুলিকে নিন্দা করিতে সাহসী হইবে?

আজকাল একটি কথা চালু হইয়া গিয়াছে, এবং সকলেই বিনা আপত্তিতে এটি স্বীকার করিয়া থাকেন যে, পৌত্তলিকতা অন্যায়। আমিও এক সময়ে এইরূপ ভাবিতাম, এবং ইহার শাস্তিস্বরূপ আমাকে এমন এক জনের পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইয়াছিল, যিনি পুতুলপূজা হইতে সব পাইয়াছিলেন। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা বলিতেছি। হিন্দুগণ, যদি পুতুলপূজা করিয়া এইরূপ রামকৃষ্ণ পরমহংসের আবির্ভাব হয়, তবে তোমরা কি চাও?—সংস্কারকগণের ধর্ম চাও, না পুতুলপূজা চাও? আমি ইহার একটা উত্তর চাই। যদি পুতুলপূজা দ্বারা এইরূপ রামকৃষ্ণ পরমহংস সৃষ্টি করিতে পারো, তবে আরও হাজার পুতুলের পূজা কর। ঈশ্বরেচ্ছায় তোমরা সাফল্য লাভ কর। যে কোন উপায়ে হউক, এইরূপ মহান চরিত্র সৃষ্টি কর। আর পুতুল-পূজাকে লোকে গালি দেয়! কেন?—তাহা কেহই জানে না। কারণ কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে জনৈক য়াহুদী-বংশসম্ভূত ব্যক্তি পুতুলপূজাকে নিন্দা করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি নিজের পুতুল ছাড়া আর সকলের পুতুলকে নিন্দা করিয়াছিলেন। সেই য়াহুদী বলিয়াছিলেন, যদি কোন বিশেষ ভাব-প্রকাশক বা পরমসুন্দর মূর্তি দ্বারা ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ করা হয়, তবে তাহা ভয়ানক দোষ, মহা পাপ; কিন্তু যদি একটি সিন্দুকের দুইধারে দুইজন দেবদূত, তাহার উপরে মেঘ—এইরূপে ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ করা হয়, তবে তাহা মহা পবিত্র। ঈশ্বর যদি ঘুঘুর রূপ ধারণ করিয়া আসেন, তবে তাহা মহা পবিত্র; কিন্তু যদি তিনি গাভীর রূপ ধারণ করিয়া আসেন, তবে তাহা হিদেনদের কুসংস্কার! অতএব উহাকে নিন্দা কর।

দুনিয়া এইভাবেই চলিয়াছে। তাই কবি বলিয়াছেন, 'আমরা মর্ত্যমানব কি নির্বোধ!' পরের চক্ষে দেখা ও বিচার করা কি কঠিন ব্যাপার! আর ইহাই মনুষ্যসমাজের উন্নতির অন্তরায়স্বরূপ। ইহাই ঈর্ষা ঘৃণা বিবাদ ও দ্বন্দ্বের মূল। বালকগণ, অর্বাচীন শিশুগণ, তোমরা মান্দ্রাজের বাহিরে কখনও যাও নাই; তোমরা সহস্র সহস্র প্রাচীন-সংস্কার-নিয়ন্ত্রিত ত্রিশকোটি লোকের উপর আইন চালাইতে চাও—তোমাদের লজ্জা করে না? এরূপ বিষম দোষ

হইতে বিরত হও এবং আগে নিজেরা শিক্ষা লাভ কর। শ্রদ্ধাহীন বালকগণ, তোমরা কেবল কাগজে গোটাকতক লাইন আঁচড় কাটিতে পারো, আর কোন আহাম্মককে ধরিয়া উহা ছাপাইয়া দিতে পারো বলিয়া নিজদিগকে জগতের শিক্ষক—ভারতের মুখপাত্র বলিয়া মনে করিতেছ! তাই নয় কি?

এই কারণে আমি মাদ্রাজের সংস্কারকগণকে এইটুকু বলিতে চাই যে, তাঁহাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে। তাঁহাদের বিশাল হৃদয়, তাঁহাদের স্বদেশপ্রীতি, দরিদ্র ও অত্যাচারিত জনগণের প্রতি তাঁহাদের ভালবাসার জন্য আমি তাঁহাদিগকে ভালবাসি। কিন্তু ভাই যেমন ভাইকে ভালবাসে অথচ তাহার দোষ দেখাইয়া দেয়, সেইভাবে আমি তাঁহাদিগকে বলিতেছি—তাঁহাদের কার্যপ্রণালী ঠিক নহে। শত বৎসর যাবৎ এই প্রণালীতে কার্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এখন আমাদিগকে অন্য কোন নূতন উপায়ে কাজ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এইটুকুই আমার বক্তব্য। ভারতে কি কখনও সংস্কারকের অভাব হইয়াছিল? তোমরা তো ভারতের ইতিহাস পড়িয়াছ? রামানুজ কি ছিলেন? শঙ্কর? নানক? চৈতন্য? কবীর? দাদু? এই যে বড় বড় ধর্মাচার্যগণ ভারতগগনে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো একে একে উদিত হইয়া আবার অস্ত গিয়াছেন, ইঁহারা কি ছিলেন? রামানুজের হৃদয় কি নীচজাতির জন্য কাঁদে নাই? তিনি কি সারাজীবন পারিয়াদিগকে[১] পর্যন্ত নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থান দিতে চেষ্টা করেন নাই? তিনি কি মুসলমানকে পর্যন্ত গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন নাই? নানক কি হিন্দু মুসলমান উভয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করিয়া সমাজে নূতন অবস্থা আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন নাই? তাঁহারা সকলেই চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কাজ এখনও চলিতেছে। তবে প্রভেদ এই—তাঁহারা আধুনিক সংস্কারকগণের মতো চীৎকার ও বাহ্যাড়ম্বর করিতেন না। আধুনিক সংস্কারকগণের মতো তাঁহাদের মুখ হইতে কখন অভিশাপ উচ্চারিত হইত না, তাঁহাদের মুখ হইতে কেবল আশীর্বাদ বর্ষিত হইত। তাঁহারা কখনও সমাজের উপর দোষারোপ করেন নাই। তাঁহারা বলিতেন, হিন্দুজাতিকে চিরকাল ধরিয়া ক্রমাগত উন্নতি করিতে হইবে।

১ দক্ষিণভারতের অস্পৃশ্য জাতিবিশেষ।

তাঁহারা অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেন—হিন্দুগণ, তোমরা এতদিন যাহা করিয়াছ, তাহা ভালই হইয়াছে ; কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, আমাদিগকে আরও ভাল কাজ করিতে হইবে। তাঁহারা এ-কথা বলেন নাই যে, তোমরা এতদিন মন্দ ছিলে, এখন তোমাদিগকে ভাল হইতে হইবে। তাঁহারা বলিতেন, তোমরা ভালই ছিলে, কিন্তু এখন তোমাদিগকে আরও ভাল হইতে হইবে। এই দুই প্রকার কথার ভিতর বিশেষ পার্থক্য আছে। আমাদিগকে আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। বৈদেশিক সংস্থাগুলি জোর করিয়া আমাদিগকে যে প্রণালীতে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তদনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা বৃথা ; উহা অসম্ভব। আমাদিগকে যে ভাঙিয়া চুরিয়া অপর জাতির মতো গড়িতে পারা অসম্ভব, সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি অন্যান্য জাতির সামাজিক প্রথার নিন্দা করিতেছি না। তাহাদের পক্ষে উহা ভাল হইলেও আমাদের পক্ষে নহে। তাহাদের পক্ষে যাহা অমৃত, আমাদের পক্ষে তাহা বিষবৎ হইতে পারে। প্রথমে এইটিই শিক্ষা করিতে হইবে। অন্য ধরনের বিজ্ঞান ঐতিহ্য ও পদ্ধতি অনুযায়ী গঠিত হওয়াতে তাহাদের আধুনিক সমাজবিধি প্রথা একরূপ দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পশ্চাতে আবার অন্য ধরনের ঐতিহ্য এবং সহস্র সহস্র বৎসরের কর্ম রহিয়াছে, সুতরাং আমরা স্বভাবতই আমাদের সংস্কার অনুযায়ী চলিতে পারি, এবং আমাদিগকে সেইরূপই করিতে হইবে।

তবে আমি কি প্রণালীতে কাজ করিব ? আমি প্রাচীন মহান্ আচার্যগণের উপদেশ অনুসরণ করিতে চাই। আমি তাঁহাদের কাজের বিশেষ আলোচনা করিয়াছি এবং তাঁহারা কি প্রণালীতে কাজ করিয়াছিলেন, ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা আবিষ্কার করিয়াছি। সেই মহাপুরুষগণ সমাজসমূহ সংগঠন করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহাতে বিশেষভাবে বল, পবিত্রতা ও জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা অতি বিস্ময়কর কাজ করিয়াছিলেন। আমাদিগকেও ঐরূপ কার্যসমূহ করিতেই হইবে। এখন অবস্থাচক্রের কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, সেজন্য কার্যপ্রণালীর সামান্য পরিবর্তন করিতে হইবে, আর কিছু নয়।

আমি দেখিতেছি—ব্যক্তির পক্ষে যেমন, প্রত্যেক জাতির পক্ষেও তেমনি জীবনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। উহাই তাহার জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। উহাই যেন তাহার জীবনসঙ্গীতের প্রধান সুর, অন্যান্য সুর যেন সেই প্রধান

সুরের সহিত সঙ্গত হইয়া ঐকতান সৃষ্টি করিতেছে। কোন দেশের—যথা ইংলণ্ডের জীবনীশক্তি রাজনীতিক অধিকার। কলাবিদ্যার উন্নতিই হয়তো অপর কোন জাতির জীবনের মূল লক্ষ্য। ভারতে কিন্তু ধর্ম জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ, উহাই যেন জাতীয় জীবন-সঙ্গীতের প্রধান সুর। আর যদি কোন জাতি তাহার এই স্বাভাবিক জীবনীশক্তি—শত শতাব্দী ধরিয়া যে দিকে উহার বিশেষ গতি হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করে এবং যদি সেই চেষ্টায় কৃতকার্য হয়, তবে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। সুতরাং যদি তোমরা ধর্মকে কেন্দ্র না করিয়া, ধর্মকেই জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তি না করিয়া রাজনীতি, সমাজনীতি বা অন্য কিছুকে উহার স্থলে বসাও, তবে তাহার ফল হইবে এই যে, তোমরা একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। যাহাতে এরূপ না ঘটে, সেজন্য তোমাদিগকে তোমাদের প্রাণশক্তিস্বরূপ ধর্মের মধ্য দিয়া সব কাজ করিতে হইবে। তোমাদের স্নায়ুতন্ত্রীগুলি তোমাদের ধর্মরূপ মেরুদণ্ডে দৃঢ়সম্বদ্ধ হইয়া নিজ নিজ সুরে বাজিতে থাকুক।

আমি দেখিয়াছি, সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে ধর্ম কিভাবে কাজ করিবে —ইহা না দেখাইয়া আমি আমেরিকায় ধর্মপ্রচার করিতে পারিতাম না। বেদান্তের দ্বারা কিরূপ অদ্ভুত রাজনীতিক পরিবর্তন সাধিত হইবে, ইহা না দেখাইয়া আমি ইংলণ্ডে ধর্মপ্রচার করিতে পারিতাম না। এইভাবে ভারতে সমাজসংস্কার প্রচার করিতে হইলে দেখাইতে হইবে, সেই নূতন সামাজিক প্রথা দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবনলাভ করিবার কি বিশেষ সাহায্য হইবে। রাজনীতি প্রচার করিতে হইলেও দেখাইতে হইবে, আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা—আধ্যাত্মিক উন্নতি উহার দ্বারা কত অধিক পরিমাণে সাধিত হইবে।

এই জগতে প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ পথ বাছিয়া লয়; প্রত্যেক জাতিও সেইরূপ। আমরা শত শত যুগ পূর্বে নিজেদের পথ বাছিয়া লইয়াছি, এখন আমাদিগকে তদনুসারে চলিতেই হইবে। আর এই পন্থা-নির্বাচন এমন কিছু খারাপ হয় নাই। জড়ের পরিবর্তে চৈতন্য, মানুষের পরিবর্তে ঈশ্বরের চিন্তাকে কি বিশেষ মন্দ পথ বলিতে পারো? তোমাদের মধ্যে পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাস, ইহলোকের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা, প্রবল ত্যাগশক্তি এবং ঈশ্বরে ও অবিনাশী আত্মায় দৃঢ় বিশ্বাস বিদ্যমান। কই, এই ভাব ত্যাগ কর

দেখি! তোমরা কখনই ইহা ত্যাগ করিতে পার না। তোমরা জড়বাদী হইয়া কিছুদিন জড়বাদের কথা বলিয়া আমাকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিতে পারো, কিন্তু আমি তোমাদের স্বভাব জানি। যখনই তোমাদিগকে ধর্ম সম্বন্ধে একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব, অমনি তোমরা পরম আস্তিক হইবে। স্বভাব বদলাইবে কিরূপে? তোমরা যে ধর্মগতপ্রাণ।

এই জন্য ভারতে যে-কোন সংস্কার বা উন্নতির চেষ্টা করা হউক, প্রথমতঃ ধর্মের উন্নতি আবশ্যক। ভারতকে সামাজিক বা রাজনীতিক ভাবে প্লাবিত করার আগে প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত কর। প্রথমেই এইটি করা আবশ্যক। প্রথমেই আমাদিগকে এই কাজে মন দিতে হইবে যে, আমাদের উপনিষদে—আমাদের পুরাণে, আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রে যে-সকল অপূর্ব সত্য নিহিত আছে, সেগুলি ঐ-সকল গ্রন্থ হইতে, মঠ হইতে, অরণ্য হইতে, সম্প্রদায়বিশেষের অধিকার হইতে বাহির করিয়া সমগ্র ভারতভূমিতে ছড়াইতে হইবে, যেন ঐ-সকল শাস্ত্রনিহিত সত্য আগুনের মতো উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব হইতে পশ্চিম, হিমালয় হইতে কুমারিকা, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত সারা দেশে ছুটিতে থাকে। সকলকেই এই-সকল শাস্ত্রনিহিত উপদেশ শুনাইতে হইবে; কারণ শাস্ত্র বলেন—প্রথমে শ্রবণ, পরে মনন, তারপর নিদিধ্যাসন কর্তব্য। প্রথমে লোকে শাস্ত্রবাক্যগুলি শুনুক, আর যে ব্যক্তি অপরকে নিজ শাস্ত্রের মহান্ সত্যগুলি শুনাইতে সাহায্য করে, সে আজ এমন এক কাজ করিতেছে, যাহার সঙ্গে অন্য কোন কাজের তুলনা হইতে পারে না। মনু বলিয়াছেন, 'এই কলিযুগে মানুষের একটি কাজ করিবার আছে। আজকাল আর যজ্ঞ ও কঠোর তপস্যায় কোন ফল হয় না। এখন দানই একমাত্র কর্ম।'[1] দানের মধ্যে ধর্মদান—আধ্যাত্মিক জ্ঞানদানই শ্রেষ্ঠ দান; দ্বিতীয় বিদ্যাদান, তৃতীয় প্রাণদান, চতুর্থ অন্নদান। এই অপূর্ব দানশীল হিন্দুজাতির দিকে দৃষ্টিপাত কর। এই দরিদ্র—অতি দরিদ্র দেশে লোকে কি পরিমাণ দান করে, লক্ষ্য কর। এখানে লোকে এমন অতিথিপরায়ণ যে, কোন ব্যক্তি বিনাসম্বলে ভারতের উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারেন।

---

১ তপঃ পরং কৃতে যুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে॥ মনুসংহিতা, ১।৮৬

লোকে পরমাত্মীয়কে যেমন যত্নের সহিত নানা উপচারের দ্বারা সেবা করে, সেইরূপ তিনি যেখানেই যাইবেন, লোকে সেই স্থানের সর্বোৎকৃষ্ট বস্তুসমূহের দ্বারা তাঁহার সেবা করিবে। এখানে কোথাও যতক্ষণ পর্যন্ত এক টুকরা রুটি থাকিবে, ততক্ষণ কোন ভিক্ষুককেই না খাইয়া মরিতে হয় না।

এই দানশীল দেশে আমাদিগকে প্রথম দুই প্রকার দানে সাহসপূর্বক অগ্রসর হইতে হইবে। প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান। এই জ্ঞানদান আবার শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকিলে চলিবে না—সমগ্র জগতে ইহা প্রচার করিতে হইবে। ইহাই বরাবর হইয়া আসিয়াছে। যাঁহারা তোমাদিগকে বলেন ভারতীয় চিন্তারাশি কখনও ভারতের বাহিরে যায় নাই, যাঁহারা তোমাদিগকে বলেন ভারতের বাহিরে ধর্মপ্রচারের জন্য আমিই প্রথম সন্ন্যাসী গিয়াছি, তাঁহারা নিজেদের জাতির ইতিহাস জানেন না। এই ব্যাপার অনেকবার ঘটিয়াছে। যখনই জগতের প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই এই আধ্যাত্মিকতার অফুরন্ত বন্যা জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে। অগণিত সৈন্যদল লইয়া উচ্চরবে ভেরী বাজাইতে বাজাইতে রাজনীতিক শিক্ষা বিস্তার করা যাইতে পারে; লৌকিক জ্ঞান বা সামাজিক জ্ঞান বিস্তার করিতে হইলেও তরবারি বা কামানের সাহায্যে উহা হইতে পারে; কিন্তু শিশির যেমন অশ্রুত ও অদৃশ্যভাবে পড়িলেও রাশি রাশি গোলাপ-কলিকে প্রস্ফুটিত করে, তেমনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান নীরবে—সকলের অজ্ঞাতসারেই হওয়া সম্ভব।

ভারত বার বার জগৎকে এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান উপহার দিয়া আসিতেছে। যখনই কোন শক্তিশালী দিগ্বিজয়ী জাতি উঠিয়া জগতের বিভিন্ন জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, যখনই তাহারা পথঘাট নির্মাণ করিয়া বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত সুগম করিয়াছে, অমনি ভারত উঠিয়া সমগ্র জগতের উন্নতিকল্পে তাহার যাহা দিবার আছে, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিতরণ করিয়াছে। বুদ্ধদেব জন্মিবার বহুদিন পূর্ব হইতেই ইহা ঘটিয়াছে। চীন, এশিয়া-মাইনর ও মালয়-দ্বীপপুঞ্জের মধ্যভাগে এখনও তাহার চিহ্ন বর্তমান। যখন সেই প্রবল গ্রীক দিগ্বিজয়ী তদানীন্তন পরিচিত জগতের সমগ্র অংশ একত্র গ্রথিত করিলেন, তখনও এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল—তখনও ভারতীয় ধর্ম সেই-সকল স্থানে ছুটিয়া গিয়াছিল। আর এখন পাশ্চাত্য দেশ যে-সভ্যতার গর্ব করিয়া থাকে, তাহা সেই মহাবন্যার অবশিষ্ট চিহ্নমাত্র। এখন আবার সেই সুযোগ উপস্থিত।

ইংলণ্ডের শক্তি পৃথিবীর জাতিগুলিকে সংযুক্ত করিয়াছে, এরূপ আর পূর্বে কখনও হয় নাই। ইংরেজদের রাস্তা ও যাতায়াতের অন্যান্য উপায়-সকল জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইংরেজ-প্রতিভায় জগৎ আজ অপূর্বভাবে একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। আজকাল যেরূপ নানাস্থানে বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহ স্থাপিত হইয়াছে, মানবজাতির ইতিহাসে পূর্বে আর কখনও এরূপ হয় নাই। সুতরাং এই সুযোগে ভারত জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কালবিলম্ব না করিয়া জগৎকে আধ্যাত্মিকতা দান করিতেছে। এখন এই-সকল পথ অবলম্বন করিয়া ভারতীয় ভাবরাশি সমগ্র জগতে ছড়াইতে থাকিবে।

আমি যে আমেরিকায় গিয়াছিলাম, তাহা আমার ইচ্ছায় বা তোমাদের ইচ্ছায় হয় নাই। কিন্তু ভারতের ঈশ্বর, যিনি ইহার অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনিই আমায় পাঠাইয়াছেন এবং তিনিই এইরূপ শত শত ব্যক্তিকে জগতের সকল জাতির নিকট প্রেরণ করিবেন। পার্থিব কোন শক্তিই ইহার প্রতিরোধে সমর্থ নহে। সুতরাং তোমাদিগকে ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশেও ধর্ম-প্রচারে যাইতে হইবে। এই ধর্মপ্রচারের জন্য তোমাদিগকে ভারতের বাহিরে যাইতে হইবে; জগতের সকল জাতির নিকট, সকল ব্যক্তির নিকট প্রচার করিতে হইবে। প্রথমেই এই ধর্মপ্রচার আবশ্যক।

ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই লৌকিক বিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা আপনি আসিবে। কিন্তু যদি ধর্মকে বাদ দিয়া লৌকিক জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা কর, তবে তোমাদিগকে স্পষ্টই বলিতেছি, ভারতে তোমাদের এ চেষ্টা ব্যর্থ হইবে—লোকের হৃদয়ে উহা প্রভাব বিস্তার করিবে না। এমন কি, এত বড় যে বৌদ্ধধর্ম, তাহাও কতকটা এই কারণেই এখানে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। যদি বৌদ্ধধর্ম ফলপ্রসবে অকৃতকার্য হইয়া থাকে, তবে তুমি আমি কি করিতে পারি?

হে বন্ধুগণ, এই জন্য আমার সঙ্কল্প এই যে, ভারতে আমি কতকগুলি শিক্ষালয় স্থাপন করিব—তাহাতে আমাদের যুবকগণ ভারতে ও ভারত-বহির্ভূত দেশে আমাদের শাস্ত্র-নিহিত সত্যসমূহ প্রচার করিবার কাজে শিক্ষালাভ করিবে। মানুষ চাই, মানুষ চাই; আর সব হইয়া যাইবে। বীর্যবান্, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের

ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়। অন্যান্য সকল জিনিসের অপেক্ষা ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অধিক। ইচ্ছাশক্তির কাছে আর সমস্তই শক্তিহীন হইয়া যাইবে, কারণ ঐ ইচ্ছাশক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিতেছে। বিশুদ্ধ ও দৃঢ় ইচ্ছার শক্তি অসীম। তোমরা কি ইহা বিশ্বাস কর না? সকলের নিকট তোমাদের ধর্মের মহান্ সত্যসমূহ প্রচার কর, প্রচার কর; জগৎ এই-সকল সত্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

শত শত শতাব্দী যাবৎ মানুষকে তাহার হীনত্বজ্ঞাপক মতবাদসমূহ শেখানো হইতেছে; তাহাদিগকে শেখানো হইয়াছে—তাহারা কিছুই নহে। সর্বত্র জনসাধারণকে চিরকাল বলা হইয়াছে—তোমরা মানুষ নও। শত শত শতাব্দী যাবৎ তাহাদিগকে এইরূপে ভয় দেখানো হইয়াছে—ক্রমশঃ তাহারা সত্যসত্যই পশুস্তরে নামিয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে কখনও আত্মতত্ত্ব শুনিতে দেওয়া হয় নাই। তাহারা এখন আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করুক—তাহারা জানুক যে, তাহাদের মধ্যে নিম্নতম ব্যক্তির হৃদয়েও আত্মা রহিয়াছেন; সেই আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; তরবারি তাঁহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না; তিনি অবিনাশী অনাদি অনন্ত শুদ্ধস্বরূপ সর্বশক্তিমান্ ও সর্বব্যাপী।

তাহারা আত্মবিশ্বাসী হউক। ইংরেজ জাতির সঙ্গে তোমাদের এত প্রভেদ কিসে? তাহারা তাহাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, প্রবল কর্তব্যজ্ঞান ইত্যাদির কথা যাহাই বলুক না কেন, আমি জানিয়াছি, উভয় জাতির মধ্যে প্রভেদ কোথায়। প্রভেদ এই, ইংরেজ নিজের উপর বিশ্বাসী, তোমরা বিশ্বাসী নও। ইংরেজ বিশ্বাস করে—সে যখন ইংরেজ, তখন সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। এই বিশ্বাসবলে তাহার অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠেন, সে তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। তোমাদিগকে লোকে বলিয়া আসিতেছে ও শিক্ষা দিতেছে যে, তোমাদের কিছু করিবার ক্ষমতা নাই—কাজেই তোমরা অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছ। অতএব আত্মবিশ্বাসী হও।

আমাদের এখন আবশ্যক—শক্তিসঞ্চার। আমরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। সেইজন্যই আমাদের মধ্যে এই-সকল গুপ্তবিদ্যা, রহস্যবিদ্যা, ভুতুড়েকাণ্ড সব আসিয়াছে। ঐগুলির মধ্যে কিছু মহৎ তত্ত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু ঐগুলি আমাদিগকে প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। তোমাদের স্নায়ু সতেজ কর।

আমাদের আবশ্যক—লৌহের মতো পেশী ও বজ্রদৃঢ় স্নায়ু। আমরা অনেক দিন ধরিয়া কাঁদিয়াছি ; এখন আর কাঁদিবার প্রয়োজন নাই, এখন নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া মানুষ হও। আমাদের এখন এমন ধর্ম চাই, যাহা আমাদিগকে মানুষ করিতে পারে। আমাদের এমন সব মতবাদ আবশ্যক, যেগুলি আমাদিগকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলে। যাহাতে মানুষ গঠিত হয়, এমন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ শিক্ষার প্রয়োজন। কোন বিষয় সত্য কি না, জানিতে হইলে তাহার অব্যর্থ পরীক্ষা এই : উহা তোমার শারীরিক মানসিক বা আধ্যাত্মিক দুর্বলতা আনয়ন করে কিনা ; যদি করে, তবে তাহা বিষবৎ পরিহার কর—উহাতে প্রাণ নাই, উহা কখন সত্য হইতে পারে না। সত্য বলপ্রদ, সত্যই পবিত্রতা-বিধায়ক, সত্যই জ্ঞানস্বরূপ। সত্য নিশ্চয়ই বলপ্রদ, হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া দেয়, হৃদয়ে বল দেয়। এই-সকল রহস্যময় গুহ্য মতে কিছু সত্য থাকিলেও সাধারণতঃ উহা মানুষকে দুর্বল করিয়া দেয়। আমাকে বিশ্বাস কর, আমি সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা বুঝিয়াছি। আমি ভারতের প্রায় সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছি, এদেশের প্রায় সকল গুহা অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছি, হিমালয়েও বাস করিয়াছি। এমন অনেককে জানি, যাহারা সারা জীবন সেখানে বাস করিতেছে। আমি ঐ-সকল গুহ্য মত সম্বন্ধে এই একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ঐগুলি মানুষকে কেবল দুর্বল করিয়া দেয়। আর আমি আমার স্বজাতিকে ভালবাসি ; তোমরা তো এখনই যথেষ্ট দুর্বল হইয়া পড়িয়াছ, তোমাদিগকে আর দুর্বলতর—হীনতর হইতে দেখিতে পারি না। অতএব তোমাদের কল্যাণের জন্য এবং সত্যের জন্য, আমার স্বজাতির যাহাতে আর অবনতি না হয় সেজন্য উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি—আর না, অবনতির পথে আর অগ্রসর হইও না—যতদূর গিয়াছ, যথেষ্ট হইয়াছে।

এখন বীর্যবান্ হইবার চেষ্টা কর। তোমাদের উপনিষদ্—সেই বলপ্রদ আলোকপ্রদ দিব্য দর্শনশাস্ত্রগুলি আবার অবলম্বন কর, আর এই-সকল রহস্যময় দুর্বলতাজনক বিষয় পরিত্যাগ কর। উপনিষদ্রূপ এই মহত্তম দর্শন অবলম্বন কর। জগতের মহত্তম সত্যসকল অতি সহজ। যেমন তোমার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না, ইহাও সেইরূপ সহজবোধ্য। তোমাদের সম্মুখে উপনিষদের এই সত্যসমূহ রহিয়াছে। ঐ সত্য-সকল অবলম্বন কর, ঐগুলি উপলব্ধি করিয়া কার্যে পরিণত কর—তবে নিশ্চয় ভারতের উদ্ধার হইবে।

আর একটি কথা বলিলেই আমার বক্তব্য শেষ হইবে। লোকে স্বদেশহিতৈষিতার আদর্শের কথা বলিয়া থাকে। আমিও স্বদেশহিতৈষিতা বিশ্বাস করি। স্বদেশহিতৈষিতায় বিশ্বাসী আমারও একটা আদর্শ আছে। মহৎ কার্য করিতে গেলে তিনটি জিনিসের আবশ্যক : প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা—আন্তরিকতা আবশ্যক। বুদ্ধি, বিচারশক্তি আমাদিগকে কতটুকু সাহায্য করিতে পারে? উহারা আমাদিগকে কয়েক পদ অগ্রসর করাইয়া দেয় মাত্র, কিন্তু হৃদয়দ্বার দিয়াই মহাশক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে—জগতের সকল রহস্যই প্রেমিকের নিকট উন্মুক্ত।

হে ভাবী সংস্কারকগণ, ভাবী স্বদেশহিতৈষিগণ! তোমরা হৃদয়বান্ হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ—কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে, কোটি কোটি লোক শত শতাব্দী ধরিয়া অর্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ—অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতগগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এই-সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয়সম্পত্তি, এমন কি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিও তোমরা প্রথম সোপানে—স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ। তোমরা অনেকেই জানো, আমেরিকায় ধর্মমহাসভা হইয়াছিল বলিয়া আমি সেখানে যাই নাই, দেশের জনসাধারণের দুর্দশা দূর করিবার জন্য আমার ঘাড়ে যেন একটা ভূত চাপিয়াছিল। আমি অনেক বৎসর যাবৎ সমগ্র ভারতবর্ষে ঘুরিয়াছি, কিন্তু আমার স্বদেশবাসীর জন্য কাজ করিবার কোন সুযোগ পাই নাই। সেই জন্যই আমি আমেরিকায় গিয়াছিলাম। তখন তোমাদের মধ্যে যাহারা আমাকে জানিতে, তাহারা অবশ্য এ-কথা জানো। ধর্মমহাসভা লইয়া কে মাথা ঘামায়? এখানে আমার

নিজের রক্তমাংস-স্বরূপ জনসাধারণ দিন দিন ডুবিতেছে, তাহাদের খবর কে লয়? ইহাই ছিল আমার প্রথম সোপান।

মানিলাম, তোমরা দেশের দুর্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুর্দশা প্রতিকার করিবার কোন উপায় স্থির করিয়াছ কি? কেবল বৃথাবাক্যে শক্তিক্ষয় না করিয়া কোন কার্যকর পথ বাহির করিয়াছ কি? মানুষদের গালি না দিয়া তাহাদের যথার্থ কোন সাহায্য করিতে পারো কি? স্বদেশবাসীর এই জীবন্মৃত অবস্থা দূর করিবার জন্য তাহাদের এই ঘোর দুঃখে কিছু সান্ত্বনাবাক্য শুনাইতে পারো কি?—কিন্তু ইহাতেও হইল না। তোমরা কি পর্বতপ্রায় বাধাবিঘ্নকে তুচ্ছ করিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ তরবারি হস্তে তোমাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি তোমরা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছ, তাহাই করিয়া যাইতে পারো কি? যদি তোমাদের স্ত্রী-পুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, যদি তোমাদের ধন-মান সব যায়, তথাপি কি তোমরা উহা ধরিয়া থাকিতে পারো? রাজা ভর্তৃহরি যেমন বলিয়াছেন, 'নীতিনিপুণ ব্যক্তিগণ নিন্দাই করুন বা স্তবই করুন, লক্ষ্মীদেবী গৃহে আসুন বা যথা ইচ্ছা চলিয়া যান, মৃত্যু আজই হউক বা যুগান্তরেই হউক, তিনিই ধীর, যিনি সত্য হইতে এক বিন্দুও বিচলিত হন না।'[১] সেইরূপ নিজ পথ হইতে বিচলিত না হইয়া তোমরা কি তোমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারো? তোমাদের কি এইরূপ দৃঢ়তা আছে? যদি এই তিনটি জিনিস তোমাদের থাকে, তবে তোমরা প্রত্যেকেই অলৌকিক কার্য সাধন করিতে পারো। তোমাদের সংবাদ-পত্রে লিখিবার অথবা বক্তৃতা দিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন হইবে না। তোমাদের মুখ এক অপূর্ব স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ধারণ করিবে। তোমরা যদি পর্বতের গুহায় যাইয়া বাস কর, তথাপি তোমাদের চিন্তারাশি ঐ পর্বতপ্রাচীর ভেদ করিয়া বাহির হইবে। হয়তো শত শত বৎসর যাবৎ উহা কোন আশ্রয় না পাইয়া সূক্ষ্মাকারে সমগ্র জগতে ভ্রমণ করিবে। কিন্তু একদিন না একদিন উহা কোন না কোন মস্তিষ্ককে আশ্রয় করিবেই করিবে। তখন সেই চিন্তানুযায়ী কার্য হইতে থাকিবে। অকপটতা, সাধু উদ্দেশ্য ও চিন্তার শক্তি অসামান্য।

১ নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু, লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা, ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥—নীতিশতক, ৭৪

আর এক কথা—আমার আশঙ্কা হয়, তোমাদের বিলম্ব হইতেছে; হে আমার স্বদেশবাসিগণ, হে আমার বন্ধুগণ, হে আমার সন্তানগণ, এই জাতীয় অর্ণবপোত লক্ষ লক্ষ মানবাত্মাকে জীবন-নদীতে পারাপার করিতেছে। ইহার সহায়তায় অনেক শতাব্দী যাবৎ লক্ষ লক্ষ মানব জীবন-নদীর অপর পারে অমৃতধামে নীত হইয়াছে। আজ হয়তো তোমাদের নিজ-দোষেই উহাতে দু-একটি ছিদ্র হইয়াছে, উহা একটু খারাপও হইয়া গিয়াছে। তোমরা কি এখন উহার নিন্দা করিবে? জগতের সকল জিনিস অপেক্ষা যে-জিনিস আমাদের অধিক কাজে আসিয়াছে, এখন কি তাহার উপর অভিশাপ বর্ষণ করা উচিত? যদি এই জাতীয় অর্ণবপোতে—আমাদের এই সমাজে—ছিদ্র হইয়া থাকে, তথাপি আমরা তো এই সমাজেরই সন্তান। আমাদিগকেই ঐ ছিদ্র বন্ধ করিতে হইবে। আনন্দের সহিত আমাদের হৃদয়ের শোণিত দিয়াও বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; যদি আমরা বন্ধ করিতে না পারি, তবে মরিতে হইবে। আমরা আমাদের মস্তিষ্করূপ কাষ্ঠখণ্ডগুলি দ্বারা ঐ অর্ণবপোতের ছিদ্রগুলি বন্ধ করিব, কিন্তু কখনই উহার নিন্দা করিব না। এই সমাজের বিরুদ্ধে একটা কর্কশ কথা বলিও না। আমি ইহার অতীত মহত্ত্বের জন্য ইহাকে ভালবাসি। আমি তোমাদের সকলকে ভালবাসি, কারণ তোমরা দেবগণের বংশধর, তোমরা মহামহিমান্বিত পূর্বপুরুষগণের সন্তান। তোমাদের সর্বপ্রকার কল্যাণ হউক। তোমাদিগকে কি নিন্দা করিব বা গালি দিব?—কখনই নয়। হে আমার সন্তানগণ, তোমাদের নিকট আমার সমুদয় পরিকল্পনা বলিতে আসিয়াছি। যদি তোমরা আমার কথা শোন, আমি তোমাদের সঙ্গে কাজ করিতে প্রস্তুত আছি। যদি না শোন, এমন কি আমাকে ভারতভূমি হইতে তাড়াইয়া দাও, তথাপি আমি তোমাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিব—আমরা সকলে ডুবিতেছি। এই জন্যই আমি তোমাদের ভিতর তোমাদেরই একজন হইয়া তোমাদের সঙ্গে মিশিতে আসিয়াছি। আর যদি আমাদিগকে ডুবিতেই হয়, তবে আমরা যেন সকলে এক সঙ্গে ডুবি, কিন্তু কাহারও প্রতি যেন কটূক্তি প্রয়োগ না করি।

ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা

[মাদ্রাজে প্রদত্ত তৃতীয় বক্তৃতা]

আমাদের জাতি ও ধর্মের অভিধা বা সংজ্ঞা-স্বরূপ একটি শব্দ খুব চলিত হইয়া পড়িয়াছে। আমি 'হিন্দু' শব্দটি লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিতেছি। 'বেদান্তধর্ম' বলিতে আমি কি লক্ষ্য করিয়া থাকি, তাহা বুঝাইবার জন্য এই শব্দটির অর্থ ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। প্রাচীন পারসীকগণ সিন্ধু-নদকে 'হিন্দু' বলিতেন। সংস্কৃত ভাষায় যেখানে 'স' আছে, প্রাচীন পারসীক ভাষায় তাহাই 'হ'-রূপে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে সিন্ধু হইতে 'হিন্দু' হইল। আর তোমরা সকলেই জানো, গ্রীকগণ 'হ' উচ্চারণ করিতে পারিত না; সুতরাং তাহারা একেবারে 'হ'টিকে উড়াইয়া দিল—এইরূপে আমরা 'ইণ্ডিয়ান' নামে পরিচিত হইলাম।

এখন কথা এই, প্রাচীনকালে এ-শব্দের অর্থ যাহাই থাকুক, উহা সিন্ধুনদের অপরতীরের অধিবাসিগণকেই বুঝাক বা যাহাই বুঝাক, বর্তমানে এই শব্দের আর কোন সার্থকতা নাই; কারণ এখন আর সিন্ধুনদের অপরতীরের অধিবাসিগণ একধর্মাবলম্বী নহে। এখানে এখন আসল হিন্দু, মুসলমান, পারসীক, খ্রীষ্টান এবং অল্পসংখ্যক বৌদ্ধ ও জৈন বাস করিতেছেন। 'হিন্দু' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে ইঁহাদের সকলকেই হিন্দু বলিতে হয়, কিন্তু ধর্মহিসাবে ইঁহাদের সকলকে হিন্দু বলা চলে না। আর আমাদের ধর্ম যেন নানা মত, নানা ভাব এবং নানাবিধ অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপের সমষ্টিস্বরূপ—এইসব একসঙ্গে রহিয়াছে, কিন্তু ইহাদের একটা সাধারণ নাম নাই, একটা মণ্ডলী নাই, একটা সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান নাই। এই কারণে আমাদের ধর্মের একটি সাধারণ বা সর্ববাদিসম্মত নাম দেওয়া বড় কঠিন। বোধ হয়, একটিমাত্র বিষয়ে আমাদের সকল সম্প্রদায় একমত, আমরা সকলেই আমাদের শাস্ত্র—বেদে বিশ্বাসী। এটি বোধ হয় নিশ্চিত যে, যে-ব্যক্তি বেদের সর্বোচ্চ প্রামাণ্য অস্বীকার করে, তাহার নিজেকে হিন্দু বলিবার অধিকার নাই।

তোমরা সকলেই জানো, এই বেদসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে নানাবিধ যাগযজ্ঞ ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি আছে, উহাদের

মধ্যে অধিকাংশই আজকাল প্রচলিত নাই। জ্ঞানকাণ্ডে বেদের আধ্যাত্মিক উপদেশসমূহ লিপিবদ্ধ—উহা 'উপনিষদ্' বা 'বেদান্ত' নামে পরিচিত। দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী আচার্য ও দার্শনিকগণ—সকলেই উহাকে উচ্চতম প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় প্রত্যেক দর্শন ও প্রত্যেক সম্প্রদায়কেই দেখাইতে হয় যে, তাঁহার দর্শন বা সম্প্রদায় উপনিষদ্-রূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি কেহ তাহা না দেখাইতে পারেন, তবে সেই দর্শন বা সম্প্রদায় প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী বলিয়া পরিগণিত হইবে। সুতরাং বর্তমানকালে সমগ্র ভারতের হিন্দুকে যদি কোন সাধারণ নামে পরিচিত করিতে হয়, তবে তাহাদিগকে সম্ভবতঃ 'বৈদান্তিক' বা 'বৈদিক'—এই দুইটির মধ্যে যেটি তোমাদের ইচ্ছা বলিলেই ঠিক বলা হইবে। আর আমি 'বৈদান্তিক ধর্ম' ও 'বেদান্ত' শব্দ দুইটি ঐ অর্থেই সর্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি।

আমি আর একটু স্পষ্ট করিয়া এইটি বুঝাইতে চাই; কারণ ইদানীং অনেকের পক্ষে বেদান্তদর্শনের 'অদ্বৈত' ব্যাখ্যাকেই 'বেদান্ত' শব্দের সহিত সমার্থক-রূপে প্রয়োগ করা একটা চলিত প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা সকলেই জানি, উপনিষদ্‌কে ভিত্তি করিয়া যে-সকল বিভিন্ন দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে, অদ্বৈতবাদ তাহাদের অন্যতম মাত্র। উপনিষদের প্রতি অদ্বৈতবাদীর যতটা শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরও ততটা আছে; এবং অদ্বৈতবাদীরা তাঁহাদের দর্শন বেদান্ত-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যতটা দাবি করেন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরাও ততটাই করিয়া থাকেন। দ্বৈতবাদী ও ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায়গুলিও এইরূপ করিয়া থাকেন। ইহা সত্ত্বেও সাধারণ লোকের মনে 'বৈদান্তিক' ও 'অদ্বৈতবাদী' সমার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সম্ভবতঃ ইহার কিছু কারণও আছে।

যদিও বেদই আমাদের প্রধান শাস্ত্র, তথাপি বেদের পরবর্তী স্মৃতি-পুরাণও আমাদের শাস্ত্র; কারণ সেগুলিতে বেদেরই মত বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত ও নানাবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। এগুলি অবশ্য বেদের মতো প্রামাণিক নহে। আর ইহাও শাস্ত্রবিধান যে, যেখানে শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে কোন বিরোধ হইবে, সেখানে শ্রুতির মত গ্রাহ্য হইবে এবং স্মৃতির মত পরিত্যাগ করিতে হইবে। এখন আমরা দেখিতে পাই, অদ্বৈতকেশরী শঙ্করাচার্য ও তাঁহার অনুগামী আচার্যগণের ব্যাখ্যায় প্রমাণরূপে উপনিষদ্ অধিক পরিমাণে

উদ্ধৃত হইয়াছে। কেবল যেখানে এমন বিষয় ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছে, যাহা শ্রুতিতে কোনরূপে পাওয়া যায় না, এমন অল্পস্থলেই কেবল স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্যান্য-মতবাদিগণ কিন্তু শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতির উপরেই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়াছেন; যতই আমরা দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়সমূহের পর্যালোচনা করি, ততই দেখিতে পাই, তাঁহাদের উদ্ধৃত স্মৃতিবাক্য শ্রুতির তুলনায় এত অধিক যে, বৈদান্তিকের নিকট তাহা আশা করা উচিত নয়। বোধ হয়, ইঁহারা স্মৃতি-পুরাণাদি প্রমাণের উপর এত অধিক নির্ভর করিয়াছিলেন যে, কালে অদ্বৈতবাদীই খাঁটি বৈদান্তিক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

যাহা হউক, আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, 'বেদান্ত' শব্দ দ্বারা ভারতীয় ধর্মসমষ্টি বুঝিতে হইবে। আর বেদান্ত যখন বেদ, তখন ইহা সর্ববাদি-সম্মতিক্রমে আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ। অবশ্য আধুনিক পণ্ডিতগণের মত যাহাই হউক, হিন্দুরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নন যে, বেদের কতকাংশ এক সময়ে এবং কতকাংশ অন্য সময়ে লিখিত হইয়াছে। হিন্দুরা অবশ্য এখনও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, সমগ্র বেদ এককালে উৎপন্ন হইয়াছিল, অথবা যদি আমার এরূপ ভাষা-প্রয়োগে কেহ আপত্তি না করেন—উহারা কখনই সৃষ্ট হয় নাই, উহারা চিরকাল সৃষ্টিকর্তার মনে বর্তমান ছিল। 'বেদান্ত' শব্দে আমি সেই অনাদি অনন্ত জ্ঞানরাশিকেই লক্ষ্য করিতেছি। ভারতের দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ সকলই উহার অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবতঃ আমরা বৌদ্ধধর্ম, এমন কি জৈনধর্মের অংশবিশেষ গ্রহণ করিতে পারি—যদি উক্ত ধর্মাবলম্বিগণ অনুগ্রহপূর্বক আমাদের মধ্যে আসিতে সম্মত হন। আমাদের হৃদয় তো যথেষ্ট প্রশস্ত—আমরা তো তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত—তাঁহারাই আসিতে অসম্মত। আমরা তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে অনায়াসে প্রস্তুত; কারণ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিবে যে, বৌদ্ধধর্মের সারভাগ ঐ-সকল উপনিষদ্ হইতেই গৃহীত; এমন কি বৌদ্ধধর্মের নীতি—তথাকথিত অদ্ভুত ও মহান্ নীতিতত্ত্ব—কোন না কোন উপনিষদে অবিকল বর্তমান। এইরূপ জৈনদেরও ভাল ভাল মতগুলি উপনিষদে রহিয়াছে, কেবল অযৌক্তিক সিদ্ধান্তগুলি নাই। পরবর্তী কালে ভারতীয় ধর্মচিন্তার যে-সকল পরিণতি হইয়াছে, সেগুলিরও বীজ আমরা উপনিষদে দেখিতে পাই। সময়ে সময়ে বিনা যুক্তিতে এরূপ অভিযোগ করা হইয়া থাকে যে, উপনিষদে 'ভক্তি'র আদর্শ নাই। যাঁহারা উপনিষদ্ বিশেষভাবে

অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন—এ অভিযোগ মোটেই সত্য নহে। প্রত্যেক উপনিষদেই অনুসন্ধান করিলে যথেষ্ট ভক্তির কথা পাওয়া যায়। তবে অন্যান্য অনেক বিষয়, যাহা পরবর্তী কালে পুরাণ ও স্মৃতিসমূহে বিশেষরূপে পরিণত হইয়া ফলপুষ্পশোভিত মহীরুহের আকার ধারণ করিয়াছে, উপনিষদে সেগুলি মাত্র বীজভাবে বর্তমান। উপনিষদে যেন উহারা চিত্রের প্রথম রেখাপাত অথবা কাঠামোরূপে বর্তমান। কোন না কোন পুরাণে ঐ চিত্রগুলি পরিস্ফুট করা হইয়াছে, কঙ্কালসমূহে মাংস-শোণিত সংযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এমন কোন সুপরিণত ভারতীয় আদর্শ নাই, যাহার বীজ সেই সর্বভাবের খনিস্বরূপ উপনিষদে না পাওয়া যায়। ভালভাবে উপনিষদের জ্ঞান অর্জন করেন নাই, এরূপ কয়েকজন ব্যক্তি প্রমাণ করিবার হাস্যাস্পদ চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভক্তিবাদ বিদেশাগত; কিন্তু তোমরা সকলেই জানো, তাঁহাদের সমুদয় চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তোমাদের যতটুকু ভক্তির প্রয়োজন, তার সবই উপনিষদের কথা কি, সংহিতাতেই রহিয়াছে—উপাসনা প্রেম ভক্তিতত্ত্বের যাহা কিছু আবশ্যক, সবই রহিয়াছে; কেবল ভক্তির আদর্শ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতেছে। সংহিতা-ভাগে স্থানে স্থানে ভীতি-প্রসূত ধর্মের চিহ্ন পাওয়া যায়। সংহিতাভাগে স্থানে স্থানে দেখা যায়, উপাসক—বরুণ বা অন্য কোন দেবতার সম্মুখে ভয়ে কাঁপিতেছে; স্থানে স্থানে দেখা যায়, তাহারা নিজদিগকে পাপী ভাবিয়া অতিশয় যন্ত্রণা পাইতেছে; কিন্তু উপনিষদে এ-সকল বর্ণনার স্থান নাই। উপনিষদে ভয়ের ধর্ম নাই; উপনিষদের ধর্ম—প্রেমের, উপনিষদের ধর্ম—জ্ঞানের।

এই উপনিষদ্‌সমূহই আমাদের শাস্ত্র। এইগুলি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আর আমি তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি, পরবর্তী পৌরাণিক শাস্ত্র ও বেদের মধ্যে যেখানেই প্রভেদ লক্ষিত হইবে, সেখানেই পুরাণের মত অগ্রাহ্য করিয়া বেদের মত গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু কার্যতঃ দেখিতে পাই, আমরা শতকরা নব্বই জন পৌরাণিক আর বাকি শতকরা দশ জন বৈদিক—তাহাও হয় কি না সন্দেহ। আরও দেখিতে পাই, আমাদের মধ্যে নানাবিধ অত্যন্ত বিরোধী আচার বিদ্যমান—দেখিতে পাই, আমাদের সমাজে এমন সব ধর্মমত রহিয়াছে, যেগুলির কোন প্রমাণ হিন্দুদের শাস্ত্রে নাই। আর শাস্ত্রপাঠে আমরা দেখিতে পাই এবং দেখিয়া আশ্চর্য হই যে, আমাদের দেশে অনেক স্থলে এমন সব প্রথা প্রচলিত আছে, যেগুলির প্রমাণ বেদ স্মৃতি

পুরাণ কোথাও নাই,—সেগুলি কেবল বিশেষ বিশেষ দেশাচারমাত্র। তথাপি প্রত্যেক অজ্ঞ গ্রামবাসীই মনে করে, যদি তাহার গ্রাম্য আচারটি উঠিয়া যায়, তাহা হইলে সে আর হিন্দু থাকিবে না। তাহার মনে বৈদান্তিক ধর্ম ও এই-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশাচার অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। শাস্ত্রপাঠ করিয়াও সে বুঝিতে পারে না যে, সে যাহা করিতেছে, তাহাতে শাস্ত্রের সম্মতি নাই! তাহার পক্ষে ইহা বুঝা বড় কঠিন হইয়া উঠে যে, ঐ-সকল আচার পরিত্যাগ করিলে তাহার কিছুই ক্ষতি হইবে না, বরং সে পূর্বাপেক্ষা উন্নততর হইবে, মানুষের মতো মানুষ হইবে। দ্বিতীয়তঃ আর এক অসুবিধা—আমাদের শাস্ত্র অতি বৃহৎ ও অসংখ্য। পতঞ্জলি-প্রণীত 'মহাভাষ্য' নামক শব্দশাস্ত্রে পাঠ করা যায় যে, সামবেদের সহস্র শাখা ছিল। সেগুলি গেল কোথায়, কেহই জানে না। প্রত্যেক বেদ সম্বন্ধেই এইরূপ। এই-সকল গ্রন্থের অধিকাংশ লোপ পাইয়াছে, সামান্য অংশই আমাদের নিকট বর্তমান। এক এক ঋষি-পরিবার এক এক শাখার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই-সকল পরিবারের মধ্যে অধিকাংশেরই হয় স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বংশলোপ হইয়াছে, অথবা বৈদেশিক অত্যাচারে বা অন্য কারণে তাঁহাদের বিনাশ ঘটিয়াছে। আর তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যে-বেদের শাখাবিশেষ রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও লোপ পাইয়াছে। এই বিষয়টি আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক; কারণ যাহারা কিছু নূতন বিষয় প্রচার করিতে অথবা বেদের বিরোধী কোন বিষয় সমর্থন করিতে চায়, তাহাদের পক্ষে এই যুক্তিটি চরম অবলম্বন হইয়া দাঁড়ায়। যখনই ভারতে শ্রুতি ও দেশাচার লইয়া তর্ক উপস্থিত হয় এবং যখনই ইহা দেখাইয়া দেওয়া হয় যে, এই দেশাচারটি শ্রুতি-বিরুদ্ধ, তখন অপর পক্ষ এই উত্তর দিয়া থাকে, 'না, উহা শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে, উহা শ্রুতির সেই-সকল শাখায় ছিল, যেগুলি এখন লোপ পাইয়াছে। ঐ প্রথাটিও বেদসম্মত।' শাস্ত্রের এই-সকল নানাবিধ টীকা-টিপ্পনীর ভিতর কোন সাধারণ সূত্র বাহির করা অবশ্যই বিশেষ কঠিন। কিন্তু সহজেই বুঝিতে পারি যে, এই-সকল নানাবিধ বিভাগ ও উপবিভাগের একটি সাধারণ ভিত্তি নিশ্চয়ই আছে। অট্টালিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি নিশ্চয় একটি সাধারণ নক্সা অনুযায়ী নির্মিত হইয়াছে। আমরা যাহাকে আমাদের ধর্ম বলি, সেই আপাতবিশৃঙ্খল মতগুলির নিশ্চয় কোন সাধারণ ভিত্তি আছে; তাহা না হইলে উহা এতদিন টিকিয়া থাকিতে পারিত না।

আবার আমাদের ভাষ্যকারদিগের ভাষ্য আলোচনা করিতে গেলে আর এক বাধা উপস্থিত হয়। অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকার যখন অদ্বৈতপর শ্রুতির ব্যাখ্যা করেন, তখন তিনি উহার সোজাসুজি অর্থ করেন; কিন্তু তিনিই আবার যখন দ্বৈতপর শ্রুতিব ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন, তখন উহার শব্দার্থ বিকৃত করিয়া উহা হইতে অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থ বাহির করেন। ভাষ্যকার নিজ মনোমত অর্থ বাহির করিবার জন্য সময়ে সময়ে 'অজা' (জন্ম-রহিত) শব্দের অর্থ ছাগী করিয়াছেন—কি অদ্ভুত পরিবর্তন! দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারেরাও এইরূপ, এমন কি ইহা অপেক্ষাও বিকৃতভাবে শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেখানে যেখানে তাঁহারা দ্বৈতপর শ্রুতি পাইয়াছেন, সেগুলি যথাযথ রাখিয়া দিয়াছেন, কিন্তু যেখানেই অদ্বৈতবাদের কথা আসিয়াছে, সেইখানেই তাঁহারা সেই-সকল শ্রুতির যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সংস্কৃত ভাষা এত জটিল, বৈদিক সংস্কৃত এত প্রাচীন, সংস্কৃত শব্দশাস্ত্র এত সুপরিণত যে, একটি শব্দের অর্থ লইয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া তর্ক চলিতে পারে। কোন পণ্ডিতের যদি খেয়াল হয়, তবে তিনি যে-কোন ব্যক্তির প্রলাপোক্তিকেও যুক্তিবলে এবং শাস্ত্র ও ব্যাকরণের নিয়ম উদ্ধৃত করিয়া শুদ্ধ সংস্কৃত করিয়া তুলিতে পারেন। উপনিষদ্ বুঝিবার পক্ষে এই-সকল বাধাবিঘ্ন আছে। বিধাতার ইচ্ছায় আমি এমন এক ব্যক্তির সঙ্গলাভের সুযোগ পাইয়াছিলাম, যিনি একদিকে যেমন ঘোর দ্বৈতবাদী, অপরদিকে তেমনি একনিষ্ঠ অদ্বৈতবাদী ছিলেন; যিনি একদিকে যেমন পরম ভক্ত, অপরদিকে তেমনি পরম জ্ঞানী ছিলেন। এই ব্যক্তির শিক্ষাতেই আমি শুধু অন্ধভাবে ভাষ্যকারদিগের অনুসরণ না করিয়া স্বাধীনভাবে উৎকৃষ্টরূপে প্রথমে উপনিষদ্ ও অন্যান্য শাস্ত্র বুঝিতে শিখিয়াছি। আমি এ-বিষয়ে যৎসামান্য যাহা অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এই-সকল শাস্ত্রবাক্য পরস্পরবিরোধী নহে। সুতরাং আমাদের শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। শ্রুতিবাক্যগুলি অতি মনোরম, অতি অদ্ভুত আর উহারা পরস্পরবিরোধী নহে, ঐগুলির মধ্যে অপূর্ব সামঞ্জস্য বিদ্যমান, একটি তত্ত্ব যেন অপরটির সোপানস্বরূপ। আমি এই-সকল উপনিষদেই একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যে, প্রথমে দ্বৈতভাবের কথা—উপাসনা প্রভৃতি আরম্ভ হইয়াছে, শেষে অদ্বৈতভাবের অপূর্ব উচ্ছ্বাসে সে-গুলি সমাপ্ত হইয়াছে।

সুতরাং এখন এই ব্যক্তির জীবনের আলোকে আমি দেখিতেছি যে, দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর পরস্পর বিবাদ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। উভয়েরই জাতীয় জীবনে বিশেষ স্থান আছে। দ্বৈতবাদী থাকিবেই— অদ্বৈতবাদীর ন্যায় দ্বৈতবাদীরও জাতীয় ধর্মজীবনে বিশেষ স্থান আছে। একটি ব্যতীত অপরটি থাকিতে পারে না, একটি অপরটির পরিণতি ; একটি যেন গৃহ, অপরটি ছাদ ; একটি যেন মূল, অপরটি ফল।

আর উপনিষদের শব্দার্থের বিপর্যয় করিবার চেষ্টা আমার নিকট অতিশয় হাস্যাস্পদ বলিয়া বোধ হয় ; কারণ আমি দেখিতে পাই, উহার ভাষাই অপূর্ব। শ্রেষ্ঠ দর্শনরূপে উহার গৌরব ছাড়িয়া দিলেও, মানবজাতির মুক্তিপথ-প্রদর্শক ধর্মবিজ্ঞানরূপে উহার অদ্ভুত গৌরব ছাড়িয়া দিলেও ঔপনিষদিক সাহিত্যে মহান্ ভাবের যেমন অতি অপূর্ব চিত্র আছে, জগতে আর কোথাও তেমন নাই। এখানেই মানবমনের সেই প্রবল বিশেষত্ব—সেই অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ হিন্দুমনের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

অন্যান্য সকল জাতির ভিতরেই এই মহান্ ভাবের চিত্র অঙ্কন করিবার চেষ্টা দেখা যায় ; কিন্তু প্রায় সর্বত্রই দেখিবে, তাহারা বাহ্য প্রকৃতির মহান্ ভাবকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ মিল্টন, দান্তে, হোমর বা অন্য যে-কোন পাশ্চাত্য কবির কাব্য আলোচনা করা যাউক, তাঁহাদের কাব্যে স্থানে স্থানে মহত্ত্বব্যঞ্জক অপূর্ব শ্লোকাবলী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে সর্বত্রই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনার চেষ্টা—বহিঃপ্রকৃতির বিশাল ভাব, দেশকালের অনন্ত ভাবের বর্ণনা। আমরা বেদের সংহিতাভাগেও এই চেষ্টা দেখিতে পাই। সৃষ্টি প্রভৃতি বর্ণনাত্মক কতকগুলি অপূর্ব ঋঙ্মন্ত্রে বাহ্য প্রকৃতির মহান্ ভাব, দেশকালের অনন্তত্ব যতদূর উচ্চভাষায় সম্ভব বর্ণনা করা হইয়াছে ; কিন্তু তাঁহারা যেন শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন যে, এ উপায়ে অনন্তস্বরূপকে ধরিতে পারা যায় না ; বুঝিলেন, তাঁহাদের মনের যে-সকল ভাব তাঁহারা ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, অনন্ত দেশ অনন্ত বিস্তার ও অনন্ত বাহ্যপ্রকৃতিও সেগুলি প্রকাশ করিতে অক্ষম। তখন তাঁহারা জগৎ-সমস্যা ব্যাখ্যা করিবার জন্য অন্য পথ ধরিলেন।

উপনিষদের ভাষা নূতন মূর্তি ধারণ করিল—উপনিষদের ভাষা একরূপ নাস্তিভাবদ্যোতক, স্থানে স্থানে অস্ফুট, উহা যেন তোমাকে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে

লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু অর্ধ পথে গিয়াই ক্লান্ত হয়, তোমাকে কেবল এক ধারণাতীত অতীন্দ্রিয় বস্তুর আভাস দেখাইয়া দেয়, তথাপি সেই বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তোমার কোন সন্দেহ থাকে না। জগতে এমন কবিতা কোথায়, যাহার সহিত এই শ্লোকের তুলনা হইতে পারে?—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।[১]

—সেখানে সূর্য কিরণ দেয় না, চন্দ্র-তারাও নহে, এই বিদ্যুৎও সেই স্থানকে আলোকিত করিতে পারে না, এই সামান্য অগ্নির আর কথা কি?

পৃথিবীর সমগ্র দার্শনিক ভাবের পূর্ণতর চিত্র আর কোথায় পাইবে? হিন্দুজাতির সমগ্র চিন্তার, মানবজাতির মুক্তির সামগ্রিক কল্পনার সারাংশ যেমন অদ্ভুত ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে, যেমন অপূর্ব রূপকে বর্ণিত হইয়াছে, তেমন আর কোথায় পাইবে?

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥[২]

—একই বৃক্ষের উপর দুইটি সুন্দরপক্ষযুক্ত পক্ষী রহিয়াছে—উভয়েই পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন; তন্মধ্যে একটি সেই বৃক্ষের ফল খাইতেছে, অপরটি না খাইয়া স্থিরভাবে নীরবে বসিয়া আছে। নিম্নশাখায় উপবিষ্ট পক্ষী কখন মিষ্ট কখন বা কটু ফল ভোজন করিতেছে এবং সেই কারণে কখন সুখী, কখন বা দুঃখী হইতেছে; কিন্তু উপরিস্থ শাখার পক্ষীটি স্থির গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট—সে ভালমন্দ কোন ফলই খাইতেছে না, সে সুখ-দুঃখ উভয়েই উদাসীন—নিজ মহিমায় মগ্ন হইয়া আছে। এই পক্ষিদ্বয়—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। মানবাত্মার ইহাই যথার্থ চিত্র। মানুষ ইহজীবনের স্বাদু ও কটু ফল ভোজন করিতেছে—সে কাঞ্চনের অন্বেষণে মত্ত—সে ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে

১ কঠোপনিষদ্, ২।২।১৫ ২ মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩।১।১-৩

ধাবমান, সংসারের ক্ষণিক বৃথা সুখের জন্য মরিয়া হইয়া পাগলের মতো ছুটিতেছে।

অন্য আর এক স্থলে উপনিষদ্ সারথি ও তাহার অসংযত দুষ্ট অশ্বের সহিত মানবের এই ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণের তুলনা করিয়াছেন। মানুষ এইরূপে জীবনের বৃথা সুখানুসন্ধান-চেষ্টায় ছুটিতেছে। জীবনের উষাকালে মানুষ কত সোনার স্বপ্ন দেখিয়া থাকে; কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারে, সেগুলি স্বপ্নমাত্র—বার্ধক্যে সে তাহার অতীত কর্মসমূহেরই রোমন্থন করিতে থাকে, পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে, কিন্তু কিসে এই ঘোর সংসারজাল হইতে বাহির হইবে, তাহার কোন উপায় খুঁজিয়া পায় না। ইহাই মানুষের নিয়তি। কিন্তু সকল মানুষেরই জীবনে সময়ে সময়ে এমন শুভ মুহূর্ত আসিয়া থাকে—গভীরতম শোকে, এমন কি গভীরতম আনন্দের মধ্যেও মানুষের এমন শুভক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন সেই সূর্যালোক-অবরোধকারী মেঘের খানিকটা যেন ক্ষণকালের জন্য সরিয়া যায়। তখন আমরা আমাদের এই সীমাবদ্ধ ভাব সত্ত্বেও ক্ষণকালের জন্য সেই সর্বাতীত সত্তার চকিতবৎ দর্শনলাভ করি; দূরে দূরে—পঞ্চেন্দ্রিয়াবদ্ধ জীবনের বহু দূরে—এই সংসারের ব্যর্থ ভোগ ও সুখদুঃখ হইতে অনেক দূরে, দূরে দূরে—প্রকৃতির পরপারে—ইহলোকে বা পরলোকে আমরা যে সুখভোগের কল্পনা করিয়া থাকি, তাহা হইতে বহু দূরে, বিত্তৈষণা লোকৈষণা প্রজৈষণা হইতে বহু দূরে—তখন মানুষ ক্ষণিকের জন্য দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া স্থিরভাব অবলম্বন করে, সে তখন বৃক্ষের উপরিভাগে অবস্থিত অপর পক্ষীটিকে শান্ত ও মহিমময় অবলোকন করে,—সে দেখে, পক্ষীটি স্বাদু অ-স্বাদু কোন ফল ভক্ষণ করিতেছে না—নিজ মহিমায় নিজে বিভোর, আত্মতৃপ্ত;—যেমন গীতায় উক্ত হইয়াছে:

> যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
> আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥

—যিনি আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত ও আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার আর কোন কার্য অবশিষ্ট থাকে না। তিনি আর কেন বৃথা কার্য করিয়া সময় কাটাইবেন?

একবার চকিতভাবে দর্শনের পর মানুষ আবার ভুলিয়া যায়, আবার সংসারবৃক্ষে স্বাদু অস্বাদু ফল ভোজন করিতে থাকে—তখন আর তাহার কিছুই স্মরণ থাকে না। আবার হয়তো কিছুদিন পরে সে আর একবার পূর্বের ন্যায়

চকিত দর্শন লাভ করে এবং যতই ঘা খায়, ততই সেই নিম্নশাখাস্থিত পক্ষী উপরিস্থ পক্ষীর নিকটবর্তী হইতে থাকে। যদি সৌভাগ্যক্রমে সে ক্রমাগত সংসারের তীব্র আঘাত পায়, তবে সে তাহার সঙ্গী—তাহাব প্রাণ—তাহার সখা সেই অপর পক্ষীর ক্রমশঃ সমীপবর্তী হইতে থাকে। আর যতই সে অধিকতর নিকটবর্তী হয়, ততই দেখে সেই উপরিস্থ পক্ষীর দেহের জ্যোতিঃ আসিয়া তাহার পক্ষের চতুর্দিকে খেলা করিতেছে ; যতই সমীপবর্তী হয়, ততই তাহার রূপান্তর হইতে থাকে। ক্রমশঃ যতই সে নিকট হইতে নিকটতর হইতে থাকে, ততই দেখে—সে যেন মিলাইয়া যাইতেছে ; অবশেষে সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া যায়। তখন সে বুঝিতে পারে—তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব কোনকালে ছিল না, পত্ররাশির ভিতর সঞ্চরণশীল পক্ষীটি শান্ত গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট অপর পক্ষীর প্রতিবিম্বমাত্র। তখন সে জানিতে পারে—সে নিজেই ঐ উপরিস্থ পক্ষী, সে সর্বদাই শান্তভাবে অবস্থিত ছিল ; ঐ মহিমা তাহারই। তখন আর কোন ভয় থাকে না, তখন সে সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইয়া ধীর শান্তভাবে অবস্থান করে। এই রূপকের মাধ্যমে উপনিষদ্ তোমাদিগকে দ্বৈতভাব হইতে আরম্ভ করিয়া চূড়ান্ত অদ্বৈতভাবে লইয়া যাইতেছেন।

উপনিষদের এই অপূর্ব কবিত্ব, মহত্ত্বের চিত্র, মহোচ্চ ভাবসমূহ দেখাইবার জন্য শত শত উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু এই বক্তৃতায় আমাদের আর সময় নাই। তবে আর একটি কথা বলিব—উপনিষদের ভাষা, ভাব সব কিছুরই ভিতর কোন কুটিল ভাব নাই, উহার প্রত্যেক কথাই তরবারি-ফলকের মতো, হাতুড়ির ঘায়ের মতো সাক্ষাৎভাবে হৃদয়ে আঘাত করে। উহাদের *অর্থ বুঝিতে কিছুমাত্র ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই*—সেই সঙ্গীতের প্রত্যেকটি সুরের একটা জোর আছে, প্রত্যেকটি তাহার সম্পূর্ণ ভাব হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেয়। কোন ঘোরফের নাই, একটিও অসম্বদ্ধ প্রলাপ নাই, একটিও জটিল বাক্য নাই, যাহাতে মাথা গুলাইয়া যায়। উহাতে অবনতির চিহ্নমাত্র নাই, বেশী রূপক-বর্ণনার চেষ্টা নাই। বিশেষণের পর বিশেষণ দিয়া ভাবটিকে ক্রমাগত জটিলতর করা হইল, প্রকৃত বিষয়টি একেবারে চাপা পড়িল, মাথা গুলাইয়া গেল, তখন সেই শাস্ত্ররূপ গোলকধাঁধার বাহিরে যাইবার আর উপায় রহিল না—উপনিষদে এ-ধরনের চেষ্টার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। যদি ইহা মানবপ্রণীত হয়, তবে ইহা এমন এক জাতির সাহিত্য, যে-জাতি

তখনও তাহার জাতীয় তেজবীর্য একবিন্দুও হারায় নাই। ইহার প্রতি পৃষ্ঠা আমাদিগকে তেজবীর্যের কথা বলিয়া থাকে।

এই বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে, সমগ্র জীবনে আমি এই মহাশিক্ষা পাইয়াছি—উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। মানুষ কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করে, তাহার দুর্বলতা কি নাই? উপনিষদ্ বলেন, আছে বটে, কিন্তু অধিকতর দুর্বলতা দ্বারা কি এই দুর্বলতা দূর হইবে? ময়লা দিয়া কি ময়লা দূর হইবে? পাপের দ্বারা কি পাপ দূর করা যায়? উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, তেজস্বী হও, উঠিয়া দাঁড়াও, বীর্য অবলম্বন কর। জগতের সাহিত্যের মধ্যে কেবল উপনিষদেই 'অভীঃ' এই শব্দ বার বার ব্যবহৃত হইয়াছে—আর কোন শাস্ত্রে ঈশ্বর বা মানবের প্রতি 'অভীঃ' বা ভয়শূন্য এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নাই। 'অভীঃ'—ভয়শূন্য হও।

আমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে সুদূর অতীতের সেই পাশ্চাত্যদেশীয় সম্রাট আলেকজাণ্ডারের চিত্র উদিত হইতেছে। আমি যেন দেখিতেছি—সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট সিন্ধুনদের তটে দাঁড়াইয়া অরণ্যবাসী, শিলাখণ্ডে উপবিষ্ট, সম্পূর্ণ উলঙ্গ, স্থবির আমাদেরই জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ করিতেছেন; সম্রাট সন্ন্যাসীর অপূর্বজ্ঞানে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে অর্থ-মানের প্রলোভন দেখাইয়া গ্রীসদেশে আসিতে আহ্বান করিতেছেন। সন্ন্যাসী অর্থ-মানাদি প্রলোভনের কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া গ্রীসে যাইতে অস্বীকার করিলেন; তখন সম্রাট নিজ রাজপ্রতাপ প্রকাশ করিয়া বলেন, 'যদি আপনি না আসেন, আমি আপনাকে মারিয়া ফেলিব।' তখন সন্ন্যাসী উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, 'তুমি এখন যেরূপ বলিলে, জীবনে এরূপ মিথ্যা কথা আর কখনও বলো নাই। আমাকে কে বধ করিতে পারে? জড়জগতের সম্রাট, তুমি আমায় মারিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না! আমি চৈতন্যস্বরূপ, অজ ও অক্ষয়। আমি কখন জন্মাই নাই, কখন মরিবও না! আমি অনন্ত, সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ! তুমি শিশু, তুমি আমায় মারিবে?' ইহাই প্রকৃত তেজ, ইহাই প্রকৃত বীর্য।

হে বন্ধুগণ, হে স্বদেশবাসিগণ, আমি যতই উপনিষদ্ পাঠ করি, ততই আমি তোমাদের জন্য অশ্রুবিসর্জন করিয়া থাকি; কারণ উপনিষদুক্ত এই তেজস্বিতাই আমাদের বিশেষভাবে জীবনে পরিণত করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। শক্তি, শক্তি—ইহাই আমাদের চাই। শক্তি আমাদের বিশেষ আবশ্যক। কে

আমাদিগকে শক্তি দিবে? আমাদিগকে দুর্বল করিবার সহস্র সহস্র বিষয় আছে, গল্পও যথেষ্ট আছে। আমাদের প্রত্যেক পুরাণে এত গল্প আছে, যেগুলি পৃথিবীর গ্রন্থাগারসমূহের তিন-চতুর্থাংশ পূর্ণ করিতে পারে—এ-সকলই আমাদের আছে। যাহা কিছু আমাদের জাতিকে দুর্বল করিতে পারে, তাহাও বিগত সহস্র বর্ষ ধরিয়া আমাদের মধ্যে রহিয়াছে। বোধ হয় যেন বিগত সহস্র বর্ষ ধরিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল—কিভাবে দুর্বল হইতে দুর্বলতর হওয়া যায়। অবশেষে আমরা কেঁচোর মতো হইয়া পড়িয়াছি—এখন যাহার ইচ্ছা সেই আমাদিগকে মাড়াইয়া যাইতেছে। হে বন্ধুগণ, তোমাদের সহিত আমার শোণিতের সম্বন্ধ, তোমাদের জীবনমরণে আমার জীবনমরণ। আমি তোমাদিগকে পূর্বোক্ত কারণসমূহের জন্য বলিতেছি, আমাদের প্রয়োজন—শক্তি, শক্তি, কেবল শক্তি। আর উপনিষদ্‌সমূহ শক্তির বৃহৎ আকর। উপনিষদ্ যে শক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ, সেই শক্তি সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করিতে পারে। উহার দ্বারা সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত, শক্তিমান্ ও বীর্যশালী করিতে পারা যায়। উহা সকল জাতির, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের দুর্বল দুঃখী পদদলিতকে উচ্চরবে আহ্বান করিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া মুক্ত হইতে বলে। মুক্তি বা স্বাধীনতা—দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক—ইহাই উপনিষদের মূলমন্ত্র। জগতের মধ্যে ইহাই একমাত্র শাস্ত্র, যাহা পরিত্রাণের (salvation) কথা বলে না, মুক্তির কথা বলে। প্রকৃত বন্ধন হইতে মুক্ত হও, দুর্বলতা হইতে মুক্ত হও।

আর উপনিষদ্ দেখাইয়া দেয় যে, ঐ মুক্তি তোমার মধ্যে পূর্ব হইতেই বিদ্যমান। এই মতটি উপনিষদের আর এক বিশেষত্ব। তুমি দ্বৈতবাদী, তা হউক; কিন্তু তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মা স্বভাবতই পূর্ণস্বরূপ। কেবল কতকগুলি কাজের দ্বারা উহা সঙ্কুচিত হইয়াছে মাত্র। আধুনিক পরিণামবাদীরা (Evolutionists) যাহাকে ক্রমবিকাশ (Evolution) ও পূর্বানুকৃতি (Atavism) বলিয়া থাকেন, রামানুজের সঙ্কোচ-বিকাশের মতও ঠিক সেইরূপ। আত্মা তাঁহার স্বাভাবিক পূর্ণতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যেন সঙ্কোচপ্রাপ্ত হন, তাঁহার শক্তিসমূহ অব্যক্তভাব ধারণ করে; সৎকর্ম ও সৎচিন্তা দ্বারা উহা পুনরায় বিকাশপ্রাপ্ত হয় এবং তখনই উহার স্বাভাবিক পূর্ণতা প্রকটিত হইয়া পড়ে। অদ্বৈতবাদীর সহিত দ্বৈতবাদীর প্রভেদ এইটুকু যে,

অদ্বৈতবাদী প্রকৃতির পরিণাম স্বীকার করেন, আত্মার নয়। মনে কর, একটি যবনিকা রহিয়াছে, আর ঐ যবনিকাটিতে একটি ছোট ছিদ্র আছে। আমি ঐ যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া এই মহতী জনতাকে দেখিতেছি। প্রথমে কেবল কয়েকটি মুখ দেখিতে পাইব। মনে কর, ছিদ্রটি বাড়িতে লাগিল; ছিদ্রটি যতই বাড়িতে থাকিবে, ততই আমি এই সমবেত জনতার অধিকতর অংশকে দেখিতে পাইব। শেষে ছিদ্রটি বাড়িতে বাড়িতে যবনিকা ও ছিদ্র এক হইয়া যাইবে। তখন তোমাদের ও আমার মধ্যে কোন ব্যবধান থাকিবে না। এস্থলে তোমাদের বা আমার কোন পরিবর্তন হয় নাই। যাহা কিছু পরিবর্তন কেবল যবনিকাটিতে ঘটিয়াছে। তোমরা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একরূপই ছিলে, কেবল যবনিকাটির পরিবর্তন হইল। পরিণাম সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদীর ইহাই মত: প্রকৃতির পরিণাম ও অন্তরাত্মার প্রকাশ। আত্মা কোনরূপে সঙ্কুচিত হইতে পারে না, ইহা অপরিণামী ও অনন্ত। আত্মা যেন মায়ারূপ অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়াছিল—যতই এই মায়ার আবরণ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয়, ততই আত্মা সহজাত স্বাভাবিক মহিমায় প্রকাশিত হয় এবং ক্রমশঃ অধিকতর অভিব্যক্ত হইতে থাকে।

ভারতের নিকট এই মহান্ তত্ত্বটি শিখিবার জন্য পৃথিবীর লোক অপেক্ষা করিতেছে; তাহারা যাহাই বলুক, যতই নিজেদের গরিমা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করুক, ক্রমশঃ যতই দিন যাইবে তাহারা বুঝিবে, এই তত্ত্ব স্বীকার না করিয়া কোন সমাজই টিকিতে পারে না। তোমরা কি দেখিতেছ না, সকল বিষয়েই কিরূপ গুরুতর পরিবর্তন হইতেছে? তোমরা কি দেখিতেছ না, পূর্বে সবই স্বভাবতঃ মন্দ বলিয়া গ্রহণ করিবার রীতি ছিল, কিন্তু এখন উহা স্বভাবতঃ ভাল বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে? কি শিক্ষাপ্রণালীতে, কি অপরাধিগণের শাস্তি-বিধানে, কি উন্মাদের চিকিৎসায়, এমন কি, সাধারণ ব্যাধির চিকিৎসায় পর্যন্ত প্রাচীন নিয়ম ছিল—সবই স্বভাবতঃ মন্দ বলিয়া ধরিয়া লওয়া। আধুনিক নিয়ম কি? আধুনিক বিধান বলে, শরীর স্বভাবতই সুস্থ, নিজ প্রকৃতিবশে ব্যাধির উপশম করিয়া থাকে। ঔষধ বড় জোর শরীরের মধ্যে যে সারপদার্থ আছে, তাহা সঞ্চয় করিতে সাহায্য করে। অপরাধীদের সম্বন্ধে এই নববিধান কি বলে? নূতন বিধান স্বীকার করিয়া থাকে, কোন অপরাধী ব্যক্তি যতই হীন হউক, তাহার মধ্যে যে-দেবত্ব রহিয়াছে, তাহার কখনও পরিবর্তন হয় না, সুতরাং অপরাধিগণের প্রতি আমাদের সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত।

এখন পূর্বের ভাব সব বদলাইয়া যাইতেছে। এখন কারাগারকে অনেকস্থলে 'সংশোধনাগার' বলা হয়। সব বিষয়েই এরূপ ঘটিয়াছে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই দেবত্ব বর্তমান—এই ভারতীয় ভাব ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশেও নানা ভাবে ব্যক্ত হইতেছে। আর কেবল তোমাদের শাস্ত্রেই ইহার ব্যাখ্যা রহিয়াছে; অন্যান্য জাতিকে ঐ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতেই হইবে। মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে গুরুতর পরিবর্তন আসিবে, আর মানুষের কেবল দোষপ্রদর্শনরূপ পুরাতন ভাব লোপ পাইবে। এই শতাব্দীর মধ্যেই ঐ ভাব চরম আঘাত পাইবে। এখন লোকে নিজদিগকে গালিমন্দ করিতে পারে। 'জগতে পাপ নাই'—আমি নাকি এই ঘোর পৈশাচিক তত্ত্ব প্রচার করিয়া থাকি; জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত লোকে আমাকে এজন্য গালি দিয়াছে। ভাল কথা, কিন্তু এখন যাহারা আমায় গালি দিতেছে, তাহাদেরই বংশধরগণ—আমি অধর্ম প্রচার করি নাই, ধর্মই প্রচার করিয়াছি বলিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিবে। অজ্ঞানান্ধকার বিস্তার না করিয়া জ্ঞানালোক বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছি বলিয়া আমি গৌরব অনুভব করিয়া থাকি।

আমাদের উপনিষদ্ হইতে আর একটি মহান্ উপদেশ লাভ করিবার জন্য পৃথিবী অপেক্ষা করিতেছে—সমগ্র জগতের অখণ্ডত্ব। অতি প্রাচীন কালে এক বস্তু ও আর এক বস্তুতে যে পার্থক্য বিবেচিত হইত, এখন অতি দ্রুত তাহা চলিয়া যাইতেছে। তড়িৎ ও বাষ্প-শক্তি জগতের বিভিন্ন অংশকে পরস্পরের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেছে। তাহার ফলস্বরূপ আমরা হিন্দুগণ এখন আর আমাদের দেশ ছাড়া অন্য সব দেশকে কেবল ভূত-প্রেত ও রাক্ষস-পিশাচে পূর্ণ বলি না, এবং খ্রীষ্টান দেশের লোকেরাও বলেন না—ভারতে কেবল নরমাংস-ভোজী ও অসভ্য মানুষের বাস।

আমাদের উপনিষদ্ ঠিকই বলিয়াছেন—অজ্ঞানই সর্বপ্রকার দুঃখের কারণ। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের যে-কোন অবস্থায় প্রয়োগ করি না কেন, দেখা যায়, উহা সম্পূর্ণ সত্য। অজ্ঞানবশতই আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করি, পরস্পরকে জানি না বলিয়াই আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা নাই। যখনই আমরা পরস্পরকে ঠিকমত জানিতে পারি, তখনই আমাদের মধ্যে প্রেমের উদয় হয়, হইবেই তো কারণ আমরা সকলেই কি এক নহি? সুতরাং

দেখিতে পাইতেছি, চেষ্টা না করিলেও আমাদের সকলের একত্বভাব স্বভাবতই আসিয়া থাকে।

রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রেও যে-সকল সমস্যা বিশ বৎসর পূর্বে শুধু জাতীয় সমস্যা ছিল, এখন আর জাতীয় ভিত্তিতে সেগুলির সমাধান করা যায় না। উক্ত সমস্যাগুলি ক্রমশঃ বিপুলায়তন হইতেছে, বিরাট আকার ধারণ করিতেছে। আন্তর্জাতিক ভিত্তিরূপ প্রশস্ততর ভূমি হইতেই শুধু উহাদের মীমাংসা করা যাইতে পারে। আন্তর্জাতিক সংহতি, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ, আন্তর্জাতিক বিধান—ইহাই এ যুগের মূলমন্ত্র। সকলের ভিতর একত্বভাব কিভাবে বিস্তৃত হইতেছে, ইহাই তাহার প্রমাণ।

বিজ্ঞানেও জড়তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ উদার ভাব এখন আবিষ্কৃত হইতেছে। এখন তোমরা সমগ্র জড়বস্তুকে—সমগ্র জগৎকে এক অখণ্ড বস্তুরূপে, এক বৃহৎ জড়সমুদ্ররূপে বর্ণনা করিয়া থাকো; তুমি, আমি, চন্দ্রসূর্য, এমন কি আর যাহা কিছু—সবই এই মহান্ সমুদ্রের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত মাত্র, আর কিছু নহে। মানসিক দৃষ্টিতে দেখিলে উহা এক অনন্ত চিন্তাসমুদ্ররূপে প্রতীত হয়; তুমি আমি সেই চিন্তাসমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত, আর চৈতন্যদৃষ্টিতে দেখিলে সমগ্র জগৎ এক অচল অপরিণামী অখণ্ড সত্তা অর্থাৎ আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়। নীতির জন্যও জগৎ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে—তাহাও আমাদের গ্রন্থে রহিয়াছে। নীতিতত্ত্বের ভিত্তি সম্বন্ধেও জগৎ জানিতে উৎসুক—তাহাও আমাদের শাস্ত্র হইতেই পাইবে।

ভারতে—আমাদের কি প্রয়োজন? বৈদেশিকগণের যদি এই-সকল বিষয়ের প্রয়োজন থাকে, তবে আমাদের বিশগুণ প্রয়োজন আছে। কারণ আমাদের উপনিষদ্ যতই বড় হউক, অন্যান্য জাতির সহিত তুলনায় আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিগণ যতই বড় হউন, আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি—আমরা দুর্বল, অতি দুর্বল। প্রথমতঃ আমাদের শারীরিক দৌর্বল্য—এই শারীরিক দৌর্বল্য আমাদের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ। আমরা অলস, আমরা কাজ করিতে পারি না; আমরা একসঙ্গে মিলিতে পারি না; আমরা পরস্পরকে ভালবাসি না; আমরা ঘোর স্বার্থপর; আমরা তিন জন এক সঙ্গে মিলিলেই পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া থাকি, ঈর্ষা করিয়া থাকি। আমাদের এখন এই অবস্থা—আমরা অতিশয় বিশৃঙ্খলভাবাপন্ন, ঘোর স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছি—

শত শত শতাব্দী যাবৎ এই লইয়া বিবাদ করিতেছি, তিলক ধারণ এইভাবে করিতে হইবে কি ঐ ভাবে। কোন মানুষের দৃষ্টিতে আমার খাওয়া নষ্ট হইবে কিনা, এই ধরনের গুরুতর সমস্যার উপর বড় বড় বই লিখিতেছি। যে-জাতির মস্তিষ্কের সমুদয় শক্তি এইরূপ অপূর্ব সুন্দর সুন্দর সমস্যার গবেষণায় নিযুক্ত, সে-জাতির নিকট হইতে বড় রকমের একটা কিছু আশা করা যায় না, এরূপ আচরণে আমাদের লজ্জাও হয় না! হাঁ, কখন কখন লজ্জা হয় বটে, কিন্তু আমরা যাহা ভাবি তাহা করিতে পারি না। আমরা ভাবি অনেক জিনিস, কিন্তু কাজে পরিণত করি না। এইরূপে তোতাপাখির মতো কথা বলা আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে—আচরণে আমরা পশ্চাৎপদ। ইহার কারণ কি? শারীরিক দুর্বলতাই ইহার কারণ। দুর্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না; আমাদিগকে সবলমস্তিষ্ক হইতে হইবে—আমাদের যুবকগণকে প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে, ধর্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও—তোমাদের নিকট ইহাই আমার বক্তব্য। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হইবে। আমাকে অতি সাহসপূর্বক এ-কথাগুলি বলিতে হইতেছে; কিন্তু না বলিলেই নয়। আমি তোমাদিগকে ভালবাসি। আমি জানি, পায়ে কোথায় কাঁটা বিঁধিতেছে। আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তোমাদের বলি, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা আরও ভাল বুঝিবে। তোমাদের রক্ত একটু তাজা হইলে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও মহান্ বীর্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। যখন তোমাদের শরীর তোমাদের পায়ের উপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইবে, যখন তোমরা নিজেদের মানুষ বলিয়া অনুভব করিবে, তখনই তোমরা উপনিষদ্ ও আত্মার মহিমা ভাল করিয়া বুঝিবে। এইরূপে বেদান্ত আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে। অনেক সময় লোকে আমার অদ্বৈতমত-প্রচারে বিরক্ত হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ বা অন্য কোন বাদ প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমাদের এখন কেবল আবশ্যক: আত্মার এই অপূর্ব তত্ত্ব—অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য, অনন্ত শুদ্ধত্ব ও অনন্ত পূর্ণতার তত্ত্ব অবগত হওয়া।

যদি আমার একটি ছেলে থাকিত, তবে সে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আমি তাহাকে শুনাইতে আরম্ভ করিতাম, 'ত্বমসি নিরঞ্জনঃ'। তোমরা অবশ্যই পুরাণে রানী

মদালসার সেই স্নুন্দর উপাখ্যান পাঠ করিয়াছ। একটি সন্তান লাভ করিবার পরই তিনি তাহাকে স্বহস্তে দোলায় স্থাপন করিয়া দোল দিতে দিতে গাহিতে আরম্ভ করিলেন, 'ত্বমসি নিরঞ্জনঃ'। এই উপাখ্যানের মধ্যে মহা সত্য নিহিত রহিয়াছে। তুমি আপনাকে মহান্ বলিয়া উপলব্ধি কর, তুমি মহান্ হইবে।

সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছে, আমি সমস্ত জগৎ ঘুরিয়া কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলাম। ইংরেজ 'পাপ, পাপী' ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া থাকে; বাস্তবিক যদি সকল ইংরেজ নিজেদের পাপী বলিয়া বিশ্বাস করিত, তবে আফ্রিকার অভ্যন্তরে নিগ্রোদের অবস্থার সহিত তাহাদের কোন পার্থক্য থাকিত না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে এ-কথা বিশ্বাস করে না, বরং বিশ্বাস করে—সে জগতের অধীশ্বর হইয়া জন্মিয়াছে; সে নিজের মহত্ত্বে বিশ্বাসী; সে বিশ্বাস করে—সে সব করিতে পারে, ইচ্ছা হইলে সে সূর্যলোকে চন্দ্রলোকে যাইতে পারে; তাহাতেই সে বড় হইয়াছে। যদি সে পুরোহিতদের বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া বিশ্বাস করিত যে, সে ক্ষুদ্র হতভাগ্য পাপী মাত্র, অনন্ত কাল ধরিয়া তাহাকে নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে, তবে আজ তাহাকে যেরূপ দেখিতেছ, সে কখনও সেরূপ বড হইত না। এইরূপে আমি প্রত্যেক জাতির ভিতরই দেখিতে পাই, তাহাদের পুরোহিতেরা যাহাই বলুক এবং তাহারা যতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হউক, তাহাদের আভ্যন্তরীণ ব্রহ্মভাব কখন বিলুপ্ত হইবে না, উহা ফুটিয়া উঠিবেই উঠিবে। আমরা বিশ্বাস হারাইয়াছি। তোমরা কি আমার কথায় বিশ্বাস করিবে?—আমরা ইংরেজ নরনারী অপেক্ষা কম বিশ্বাসী, হাজারগুণ কম বিশ্বাসী। আমাকে স্পষ্ট কথা বলিতে হইতেছে, কিন্তু না বলিয়া উপায় নাই। তোমরা কি দেখিতেছ না, ইংরেজ নরনারী যখন আমাদের ধর্মতত্ত্ব একটু-আধটু বুঝিতে পারে, তখন তাহারা যেন উহাতে মাতিয়া উঠে, আর যদিও তাহারা রাজার জাতি, তথাপি স্বদেশের লোকের উপহাস ও বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া ভারতে আমাদের ধর্ম প্রচার করিতে আসিয়া থাকে? তোমাদের মধ্যে কয়জন এরূপ করিতে পারো? এই কথাটি কেবল ভাবিয়া দেখ। আর করিতে পার না কেন? তোমরা কি জান না বলিয়া করিতে পার না?—তাহা নয়, তাহাদের অপেক্ষা তোমরা বেশী জানো, তাই তোমরা কাজ করিতে পার না। যতটা জানিলে তোমাদের পক্ষে কল্যাণ, তোমরা তাহা অপেক্ষা বেশী জানো—ইহাই তোমাদের মুশকিল। তোমাদের রক্ত পাতলা, তোমাদের

মস্তিষ্ক আবিলতাপূর্ণ ও অসাড়, তোমাদের শরীর দুর্বল। শরীরের এ অবস্থা পরিবর্তন করিতে হইবে। শারীরিক দৌর্বল্যই সকল অনিষ্টের মূল, আর কিছু নহে। গত কয়েক শত বৎসর যাবৎ তোমরা নানাবিধ সংস্কার, আদর্শ প্রভৃতির কথা কহিয়াছ, কিন্তু কাজের সময় আর তোমাদের সন্ধান পাওয়া যায় না। ক্রমশঃ তোমাদের আচরণে সকলে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে; আর 'সংস্কার' নামটা পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ কি? তোমাদের জ্ঞানের কি কিছু কমতি আছে? জ্ঞানের কমতি কোথায়? তোমরা যে অতিরিক্ত জ্ঞানী! সকল অনিষ্টের মূল কারণ এই যে, তোমরা দুর্বল, অতি দুর্বল—তোমাদের শরীর দুর্বল, মন দুর্বল, তোমাদের আত্মবিশ্বাস একেবারেই নাই। শত শতাব্দী যাবৎ অভিজাত সম্প্রদায়, রাজা ও বৈদেশিকরা অত্যাচার করিয়া তোমাদিগকে পিষিয়া ফেলিয়াছে; হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের স্বজনগণ তোমাদের সব বল হরণ করিয়াছে। তোমরা এখন পদদলিত, ভগ্নদেহ, মেরুদণ্ডহীন কীটের মতো হইয়াছ। কে আমাদিগকে এখন বল দিবে? আমি বলিতেছি, আমাদের এখন চাই বল, চাই বীর্য।

এই বীর্যলাভের প্রথম উপায়—উপনিষদে বিশ্বাসী হওয়া এবং বিশ্বাস করা যে, 'আমি আত্মা, তরবারি আমাকে ছেদন করিতে পারে না, কোন যন্ত্র আমাকে ভেদ করিতে পারে না, অগ্নি আমাকে দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, আমি সর্বশক্তিমান্, আমি সর্বজ্ঞ।' অতএব এই আশাপ্রদ পরিত্রাণ-কারী বাক্যগুলি সর্বদা উচ্চারণ কর; বলিও না—আমরা দুর্বল। আমরা সব করিতে পারি। আমরা কি না করিতে পারি? আমাদের দ্বারা সবই হইতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে সেই মহিমময় আত্মা রহিয়াছেন। আত্মায় বিশ্বাসী হইতে হইবে। নচিকেতার মতো বিশ্বাসী হও। নচিকেতার পিতা যখন যজ্ঞ করিতেছিলেন, তখন নচিকেতার অন্তরে শ্রদ্ধা প্রবেশ করিল। আমার ইচ্ছা—তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর সেই শ্রদ্ধা আবির্ভূত হউক, তোমাদের প্রত্যেকেই বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইয়া ইঙ্গিতে জগৎ-আলোড়নকারী মহামনীষাসম্পন্ন মহাপুরুষ হও, সর্বপ্রকারে অনন্ত ঈশ্বরতুল্য হও; আমি তোমাদের সকলকেই এইরূপ দেখিতে চাই। উপনিষদ্ হইতে তোমরা এইরূপ শক্তিলাভ করিবে, উহা হইতে তোমরা এই বিশ্বাস পাইবে। এ-সবই উপনিষদে রহিয়াছে।

এ যে শুধু সন্ন্যাসীর জন্য ছিল, এ যে রহস্য-বিদ্যা! প্রাচীনকালে অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীরাই কেবল উপনিষদের চর্চা করিতেন! শঙ্কর একটু সদয় হইয়া বলিলেন, গৃহস্থেরাও উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিতে পারে; ইহাতে তাঁহাদের কল্যাণই হইবে, কোন অনিষ্ট হইবে না। তবু লোকের মন হইতে এ সংস্কার এখনও যায় নাই যে উপনিষদে কেবল সন্ন্যাসীদের আরণ্যক জীবনের কথাই আছে। আমি তোমাদিগকে সেদিনই বলিয়াছি, যিনি স্বয়ং বেদের প্রকাশ সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই বেদের একমাত্র টীকা—একমাত্র প্রামাণিক টীকা—গীতা চিরকালের মতো রচিত হইয়াছে। ইহার উপর আর কোন টীকা-টিপ্পনী চলিতে পারে না। এই গীতায় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বেদান্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। তুমি যে-কাজই কর না কেন, তোমার পক্ষে বেদান্তের প্রয়োজন। বেদান্তের এই-সকল মহান্ তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না; বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে—সর্বত্র এই-সকল তত্ত্ব আলোচিত হইবে, কার্যে পরিণত হইবে। প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালকবালিকা—যে যে-কাজ করুক না কেন, যে যে-অবস্থায় থাকুক না কেন—সর্বত্র বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক।

আর ভয়ের কোন কারণ নাই। উপনিষদ্-নিহিত তত্ত্বাবলী জেলে-মালা প্রভৃতি জনসাধারণ কিভাবে কার্যে পরিণত করিবে? ইহার উপায় শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে; অনন্ত পথ আছে—ধর্ম অনন্ত, ধর্মের গণ্ডি ছাড়াইয়া কেহই যাইতে পারে না। আর তুমি যাহা করিতেছ, তোমার পক্ষে তাহাই অতি উত্তম। অতি স্বল্প কর্মও যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তাহা হইতে অদ্ভুত ফল লাভ হয়; অতএব যে যতটুকু পারে করুক। জেলে যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল মৎস্যজীবী হইবে; ছাত্র যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল বিদ্যার্থী হইবে। উকিল যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল আইনজ্ঞ হইবে। এইভাবে অন্যান্য সর্বত্র।

আর ইহার ফল হইবে এই যে, জাতিবিভাগ অনন্তকালের জন্য থাকিয়া যাইবে। সমাজের প্রকৃতিই এই—বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া। তবে চলিয়া যাইবে কি? বিশেষ বিশেষ অধিকারগুলি আর থাকিবে না। জাতি-বিভাগ প্রাকৃতিক নিয়ম। সামাজিক জীবনে আমি কোন বিশেষ কর্তব্য সাধন

করিতে পারি, তুমি অন্য কাজ করিতে পারো। তুমি না হয় একটা দেশ শাসন করিতে পারো, আমি একজোড়া জুতা সারিতে পারি। কিন্তু তা বলিয়া তুমি আমা অপেক্ষা বড় হইতে পার না। তুমি কি আমার জুতা সারিয়া দিতে পারো? আমি কি দেশ শাসন করিতে পারি? এই কার্যবিভাগ স্বাভাবিক। আমি জুতা সেলাই করিতে পটু, তুমি বেদপাঠে পটু। তা বলিয়া তুমি আমার মাথায় পা দিতে পার না। তুমি খুন করিলে প্রশংসা পাইবে; আর আমি একটা আম চুরি করিলে আমাকে ফাঁসি যাইতে হইবে—এরূপ হইতে পারে না। এই অধিকার-তারতম্য উঠিয়া যাইবে। জাতিবিভাগ ভাল জিনিস। জীবনসমস্যা-সমাধানের ইহাই একমাত্র স্বাভাবিক উপায়। লোকে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করিবে; ইহা অতিক্রম করিবার উপায় নাই। যেখানেই যাও, জাতিবিভাগ থাকিবেই। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, অধিকার-তারতম্যগুলিও থাকিবে। এগুলিকে প্রচণ্ড আঘাত করিতে হইবে। যদি জেলেকে বেদান্ত শিখাও, সে বলিবে—তুমি যেমন আমিও তেমন, তুমি না হয় দার্শনিক, আমি না হয় মৎস্যজীবী; কিন্তু তোমার ভিতর যে-ঈশ্বর আছেন, আমার ভিতরও সেই ঈশ্বর আছেন। আর ইহাই আমরা চাই—কাহারও কোন বিশেষ অধিকার নাই, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি করিবার সমান সুবিধা থাকিবে।

সকল ব্যক্তিকেই তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দাও। প্রত্যেকে নিজেই নিজের মুক্তিসাধন করিবে। উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন—স্বাধীনতা। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ এ-কথা বলিতে সাহসী হয় যে, আমি এই নারীর বা ঐ ছেলেটির মুক্তি করিয়া দিব; তবে উহা অতি অন্যায়, অত্যন্ত ভুল কথা। আমাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, 'আপনি বিধবাদিগের ও নারীজাতির উন্নতির উপায় সম্বন্ধে কি চিন্তা করেন?' এ প্রশ্নের আমি শেষ বারের মতো উত্তর দিতেছি—আমি কি বিধবা যে, আমাকে এই অর্থহীন প্রশ্ন করিতেছ? আমি কি নারী যে, আমাকে বারংবার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি কে যে, গায়ে পড়িয়া নারীজাতির সমস্যা সমাধান করিতে অগ্রসর হইতেছ? তুমি কি প্রত্যেক বিধবা ও প্রত্যেক নারীর ভাগ্যবিধাতা স্বয়ং ঈশ্বর? তফাত! তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই পূরণ করিবে। কি আপদ! যথেচ্ছাচারী তোমরা ভাবিতেছ—সকলের জন্য সব করিতে পারো! তফাত! ভগবান্ সকলকে দেখিবেন। তুমি কে যে, নিজেকে সর্বজ্ঞ মনে করিয়া লইয়াছ?

হে নাস্তিকগণ, তোমরা ঈশ্বরের উপর কর্তৃত্ব করিতে সাহস কর কিসে? কারণ তোমরা কি জান না, প্রত্যেকটি আত্মাই পরমাত্মস্বরূপ? নিজেদের চরকায় তেল দাও, তোমাদের ঘাড়ে এক বোঝা কর্ম রহিয়াছে। হে নাস্তিকগণ, সমগ্র জাতি তোমাদিগকে গাছে তুলিয়া দিতে পারে, সমাজ তোমাদের উচ্চ প্রশংসা করিয়া আকাশে তুলিয়া দিতে পারে, আহাম্মকেরা তোমাদের সুখ্যাতি করিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর নিদ্রিত নহেন; ইহলোকে বা পরলোকে নিশ্চয়ই তোমাদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হইবে।

প্রত্যেক নরনারীকে—সকলকেই ঈশ্বরদৃষ্টিতে দেখিতে থাকো। তোমরা কাহাকেও সাহায্য করিতে পার না, কেবল সেবা করিতে পারো। প্রভুর সন্তানদিগকে, যদি সৌভাগ্য হয় তবে স্বয়ং প্রভুকে সেবা কর। যদি প্রভুর অনুগ্রহে তাঁহার কোন সন্তানের সেবা করিতে পারো, তবে ধন্য হইবে। নিজেদের খুব বড় কিছু ভাবিও না। ধন্য যে তোমরা সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ, অপরে পায় নাই। উপাসনাবোধে ঐটুকু কর। দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে আমি যেন ঈশ্বরকে দেখি, নিজ মুক্তির জন্য তাহাদের নিকটে গিয়া তাহাদের পূজা করিব—ঈশ্বর তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন। কতকগুলি লোক যে দুঃখ পাইতেছে, তাহা তোমার আমার মুক্তির জন্য—যাহাতে আমরা রোগী, পাগল, কুষ্ঠী, পাপী প্রভৃতি রূপধারী প্রভুর পূজা করিতে পারি। আমার কথাগুলি বড় কঠিন হইতেছে, কিন্তু আমাকে ইহা বলিতেই হইবে, কারণ তোমার আমার জীবনের ইহাই শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য যে, আমরা প্রভুকে এই-সকল বিভিন্ন রূপে সেবা করিতে পারি। কাহারও কল্যাণ করিতে পারো—এ ধারণা ছাড়িয়া দাও। তবে যেমন বীজকে জল মৃত্তিকা বায়ু প্রভৃতি তাহার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যোগাইয়া দিলে উহা নিজ প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী যাহা কিছু আবশ্যক গ্রহণ করে এবং নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী বাড়িতে থাকে, তোমরাও সেইভাবে অপরের কল্যাণসাধন করিতে পারো।

জগতে জ্ঞানালোক বিস্তার কর; আলোক—আলোক লইয়া আইস। প্রত্যেকে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হউক; যতক্ষণ না সকলেই ভগবানের নিকট পৌঁছায়, ততক্ষণ যেন তোমাদের কাজ শেষ না হয়। দরিদ্রের নিকট জ্ঞানালোক বিস্তার কর, ধনীদের নিকট আরও অধিক আলোক লইয়া যাও, কারণ দরিদ্র অপেক্ষা ধনীদের অধিক আলোক প্রয়োজন। অশিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট আলোক

লইয়া যাও, শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট আরও অধিক আলোক লইয়া যাও, কারণ আজকাল শিক্ষাভিমান বড়ই প্রবল। এইভাবে সকলের নিকট আলোক বিস্তার কর, অবশিষ্ট যাহা কিছু প্রভুই করিবেন, কারণ ভগবানই বলিয়াছেন :

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥

—কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নহে; তুমি এমনভাবে কর্ম করিও না, যাহাতে তোমাকে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়; অথচ কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

যিনি শত শত যুগ পূর্বে আমাদের পুর্বপুরুষদিগকে এমন মহোচ্চ তত্ত্বসমূহ শিখাইয়াছেন, তিনি যেন আমাদিগকে তাঁহার আদেশ কার্যে পরিণত করিবার শক্তি দান করেন।

ভারতীয় মহাপুরুষগণ

[মান্দ্রাজে প্রদত্ত বক্তৃতা]

ভারতীয় মহাপুরুষগণের কথা বলিতে গিয়া আমার মনে সেই প্রাচীনকালের কথা উদিত হইতেছে, ইতিহাস যে-কালের কোন ঘটনার উল্লেখ করে না এবং ঐতিহ্য যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার হইতে রহস্য-উদ্‌ঘাটনের বৃথা চেষ্টা করিয়া থাকে। ভারতে অসংখ্য মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—বাস্তবিক হিন্দুজাতি সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ অসংখ্য মহাপুরুষের জন্মদান ব্যতীত আর কি করিয়াছে? সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন যুগপ্রবর্তক শ্রেষ্ঠ আচার্যের কথা অর্থাৎ তাঁহাদের চরিত্র আলোচনা করিয়া যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাদের নিকট বলিব।

প্রথমতঃ আমাদের শাস্ত্র সম্বন্ধেই আমাদের কিছু বুঝা আবশ্যক। আমাদের শাস্ত্রে দ্বিবিধ সত্য উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রথমটি সনাতন সত্য; দ্বিতীয়টি প্রথমোক্তের ন্যায় ততদূর প্রামাণিক না হইলেও বিশেষ দেশকালপাত্রে প্রযোজ্য। সনাতন সত্য—জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ এবং উহাদের পরস্পর সম্বন্ধের বিষয় শ্রুতি বা বেদে লিপিবদ্ধ আছে। দ্বিতীয় প্রকার সত্য—স্মৃতি, মনু যাজ্ঞবল্ক্য

প্রভৃতি সংহিতায় এবং পুরাণে ও তন্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। এগুলির প্রামাণ্য শ্রুতির অধীন, কারণ স্মৃতি যদি শ্রুতির বিরোধী হয়, তবে শ্রুতিকেই সে স্থলে মানিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্র-বিধান। তাৎপর্য এই যে, শ্রুতিতে জীবাত্মার নিয়তি ও তাঁহার চরম লক্ষ্যবিষয়ক মুখ্য তত্ত্বসমূহের সম্পূর্ণ বর্ণনা আছে, কেবল গৌণ বিষয়গুলি—যেগুলি উহাদের বিস্তার, সেগুলিই বিশেষভাবে বর্ণনা করা স্মৃতি ও পুরাণের কার্য। সাধারণভাবে উপদেশ দিতে শ্রুতিই পর্যাপ্ত; ধর্মজীবন-যাপনের সারতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রুতিনির্দিষ্ট উপদেশের বেশি আর কিছু বলা যাইতে পারে না, আর কিছু জানিবারও নাই। এ-বিষয়ে যাহা কিছু প্রয়োজন, সবই শ্রুতিতে আছে; জীবাত্মার সিদ্ধিলাভের জন্য যে-সকল উপদেশের প্রয়োজন, শ্রুতিতে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে কথিত হইয়াছে। কেবল বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিধান শ্রুতিতে নাই; স্মৃতি বিভিন্ন সময়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। শ্রুতির আর একটি বিশেষত্ব আছে। যে-সকল মহাপুরুষ শ্রুতিতে বিভিন্ন সত্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—ইঁহাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশি, তবে কয়েকজন নারীরও উল্লেখ পাওয়া যায়—তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে, যথা তাঁহাদের জন্মের সন-তারিখ প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে আমরা অতি সামান্যই জানিতে পারি; কিন্তু তাঁহাদের সর্বোৎকৃষ্ট চিন্তা—তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ আবিষ্ক্রিয়া বলিলেই ভাল হয়—আমাদের দেশের ধর্মসাহিত্যরূপ বেদে লিপিবদ্ধ ও রক্ষিত আছে। স্মৃতিতে কিন্তু মহাপুরুষগণের জীবনী ও কার্যকলাপই বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। ইঙ্গিতে সমগ্র জগতের পরিচালক অদ্ভুত মহাশক্তিশালী মনোহরচরিত্র মহাপুরুষগণের পরিচয় স্মৃতিতেই আমরা সর্বপ্রথম পাইয়া থাকি—তাঁহাদের চরিত্র এত উন্নত যে, তাঁহাদের উপদেশাবলীও যেন উহার নিকট সামান্য বলিয়া বোধ হয়।

আমাদের ধর্মের এই বিশেষত্বটি আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, আমাদের ধর্মে যে-ঈশ্বরের উপদেশ আছে, তিনি নির্গুণ অথচ সগুণ। উহাতে ব্যক্তিগত-সম্বন্ধরহিত অনন্ত সনাতন তত্ত্বসমূহের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ব্যক্তি অর্থাৎ অবতারের উপদেশ আছে। কিন্তু শ্রুতি বা বেদই আমাদের ধর্মের মূল—উহাতে কেবল সনাতন তত্ত্বের উপদেশ; বড় বড় অবতার আচার্য ও মহাপুরুষগণের বিষয় সমস্তই স্মৃতি ও পুরাণে রহিয়াছে। ইহাও লক্ষ্য করিও যে, কেবল আমাদের ধর্ম ছাড়া জগতের অন্যান্য সকল ধর্মই কোন বিশেষ ধর্মপ্রবর্তক বা ধর্মপ্রবর্তকগণের

জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। খ্রীষ্টধর্ম খ্রীষ্টের, মুসলমানধর্ম মহম্মদের, বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধের, জৈনধর্ম জিনগণের এবং অন্যান্য ধর্ম অন্যান্য ব্যক্তিগণের জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ঐ-সকল ধর্মে ঐ মহাপুরুষগণের জীবনের তথাকথিত ঐতিহাসিক প্রমাণ লইয়া যে যথেষ্ট বিবাদ হইয়া থাকে, তাহা স্বাভাবিক। যদি কখন এই প্রাচীন মহাপুরুষগণের অস্তিত্ববিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণ দুর্বল হয়, তবে তাঁহাদের ধর্মরূপ অট্টালিকা ধসিয়া পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে।

আমাদের ধর্ম ব্যক্তিবিশেষের জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া সনাতন তত্ত্বসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া আমরা এই বিপদ এড়াইয়াছি। কোন মহাপুরুষ, এমন কি, কোন অবতার বলিয়া গিয়াছেন বলিয়াই যে তোমরা ধর্ম মানিয়া চল, তাহা নহে। কৃষ্ণের কথায় বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না, কিন্তু বেদানুগত বলিয়াই কৃষ্ণবাক্যের প্রামাণ্য। কৃষ্ণের মাহাত্ম্য এই যে, বেদের যত প্রচারক হইয়াছেন তন্মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য অবতার ও মহাপুরুষ সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। আমরা গোড়াতেই এ-কথা স্বীকার করিয়া লই যে, মানুষের পূর্ণতালাভের জন্য, তাহার মুক্তির জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, সবই বেদে কথিত হইয়াছে। নূতন কিছু আবিষ্কৃত হইতে পারে না। তোমরা কখনই সকল জ্ঞানের চরম লক্ষ্য পূর্ণ একত্বের বেশি অগ্রসর হইতে পার না। বেদ অনেক দিন পূর্বেই এই পূর্ণ একত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহার চেয়ে বেশি অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। যখনই 'তত্ত্বমসি' আবিষ্কৃত হইল, তখনই আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল ; এই 'তত্ত্বমসি' বেদে রহিয়াছে। বাকী রহিল কেবল বিভিন্ন দেশ-কাল-পাত্র-অনুসারে সময়ে সময়ে লোকশিক্ষা। এই প্রাচীন সনাতন পথে জনগণকে পরিচালনা করা—ইহাই বাকী রহিল ; সেইজন্যই সময়ে সময়ে বিভিন্ন মহাপুরুষ ও আচার্যগণের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের সেই সর্বজনবিদিত বাণীতে এই তত্ত্বটি যেমন পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে, আর কোথাও তেমন হয় নাই :

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

—যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃজন করিয়া থাকি। অধর্মের নাশের জন্য আমি সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া থাকি, ইত্যাদি।—ইহাই ভারতীয় ধারণা।

ইহা হইতে কি পাওয়া যায়? সিদ্ধান্ত এই যে, একদিকে সনাতন তত্ত্বসমূহ রহিয়াছে, ঐগুলি স্বতঃপ্রমাণ, উহারা কোনরূপ যুক্তির উপর পর্যন্ত নির্ভর করে না, ঋষিগণ—যত বড়ই হউন বা অবতারগণ যত মহিমাসম্পন্নই হউন—তাঁহাদের বাক্যের উপরও নির্ভর করে না। আমরা এখানে এ-কথা বলিতে পারি যে, ভারতীয় চিন্তার এই বিশেষত্ব আছে বলিয়া আমরা বেদান্তকেই একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম বলিয়া দাবি করিতে পারি, বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না, উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমূহই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না। আমাদের দেশেই আমরা দেখিতে পাই, এখানে কত মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন! আমরা একটা ক্ষুদ্র শহরেই দেখিতে পাই, সেই শহরের বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন লোককে নিজেদের আদর্শ করিয়া থাকে। সুতরাং মহম্মদ বুদ্ধ বা খ্রীষ্ট—এরূপ কোন এক ব্যক্তি কিরূপে সমগ্র জগতের একমাত্র আদর্শস্বরূপ হইতে পারেন? অথবা সেই এক ব্যক্তির বাক্য-প্রমাণেই বা সমগ্র নীতিবিদ্যা, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও ধর্মকে সত্য বলিয়া কিরূপে স্বীকার করা যায়? বৈদান্তিক ধর্মে এরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষের বাক্যকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবার আবশ্যক হয় না। মানবের সনাতন প্রকৃতিই ইহার প্রমাণ; ইহার নীতিতত্ত্ব মানবজাতির সনাতন আধ্যাত্মিক একত্বরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; এই একত্ব চেষ্টা করিয়া লাভ করিবার নয়, উহা পূর্ব হইতেই লব্ধ।

অন্যদিকে আবার আমাদের ঋষিগণ অতিপ্রাচীন কাল হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, জগতের অধিকাংশ লোকই কোন না কোন ব্যক্তির উপর নির্ভর না করিয়া থাকিতে পারে না। লোকের কোন না কোন আকারে একটি ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বর চাই। যে বুদ্ধদেব ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া গেলেন, তাঁহার দেহত্যাগের পর পঞ্চাশ বৎসর যাইতে না যাইতে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকেই ঈশ্বর করিয়া তুলিল। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে। আমরা জানি, ঈশ্বরের বৃথা কল্পনা অপেক্ষা—অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ কাল্পনিক ঈশ্বর মানবের উপাসনার অযোগ্য—মহত্তর জীবন্ত ঈশ্বরসকল এই পৃথিবীতে সময়ে সময়ে আমাদের মধ্যেই আবির্ভূত হইয়া বাস

করিয়া থাকেন। কোনরূপ কাল্পনিক ঈশ্বর অপেক্ষা আমাদের কল্পনাসৃষ্ট কোন বস্তু অপেক্ষা অর্থাৎ আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে যতটা ধারণা করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা তাঁহারা অধিকতর পূজ্য। ঈশ্বর সম্বন্ধে তুমি আমি যতটা ধারণা করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ অনেক বড়। আমরা আমাদের মনে যতদূর উচ্চ আদর্শের চিন্তা করিতে পারি, বুদ্ধ তদপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ, জীবন্ত আদর্শ। সেই জন্যই সর্বপ্রকার কাল্পনিক দেবতাকেও অতিক্রম করিয়া তাঁহারা চিরকাল মানবের পূজা পাইয়া আসিয়াছেন। আমাদের ঋষিগণ ইহা জানিতেন, সেইজন্য তাঁহারা সকল ভারতবাসীর জন্য এই মহাপুরুষ-উপাসনার—এই অবতার-পূজার পথ খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, যিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ অবতার, তিনি আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিয়া গিয়াছেন:

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥[১]

—মানুষের মধ্য দিয়া যেখানেই অদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ হয়, জানিও আমি সেখানে বর্তমান; আমা হইতেই এই আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে।

ইহা দ্বারা হিন্দুগণের পক্ষে সকল দেশের সকল অবতারকে উপাসনা করিবার দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু যে-কোন দেশের যে-কোন সাধু-মহাত্মার পূজা করিতে পারে। আমরা কার্যতও দেখিতে পাই, আমরা অনেক সময় খ্রীষ্টানদের চার্চে ও মুসলমানদের মসজিদে গিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। ইহা ভালই বলিতে হইবে। কেন আমরা এভাবে উপাসনা করিব না? আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের ধর্ম সার্বভৌম। উহা এত উদার, এত প্রশস্ত যে, সর্বপ্রকার আদর্শকেই উহা সাদরে গ্রহণ করিতে পারে; জগতে যতপ্রকার ধর্মের আদর্শ আছে, তাহাদিগকে এখনই গ্রহণ করা যাইতে পারে, আর ভবিষ্যতে যে-সকল বিভিন্ন আদর্শ আসিবে, তাহাদের জন্য আমরা ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করিতে পারি। ঐগুলিকেও ঐভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, বৈদান্তিক ধর্মই তাহার অনন্ত বাহু প্রসারিত করিয়া সবগুলিকে আলিঙ্গন করিয়া লইবে।

---

১ গীতা, ১০।৪১

ঈশ্বরাবতার-সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি ধারণা এই। দ্বিতীয় শ্রেণীর আর এক প্রকার মহাপুরুষ আছেন; বেদে 'ঋষি' শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, আর আজকাল ইহা একটি চলিত শব্দ হইয়া পড়িয়াছে, —ঋষিবাক্যের বিশেষ প্রামাণ্য। আমাদিগকে ইহার তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। 'ঋষি' শব্দের অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা অর্থাৎ যিনি কোন তত্ত্বের সাক্ষাৎ করিয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল যে, ধর্মের প্রমাণ কি? বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা ধর্মের সত্যতা প্রমাণিত হয় না—ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন: যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।[১]—মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে। ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ॥[২]—সেখানে চক্ষু যাইতে পারে না, বাক্যও যাইতে পারে না, মনও নহে।

শত শত যুগ ধরিয়া ইহাই ঋষিদের ঘোষণা। বাহ্য প্রকৃতি আত্মার অস্তিত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অনন্ত জীবন, মানবের চরম লক্ষ্য প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। এই মনের সর্বদা পরিণাম হইতেছে, সর্বদাই যেন উহার প্রবাহ চলিয়াছে, উহা সসীম, উহা যেন খণ্ড খণ্ড ভাবে ভাঙিয়া চুরিয়া রহিয়াছে। উহা কিরূপে সেই অনন্ত অপরিবর্তনীয় অখণ্ড অবিভাজ্য সনাতন বস্তুর সংবাদ দিবে?—কখনই দিতে পারে না। আর যখনই মানবজাতি চৈতন্যহীন জড়বস্তু হইতে এই-সকল প্রশ্নের উত্তর পাইতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছে, ইতিহাসই জানে তাহার ফল কতখানি অশুভ হইয়াছে। তবে ঐ বেদোক্ত জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইলে ঐ জ্ঞানলাভ হয়, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে হয় না; ইন্দ্রিয়জ্ঞানই কি মানুষের সর্বস্ব? কে ইহা বলিতে সাহসী হইবে? আমাদের জীবনে—আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে এমন সব মুহূর্ত আসে, হয়তো আমাদের সম্মুখেই আমাদের কোন প্রিয়জনের মৃত্যু হইল অথবা আমরা অন্য কোনরূপ আঘাত পাইলাম, অথবা অতিশয় আনন্দের কিছু ঘটিল; এই-সব অবস্থায় সময়ে সময়ে মনটা যেন একেবারে স্থির হইয়া যায়। অনেক সময়ে অনেক অবস্থায় এমনও ঘটে যে, মনটা শান্ত সমাহিত হইয়া ক্ষণকালের জন্য উহার প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পায়, সেই

১ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২।৪ ২ কেন উপনিষদ্, ১।৩

অনন্তের একটু আভাস পায় ; তখন আমাদের সম্মুখে এমন এক বস্তু প্রকাশিত হয়, যেখানে মন বা বাক্য—কিছুই যাইতে পারে না। সাধারণ লোকের জীবনেই সময়ে সময়ে এইরূপ ঘটিয়া থাকে ; অভ্যাসের দ্বারা এই অবস্থাকে প্রগাঢ়, স্থায়ী, পরিপূর্ণ ও নিখুঁত করিতে হইবে। মানুষ শত শত যুগ পূর্বে আবিষ্কার করিয়াছে যে, আত্মা ইন্দ্রিয় দ্বারা বদ্ধ বা সীমিত নহে, এমন কি চেতনার দ্বারাও নহে। আমাদের বুঝিতে হইবে যে, চেতনা সেই অনন্ত শৃঙ্খলের একটি ক্ষুদ্র অংশের নাম মাত্র। চেতনা সত্তার সহিত অভিন্ন নহে, উহা সত্তার একটি অংশ মাত্র। ঋষিগণ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত ভূমিতে নির্ভীকভাবে আত্মানুসন্ধান করিয়াছেন। চেতনা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা সীমাবদ্ধ। আধ্যাত্মিক জগতের সত্যলাভ করিতে হইলে মানুষকে ইন্দ্রিয়ের বাহিরে যাইতেই হইবে। আর এখনও এমন সব লোক আছেন, যাঁহারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাহিরে যাইতে সমর্থ। ইঁহাদিগকেই ঋষি বলে ; কারণ ইঁহারা আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। সুতরাং আমার সম্মুখস্থ এই টেবিলটিকে আমি যেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা জানিয়া থাকি, বেদনিহিত সত্যসমূহের প্রমাণও সেইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূত। টেবিলটিকে আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকি, আর আধ্যাত্মিক সত্যসমূহও জীবাত্মার অতিচেতন অবস্থায় প্রত্যক্ষ অনুভূত হইয়া থাকে। এই ঋষিত্বলাভ দেশ-কাল-লিঙ্গ বা জাতি-বিশেষের উপর নির্ভর করে না। বাৎস্যায়ন অকুতোভয়ে বলিয়াছিলেন যে, এই ঋষিত্ব ঋষির বংশধরগণের, আর্য-অনার্য এমন কি ম্লেচ্ছগণের পর্যন্ত সাধারণ সম্পত্তি।

বেদের ঋষিত্ব বলিতে ইহাই বুঝায় ; আমাদিগকে ভারতীয় ধর্মের এই আদর্শ সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, আর আমি ইচ্ছা করি যে, জগতের অন্যান্য জাতিও এই আদর্শটি স্মরণ রাখিবেন, তাহা হইলেই বিভিন্ন ধর্মে বিবাদ-বিসংবাদ কমিয়া যাইবে। শাস্ত্রপাঠেই ধর্মলাভ হয় না ; অথবা মতমতান্তরের দ্বারা বা বচনে, এমন কি যুক্তিতর্ক-বিচারের দ্বারাও ধর্মলাভ হয় না। ধর্ম সাক্ষাৎ করিতে হইবে—ঋষি হইতে হইবে। বন্ধুগণ, যতদিন না তোমাদের প্রত্যেকেই ঋষি হইতেছ, যতদিন না আধ্যাত্মিক সত্য সাক্ষাৎ করিতেছ, ততদিন তোমাদের ধর্মজীবন আরম্ভ হয় নাই, জানিবে। যতদিন না অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বার খুলিয়া যায়, ততদিন তোমার পক্ষে ধর্ম কেবল কথার কথা মাত্র,

ততদিন কেবল ধর্মলাভের জন্য প্রস্তুত হইতেছ মাত্র, ততদিন পরোক্ষ বিবরণ দিতেছ মাত্র।

এক সময়ে বুদ্ধদেবের সহিত কতকগুলি ব্রাহ্মণের তর্ক হইয়াছিল। সেই সময়ে তিনি একটি অতি সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এখানে বেশ খাটে। ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধদেবের নিকট ব্রহ্মের স্বরূপ আলোচনা করিতে আসেন। সেই মহাপুরুষ তাঁহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি ব্রহ্মকে দেখিয়াছেন?' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'না, দেখি নাই।' বুদ্ধদেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার পিতা?' 'না, তিনিও দেখেন নাই।' 'আপনার পিতামহ?' 'বোধ হয়, তিনিও দেখেন নাই।' তখন বুদ্ধ বলিলেন, 'বন্ধু, আপনার পিতৃ-পিতামহগণও যাঁহাকে দেখেন নাই, এমন পুরুষ সম্বন্ধে আপনি কিরূপে বিচার দ্বারা অন্যকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন?' সমগ্র পৃথিবী ইহাই করিতেছে। বেদান্তের ভাষায় আমাদিগকেও বলিতে হইবে: নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।[১]—বাগাড়ম্বর দ্বারা সেই আত্মাকে লাভ করা যায় না, মেধা দ্বারাও তাঁহাকে লাভ করা যায় না, এমন কি, বেদপাঠের দ্বারাও নয়।

পৃথিবীর সকল জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বেদের ভাষায় আমাদিগকে বলিতে হইবে, তোমাদের বাদ-বিসংবাদ বৃথা; তোমরা যে-ঈশ্বরকে প্রচার করিতে চাও, তাঁহাকে দেখিয়াছ কি? যদি না দেখিয়া থাকো, তবে বৃথাই তোমার প্রচার; তুমি কি বলিতেছ, তাহাই তুমি জান না; আর যদি ঈশ্বরকে দেখিয়া থাকো, তবে তুমি আর বিবাদ করিবে না, তোমার মুখই উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিবে।

এক প্রাচীন ঋষি তাঁহার পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য গুরুগৃহে প্রেরণ করেন। সে যখন ফিরিল, পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কী শিখিয়াছ?' পুত্র বলিল, সে নানা বিদ্যা শিখিয়াছে। পিতা বলিলেন, 'কিছুই শেখ নাই; আবার গুরুগৃহে যাও।' পুত্র আবার গুরুগৃহে গেল; ফিরিয়া আসিলে পিতা পূর্ববৎ প্রশ্ন করিলেন। পুত্রও পূর্ববৎ উত্তর দিল। তাহাকে আর একবার গুরুগৃহে যাইতে হইল। এবার যখন সে ফিরিল, তখন তাহার সমগ্র মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় হইয়া গিয়াছে। তখন পিতা বলিলেন, 'বৎস, আজ তোমার

[১] কঠোপনিষৎ, ১।২।২৩

মুখমণ্ডল ব্রহ্মবিদের ন্যায় উদ্ভাসিত দেখিতেছি।' যখন তুমি ঈশ্বরকে জানিবে, তখন তোমার মুখ, তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার সমগ্র আকৃতিই পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। তখন তুমি মানবজাতির নিকট এক মহাকল্যাণস্বরূপ হইবে। ঋষির শক্তি কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে না। ইহাই ঋষিত্ব এবং ইহাই আমাদের ধর্মের আদর্শ। অবশিষ্ট যাহা কিছু—পরস্পর কথা-বার্তা, যুক্তি-বিচার, দর্শন, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, এমন কি বেদ পর্যন্ত—এই ঋষিত্বলাভের প্রস্তুতি-মাত্র, ও-গুলি গৌণ। ঋষিত্বলাভই মুখ্য। বেদ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষাদি—সবই গৌণ। তাহাই পরা বিদ্যা, যাহা দ্বারা আমরা সেই অক্ষর পুরুষকে জানিতে পারি। যাঁহারা এই তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বৈদিক ঋষি। ঋষি-অর্থে আমরা এক শ্রেণীর বিশেষ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে বুঝিয়া থাকি। যথার্থ হিন্দু হইতে গেলে আমাদের প্রত্যেককেই জীবনের কোন-না-কোন অবস্থায় এই ঋষিত্ব লাভ করিতে হইবে, আর ঋষিত্বলাভই হিন্দুর নিকট মুক্তি। কতকগুলি মতবাদে বিশ্বাস, সহস্র সহস্র মন্দির দর্শন বা পৃথিবীতে যত নদী আছে সবগুলিতে স্নান করিলে হিন্দুমতে মুক্তি হইবে না। ঋষি হইলে, মন্ত্রদ্রষ্টা হইলে তবেই মুক্তিলাভ হইবে।

পরবর্তী সময়ের কথা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, তখন সমগ্র জগৎ-আলোড়নকারী মহাপুরুষগণ—শ্রেষ্ঠ অবতারগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অবতারের সংখ্যা অনেক। ভাগবতের মতে অবতার অসংখ্য; তন্মধ্যে রাম ও কৃষ্ণই ভারতে বিশেষভাবে পূজিত হইয়া থাকেন। এই প্রাচীন বীরযুগের আদর্শ—সত্যপরায়ণতা ও নীতির সাকার মূর্তি, আদর্শ তনয়, আদর্শ পতি, আদর্শ পিতা, সর্বোপরি আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের চরিত্র অঙ্কন করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। এই মহাকবি যে ভাষায় রামচরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা শুদ্ধতর, মধুরতর, অথচ সরলতর ভাষা আর হইতে পারে না। আর সীতার কথা কি বলিব! তোমরা জগতের সমগ্র প্রাচীন সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া নিঃশেষ করিতে পারো, আমি তোমাদিগকে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, জগতের ভাবী সাহিত্যসমূহও নিঃশেষ করিতে পারো, কিন্তু আর একটি সীতার চরিত্র বাহির করিতে পারিবে না। সীতাচরিত্র অসাধারণ; ঐ চরিত্র ঐ একবার মাত্রই চিত্রিত হইয়াছে, আর কখনও হয় নাই, হইবেও না। রাম হয়তো অনেক হইয়াছেন, কিন্তু

সীতা আর হয় নাই। ভারতীয় নারীগণের যেরূপ হওয়া উচিত, সীতা তাহার আদর্শ; নারীচরিত্রের যত প্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই এক সীতা-চরিত্র হইতেই উদ্ভূত; আর সমগ্র আর্যাবর্তে এই সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ তিনি আবালবৃদ্ধবনিতার পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মহামহিমময়ী সীতা—সাক্ষাৎ পবিত্রতা অপেক্ষাও পবিত্রতরা, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন। যিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া সেই মহাদুঃখের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সেই নিত্যসাধ্বী নিত্যবিশুদ্ধস্বভাবা আদর্শ পত্নী সীতা, সেই নরলোকের—এমন কি দেবলোকের পর্যন্ত আদর্শস্বরূপা মহীয়সী সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে বর্তমান থাকিবেন। আমরা সকলেই তাঁহার চরিত্র বিশেষরূপে জানি, সুতরাং উহার বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন নাই। আমাদের সব পুরাণ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এমন কি আমাদের বেদ পর্যন্ত লোপ পাইতে পারে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা পর্যন্ত চিরদিনের জন্য কালস্রোতে বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, যতদিন ভারতে অতিশয় গ্রাম্যভাষাভাষী পাঁচজন হিন্দুও থাকিবে, ততদিন সীতার উপাখ্যান থাকিবে। সীতা আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর শোণিতে সীতা বিরাজমানা। আমরা সকলেই সীতার সন্তান। আমাদের নারীগণকে আধুনিক ভাবে গড়িয়া তুলিবার যে-সকল চেষ্টা হইতেছে, সেগুলির মধ্যে যদি সীতাচরিত্রের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা থাকে, তবে সেগুলি বিফল হইবে। আর প্রত্যহই আমরা ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। ভারতীয় নারীগণকে সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিজেদের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ।

অতঃপর তাঁহার কথা আলোচনা করা যাউক, যিনি নানাভাবে পূজিত হইয়া থাকেন, যিনি আবালবৃদ্ধবনিতা ভারতবাসী সকলেরই পরমপ্রিয় ইষ্টদেবতা। আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই এ-কথা বলিতেছি, ভাগবতকার যাঁহাকে অবতার বলিয়াই তৃপ্ত হন নাই, বলিয়াছেন, 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।'[১]—অন্যান্য অবতার সেই ভগবানের অংশ ও কলাস্বরূপ, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

---

১ শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৩।২৮

যখন আমরা তাঁহার বিবিধভাবসমন্বিত চরিত্রের বিষয় আলোচনা করি, তখন কিছুমাত্র আশ্চর্য বোধ হয় না যে, তাঁহার প্রতি এরূপ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। তিনি একাধারে অপূর্ব সন্ন্যাসী ও অদ্ভুত গৃহী ছিলেন; তাঁহার মধ্যে বিস্ময়কর রজঃশক্তির বিকাশ দেখা গিয়াছিল, অথচ তাঁহার অদ্ভুত ত্যাগ ছিল। গীতা পাঠ না করিলে কৃষ্ণচরিত্র কখনই বুঝা যাইতে পারে না; কারণ তিনি তাঁহার নিজ উপদেশের মূর্তিমান্ বিগ্রহ ছিলেন। সকল অবতারই, তাঁহারা যাহা প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, তাহার জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ ছিলেন। গীতার প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ চিরজীবন সেই ভগবদ্গীতার সাকার বিগ্রহরূপে বর্তমান ছিলেন; তিনি অনাসক্তির মহৎ দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি অনেককে রাজা করিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন না; সেই সমগ্র ভারতের নেতা, যাঁহার বাক্যে রাজগণ নিজ নিজ সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং রাজা হইতে ইচ্ছা করেন নাই। বাল্যকালে যে-শ্রীকৃষ্ণ সরলভাবে গোপীদের সহিত ক্রীড়া করিতেন, জীবনের সকল অবস্থাতেই তিনি সেই সরল সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ।

তাঁহার জীবনের সেই চিরস্মরণীয় অধ্যায়ের কথা মনে পড়িতেছে, যাহা অতি দুর্বোধ্য। যতক্ষণ না কেহ পূর্ণ ব্রহ্মচারী ও পবিত্রস্বভাব হইতেছে, ততক্ষণ তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত নয়। সেই প্রেমের অপূর্ব বিকাশের কথা মনে পড়িতেছে, যাহা সেই বৃন্দাবনের মধুর লীলায় রূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে; প্রেমমদিরা-পানে যে একেবারে উন্মত্ত হইয়াছে, সে ব্যতীত আর কেহ তাহা বুঝিতে পারে না। কে সেই গোপীদের প্রেম-জনিত বিরহযন্ত্রণার ভাব বুঝিতে সমর্থ, যে-প্রেম প্রেমের চরম আদর্শস্বরূপ, যে-প্রেম আর কিছু চাহে না, যে-প্রেম স্বর্গ পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করে না, যে-প্রেম ইহলোক-পরলোকের কোন বস্তু কামনা করে না! হে বন্ধুগণ, এই গোপীপ্রেম দ্বারাই সগুণ ও নির্গুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে বিরোধের একমাত্র মীমাংসা হইয়াছে। আমরা জানি, মানুষ সগুণ ঈশ্বর হইতে উচ্চতর ধারণা করিতে পারে না। আমরা ইহাও জানি, দার্শনিক-দৃষ্টিতে সমগ্র জগদ্ব্যাপী ঈশ্বরে—সমগ্র জগৎ যাঁহার বিকাশ, সেই নির্গুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসই স্বাভাবিক। এদিকে আমাদের প্রাণ একটা সাকার বস্তু চায়—এমন বস্তু চায়, যাহা আমরা ধরিতে পারি, যাঁহার পাদপদ্মে প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারি। সুতরাং সগুণ ঈশ্বরই মানবমনের সর্বোচ্চ ধারণা। কিন্তু যুক্তি এই ধারণায়

সন্তুষ্ট হইতে পারে না। ইহাই সেই অতি প্রাচীন, প্রাচীনতম সমস্যা—যাহা ব্রহ্মসূত্রে বিচারিত হইয়াছে, যাহা লইয়া বনবাসকালে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের সহিত বিচার করিয়াছিলেনঃ যদি একজন সগুণ, সম্পূর্ণ দয়াময়, সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর থাকেন, তবে এই নরককুণ্ড—সংসারের অস্তিত্ব কেন? কেন তিনি ইহা সৃষ্টি করিলেন? তাঁহাকে একজন মহাপক্ষপাতী ঈশ্বর বলিতে হইবে। ইহার কোনরূপ মীমাংসাই হয় নাই; কেবল গোপীপ্রেম সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা পড়িয়া থাকো, তাহাতেই ইহার মীমাংসা হইয়াছে। তাহারা কৃষ্ণের প্রতি কোন বিশেষণ প্রয়োগ করিতে চাহিত না; তিনি যে সৃষ্টিকর্তা, তিনি যে সর্বশক্তিমান্—তাহাও তাহারা জানিতে চাহিত না। তাহারা কেবল বুঝিত—তিনি প্রেমময়; ইহাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। গোপীরা কৃষ্ণকে কেবল বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বলিয়া বুঝিত। সেই বহু সেনাবাহিনীর নেতা রাজাধিরাজ কৃষ্ণ তাহাদের নিকট বরাবর সেই রাখালবালকই ছিলেন।

'ন ধনং ন জনং ন কবিতাং সুন্দরীং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥'[১]

—হে জগদীশ, আমি ধন জন কবিতা বা সুন্দরী—কিছুই প্রার্থনা করি না; হে ঈশ্বর, জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে। ধর্মের ইতিহাসে ইহা এক নূতন অধ্যায়—এই অহৈতুকী ভক্তি, এই নিষ্কাম কর্ম; আর মানুষের ইতিহাসে ভারতক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার কৃষ্ণের মুখ হইতে সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব নির্গত হইয়াছে। ভয়ের ধর্ম, প্রলোভনের ধর্ম চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল; নরকের ভীতি ও স্বর্গ-সুখের প্রলোভন সত্ত্বেও এই অহৈতুকী ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম-রূপ শ্রেষ্ঠ আদর্শের অভ্যুদয় হইল।

এ প্রেমের মহিমা কি আর বলিব! এইমাত্র তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, গোপীপ্রেম উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন। আমাদের মধ্যেও এমন নির্বোধের অভাব নাই, যাহারা শ্রীকৃষ্ণের জীবনের এই অতি অপূর্ব অংশের অদ্ভুত তাৎপর্য বুঝিতে পারে না। আমি আবার বলিতেছি, আমাদেরই স্বজাতি এমন অনেক অশুদ্ধচিত্ত নির্বোধ আছে, যাহারা গোপীপ্রেমের নাম শুনিলে উহা অতি অপবিত্র ব্যাপার ভাবিয়া ভয়ে দশহাত পিছাইয়া যায়। তাহাদিগকে

১ শিক্ষাষ্টকম্—চৈতন্যচরিতামৃত

শুধু এইটুকু বলিতে চাই—নিজের মন আগে শুদ্ধ কর, আর তোমাদিগকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যিনি এই অদ্ভুত গোপীপ্রেম বর্ণন করিয়াছেন, তিনি আর কেহই নহেন, তিনি সেই চিরপবিত্র ব্যাসতনয় শুক। যতদিন হৃদয়ে স্বার্থপরতা থাকে, ততদিন ভগবৎপ্রেম অসম্ভব ; উহা কেবল দোকানদারি —আমি তোমাকে কিছু দিতেছি, প্রভু, তুমি আমাকে কিছু দাও। আর ভগবান্ বলিতেছেন, যদি তুমি এরূপ না কর, তবে তুমি মরিলে পর তোমাকে দেখিয়া লইব, চিরকাল আমি তোমাকে দগ্ধ করিয়া মারিব। সকাম ব্যক্তির ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা এইরূপ। যতদিন মাথায় এইসব ভাব থাকে, ততদিন গোপীদের প্রেমজনিত বিরহের উন্মত্ততা লোকে কি করিয়া বুঝিবে ?

'সুরতবর্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥'[১]

—একবার, একবারমাত্র যদি সেই অধরের মধুর চুম্বন লাভ করা যায়! যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ, চিরকাল ধরিয়া তোমার জন্য তাহার পিপাসা বাড়িতে থাকে, তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়, তখন আমাদের অন্যান্য সকল বিষয়ে আসক্তি চলিয়া যায়, কেবল তুমিই তখন একমাত্র প্রীতির বস্তু হও।

প্রথমে এই কাঞ্চন, নাম-যশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড়ো দেখি। তখনই—কেবল তখনই তোমরা গোপীপ্রেম কি তাহা বুঝিবে। উহা এত শুদ্ধ জিনিস যে, সর্বত্যাগ না হইলে উহা বুঝিবার চেষ্টাই করা উচিত নয়। যতদিন পর্যন্ত না চিত্ত সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, ততদিন উহা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। প্রতি মুহূর্তে যাহাদের হৃদয়ে কামকাঞ্চন যশোলিপ্সার বুদ্বুদ উঠিতেছে, তাহারাই আবার গোপীপ্রেম বুঝিতে চায় এবং উহার সমালোচনা করিতে যায়! কৃষ্ণ-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম শিক্ষা দেওয়া। এমন কি দর্শনশাস্ত্র-শিরোমণি গীতা পর্যন্ত সেই অপূর্ব প্রেমোন্মত্ততার সহিত তুলনায় দাঁড়াইতে পারে না। কারণ গীতায় সাধককে ধীরে ধীরে সেই চরম লক্ষ্য মুক্তিসাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু এই গোপীপ্রেমের মধ্যে ঈশ্বর-রসাস্বাদের উন্মত্ততা, ঘোর প্রেমোন্মত্ততাই বিদ্যমান ; এখানে গুরু-শিষ্য, শাস্ত্র-উপদেশ, ঈশ্বর-স্বর্গ সব একাকার, ভয়ের ধর্মের চিহ্ন মাত্র নাই, সব গিয়াছে—আছে কেবল

১ শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৩১।১৪

প্রেমোন্মত্ততা। তখন সংসারের আর কিছু মনে থাকে না, ভক্ত তখন সংসারে কৃষ্ণ—একমাত্র সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না, তখন তিনি সর্ব-প্রাণীতে কৃষ্ণ দর্শন করেন, তাঁহার নিজের মুখ পর্যন্ত তখন কৃষ্ণের মতো দেখায়, তাঁহার আত্মা তখন কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া যায়। মহানুভব কৃষ্ণের ঈদৃশ মহিমা।

কৃষ্ণজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবান্তর কথা লইয়া সময় নষ্ট করিও না; তাঁহার জীবনের মুখ্য অংশ যাহা, তাহাই অবলম্বন কর। কৃষ্ণের জীবনচরিতে হয়তো অনেক ঐতিহাসিক অসামঞ্জস্য আছে, অনেক বিষয় হয়তো প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এ সবই সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ সময়ে সমাজে যে এক অপূর্ব নূতন ভাবের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহার অবশ্যই ভিত্তি ছিল। অন্য যে-কোন মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করিলেই দেখিতে পাই যে, তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী কতকগুলি ভাবের প্রতিধ্বনিমাত্র; আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি তাঁহার নিজ দেশে, এমন কি সেই সময়ে যে-সকল শিক্ষা প্রচলিত ছিল, শুধু সেগুলিই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, সেই মহাপুরুষ আদৌ ছিলেন কি না, সে সম্বন্ধেই গুরুতর সন্দেহ থাকিতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণের উপদেশ বলিয়া কথিত এই নিষ্কাম কর্ম ও নিষ্কাম প্রেমতত্ত্ব জগতে অভিনব মৌলিক ভাব নহে, ইহা প্রমাণ কর দেখি। যদি না পারো, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন এক ব্যক্তি নিশ্চয়ই এই তত্ত্বগুলি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ঐ তত্ত্বগুলি অপর কোন ব্যক্তির নিকট হইতে গৃহীত বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ কৃষ্ণের আবির্ভাবকালে সর্বসাধারণের মধ্যে ঐ তত্ত্ব প্রচারিত ছিল বলিয়া জানা যায় না। ভগবান কৃষ্ণই ইহার প্রথম প্রচারক, তাঁহার শিষ্য বেদব্যাস উক্ত তত্ত্ব জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিলেন। মানবভাষায় এরূপ শ্রেষ্ঠ আদর্শ আর কখনও চিত্রিত হয় নাই। আমরা তাঁহার গ্রন্থে গোপীজনবল্লভ সেই বৃন্দাবনের রাখালরাজ অপেক্ষা আর কোন উচ্চতর আদর্শ পাই না। যখন তোমাদের মস্তিষ্কে এই উন্মত্ততা প্রবেশ করিবে, যখন তোমরা মহাভাগা গোপীগণের ভাব বুঝিবে, তখনই তোমরা জানিতে পারিবে প্রেম কি বস্তু! যখন সমগ্র জগৎ তোমাদের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইবে, যখন তোমাদের হৃদয়ে অন্য কোন কামনা থাকিবে না, যখন তোমাদের সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি হইবে, আর কোনও লক্ষ্য থাকিবে না, এমন কি যখন তোমাদের সত্যানুসন্ধানস্পৃহা

পর্যন্ত থাকিবে না, তখনই তোমাদের হৃদয়ে সেই প্রেমোন্মত্ততার আবির্ভাব হইবে, তখনই তোমরা গোপীদের অহেতুক প্রেমের শক্তি বুঝিবে। ইহাই লক্ষ্য। যখন এই প্রেম লাভ করিলে, তখন সব পাইলে।

এইবার আমরা একটু নিম্নস্তরে নামিয়া গীতাপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ভারতে এখন অনেকের মধ্যে একটা চেষ্টা দেখা যায়—সেটা যেন ঘোড়ার আগে গাড়ি জোতার মতো। আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা—কৃষ্ণ গোপীদের সহিত প্রেমলীলা করিয়াছেন, এটা যেন কি এক রকম! সাহেবেরাও ইহা বড পছন্দ করে না। অমুক পণ্ডিত এই গোপীপ্রেমটা বড় সুবিধা মনে করেন না। তবে আর কি? গোপীদের যমুনার জলে ভাসাইয়া দাও! সাহেবদের অনুমোদিত না হইলে কৃষ্ণ টেকেন কি করিয়া? কখনই টিকিতে পারেন না! মহাভারতে দু-এক স্থল ছাড়া—সেগুলিও বড় উল্লেখযোগ্য স্থল নহে—গোপীদের প্রসঙ্গই নাই! দ্রৌপদীর স্তবের মধ্যে এবং শিশুপালের বক্তৃতায় বৃন্দাবনের কথা আছে মাত্র!

—এগুলি সব প্রক্ষিপ্ত! সাহেবেরা যাহা না চায়, সব উড়াইয়া দিতে হইবে! গোপীদের কথা, এমন কি, কৃষ্ণের কথা পর্যন্ত প্রক্ষিপ্ত! যে-সকল ব্যক্তি এইরূপ ঘোরতর বণিকমনোভাবাপন্ন, যাহাদের ধর্মের আদর্শ পর্যন্ত ব্যবসাদারি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের সকলেরই মনোভাব এই যে, তাহারা ইহলোকে কিছু করিয়া স্বর্গে যাইবে। ব্যবসাদার চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ চাহিয়া থাকে, তাহারা এখানে এমন কিছু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া যাইতে চায়, যাহার ফলে স্বর্গে গিয়া সুখভোগ করিবে! ইহাদের ধর্মপ্রণালীতে অবশ্য গোপীদের স্থান নাই।

আমরা এখন সেই আদর্শ প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের কথা ছাড়িয়া একটু নিম্নস্তরে নামিয়া গীতাপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা করিব। এখানেও আমরা দেখিতে পাই, গীতার মতো বেদের ভাষ্য আর কখনও হয় নাই, হইবেও না। শ্রুতি বা উপনিষদের তাৎপর্য বুঝা বড় কঠিন; কারণ ভাষ্যকারেরা সকলেই নিজেদের মতানুযায়ী উহা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশেষে যিনি স্বয়ং শ্রুতির বক্তা, সেই ভগবান্ নিজে আসিয়া গীতার প্রচারকরূপে শ্রুতির অর্থ বুঝাইলেন, আর আজ ভারতে সেই ব্যাখ্যা-প্রণালীর যেমন প্রয়োজন—সমগ্র জগতে উহার যেমন প্রয়োজন, আর কিছুরই তেমন নহে। আশ্চর্যের বিষয় পরবর্তী শাস্ত্রব্যাখ্যাতাগণ এমন কি গীতার ব্যাখ্যা করিতে গিয়াও অনেক

সময়ে ভগবদুক্ত বাক্যের তাৎপর্য ধরিতে পারেন নাই। গীতাতে কি দেখিতে পাওয়া যায়? আধুনিক ভাষ্যকারগণের ভিতরই বা কি দেখিতে পাওয়া যায়? একজন অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকার কোন উপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন; শ্রুতিতে অনেক দ্বৈতভাবাত্মক বাক্য রহিয়াছে; তিনি কোনরূপে সেগুলিকে ভাঙিয়া চুরিয়া নিজের মনোমত অর্থ তাহা হইতে বাহির করিলেন। আবার দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারও অদ্বৈতবাদাত্মক বাক্যগুলিকে ভাঙিয়া চুরিয়া দ্বৈত অর্থ করিলেন। কিন্তু গীতায় শ্রুতির তাৎপর্য এরূপ বিকৃত করিবার চেষ্টা নাই। ভগবান্ বলিতেছেন, এগুলি সব সত্য; জীবাত্মা ধীরে ধীরে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সোপানে আরোহণ করিতেছেন, এইরূপে ক্রমশঃ তিনি সেই চরম লক্ষ্য অনন্ত পূর্ণস্বরূপে উপনীত হন। গীতাতে এই ভাবে বেদের তাৎপর্য বিবৃত হইয়াছে, এমন কি কর্মকাণ্ড পর্যন্ত গীতায় স্বীকৃত হইয়াছে, আর ইহা দেখানো হইয়াছে যে, যদিও কর্মকাণ্ড সাক্ষাৎভাবে মুক্তির সহায় নয়, গৌণভাবে মুক্তির সহায়, তথাপি উহা সত্য; মূর্তিপূজাও সত্য, সর্বপ্রকার অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপও সত্য, শুধু একটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে—চিত্তশুদ্ধি। যদি হৃদয় শুদ্ধ ও অকপট হয়, তবেই উপাসনা সত্য হয় এবং আমাদিগকে চরম লক্ষ্যে লইয়া যায়, আর এই-সব বিভিন্ন উপাসনাপ্রণালীই সত্য, কারণ সত্য না হইলে সেগুলির সৃষ্টি হইল কেন? আধুনিক অনেক ব্যক্তির মত—বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায় কতকগুলি কপট ও দুষ্ট লোক স্থাপন করিয়াছে; তাহারা কিছু অর্থ-লালসায় এই-সকল ধর্ম ও সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। এ কথা একেবারে ভুল। তাঁহাদের ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে যতই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হউক না কেন, উহা সত্য নহে; ঐগুলি ঐরূপে সৃষ্ট হয় নাই। জীবাত্মার স্বাভাবিক প্রয়োজনে ঐগুলির অভ্যুদয় হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানবের ধর্মপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য সেগুলির অভ্যুদয় হইয়াছে, সুতরাং উহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কোন ফল নাই। যে-দিন সেই প্রয়োজন আর থাকিবে না, সে-দিন সেই প্রয়োজনের অভাবের সঙ্গে সেগুলিও লোপ পাইবে, আর যতদিন এই প্রয়োজন থাকিবে, ততদিন তোমরা যতই ঐগুলির তীব্র সমালোচনা কর না কেন, যতই ঐগুলির বিরুদ্ধে প্রচার কর না কেন, ঐগুলি অবশ্যই থাকিবে। তরবারি-বন্দুকের সাহায্যে পৃথিবী রক্তস্রোতে ভাসাইয়া দিতে পারো, কিন্তু যতদিন প্রতিমার প্রয়োজন থাকিবে, ততদিন প্রতিমাপূজা

থাকিবেই থাকিবে। এই বিভিন্ন অনুষ্ঠানপদ্ধতি ও ধর্মের বিভিন্ন সোপান অবশ্যই থাকিবে, আর আমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে বুঝিতে পারিতেছি, সেগুলির কি প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের কিছুকাল পরেই ভারতের ইতিহাসে এক শোচনীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল। গীতাতেই দূরাগত ধ্বনির মতো সম্প্রদায়সমূহের বিরোধ কোলাহল আমাদের কানে আসে, আর সেই সামঞ্জস্যের অদ্ভুত উপদেষ্টা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থ হইয়া বিরোধ মিটাইয়া দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, 'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।'—যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে, তেমনি আমাতেই সব ওতপ্রোত রহিয়াছে।

আমরা সাম্প্রদায়িক বিরোধের দূরশ্রুত অস্ফুটধ্বনি তখন হইতেই শুনিতে পাই। সম্ভবতঃ ভগবানের উপদেশে এই বিরোধ কিছুকাল মন্দীভূত হইয়া সমন্বয় ও শান্তি আসিয়াছিল; কিন্তু আবার বিরোধ বাধিল। শুধু ধর্মমত লইয়া নহে, সম্ভবতঃ জাতি লইয়া এ বিবাদ চলিয়াছিল; আমাদের সমাজের দুইটি প্রবল অঙ্গ—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল; এবং সহস্র বৎসর ধরিয়া যে মহান্ তরঙ্গ সমগ্র ভারতকে প্লাবিত করিয়াছিল, তাহার সর্বোচ্চ চূড়ায় আমরা আর এক মহামহিমময় মূর্তি দেখিতে পাই। তিনি আর কেহ নহেন—আমাদেরই গৌতম শাক্যমুনি। তোমরা সকলেই তাঁহার উপদেশ ও প্রচারকার্যের বিষয় অবগত আছ। আমবা তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকি, জগৎ এত বড় নির্ভীক নীতিতত্ত্বের প্রচারক আর দেখে নাই। তিনি কর্মযোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেই কৃষ্ণই যেন নিজের শিষ্যরূপে নিজ মতগুলি কার্যে পরিণত করিবার জন্য আবির্ভূত হইলেন। আবার সেই বাণী উচ্চারিত হইল, যাহা গীতায় শিক্ষা দিয়াছিল: স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ—এই ধর্মের অতি সামান্য অনুষ্ঠানও মহাভয় হইতে রক্ষা করে। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্—স্ত্রী, বৈশ্য, এমন কি শূদ্রগণ পর্যন্ত পরমগতি প্রাপ্ত হয়। গীতার বাক্যসমূহ—শ্রীকৃষ্ণের বজ্রগম্ভীর মহতী বাণী সকলের বন্ধন, সকলের শৃঙ্খল ভাঙিয়া ফেলিয়া দেয়, সকলেরই সেই পরম-পদলাভের অধিকার ঘোষণা করে।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

—যাঁহাদের মন সাম্যে অবস্থিত, তাঁহারা এখানেই সংসার জয় করিয়াছেন। ব্রহ্ম সমভাবাপন্ন ও নির্দোষ, স্থতরাং তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত।

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥

—পরমেশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া তিনি নিজে আর নিজেকে হিংসা করেন না, আত্মহিংসাশূন্য হইয়া পরমগতি লাভ করেন।

গীতার এই উপদেশের জীবন্ত উদাহরণরূপে—উহার এক বিন্দুও অন্ততঃ যাহাতে কার্যে পরিণত হয় এইজন্য—সেই গীতা-উপদেষ্টাই অন্যরূপে আবার মর্ত্যধামে আসিলেন। ইনিই শাক্যমুনি। ইনি দুঃখী দরিদ্রদের উপদেশ দিতে লাগিলেন, যাহাতে সর্বসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারেন, সেজন্য ইনি দেবভাষা পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া সাধারণলোকের ভাষায় উপদেশ দিতে লাগিলেন, রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া ইনি দুঃখী দরিদ্র পতিত ভিক্ষুকদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন, দ্বিতীয় রামের মতো ইনি চণ্ডালকে বক্ষে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন।

তোমরা সকলেই তাঁহার মহান্ চরিত্র ও অদ্ভুত প্রচারকার্যের বিষয় অবগত আছ। কিন্তু এই প্রচারকার্যের মধ্যে একটা বিষম ত্রুটি ছিল, তাহার জন্য আজ পর্যন্ত আমরা ভুগিতেছি। ভগবান্ বুদ্ধের কোন দোষ নাই, তাঁহার চরিত্র পরম পবিত্র ও মহামহিমময়। দুঃখের বিষয়—বৌদ্ধধর্মপ্রচারের ফলে যে-সকল বিভিন্ন অসভ্য ও অশিক্ষিত মানবজাতি আর্যসমাজে প্রবেশ করিতে লাগিল, তাহারা বুদ্ধদেব-প্রচারিত উচ্চ আদর্শগুলি ঠিক ঠিক গ্রহণ করিতে পারিল না। এই-সকল জাতি তাহাদের নানাবিধ কুসংস্কার এবং বীভৎস উপাসনা-পদ্ধতিগুলি সঙ্গে লইয়া দলে দলে আর্যসমাজে প্রবেশ করিতে লাগিল। কিছুদিনের জন্য বোধ হইল তাহারা যেন সভ্য হইয়াছে, কিন্তু এক শতাব্দী যাইতে না যাইতে তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষদের সর্প ভূত প্রভৃতির উপাসনা সমাজে চালাইতে লাগিল। এইরূপে সমগ্র ভারত কুসংস্কারের পূর্ণ লীলাক্ষেত্র হইয়া অত্যন্ত অবনত হইল। প্রথমে বৌদ্ধগণ প্রাণিহিংসাকে নিন্দা করিতে গিয়া বৈদিক যজ্ঞসমূহের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। তখন প্রত্যেক গৃহে এই-সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, গৃহকোণে যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নি প্রজ্বালিত থাকিত, ইহাই ছিল উপাসনার যা-কিছু সাজসজ্জা। বৌদ্ধদের প্রচারে এই যজ্ঞগুলি লোপ পাইল,

তৎপরিবর্তে বিরাট বিরাট মন্দির, জাঁকালো অনুষ্ঠানপদ্ধতি, আড়ম্বরপ্রিয় পুরোহিতদল এবং বর্তমানকালে ভারতে আর যাহা কিছু দেখিতেছ, সেইগুলির আবির্ভাব হইল। বুদ্ধ সম্বন্ধে আরও বেশী জ্ঞান থাকা উচিত ছিল, এমন কয়েকজন আধুনিক ব্যক্তির লিখিত গ্রন্থে পড়া যায়, বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুতুলপূজা তুলিয়া দিয়াছিলেন। উহা পড়িয়া আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারি না। তাঁহারা জানেন না যে, বৌদ্ধধর্মই ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও প্রতিমাপুজার সৃষ্টি করিয়াছিল।

দুই-এক বৎসর পূর্বে একজন রুশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন; তাহাতে তিনি যীশুখ্রীষ্টের একখানি অদ্ভুত জীবনচরিত পাইয়াছেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন। তিনি সেই পুস্তকখানির একস্থলে বলিতেছেন, খ্রীষ্ট ব্রাহ্মণদের নিকট ধর্মশিক্ষার্থ জগন্নাথের মন্দিরে গমন করেন, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতা ও মূর্তিপূজায় বিরক্ত হইয়া তথা হইতে তিব্বতের লামাদের নিকট ধর্মশিক্ষার্থ গমন করেন এবং তাঁহাদের উপদেশে সিদ্ধ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। যাঁহারা ভারতের ইতিহাস কিছুমাত্র জানেন, তাঁহাদের নিকট পুর্বোক্ত বিবৃতি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পুস্তকখানি আগাগোড়া প্রতারণা। কারণ জগন্নাথ-মন্দির একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির। আমরা ঐটিকে এবং অন্যান্য বৌদ্ধ মন্দিরকে হিন্দু মন্দির করিয়া লইয়াছি। এইরূপ ব্যাপার আমাদিগকে এখনও অনেক করিতে হইবে। ইহাই জগন্নাথ মন্দিরের ইতিহাস, আর সে-সময়ে সেখানে একজন ব্রাহ্মণও ছিলেন না, তথাপি বলা হইতেছে যীশুখ্রীষ্ট সেখানে ব্রাহ্মণদের নিকট উপদেশ লইবার জন্য আসিয়াছিলেন! আমাদের রুশীয় দিগ্‌গজ প্রত্নতাত্ত্বিক এই কথা বলিতেছেন!

পূর্বোক্ত কারণে বৌদ্ধধর্মের সর্বপ্রাণীতে দয়া, উহার উচ্চ নীতিতত্ত্ব ও নিত্য আত্মা আছে কি নাই—এই লইয়া চুলচেরা বিচারসত্ত্বেও সমগ্র বৌদ্ধধর্মের প্রাসাদ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল, আর চূর্ণ হইবার পর যে ভগ্নাবশেষ রহিল, তাহা অতি বীভৎস। বৌদ্ধধর্মের অবনতির ফলে যে বীভৎসতা দেখা দিল, তাহা বর্ণনা করিবার সময় আমার নাই, প্রবৃত্তিও নাই। অতি বীভৎস অনুষ্ঠান-পদ্ধতিসমূহ, অতি ভয়ানক ও অশ্লীল গ্রন্থরাজি—যাহা মানুষের হাত দিয়া আর কখন বাহির হয় নাই বা মানবমস্তিষ্ক যাহা আর কখন কল্পনা করে নাই, অতি ভীষণ পাশব অনুষ্ঠানপদ্ধতিসমূহ—যেগুলি আর কখন ধর্মের নামে চলে নাই—এ-সবই অবনত বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি।

কিন্তু ভারতের জীবনীশক্তি তখনও নষ্ট হয় নাই, তাই আবার ভগবানের আবির্ভাব হইল। যিনি বলিয়াছিলেন, 'যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, তখনই আমি আসিয়া থাকি', তিনি আবার আবির্ভূত হইলেন। এবার তাঁহার আবির্ভাব হইল দাক্ষিণাত্যে। সেই ব্রাহ্মণযুবক, যাঁহার সম্বন্ধে কথিত আছে যে, ষোড়শ বর্ষে তিনি তাঁহার সকল গ্রন্থ রচনা শেষ করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুত প্রতিভাশালী শঙ্করাচার্যের অভ্যুদয় হইল। এই ষোড়শবর্ষীয় বালকের রচনা আধুনিক সভ্য জগতে এক বিস্ময়! আর তিনিও ছিলেন বিস্ময়জনক! তিনি চাহিয়াছিলেন সমগ্র ভারতকে তাহার প্রাচীন পবিত্রভাবে লইয়া যাইতে; কিন্তু ভাবিয়া দেখ—এই কার্য কত কঠিন ও কত বিরাট! সে-সময়ে ভারতের অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছিল, সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে কিছু আভাস দিয়াছি। তোমরা যে-সকল বীভৎস আচারের সংস্কার করিতে অগ্রসর হইতেছ, সেগুলি সেই অধঃপতনের যুগ হইতে আসিয়াছে। তাতার বেলুচি প্রভৃতি দুর্দান্ত জাতিসকল ভারতে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া আমাদের সহিত মিশিয়া গেল, এবং তাহাদের জাতীয় আচারগুলিও সঙ্গে লইয়া আসিল। এইরূপে আমাদের জাতীয় জীবন অতি ভয়ানক পাশবিক আচারসমূহ দ্বারা কলুষিত হইল। উক্ত ব্রাহ্মণযুবক বৌদ্ধদের নিকট হইতে দায়স্বরূপ ইহাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আর সেই সময় হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত সমগ্র ভারতে এই অবনত বৌদ্ধধর্ম হইতে বেদান্তের পুনর্বিজয় চলিতেছে, এখনও এ-কার্য চলিতেছে, এখনও উহা শেষ হয় নাই। মহান্ দার্শনিক শঙ্কর আসিয়া দেখাইলেন, বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্তের সারাংশে বিশেষ প্রভেদ নাই। তবে বুদ্ধদেবের শিষ্যপ্রশিষ্যগণ তাঁহার উপদেশের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া নিজেরা পতিত হয় এবং আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া নাস্তিক হইয়া পড়ে—শঙ্কর ইহাই দেখাইলেন; তখন সকল বৌদ্ধই তাহাদের প্রাচীন ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা ঐ-সকল অনুষ্ঠানপদ্ধতিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল; সেগুলির কি হইবে, ইহাই এক মহাসমস্যা হইল।

তখন মহানুভব রামানুজের অভ্যুদয় হইল। শঙ্কর মহামনীষী ছিলেন বটে, কিন্তু বোধ হয় তাঁহার হৃদয় মস্তিষ্কের অনুরূপ ছিল না। রামানুজের হৃদয় শঙ্করের হৃদয় অপেক্ষা উদার ছিল। পতিতের দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদিল, তিনি তাহাদের দুঃখ মর্মে মর্মে অনুভব করিতে লাগিলেন।, কালে যে-সকল

নূতন নূতন অনুষ্ঠানপদ্ধতি দাঁড়াইয়াছিল, তিনি সেগুলি গ্রহণ করিয়া যথাসাধ্য সংস্কার করিলেন এবং নূতন নূতন অনুষ্ঠানপদ্ধতি, নূতন নূতন উপাসনাপ্রণালী সৃষ্টি করিয়া ঐগুলি যাহাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তাহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। অথচ তিনি ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত সকলের নিকট উচ্চতম আধ্যাত্মিক উপাসনার পথ উন্মুক্ত রাখিলেন। এইরূপে রামানুজের প্রচারকার্য চলিল। তাঁহার প্রচারের প্রভাব চতুর্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল, আর্যাবর্তে ঐ তরঙ্গের আঘাত লাগিল। সেখানে কয়েকজন আচার্য ঐভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইহা বহুদিন পরে—মুসলমান-শাসনকালে ঘটিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক আর্যাবর্তবাসী আচার্যগণের মধ্যে চৈতন্যই শ্রেষ্ঠ।

রামানুজের সময় হইতে ধর্মপ্রচারে একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিও; তখন হইতে সর্বসাধারণের জন্য ধর্মের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয়। শঙ্করের পূর্ববর্তী আচার্যগণের যেমন ইহাই ছিল মূলমন্ত্র, রামানুজের পরবর্তী আচার্যগণেরও তাহাই হইল। আমি জানি না, লোকে শঙ্করকে কতকটা অনুদার বলিয়া বর্ণনা করে কেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থে এমন কিছু দেখিতে পাই না, যাহাতে তাঁহার সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভগবান্ বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী যেমন তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গ দ্বারা বিকৃত হইয়াছে, তেমনি শঙ্করাচার্যের উপদেশাবলীর উপর যে সঙ্কীর্ণতার দোষ আরোপিত হয়, সম্ভবতঃ তাহাতে শঙ্করের কোন দোষ নাই, তাঁহার শিষ্যদের বুঝিবার অক্ষমতার দরুনই এ দোষ শঙ্করে আরোপিত হইয়া থাকে।

আমি এখন এই উত্তরভারতের মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যের বিষয় কিছু উল্লেখ করিয়া এই বক্তৃতা শেষ করিব। তিনি গোপীদের প্রেমোন্মত্ত ভাবের আদর্শ ছিলেন। চৈতন্যদেব স্বয়ং একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তখনকার এক অতি বিচারশীল পণ্ডিতবংশে তাঁহার জন্ম হয়, তিনিও ন্যায়ের অধ্যাপক হইয়া তর্কে পণ্ডিতদের পরাস্ত করিয়া দিগ্বিজয়ী হন। বাল্যকাল হইতে তিনি শিখিয়াছিলেন, ইহাই জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ। কোন মহাপুরুষের কৃপায় তাঁহার সমগ্র জীবন পরিবর্তিত হইয়া গেল; তখন তিনি বাদানুবাদ, তর্ক-ন্যায়ের অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিলেন। পৃথিবীতে যত বড় বড় ভক্তির আচার্য হইয়াছেন, প্রেমোন্মত্ত শ্রীচৈতন্য তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার ভক্তির তরঙ্গ সমগ্র বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইল, সকলের প্রাণে শান্তি দিল। তাঁহার প্রেমের সীমা ছিল না। পুণ্যবান্

পাপী, হিন্দু মুসলমান, পবিত্র অপবিত্র, বেশ্যা পতিত—সকলেই তাঁহার ভালবাসার ভাগ পাইত, সকলকেই তিনি কৃপা করিতেন; যদিও তৎপ্রবর্তিত সম্প্রদায়ের অত্যন্ত অবনতি হইয়াছে, যেমন কালপ্রভাবে সকলেরই অবনতি হইয়া থাকে, তথাপি তাঁহার সম্প্রদায় দরিদ্র দুর্বল জাতিচ্যুত পতিত—সমাজে পরিত্যক্ত সকল ব্যক্তিরই আশ্রয়স্থল। কিন্তু আমাকে সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইবে যে, দার্শনিক সম্প্রদায়সমূহেই আমরা অদ্ভুত উদার ভাব দেখিতে পাই। শঙ্কর-মতাবলম্বী কেহই এ-কথা স্বীকার করে না যে, ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস্তবিক কোন ভেদ আছে। এদিকে কিন্তু জাতির ব্যাপারে শঙ্কর অত্যন্ত বর্জনের ভাব পোষণ করিতেন। প্রত্যেক বৈষ্ণবাচার্যের ক্ষেত্রে আমরা জাতির প্রশ্নে অপূর্ব উদারতা দেখিতে পাই, কিন্তু ধর্মসম্বন্ধে তাঁহাদের মত সঙ্কীর্ণ।

একজনের ছিল বিরাট মস্তিষ্ক, অপরের বিশাল হৃদয়। এখন এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাবের সময় হইয়াছিল, যাঁহার মধ্যে একাধারে এইরূপ হৃদয় ও মস্তিষ্ক থাকিবে, যিনি একাধারে শঙ্করের উজ্জ্বল মেধা ও চৈতন্যের বিশাল অনন্ত হৃদয়ের অধিকারী হইবেন, যিনি দেখিবেন সকল সম্প্রদায় এক মহৎ ভাবে, ঈশ্বরের শক্তিতে অনুপ্রাণিত, দেখিবেন প্রত্যেক প্রাণীতে সেই ঈশ্বর বিদ্যমান, যাঁহার হৃদয় ভারতে বা ভারতের বাহিরে দরিদ্র দুর্বল পতিত—সকলের জন্য কাঁদিবে, অথচ যাঁহার বিশাল বুদ্ধি এমন মহৎ তত্ত্বসকল উদ্ভাবন করিবে, যেগুলি ভারতে বা ভারতের বাহিরে বিরোধী সম্প্রদায়সমূহের সমন্বয়সাধন করিবে এবং এইরূপ বিস্ময়কর সমন্বয়ের দ্বারা হৃদয় ও মস্তিষ্কের সামঞ্জস্যপূর্ণ এক সার্বভৌম ধর্ম প্রকাশ করিবে। এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আমি কয়েক বৎসর তাঁহার চরণতলে বসিয়া শিক্ষা পাইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম।

এইরূপ এক ব্যক্তির জন্মগ্রহণ করিবার সময় হইয়াছিল, প্রয়োজন হইয়াছিল; আর অদ্ভুত ব্যাপার এই, তাঁহার সমগ্র জীবনের কার্য এমন এক শহরের নিকট অনুষ্ঠিত হয়, যে-শহর পাশ্চাত্যভাবে উন্মত্ত হইয়াছিল—ভারতের অন্যান্য শহর অপেক্ষা বেশী পরিমাণেই পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়াছিল। পুঁথিগত বিদ্যা তাঁহার কিছুই ছিল না; মহামনীষাসম্পন্ন হইয়াও তিনি নিজের নামটা পর্যন্ত লিখিতে পারিতেন না, কিন্তু প্রত্যেকে—আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের

বড় বড় উপাধিধারী পর্যন্ত তাঁহাকে দেখিয়া একজন মহামনীষী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তিনি এক অদ্ভুত মানুষ ছিলেন। সে অনেক কথা, আজ রাত্রে তোমাদিগের নিকট তাঁহার বিষয়ে কিছু বলিবার সময় নাই। সুতরাং আমাকে ভারতীয় সকল মহাপুরুষের পূর্ণপ্রকাশস্বরূপ যুগাচার্য মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করিয়াই আজ ক্ষান্ত হইতে হইবে—এই মহাপুরুষের উপদেশ আধুনিক যুগে আমাদের নিকট বিশেষ কল্যাণপ্রদ। ঐ ব্যক্তির ভিতর যে ঐশ্বরিক শক্তি খেলা করিত, সেটি লক্ষ্য করিও। ইনি দরিদ্রব্রাহ্মণসন্তান, বঙ্গদেশের অজ্ঞাত অপরিচিত কোন সুদূর পল্লীতে ইঁহার জন্ম। আজ ইওরোপ-আমেরিকায় সহস্র সহস্র ব্যক্তি সত্য সত্যই ফুলচন্দন দিয়া তাঁহার পূজা করিতেছে এবং পরে আরও সহস্র সহস্র লোক পূজা করিবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা কে বুঝিতে পারে? হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা যদি ইহাতে বিধাতার হাত না দেখিতে পাও, তবে তোমরা অন্ধ, নিশ্চিত জন্মান্ধ; যদি সময় আসে, যদি আর কখনও তোমাদের সহিত আলোচনা করিবার সুযোগ হয়, তবে তোমাদিগকে ইঁহার বিষয় আরও বিস্তারিতভাবে বলিব; এখন কেবল এইটুকু মাত্র বলিতে চাই, যদি আমার জীবনে একটিও সত্য কথা বলিয়া থাকি, তবে তাহা তাঁহার—তাঁহারই বাক্য; আর যদি এমন অনেক কথা বলিয়া থাকি, যেগুলি অসত্য, ভ্রমাত্মক, যেগুলি মানবজাতির কল্যাণকর নহে, সেগুলি সবই আমার, সেগুলির জন্য আমিই সম্পূর্ণ দায়ী।

আমাদের উপস্থিত কর্তব্য

এই বক্তৃতা ট্রিপ্লিকেন সাহিত্য সমিতিতে প্রদত্ত হয়। এই সমিতির সভ্যদের চেষ্টাতেই স্বামীজী চিকাগোর ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হন।

পৃথিবী যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই দিন দিন জীবন-সমস্যা আরও গভীর ও ব্যাপক হইতেছে। অতি প্রাচীনকালে যখন সমগ্র জগতের অখণ্ডস্বরূপ বৈদান্তিক সত্য প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন হইতেই উন্নতির মূলমন্ত্র ও সারতত্ত্ব প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। সমগ্র জগৎকে নিজের সঙ্গে না টানিয়া জগতের একটি পরমাণু পর্যন্ত নড়িতে পারে না। সমগ্র জগৎকে সঙ্গে সঙ্গে উন্নতিপথে অগ্রসর না করাইয়া জগতের কোন স্থানে কোনরূপ উন্নতি সম্ভব নহে। আর প্রতিদিনই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতররূপে বুঝা যাইতেছে যে, শুধু জাতীয় বা কোন সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া কোন সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। যে-কোন বিষয়—যে-কোন ভাব হউক, উহাকে উদার হইতে উদারতর হইতে হইবে, যতক্ষণ না উহা সার্বভৌম হইয়া দাঁড়ায়; যে-কোন আকাঙ্ক্ষাই হউক, উহাকে ক্রমশঃ এমন বাড়াইতে হইবে, উহা যেন সমগ্র মানবজাতিকে, শুধু তাহাই নহে, সমগ্র প্রাণিজগৎকে পর্যন্ত নিজ সীমার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে, প্রাচীনকালে আমাদের দেশ যে উচ্চাসনে আরূঢ় ছিল, গত কয়েক শতাব্দী হইতে আর তাহা নাই। যদি আমরা এই অবনতির কারণ অনুসন্ধান করি, তবে দেখিতে পাই, আমাদের দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা—আমাদের কার্যক্ষেত্রের সঙ্কোচনই ইহার অন্যতম কারণ।

জগতে দুইটি আশ্চর্য জাতির আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে। একই মূল জাতি হইতে উৎপন্ন, কিন্তু বিভিন্ন দেশকালঘটনাচক্রে স্থাপিত, নিজ নিজ বিশেষ নির্দিষ্ট পন্থায় জীবন-সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত দুইটি প্রাচীন জাতি ছিল,—আমি হিন্দু ও গ্রীক জাতির কথা বলিতেছি। উত্তরে হিমাচলের হিমশিখরসীমাবদ্ধ, জগতের প্রান্তবৎ প্রতীয়মান অনন্ত অরণ্যানী ও সমতলে প্রবহমান সমুদ্রবৎ বিশাল স্বাদুসলিলা স্রোতস্বতী-বেষ্টিত ভারতীয় আর্যের মন সহজেই অন্তর্মুখ হইল। আর্যজাতি স্বভাবতই অন্তর্মুখ, আবার চতুর্দিকে এই-সকল মহাভাবোদ্দীপক দৃশ্যাবলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাদের সূক্ষ্মভাবগ্রাহী মস্তিষ্ক স্বভাববশেই

অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ হইল, স্বচিত্তের বিশ্লেষণ ভারতীয় আর্যের প্রধান লক্ষ্য হইল। অপর দিকে গ্রীকজাতি জগতের এমন এক স্থানে বাস করিত, যেখানে গাম্ভীর্য অপেক্ষা সৌন্দর্যের বেশী সমাবেশ—গ্রীক দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্বর্তী সুন্দর দ্বীপসমূহ—চতুর্দিকের নিরাভরণা কিন্তু হাস্যময়ী প্রকৃতি—তাহার মন সহজেই বহির্মুখ হইল, উহা বাহ্য জগতের বিশ্লেষণ করিতে চাহিল। ফলে আমরা দেখিতে পাই, ভারত হইতে সর্বপ্রকার বিশ্লেষণাত্মক এবং গ্রীস হইতে শ্রেণীবিভাগপূর্বক বিশ্বজনীন সত্যে উপনীত হইবার বিজ্ঞানসমূহের উদ্ভব।

হিন্দু মন নিজ বিশিষ্ট পথে চলিয়া অতি বিস্ময়কর ফল লাভ করিয়াছিল। এখনও হিন্দুদের যেরূপ বিচারশক্তি, ভারতীয় মস্তিষ্ক এখনও যেরূপ শক্তির আধার, তাহার সহিত অন্য কোন জাতির তুলনা হয় না। আর আমরা সকলেই জানি, আমাদের যুবকগণ অন্য যে-কোন দেশের যুবকগণের সহিত প্রতিযোগিতায় সর্বদাই জয়ী হইয়া থাকে; তথাপি যখন সম্ভবতঃ মুসলমানদিগের ভারতবিজয়ের দুই-এক শতাব্দী পূর্বে জাতীয় প্রাণশক্তি স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন জাতির এই বিশেষত্বটিকে—বিচারশক্তিকে লইয়া এত বাড়বাড়ি করা হইল যে, উহারও অবনতি হইল। আর আমরা ভারতীয় শিল্প, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, সকল বিষয়েই এই অবনতির কিছু না কিছু চিহ্ন দেখিতে পাই। শিল্পের আর সেই উদার ধারণা রহিল না, ভাবের উচ্চতা ও বিভিন্ন অঙ্গের সামঞ্জস্যের চেষ্টা আর রহিল না। সকল বিষয়েই প্রচণ্ড অলঙ্কারপ্রিয়তার আবির্ভাব হইল, সমগ্র জাতির মৌলিকত্ব যেন অন্তর্হিত হইল। সঙ্গীতে প্রাচীন সংস্কৃতের হৃদয়-আলোড়নকারী গভীর ভাব আর রহিল না, পূর্বে যে প্রত্যেকটি সুর স্বতন্ত্র থাকিয়াও অপূর্ব ঐকতানের সৃষ্টি করিত, তাহা আর রহিল না; সুরগুলি যেন নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য হারাইল। আমাদের সমগ্র আধুনিক সঙ্গীতে নানাবিধ সুরের তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে। কতকগুলি মিশ্রসুরের বিশৃঙ্খল সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহাই সঙ্গীতশাস্ত্রের অবনতির চিহ্ন। তোমাদের ভাবরাজ্যের অন্যান্য বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করিলেও এইরূপ অলঙ্কারপ্রিয়তার প্রাচুর্য এবং মৌলিকতার অভাব দেখিতে পাইবে, আর তোমাদের বিশেষ কর্মক্ষেত্র—ধর্মেও ঘোর ভয়াবহ অবনতি হইয়াছিল। যে জাতি শত শত বৎসর যাবৎ এক গ্লাস জল 'ডান হাতে খাইব, কি বাঁ হাতে খাইব'—এইরূপ গুরুতর সমস্যাগুলির বিচারে ব্যস্ত রহিয়াছে, সেই জাতির নিকট আর কি আশা করিতে পারো? যে-দেশের বড় বড় মাথাগুলি

শত শত বৎসর ধরিয়া এই স্পৃশ্যাস্পৃশ্য-বিচারে ব্যস্ত, সেই জাতির অবনতি যে চরম সীমায় দাঁড়াইয়াছে, তাহা কি আর বলিতে হইবে? বেদান্তের তত্ত্বসমূহ, জগতে প্রচারিত ঈশ্বর ও আত্মা-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে মহত্তম ও গৌরবময় সিদ্ধান্তসমূহ প্রায় বিলুপ্ত হইল, গভীর অরণ্যে কয়েকজন সন্ন্যাসী দ্বারা রক্ষিত হইয়া লুক্কায়িত রহিল, অবশিষ্ট সকলে কেবল খাদ্যাখাদ্য স্পৃশ্যাস্পৃশ্য প্রভৃতি গুরুতর প্রশ্নসমূহের সিদ্ধান্তে নিযুক্ত রহিল। মুসলমানগণ ভারতবিজয় করিয়া—তাহারা যাহা জানিত, এমন অনেক ভাল বিষয় শিখাইয়াছিল। কারণ পৃথিবীর হীনতম ব্যক্তিও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে কিছু না কিছু শিখাইতে পারে, কিন্তু তাহারা আমাদের জাতির ভিতর শক্তিসঞ্চার করিতে পারিল না।

অবশেষে আমাদের সৌভাগ্যবশতই হউক বা দুর্ভাগ্যক্রমেই হউক, ইংরেজ ভারত জয় করিল। অবশ্য পরদেশবিজয় মাত্রেই মন্দ, বৈদেশিক শাসন নিশ্চয়ই অশুভ। তবে অশুভের মধ্য দিয়াও কখন কখন শুভ সংঘটিত হইয়া থাকে। ইংরেজের ভারতবিজয়ে এই বিশেষ শুভ ফল হইয়াছে: ইংলণ্ড ও সমগ্র ইওরোপ সভ্যতার জন্য গ্রীসের নিকট ঋণী; ইওরোপের সব কিছুর মধ্যে গ্রীসই যেন কথা বলিতেছে; উহার প্রত্যেক গৃহে, প্রত্যেক আসবাব-টিতে পর্যন্ত যেন গ্রীসের ছাপ; ইওরোপের বিজ্ঞান শিল্প—সর্বত্র গ্রীসের ছায়া। আজ ভারতক্ষেত্রে সেই প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচীন হিন্দু একত্র মিলিত হইয়াছে। এই মিলনের ফলে ধীরে ও নিঃশব্দে একটা পরিবর্তন আসিতেছে, আমরা চতুর্দিকে যে উদার জীবনপ্রদ পুনরুত্থানের আন্দোলন দেখিতেছি, তাহা এই-সব বিভিন্ন ভাবের একত্র সংমিশ্রণের ফল। মানব-জীবন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রশস্ততর হইতেছে। আমরা উদারভাবে সহৃদয়তা ও সহানুভূতির সহিত মানবজীবনের সমস্যাসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে শিখিতেছি, আর যদিও আমরা প্রথমে ভ্রান্তিবশতঃ আমাদের ভাবগুলিকে একটু সঙ্কীর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে, চতুর্দিকে যে-সব উদার ভাব দেখা যাইতেছে, সেগুলি এবং জীবনের এই প্রশস্ততর ধারণাগুলি আমাদেরই প্রাচীন শাস্ত্রনিবদ্ধ উপদেশের স্বাভাবিক পরিণতি। আমাদের পূর্বপুরুষগণ অতি প্রাচীনকালেই যে-সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই ভাবগুলি যদি ঠিক ঠিক কার্যে পরিণত করা যায়, তবে আমরা উদার না হইয়া থাকিতে পারি না। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট সকল বিষয়েরই লক্ষ্য—নিজ

ক্ষুদ্র গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া, পরস্পরে ভাব আদানপ্রদান করিয়া উদার হইতে উদারতর হওয়া—ক্রমশঃ সার্বভৌম ভাবে উপনীত হওয়া। কিন্তু আমরা শাস্ত্রোপদেশ না মানিয়া ক্রমশঃ নিজদের সঙ্কীর্ণতর করিয়া ফেলিতেছি, বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছি।

আমাদের উন্নতির পথে যত বিঘ্ন আছে, 'আমরাই জগতের একমাত্র শ্রেষ্ঠ জাতি'—এই গোঁড়ামি সেগুলির একটি। ভারতকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি, স্বদেশের কল্যাণের জন্য আমি সর্বদাই বদ্ধপরিকর, আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষগণকে আমি বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করি, তথাপি পৃথিবীর নিকট আমাদের যে অনেক জিনিস শিখিতে হইবে—এ ধারণা ত্যাগ করিতে পারি না। আমাদিগকে সকলের পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে, কারণ এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, সকলেই আমাদিগকে মহৎ শিক্ষা দিতে পারে। আমাদেরই শ্রেষ্ঠ স্মৃতিকার মনু বলিয়াছেন :

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥[১]

—অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া নীচ জাতির নিকট হইতেও হিতকর বিদ্যা গ্রহণ করিবে, অতি অন্ত্যজ ব্যক্তির নিকট হইতেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম শিক্ষা করিবে ইত্যাদি।

সুতরাং যদি আমরা মনুর উপযুক্ত বংশধর হই, তবে তাঁহার আদেশ আমাদিগকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে, যে-কোন ব্যক্তি আমাদিগকে শিক্ষা দিতে সমর্থ, তাহার নিকট হইতেই ঐহিক বা পারত্রিক বিষয়ে শিক্ষা লইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

পক্ষান্তরে ভুলিলে চলিবে না যে, আমাদেরও জগৎকে বিশেষ কিছু শিক্ষা দিবার আছে। ভারতের বাহিরের দেশগুলির সহিত আমাদের সংস্রব না রাখিলে চলিবে না। আমরা যে একসময়ে অপরের সহিত সংস্রব না রাখিবার কথা ভাবিয়াছিলাম, তাহা শুধু আমাদের নির্বুদ্ধিতা, আর তাহারই শাস্তিস্বরূপ আমরা সহস্র বৎসর যাবৎ দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছি। আমরা যে অন্যান্য জাতির সহিত আমাদের আদর্শ তুলনা করিবার জন্য বিদেশে যাই নাই, আমরা যে জগতের গতি লক্ষ্য করিয়া চলিতে শিখি নাই, ইহাই ভারতীয় মনের

১ মনুসংহিতা, ২।২৩৮

অবনতির এক প্রধান কারণ। আমরা যথেষ্ট শাস্তি পাইয়াছি, আর যেন আমরা ভ্রমে না পড়ি। ভারতবাসীর ভারতের বাহিরে যাওয়া অনুচিত—এ-সব আহাম্মকের কথা, ছেলেমানুষি। এ-সব ধারণা সমূলে বিনাশ করিতে হইবে। তোমরা যতই ভারত হইতে বাহির হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত মিশিবে, ততই তোমাদের এবং দেশের কল্যাণ। তোমরা পূর্ব হইতেই—শত শত বৎসর পূর্ব হইতেই—যদি ইহা করিতে, তবে আজ এরূপ হইতে না—যে-কোন জাতি তোমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তাহারই পদানত হইতে না। জীবনের প্রথম স্পষ্ট চিহ্ন—বিস্তার। যদি তোমরা বাঁচিতে চাও, তবে তোমাদিগকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়িতে হইবে। যে-মুহূর্তে তোমাদের বিস্তার বন্ধ হইবে, সেই-মুহূর্ত হইতেই জানিবে মৃত্যু তোমাদিগকে ঘিরিয়াছে, বিপদ তোমাদের সম্মুখে। আমি ইওরোপ-আমেরিকায় গিয়াছিলাম, তোমরাও সহৃদয়ভাবে তাহা উল্লেখ করিয়াছ। আমাকে যাইতে হইয়াছিল, কারণ এই বিস্তৃতিই জাতীয় জীবনের পুনরভ্যুদয়ের প্রথম চিহ্ন। এই পুনরভ্যুদয়শীল জাতীয় জীবন ভিতরে ভিতরে বিস্তৃত হইয়া আমাকে যেন দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, আরও সহস্র সহস্র ব্যক্তি এইরূপে নিক্ষিপ্ত হইবে। আমার কথা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, যদি এই জাতি আদৌ বাঁচিয়া থাকে, তবে এরূপ হইবেই হইবে। সুতরাং এই বিস্তার জাতীয় জীবনের পুনরভ্যুদয়ের সর্বপ্রধান লক্ষণ; এই বিস্তারের সহিত মানবের জ্ঞানভাণ্ডারে আমাদের যাহা দিবার আছে, সমগ্র পৃথিবীর উন্নতিবিধানে আমাদের যেটুকু দেয় আছে, তাহাও ভারতের বাহিরে যাইতেছে।

ইহা কিছু নূতন ব্যাপার নহে। তোমাদের মধ্যে যাহারা মনে কর, হিন্দুরা চিরকাল তাহাদের দেশের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ, তাহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; তোমরা তোমাদের প্রাচীন শাস্ত্র পড় নাই, তোমরা তোমাদের জাতীয় ইতিহাস ঠিক ঠিক যথাযথ অধ্যয়ন কর নাই। যে-কোন জাতিই হউক, বাঁচিতে হইলে তাহাকে কিছু দিতেই হইবে। প্রাণ দিলে প্রাণ পাইবে, কিছু গ্রহণ করিলে উহার মূল্যস্বরূপ অপর সকলকে কিছু দিতেই হইবে। এত সহস্র বৎসর ধরিয়া আমরা যে বাঁচিয়া আছি—এ-কথা তো আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন কিরূপে আমরা এতদিন জীবিত রহিয়াছি, এই সমস্যার যদি সমাধান করিতে হয়, তবে স্বীকার করিতেই হইবে আমরা চিরকালই

পৃথিবীকে কিছু না কিছু দিয়া আসিতেছি, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাহাই ভাবুক না কেন।

তবে ভারতের দান—ধর্ম, দার্শনিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা; ধর্মজ্ঞান বিস্তার করিতে, ধর্মপ্রচারের পথ পরিষ্কার করিতে সৈন্যদলের প্রয়োজন হয় না। জ্ঞান ও দার্শনিক সত্য শোণিতপ্রবাহের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে হয় না। জ্ঞান ও দার্শনিক তত্ত্ব রক্তাক্ত নরদেহের উপর দিয়া সদর্পে অগ্রসর হয় না, ঐগুলি শান্তি ও প্রেমের পক্ষদ্বয়ে ভর করিয়া শান্তভাবে আসিয়া থাকে, আর এইরূপই বরাবর হইয়াছে। অতএব দেখা গেল, ভারতকেও বরাবর পৃথিবীকে কিছু না কিছু দিতে হইয়াছে। লণ্ডনস্থ জনৈকা মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তোমরা হিন্দুরা কি করিয়াছ? তোমরা কখন একটি জাতিকেও জয় কর নাই!' ইংরেজ জাতির পক্ষে—বীর, সাহসী, ক্ষত্রিয়প্রকৃতি ইংরেজ জাতির পক্ষে এ কথা শোভা পায়; তাহাদের পক্ষে একজন অন্যকে জয় করিতে পারিলে তাহাই শ্রেষ্ঠ গৌরব বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহাদের দৃষ্টিতে উহা সত্য বটে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে ঠিক বিপরীত। যখন আমি আমার মনকে জিজ্ঞাসা করি, 'ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি?' উত্তর পাই, 'কাবণ এই যে, আমরা কখনও অপর জাতিকে জয় করি নাই।' ইহাই আমাদের গৌরব। তোমরা আজকাল সর্বদাই 'আমাদের ধর্ম পরধর্ম-বিজয়ে সচেষ্ট নহে' বলিয়া উহার নিন্দা শুনিতে পাও; আর আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি, এমন ব্যক্তিগণের নিকট শুনিতে পাও, যাহাদের নিকট অধিকতর জ্ঞানের আশা করা যায়। আমার মনে হয়, আমাদের ধর্ম যে অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী, ইহাই তাহার একটি প্রধান যুক্তি; আমাদের ধর্ম কখনই অপর ধর্ম জয় করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই, উহা কখনই রক্তপাত করে নাই, উহা সর্বদাই আশীর্বাণী ও শান্তিবাক্য উচ্চারণ করিয়াছে, সকলকে উহা প্রেম ও সহানুভূতির কথাই বলিয়াছে। এখানে—কেবল এখানেই পরধর্ম-সহিষ্ণুতা-বিষয়ক ভাবসমূহ প্রথম প্রচারিত হয়; কেবল এইখানেই এই পরধর্ম-সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতির ভাব কার্যে পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য দেশে ইহা কেবল মতবাদে পর্যবসিত। এখানে—কেবল এখানেই হিন্দুরা মুসলমানদের জন্য মসজিদ ও খ্রীষ্টানদের জন্য চার্চ নির্মাণ করিয়া দেয়। অতএব হে ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা বুঝিতেছেন—আমরা আমাদের ভাব জগতে অনেকবার বহন করিয়াছি, কিন্তু অতি ধীরে, নীরবে ও

অজ্ঞাতভাবে। ভারতের সকল বিষয়ই এইরূপ। ভারতীয় চিন্তার একটি লক্ষণ উহার শান্তভাব, উহার নীরবতা। আবার উহার পশ্চাতে যে প্রবল শক্তি রহিয়াছে, তাহাকে বল-বাচক কোন শব্দে অভিহিত করা যায় না। উহাকে ভারতীয় চিন্তারাশির নীরব মোহিনীশক্তি বলা যাইতে পারে। কোন বৈদেশিক যদি আমাদের সাহিত্য-অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়, প্রথমতঃ উহা তাহার অতিশয় বিরক্তিকর লাগে; উহাতে হয়তো তাহার দেশের সাহিত্যের মতো উদ্দীপনা নাই, তীব্র গতি নাই, যাহাতে সে সহজেই মাতিয়া উঠিবে। ইওরোপের বিয়োগান্ত নাটকগুলির সহিত আমাদের নাটকগুলির তুলনা কর। পাশ্চাত্য নাটকগুলি ঘটনাবৈচিত্র্যে পূর্ণ, ক্ষণকালের জন্য উদ্দীপিত করে; কিন্তু শেষ হইয়া যাইবামাত্র প্রতিক্রিয়া আসে, স্মৃতি হইতে মুছিয়া যায়। ভারতের বিয়োগান্ত নাটকগুলি যেন ঐন্দ্রজালিকের শক্তি, ধীর নিস্তব্ধভাবে কাজ করে, একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে উহাদের প্রভাব তোমার উপর বিস্তৃত হইতে থাকে; আর কোথায় যাইবে? তুমি বাঁধা পড়িলে; আর যে-কোন ব্যক্তিই আমাদের সাহিত্যে প্রবেশ করিতে সাহসী হইয়াছে, সেই উহার বন্ধন অনুভব করিয়াছে—সেই উহার সহিত চিরপ্রেমে বাঁধা পড়িয়াছে।

শিশিরবিন্দু যেমন নিস্তব্ধ অদৃশ্য ও অশ্রুতভাবে পড়িয়া অতি সুন্দর গোলাপ-কলিকে প্রস্ফুটিত করে, সমগ্র পৃথিবীর চিন্তারাশিতে ভারতের দান সেইরূপ বুঝিতে হইবে। নীরবে, অজ্ঞাতসারে অথচ অদম্য মহাশক্তিবলে উহা সমগ্র পৃথিবীর চিন্তারাশিতে যুগান্তর আনিয়াছে, তথাপি কেহই জানে না—কখন এরূপ করিল। আমার নিকট একবার কথাপ্রসঙ্গে কেহ বলিয়াছিল, 'ভারতীয় কোন প্রাচীন গ্রন্থকারের নাম আবিষ্কার করা কি কঠিন ব্যাপার!' ঐ কথায় আমি উত্তর দিই, 'ইহাই ভারতীয় ভাব।' তাঁহারা আধুনিক গ্রন্থকারগণের মতো ছিলেন না—যাঁহারা অন্যান্য গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে শতকরা নব্বই ভাগ চুরি করিয়াছেন, শতকরা দশভাগমাত্র তাঁহাদের নিজেদের, কিন্তু তাঁহারা গ্রন্থারম্ভে একটি ভূমিকা লিখিয়া পাঠককে বলিতে ভুলেন নাই যে, 'এই-সকল মতামতের জন্য আমিই দায়ী।'

যে-সকল মহামনীষী মানবজাতির হৃদয়ে মহান্ তত্ত্বসমূহের ভাব দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা গ্রন্থ লিখিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, গ্রন্থে নিজেদের নাম পর্যন্ত দেন

নাই, তাঁহারা সমাজকে তাঁহাদের গ্রন্থরাশি উপহার দিয়া নীরবে দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের দর্শনকার বা পুরাণকারগণের নাম কে জানে? তাঁহারা সকলেই ব্যাস, কপিল প্রভৃতি উপাধিমাত্র দ্বারা পরিচিত। তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত সন্তান। তাঁহারাই যথার্থভাবে গীতার শিক্ষা অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের সেই মহান্ উপদেশ—'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' (কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে কখনই নহে)—জীবনে পালন করিয়া গিয়াছেন।

ভদ্রমহোদয়গণ, ভারত এইরূপে সমগ্র পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তবে ইহার জন্য একটি পরিবেশ প্রয়োজন। পণ্যদ্রব্য যেমন কাহারও নির্মিত পথ দিয়াই একস্থান হইতে অপর স্থানে যাইতে পারে, ভাবরাশি সম্বন্ধেও সেইরূপ। ভাবরাশি এক দেশ হইতে অপর দেশে যাইবার পূর্বে উহাদের যাইবার পথ প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক; আর পৃথিবীর ইতিহাসে যখনই কোন মহা দিগ্বিজয়ী জাতি উঠিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে এক সূত্রে গাঁথিয়াছে, তখনই এই সূত্র অবলম্বন করিয়া ভারতের চিন্তারাশি প্রবাহিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক জাতির শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়াছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই আরও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, বৌদ্ধদের পূর্বেও ভারতীয় চিন্তারাশি পৃথিবীর সর্বত্র প্রবেশ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্বেই চীন পারস্য ও পূর্ব দ্বীপপুঞ্জে বেদান্ত প্রবেশ করিয়াছিল। পুনরায় যখন মহতী গ্রীকশক্তি প্রাচ্য জগতের সমুদয় অংশকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছিল, তখন আবার সেখানে ভারতীয় চিন্তারাশি প্রবাহিত হইয়াছিল; খ্রীষ্টধর্ম যে-সভ্যতার গর্ব করিয়া থাকে, তাহাও ভারতীয় চিন্তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা সেই ধর্মের উপাসক, বৌদ্ধধর্ম—উহার সমুদয় মহত্ত্ব সত্ত্বেও—যাহার বিদ্রোহী সন্তান এবং খ্রীষ্টধর্ম অত্যন্ত সামঞ্জস্যহীন অনুকরণমাত্র।

আবার যুগচক্র ফিরিয়াছে, আবার সময় আসিয়াছে। ইংলণ্ডের দোর্দণ্ড শক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাগকে আবার একত্র করিয়াছে। রোমক রাজপথগুলির মতো ইংরেজের পথ—কেবল স্থলে নহে, অতলস্পর্শ সমুদ্রের প্রত্যেক অংশ দিয়া পর্যন্ত ছুটিয়াছে। ইংলণ্ডের পথগুলি সমুদ্র হইতে সমুদ্রান্তরে ছুটিয়াছে। পৃথিবীর প্রত্যেক অংশ অন্য সকল অংশের সহিত যুক্ত হইয়াছে আর বিদ্যুৎ নব-

নিযুক্ত দূতরূপে উহার অতি অদ্ভুত অংশ অভিনয় করিতেছে। এই-সকল অনুকূল অবস্থা পাইয়া ভারত আবার জাগিতেছে এবং জগতের উন্নতি ও সভ্যতায় তাহার যাহা দিবার আছে, দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার ফলস্বরূপ প্রকৃতি যেন আমাকে জোর করিয়া ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় ধর্মপ্রচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছিল। আমাদের প্রত্যেকেরই আশা করা উচিত ছিল যে, উহার সময় আসিয়াছে। সকল দিকেই শুভচিহ্ন দেখা যাইতেছে; ভারতীয় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবরাশি আবার সমগ্র পৃথিবীকে জয় করিবে। সুতরাং আমাদের জীবনসমস্যা ক্রমশঃ বৃহত্তর আকার ধারণ করিতেছে। আমাদের শুধু যে স্বদেশকে জাগাইতে হইবে তাহা নহে, ইহা তো অতি সামান্য কথা; আমি একজন কল্পনাপ্রিয় ভাবুক ব্যক্তি, আমার ধারণা এই—হিন্দুজাতি সমগ্র জগৎ জয় করিবে।

পৃথিবীতে অনেক বড বড দিগ্বিজয়ী জাতি আবির্ভূত হইয়াছে; আমরাও বরাবর দিগ্বিজয়ী। আমাদের দিগ্বিজয়ের উপাখ্যান ভারতের মহান্ সম্রাট অশোক ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার দিগ্বিজয়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার ভারতকে পৃথিবী জয় করিতে হইবে। ইহাই আমার জীবনস্বপ্ন—আর আমি ইচ্ছা করি তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই, যাহারা আমার কথা শুনিতেছ, সকলের মনে এই কল্পনা জাগ্রত হউক; আর যতদিন না তোমরা উহা কাজে পরিণত করিতে পারিতেছ, ততদিন যেন তোমাদের কাজের বিরাম না হয়। লোকে তোমায় প্রতিদিন বলিবে, আগে নিজের ঘর সামলাও, পরে বিদেশে প্রচারকার্যে যাইও। কিন্তু আমি তোমাদিগকে অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি—যখনই তোমরা অপরের জন্য কাজ কর, তখনই তোমরা শ্রেষ্ঠ কাজ করিয়া থাকো। যখনই তোমরা অপরের জন্য কাজ করিয়া থাকো, বৈদেশিক ভাষায় সমুদ্রের পারে তোমাদের ভাববিস্তারের চেষ্টা কর, তখনই তোমরা নিজের জন্য শ্রেষ্ঠ কাজ করিতেছ, আর উপস্থিত সভা হইতেই প্রমাণ হইতেছে—তোমাদের চিন্তারাশি দ্বারা অপর দেশে জ্ঞানালোক-বিস্তারের চেষ্টা করিলে তাহা কিভাবে তোমাদেরই সাহায্য করিয়া থাকে। যদি আমি ভারতেই আমার কার্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রাখিতাম, তাহা হইলে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় যাওয়ার দরুন যে ফল হইয়াছে, তাহার এক-চতুর্থাংশও হইত না। ইহাই আমাদের সম্মুখে মহান্ আদর্শ, আর প্রত্যেককেই ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। ভারতের

দ্বারা সমগ্র জগৎ জয়—ইহার কম কিছুতেই নহে ; আর আমাদের সকলকে ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, ইহার জন্য প্রাণ পণ করিতে হইবে। বৈদেশিকগণ আসিয়া তাহাদের সৈন্যদল দ্বারা ভারত প্লাবিত করিয়া দিক—ওঠ ভারত, তোমার আধ্যাত্মিকতা দ্বারা জগৎ জয় কর। এই দেশেই এ কথা প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল, ঘৃণা দ্বারা ঘৃণাকে জয় করা যায় না, প্রেমের দ্বারা বিদ্বেষকে জয় করা যায় ; আমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে। জড়বাদ ও উহার আনুষঙ্গিক দুঃখগুলিকে জড়বাদ দ্বারা জয় করা যায় না। যখন একদল সৈন্য অপর দলকে বাহুবলে জয় করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহারা মানবজাতিকে পশুতে পরিণত করে, এবং ক্রমশঃ ঐরূপ পশুসংখ্যা বাড়িতে থাকে। আধ্যাত্মিকতা অবশ্যই পাশ্চাত্যদেশ জয় করিবে। ধীরে ধীরে তাহারা বুঝিতেছে যে, জাতিরূপে যদি বাঁচিতে হয়, তবে তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন হইতে হইবে। তাহারা উহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহারা উহার জন্য উৎসুক হইয়া আছে। কোথা হইতে উহা আসিবে? ভারতীয় মহান্ ঋষিগণের ভাবরাশি বহন করিয়া পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে যাইতে প্রস্তুত —এমন মানুষ কোথায়? এই মঙ্গলবার্তা যাহাতে পৃথিবীর প্রত্যেক অলিতে-গলিতে পৌঁছায়, তাহার জন্য সর্বত্যাগ করিতে প্রস্তুত—এমন মানুষ কোথায়? সত্যপ্রচারে সাহায্যের জন্য এইরূপ বীরহৃদয় মানুষের প্রয়োজন। বিদেশে গিয়া বেদান্তের এই মহান্ সত্যসমূহ-প্রচারের জন্য বীরহৃদয় কর্মী প্রয়োজন। জগতে ইহার প্রয়োজন হইয়াছে, ইহা না হইলে জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে। সমুদয় পাশ্চাত্য জগৎ যেন একটি আগ্নেয়গিরির উপর অবস্থিত, কালই ইহা ফাটিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্য লোকেরা পৃথিবীর সর্বত্র অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু কোথাও শান্তি পায় নাই ; সুখের পেয়ালা প্রাণ ভরিয়া পান করিয়াছে, কিন্তু উহাতে তৃপ্তি পায় নাই। এখন এমন কাজ করিবার সময় আসিয়াছে, যাহাতে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ পাশ্চাত্যের অন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করিতে পারে। অতএব হে মাদ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদিগকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে বলিতেছি—আমাদিগকে বিদেশে যাইতে হইবে, আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিক চিন্তার দ্বারা আমাদিগকে পৃথিবী জয় করিতে হইবে, এ ছাড়া আর গত্যন্তর নাই ; এইরূপই করিতে হইবে, নতুবা মৃত্যু নিশ্চিত। জাতীয় জীবনকে—যে

জাতীয় জীবন একদিন সতেজ ছিল তাহাকে—পুনরায় সতেজ করিতে গেলে ভারতীয় চিন্তারাশি দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে এ-কথা ভুলিলে চলিবে না যে, আধ্যাত্মিক চিন্তা দ্বারা জগদ্‌বিজয় বলিতে আমি জীবনপ্রদ তত্ত্বসমূহের প্রচারকেই লক্ষ্য করিতেছি, শত শতাব্দী ধরিয়া আমরা যে কুসংস্কাররাশিকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছি, সেগুলি নহে; ঐ আগাছাগুলিকে এই ভারতভূমি হইতে পর্যন্ত উপড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে উহারা একেবারে মরিয়া যায়। ঐগুলি জাতীয় অবনতির কারণ, ঐগুলি হইতেই মস্তিষ্কের নির্বীর্যতা আসিয়া থাকে। আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে, যেন আমাদের মস্তিষ্ক উচ্চ ও মহৎ চিন্তায় অক্ষম হইয়া না পড়ে, উহা যেন মৌলিকতা না হারায়, উহা যেন নিস্তেজ হইয়া না যায়, উহা যেন ধর্মের নামে সর্বপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসংস্কারে নিজেকে বিযাক্ত করিয়া না ফেলে। আমাদের এখানে—এই ভারতে কতকগুলি বিপদ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, উহাদের মধ্যে একদিকে ঘোর জড়বাদ, অপরদিকে উহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ঘোর কুসংস্কার—দুই-ই পরিহার করিয়া চলিতে হইবে। একদিকে পাশ্চাত্যবিদ্যার মদিরাপানে মত্ত হইয়া আজকাল কতকগুলি ব্যক্তি মনে করিতেছে, তাহারা সব জানে; তাহারা প্রাচীন ঋষিগণের কথায় উপহাস করিয়া থাকে। তাহাদের নিকট হিন্দুজাতির সমুদয় চিন্তা কেবল কতকগুলি আবর্জনার স্তূপ, হিন্দুদর্শন কেবল শিশুর আধ আধ কথা এবং হিন্দুধর্ম নির্বোধের কুসংস্কারমাত্র! অপরদিকে আবার কতকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, কিন্তু তাঁহারা কতকটা বাতিকগ্রস্ত, তাঁহারা আবার উহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত; তাঁহারা সব ঘটনাকেই একটা শুভ বা অশুভ লক্ষণরূপে দেখিয়া থাকেন। তিনি যে জাতি-বিশেষের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহার বিশেষ জাতীয় দেবতার অথবা তাঁহার গ্রামের যাহা কিছু কুসংস্কার আছে, তাহার দার্শনিক আধ্যাত্মিক এবং সর্বপ্রকার ছেলেমানুষি ব্যাখ্যা করিতে তিনি প্রস্তুত। তাঁহার নিকট প্রত্যেক গ্রাম্য কুসংস্কারটিই বেদবাণীর তুল্য এবং তাঁহার মতে সেইগুলি প্রতিপালন করার উপর জাতীয় জীবন নির্ভর করিতেছে। এই-সব হইতে তোমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে।

তোমরা প্রত্যেকে বরং ঘোর নাস্তিক হও, কিন্তু আমি তোমাদের কুসংস্কারগ্রস্ত নির্বোধ দেখিতে ইচ্ছা করি না; কারণ নাস্তিকের বরং জীবন

আছে, তাহার কিছু হইবার আশা আছে, সে মৃত নহে। কিন্তু যদি কুসংস্কার ঢোকে, তবে মাথা একেবারে যায়, মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়া পড়ে; পতনের ভাব তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এই দুইটিই পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমরা চাই নির্ভীক সাহসী লোক, আমরা চাই—রক্ত তাজা হউক, স্নায়ু সতেজ হউক, পেশী লৌহদৃঢ় হউক। মস্তিষ্ককে দুর্বল করে—এমন ভাবের দরকার নাই। সেগুলি পরিত্যাগ কর। সর্বপ্রকার রহস্যের দিকে ঝোঁক ত্যাগ কর। ধর্মে কোন গুপ্তভাব নাই। বেদান্ত বা বেদসংহিতা বা পুরাণে কি কোন গুপ্তভাব আছে? প্রাচীন ঋষিগণ তাঁহাদের ধর্মপ্রচারের জন্য কোথাও কি গুপ্তসমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন? তাঁহাদের আবিষ্কৃত মহান্ সত্যসমূহ সমগ্র পৃথিবীতে দিবার জন্য তাঁহারা কি হাত-সাফাই কৌশল প্রভৃতি অবলম্বন করিয়াছিলেন—ইহা কোথাও লিপিবদ্ধ দেখিয়াছ কি? গুপ্তভাব লইয়া নাড়াচাড়া ও কুসংস্কার সর্বদাই দুর্বলতার চিহ্ন, উহা সর্বদাই অবনতি ও মৃত্যুর লক্ষণ। অতএব ঐগুলি হইতে সাবধান হও, তেজস্বী হও, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াও। সংসারে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার আছে। প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যতদূর, সেই হিসাবে উহাদিগকে অতিপ্রাকৃত বলিতে পারি, কিন্তু উহাদের কোনটি গুপ্ত নহে। ধর্মের সত্যসমূহ গুপ্ত অথবা উহারা হিমালয়ের শিখরে অবস্থিত গুপ্তসমিতি-গুলির একচেটিয়া সম্পত্তি—এ-কথা ভারতভূমিতে কখনই প্রচারিত হয় নাই। আমি হিমালয়ে গিয়াছিলাম, তোমরা যাও নাই। তোমাদের দেশ হইতে উহা শত শত মাইল দূরে। আমি একজন সন্ন্যাসী, গত চতুর্দশ বৎসর যাবৎ পদব্রজে চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছি, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি—এইরূপ গুপ্তসমিতি কোথাও নাই। এই-সকল কুসংস্কারের পিছনে ছুটিও না। তোমাদের এবং তোমাদের সমগ্র জাতির পক্ষে বরং ঘোর নাস্তিক হওয়া ভাল, কারণ নাস্তিক হইলে অন্ততঃ তোমাদের একটু তেজ থাকিবে, কিন্তু এইরূপ কুসংস্কারসম্পন্ন হওয়া অবনতি ও মৃত্যুস্বরূপ। সতেজ-মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ এইসকল কুসংস্কার লইয়া তাহাদের সময় কাটায়, ঘোরতর কুসংস্কারসমূহের রূপক ব্যাখ্যা করিয়া সময় নষ্ট করে—ইহা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে ঘোরতর লজ্জার বিষয়। সাহসী হও, সকল বিষয় ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিও না। প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের অনেক কুসংস্কার আছে, আমাদের শরীরে অনেক কালো দাগ—অনেক ক্ষত আছে, ঐগুলিকে একেবারে তুলিয়া ফেলিতে হইবে,

কাটিয়া ফেলিতে হইবে, নষ্ট করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে আমাদের ধর্ম, আমাদের আধ্যাত্মিকতা, আমাদের জাতীয় জীবন কিছুমাত্র নষ্ট হইবে না। ধর্মের মূলতত্ত্বগুলি ইহাতে অক্ষতই থাকিবে; আর এই কালো দাগগুলি যতই মুছিয়া যাইবে, ততই মূলতত্ত্বগুলি আরও উজ্জ্বলভাবে, সতেজে প্রকাশিত হইবে। ঐ তত্ত্বগুলিকে ধরিয়া থাকো।

তোমরা শুনিয়াছ, পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মই নিজেকে সার্বভৌম ধর্ম বলিয়া দাবি করিয়া থাকে। প্রথমতঃ আমি বলিতে চাই যে, সম্ভবতঃ কোন ধর্মই কোন কালে সার্বভৌম ধর্মরূপে পরিগণিত হইবে না; কিন্তু যদি কোন ধর্মের এই দাবি করিবার অধিকার থাকে, তবে আমাদের ধর্মই কেবল এই নামের যোগ্য হইতে পারে, অপর কোন ধর্ম নহে; কারণ অন্যান্য সকল ধর্মই কোন ব্যক্তিবিশেষ অথবা ব্যক্তিগণের উপর নির্ভর করে। অন্যান্য সকল ধর্মই কোন তথাকথিত ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবনের সহিত জড়িত। উহারা মনে করে, ঐ ঐতিহাসিকতাই তাহাদের ধর্মের শক্তি, কিন্তু বাস্তবিক যাহাকে তাহারা সবলতা মনে করে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে দুর্বলতা, কারণ যদি ঐ ব্যক্তির ঐতিহাসিকতা অপ্রমাণ করা যায়, তবে তাহাদের ধর্মরূপ প্রাসাদ একেবারে ধসিয়া পড়ে। ঐ ধর্ম-স্থাপক বড় বড় মহাপুরুষদের জীবনের অর্ধেক ঘটনা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক সম্পর্কে বিশেষরূপে সন্দেহ উত্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং কেবল তাঁহাদের কথার উপর যে-সকল সত্যের প্রামাণ্য ছিল, সেগুলি আবার শূন্যে বিলীন হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমাদের ধর্মে যদিও মহাপুরুষের সংখ্যা যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ধর্মের সত্যসকল তাঁহাদের কথার উপর নির্ভর করে না। কৃষ্ণ বলিয়া কৃষ্ণের মাহাত্ম্য নহে, তিনি বেদান্তের একজন মহান্ আচার্য বলিয়াই তাঁহার মাহাত্ম্য। যদি তিনি তাহা না হইতেন, তবে বুদ্ধদেবের নামের মতো তাঁহার নামও ভারত হইতে একেবারে লোপ পাইত।

সুতরাং আমরা ব্যক্তিবিশেষের মতানুগামী নহি, আমরা চিরকালই ধর্মের তত্ত্বগুলির উপাসক। ব্যক্তিগণ সেই তত্ত্বসমূহের সাকারমূর্তিস্বরূপ—উদাহরণস্বরূপ। যদি ঐ তত্ত্বগুলি অবিকৃত থাকে, তবে শত সহস্র মহাপুরুষের, শত সহস্র বুদ্ধের অভ্যুদয় হইবে। কিন্তু যদি ঐ তত্ত্বগুলি লোপ পায়, যদি মানুষ ঐগুলি ভুলিয়া যায়, আর সমস্ত জাতীয় জীবন তথাকথিত কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির মত অবলম্বন করিয়া চলিতে যায়, তবে সেই ধর্মের অবনতি অনিবার্য, সেই ধর্মের

বিপদ অবশ্যম্ভাবী। কেবল আমাদের ধর্মই কোন ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিসমূহের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত নহে, উহা তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। অপর দিকে আবার উহাতে লক্ষ লক্ষ অবতার ও মহাপুরুষের স্থান হইতে পারে। নূতন অবতার বা নূতন মহাপুরুষেরও আমাদের ধর্মে স্থান হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেককেই সেই তত্ত্বসমূহের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইতে হইবে—এইটি ভুলিলে চলিবে না। আমাদের ধর্মের এই তত্ত্বগুলি অবিকৃতভাবে রহিয়াছে আর এইগুলি যাহাতে কালে মলিন হইয়া না পড়ে, সেজন্য আমাদের সকলকে সারা জীবন চেষ্টা করিতে হইবে। আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের ঘোর জাতীয় অবনতি ঘটিলেও বেদান্তের এই তত্ত্বগুলি কখনই মলিন হয় নাই। অতি দুষ্ট ব্যক্তিও ঐগুলি দূষিত করিতে সাহসী হয় নাই। আমাদের শাস্ত্রসমূহ পৃথিবীর মধ্যে অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্ষা উত্তমভাবে রক্ষিত হইয়াছে। অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত তুলনায় উহাতে প্রক্ষিপ্ত অংশ, মূলের বিকৃতি অথবা ভাবের বিপর্যয় নাই বলিলেই হয়। প্রথমেও যেমন ছিল, ঠিক সেই ভাবেই উহা রহিয়াছে এবং মানুষের মনকে সেই আদর্শের দিকে পরিচালিত করিতেছে।

বিভিন্ন ভাষ্যকার উহার ভাষ্য করিয়াছেন, অনেক মহান্ আচার্য উহা প্রচার করিয়াছেন এবং উহাদের উপর ভিত্তি করিয়া সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছেন, আর তোমরা দেখিবে এই বেদগ্রন্থে এমন অনেক তত্ত্ব আছে, যেগুলি আপাত-দৃষ্টিতে বিরোধী বলিয়া প্রতীত হয়। কতকগুলি শ্লোক সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদাত্মক, অপরগুলি আবার সম্পূর্ণ অদ্বৈতভাবদ্যোতক। দ্বৈতবাদী ভাষ্যকার দ্বৈতবাদ ছাড়া আর কিছুই বুঝিতে পারেন না, সুতরাং তিনি অদ্বৈত শ্লোকগুলি একেবারে চাপা দিয়া যাইতে চান। দ্বৈতবাদী ধর্মাচার্য ও পুরোহিতগণ সকলেই দ্বৈতভাবে উহাদের ব্যাখ্যা করিতে চান। অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকারগণও দ্বৈত শ্লোকগুলিকে সেইরূপ অদ্বৈতপক্ষে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহা তো বেদের দোষ নহে। সমগ্র বেদই দ্বৈতভাবের কথা বলিতেছে, এটি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা মূর্খোচিত কার্য। আবার সমগ্র বেদ অদ্বৈতভাবসমর্থক, ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টাও সেইরূপ মূর্খতা। বেদে দ্বৈত অদ্বৈত দুই-ই আছে। আমরা নূতন নূতন ভাবের আলোকে ইহা আজকাল অপেক্ষাকৃত ভালভাবে বুঝিতে পারিতেছি। এই-সকল বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও ধারণার দ্বারা পরিশেষে এই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মনের ক্রমোন্নতির জন্যই এই-সব মতের প্রয়োজন আর সেজন্যই বেদ

এরূপ উপদেশ দিয়াছেন। সমগ্র মানবজাতির প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বেদ সেই উচ্চতম লক্ষ্যে পৌঁছিবার বিভিন্ন সোপান দেখাইয়াছেন। সেগুলি যে পরস্পরবিরোধী, তাহা নহে ; শিশুদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য বেদ ঐ-সকল বৃথা বাক্য প্রয়োগ করেন নাই।

উহাদের প্রয়োজন আছে ; শুধু শিশুদের জন্য নহে, অনেক বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্যও বটে। যতদিন আমাদের শরীর আছে, যতদিন এই শরীরকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হইতেছে, যতদিন আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়াবদ্ধ, যতদিন আমরা এই স্থূলজগৎ দেখিতেছি, ততদিন আমাদিগকে ব্যক্তি-ঈশ্বর বা সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ মহামনীষী রামানুজ প্রমাণ করিয়াছেন : ঈশ্বর, জীব, জগৎ—এই তিনটির মধ্যে একটি স্বীকার করিলে অপর দুটিও স্বীকার করিতেই হইবে। ইহা পরিহার করিবার উপায় নাই। সুতরাং যতদিন তোমরা বাহ্য জগৎ দেখিতেছ, ততদিন জীবাত্মা ও ঈশ্বর অস্বীকার করা ঘোর বাতুলতা।

তবে মহাপুরুষগণের জীবনে কখন কখন এমন সময় আসিতে পারে, যখন জীবাত্মা তাহার সমুদয় বন্ধন অতিক্রম করিয়া প্রকৃতির পারে চলিয়া যায়—সেই সর্বাতীত প্রদেশে চলিয়া যায়, যাহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন :

'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।'

'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌ গচ্ছতি নো মনঃ।'

'নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।'

—মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে।—সেখানে চক্ষুও যায় না, বাক্যও যায় না, মনও যায় না।—আমি তাঁহাকে জানি, ইহা মনে করি না ; জানি না, ইহাও মনে করি না।[১]

তখনই জীবাত্মা সমুদয় বন্ধন অতিক্রম করে ; তখনই, কেবল তখনই তাহার হৃদয়ে অদ্বৈতবাদের মূলতত্ত্ব—আমি ও সমগ্র জগৎ এক, আমি ও ব্রহ্ম এক—এইভাব উদিত হয়।

আর শুদ্ধ জ্ঞান ও দর্শন দ্বারাই এই সিদ্ধান্ত যে লব্ধ হয়, তাহা নহে ; প্রেমবলেও আমরা ইহার কতকটা আভাস পাইতে পারি। ভাগবতে পড়িয়াছ,

১ তৈত্তি উপ. ২।৯ ; কেন উপ. ১।৩ ; কেন উপ. ২।২

গোপীগণের মধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে তাঁহার বিরহে বিলাপ করিতে করিতে গোপীদের মনে শ্রীকৃষ্ণের ভাবনা এরূপ প্রবল হইল যে, তাহাদের প্রত্যেকেই নিজ দেহ বিস্মৃত হইয়া নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ-জ্ঞানে তাঁহারই মতো বেশভূষা করিয়া তাঁহারই লীলার অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুতরাং বুঝিতেছ, প্রেমবলেও এই একত্ব-অনুভূতি আসিয়া থাকে। জনৈক প্রাচীন পারস্যদেশীয় সুফীর একটি কবিতায় এই ভাবের কথা আছে: প্রেমাস্পদের নিকট গিয়া দেখিলাম—গৃহদ্বার রুদ্ধ। দ্বারে করাঘাত করিলাম, ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, 'কে ?' উত্তর দিলাম, 'আমি'। দ্বার খুলিল না। দ্বিতীয়বার আসিয়া দ্বারে আঘাত করিলাম। আবার সেই প্রশ্ন, 'কে ?' আবার উত্তর দিলাম, 'আমি অমুক।' তথাপি দ্বার খুলিল না। তৃতীয়বার আসিলাম, পরিচিত কণ্ঠস্বর আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'কে ?' তখন বলিলাম—'হে প্রিয়তম, আমিই তুমি, তুমিই আমি।' তখন দ্বার খুলিল।

সুতরাং আমাদিগকে বুঝিতে হইবে ব্রহ্মানুভূতির বিভিন্ন সোপান আছে, আর যদিও প্রাচীন ভাষ্যকারগণের মধ্যে—যাঁহাদিগকে আমাদের শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা উচিত তাঁহাদের মধ্যে—বিবাদ থাকে, তথাপি আমাদের বিবাদ করিবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ জ্ঞানের ইতি করা যায় না। প্রাচীনকালে বা বর্তমানকালে সর্বজ্ঞত্ব কাহারও একচেটিয়া অধিকার নহে। অতীত কালে যদি ঋষি-মহাপুরুষ হইয়া থাকেন, নিশ্চিত জানিও বর্তমানকালেও অনেক ঋষির অভ্যুদয় হইবে; যদি প্রাচীনকালে ব্যাস-বাল্মীকি-শঙ্করাচার্যগণের অভ্যুদয় হইয়া থাকে, তবে তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এক এক জন শঙ্করাচার্য হইতে পারিবে না কেন? আমাদের ধর্মের এই বিশেষত্বটিও তোমাদের সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে; অন্যান্য ধর্মেও প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণের বাক্যই শাস্ত্রের প্রমাণস্বরূপ কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এইরূপ পুরুষের সংখ্যা এক দুই অথবা কয়েকজন জন মাত্র,—তাঁহাদেরই মাধ্যমে সর্বসাধারণের নিকট সত্য প্রচারিত হইয়াছে; আর সকলকেই তাঁহাদের কথা মানিতে হইবে। নাজারেথের যীশুর মধ্যে সত্যের প্রকাশ হইয়াছিল; আমাদের সকলকে উহাই মানিয়া লইতে হইবে, আমরা আর বেশী কিছু জানি না। কিন্তু আমাদের ধর্ম বলে: মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের ভিতর সেই সত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল—একজন দুইজন নহে, অনেকের মধ্যে ঐ সত্য আবির্ভূত হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতেও হইবে। 'মন্ত্রদ্রষ্টা'

অর্থ মন্ত্র অর্থাৎ তত্ত্বসমূহ যিনি সাক্ষাৎ করিয়াছেন—কেবল বাক্যবাগীশ, শাস্ত্রপাঠক, পণ্ডিত বা শব্দবিৎ নহে—তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়াছেন, এমন ব্যক্তি।

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।'[1]

—বহু বাক্যব্যয় দ্বারা, অথবা মেধা দ্বারা, এমন কি বেদপাঠ দ্বারাও আত্মাকে লাভ করা যায় না।

বেদ নিজে এ-কথা বলিতেছেন। তোমরা কি অন্য কোন শাস্ত্রে এরূপ নির্ভীক বাণী শুনিতে পাও—'বেদপাঠের দ্বারাও আত্মাকে লাভ করা যায় না'? হৃদয় খুলিয়া প্রাণ-ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে হইবে। তীর্থে বা মন্দিরে গেলে, তিলকধারণ করিলে অথবা বস্ত্রবিশেষ পরিলে ধর্ম হয় না। তুমি গায়ে চিত্র-বিচিত্র করিয়া চিতাবাঘটি সাজিয়া বসিয়া থাকিতে পারো, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না তোমার হৃদয় খুলিতেছে, যতদিন পর্যন্ত না ভগবানকে উপলব্ধি করিতেছ, ততদিন সব বৃথা। হৃদয় যদি রাঙিয়া যায়, তবে আর বাহিরের রঙের আবশ্যক নাই। ধর্ম অনুভব করিলে তবেই কাজ হইবে। বাহিরের রঙ আড়ম্বরাদি যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ধর্মজীবনে সাহায্য করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলির উপযোগিতা আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি থাকুক, ক্ষতি নাই; কিন্তু সেগুলি আবার অনেক সময় শুধু অনুষ্ঠানমাত্রে পর্যবসিত হইয়া যায়; তখন তাহারা ধর্মজীবনে সাহায্য না করিয়া বরং বিঘ্ন করে; লোকে এই বাহ্য অনুষ্ঠানগুলির সহিত ধর্মকে এক করিয়া বসে। তখন মন্দিরে যাওয়া ও পুরোহিতকে কিছু দেওয়াই ধর্মজীবন হইয়া দাঁড়ায়; এইগুলি অনিষ্টকর; ইহা যাহাতে বন্ধ হয়, তাহা করা উচিত। আমাদের শাস্ত্র বার বার বলিতেছেন, ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের দ্বারা কখনও ধর্মানুভূতি লাভ করা যায় না। যাহা আমাদিগকে সেই অক্ষর পুরুষের সাক্ষাৎ করায় তাহাই ধর্ম; আর এই ধর্ম সকলেরই জন্য। যিনি সেই অতীন্দ্রিয় সত্য সাক্ষাৎ করিয়াছেন, যিনি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি ভগবানকে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাকে সর্বভূতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি ঋষি হইয়াছেন। সহস্র বৎসর পূর্বে যিনি এইরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন—তিনিও যেমন ঋষি, সহস্র বৎসর পরেও যিনি উপলব্ধি করিবেন, তিনিও তেমনি ঋষি। আর যতদিন না তোমরা ঋষি হইতেছ, ততদিন তোমাদের ধর্মজীবন শুরু

১ কঠ উপ. ১।২।২৩

হইবে না; তখনই তোমাদের প্রকৃত ধর্ম আরম্ভ হইবে, এখন কেবল প্রস্তুত হইতেছ মাত্র; তখনই তোমাদের ভিতর ধর্মের প্রকাশ হইবে, এখন কেবল মানসিক ব্যায়াম ও শারীরিক যন্ত্রণাভোগ করিতেছ মাত্র। অতএব আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের ধর্ম স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন, যে কেহ মুক্তিলাভ করিতে চায়, তাহাকে এই ঋষিত্ব লাভ করিতে হইবে, মন্ত্রদ্রষ্টা হইতে হইবে, ঈশ্বরদর্শন করিতে হইবে। ইহাই মুক্তি।

আর ইহাই যদি আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হয়, তবে বুঝা যাইতেছে যে, আমরা নিজে নিজেই অতি সহজে আমাদের শাস্ত্র বুঝিতে পারিব, নিজেরাই উহার অর্থ বুঝিতে পারিব, উহার মধ্য হইতে যেটুকু আমাদের প্রয়োজন তাহাই গ্রহণ করিতে পারিব, নিজে নিজেই সত্য বুঝিতে পারিব, এবং তাহাই করিতে হইবে। আবার প্রাচীন ঋষিগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে সম্মান দেখাইতে হইবে। এই প্রাচীনগণ মহাপুরুষ ছিলেন, কিন্তু আমরা আরও বড় হইতে চাই। তাঁহারা অতীতকালে বড় বড় কাজ করিয়াছিলেন, আমাদিগকে তাঁহাদের অপেক্ষাও বড় বড় কাজ করিতে হইবে। প্রাচীন ভারতে শত শত ঋষি ছিলেন, এখন লক্ষ লক্ষ ঋষি হইবেন, নিশ্চয় হইবেন। আর তোমাদের প্রত্যেকেই যত শীঘ্র ইহা বিশ্বাস করিবে, ভারতের পক্ষে ও সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে ততই কল্যাণ। তোমরা যাহা বিশ্বাস করিবে, তাহাই হইবে। তোমরা যদি নিজেদের অকুতোভয় বলিয়া বিশ্বাস কর, তবে অকুতোভয় হইবে। যদি সাধু বলিয়া বিশ্বাস কর, কালই তোমরা সাধুরূপে পরিণত হইবে। কিছুই তোমাদিগকে বাধা দিতে পারিবে না। কারণ, আমাদের আপাতবিরোধী সম্প্রদায়গুলির ভিতর যদি একটি সাধারণ মতবাদ থাকে, তবে তাহা এই: 'আত্মার মধ্যে পূর্ব হইতেই মহিমা, তেজ ও পবিত্রতা রহিয়াছে। কেবল রামানুজের মতে আত্মা সময়ে সময়ে সঙ্কুচিত হন ও সময়ে সময়ে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আর শঙ্করের মতে ঐ সঙ্কোচ ও বিকাশ ভ্রমমাত্র। এ প্রভেদ থাকুক, কিন্তু সকলেই তো স্বীকার করিতেছেন—ব্যক্তই হউক, আর অব্যক্তই হউক, যে-কোন আকারে হউক, ঐ শক্তি রহিয়াছে। আর যত শীঘ্র উহা বিশ্বাস করা যায়, ততই তোমাদের কল্যাণ। সব শক্তি তোমাদের ভিতরে রহিয়াছে। তোমরা সব করিতে পারো। ইহা বিশ্বাস কর। মনে করিও না—তোমরা দুর্বল। আজকাল অনেকে যেমন নিজেদের আধপাগলা বলিয়া মনে করে, সেরূপ

মনে করিও না। অপরের সাহায্য ব্যতীতও তোমরা সব করিতে পারো। সব শক্তি তোমাদের ভিতর রহিয়াছে ; উঠিয়া দাঁড়াও এবং তোমাদের ভিতর যে দেবত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ কর।

ভারতের ভবিষ্যৎ

মাদ্রাজে এই শেষ বক্তৃতাটি একটি বৃহৎ তাঁবুর মধ্যে প্রদত্ত হয়—প্রায় চারি সহস্র শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল।

এই সেই প্রাচীনভূমি, অন্যান্য দেশে যাইবার পূর্বেই তত্ত্বজ্ঞান যে স্থানকে নিজ প্রিয় বাসভূমিরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছিল ; এই সেই ভারতভূমি, যে ভূমির আধ্যাত্মিক প্রবাহ জড়রাজ্যে সাগরসদৃশ প্রবহমান স্রোতস্বতীসমূহের তুল্য, যেখানে অনন্ত হিমালয় স্তরে স্তরে উত্থিত হইয়া হিমশিখররাজি দ্বারা যেন স্বর্গ-রাজ্যের রহস্যনিচয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। এই সেই ভারত, যে দেশের মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠ ঋষিমুনিগণের পদধূলিতে পবিত্র হইয়াছে। এইখানেই সর্বপ্রথম অন্তর্জগতের রহস্য-উদ্ঘাটনের চেষ্টা হইয়াছিল, এইখানেই মানবমন নিজ স্বরূপ অনুসন্ধানে প্রথম অগ্রসর হইয়াছিল। এইখানেই জীবাত্মার অমরত্ব, অন্তর্যামী ঈশ্বর এবং জগৎপ্রপঞ্চে ও মানবে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় মতবাদের প্রথম উদ্ভব। ধর্ম ও দর্শনের সর্বোচ্চ আদর্শসকল এইখানেই চরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল। এই সেই ভূমি, যেখান হইতে ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বন্যার মতো প্রবাহিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়াছে, আর এখান হইতেই আবার সেইরূপ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া নিস্তেজ জাতিসমূহের ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার করিবে। এই সেই ভারত, যাহা শত শতাব্দীর অত্যাচার, শত শত বৈদেশিক আক্রমণ, শত প্রকার রীতিনীতির বিপর্যয় সহ্য করিয়াও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই সেই ভূমি, যাহা নিজ অবিনাশী বীর্য ও জীবন লইয়া পর্বত অপেক্ষা দৃঢ়তর ভাবে এখনও দণ্ডায়মান। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট আত্মা যেমন অনাদি অনন্ত ও অমৃতস্বরূপ, আমাদের এই ভারতভূমির জীবনও সেইরূপ। আর আমরা এই দেশের সন্তান।

মনে করিও না। অপরের সাহায্য ব্যতীতও তোমরা সব করিতে পারো। সব শক্তি তোমাদের ভিতর রহিয়াছে ; উঠিয়া দাঁড়াও এবং তোমাদের ভিতর যে দেবত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ কর।

ভারতের ভবিষ্যৎ

মাদ্রাজে এই শেষ বক্তৃতাটি একটি বৃহৎ তাঁবুর মধ্যে প্রদত্ত হয়—প্রায় চারি সহস্র শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল।

এই সেই প্রাচীনভূমি, অন্যান্য দেশে যাইবার পূর্বেই তত্ত্বজ্ঞান যে স্থানকে নিজ প্রিয় বাসভূমিরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছিল ; এই সেই ভারতভূমি, যে ভূমির আধ্যাত্মিক প্রবাহ জড়রাজ্যে সাগরসদৃশ প্রবহমান স্রোতস্বতীসমূহের তুল্য, যেখানে অনন্ত হিমালয় স্তরে স্তরে উত্থিত হইয়া হিমশিখররাজি দ্বারা যেন স্বর্গ-রাজ্যের রহস্যনিচয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। এই সেই ভারত, যে দেশের মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠ ঋষিমুনিগণের পদধূলিতে পবিত্র হইয়াছে। এইখানেই সর্বপ্রথম অন্তর্জগতের রহস্য-উদ্ঘাটনের চেষ্টা হইয়াছিল, এইখানেই মানবমন নিজ স্বরূপ অনুসন্ধানে প্রথম অগ্রসর হইয়াছিল। এইখানেই জীবাত্মার অমরত্ব, অন্তর্যামী ঈশ্বর এবং জগৎপ্রপঞ্চে ও মানবে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় মতবাদের প্রথম উদ্ভব। ধর্ম ও দর্শনের সর্বোচ্চ আদর্শসকল এইখানেই চরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল। এই সেই ভূমি, যেখান হইতে ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বন্যার মতো প্রবাহিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়াছে, আর এখান হইতেই আবার সেইরূপ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া নিস্তেজ জাতিসমূহের ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার করিবে। এই সেই ভারত, যাহা শত শতাব্দীর অত্যাচার, শত শত বৈদেশিক আক্রমণ, শত প্রকার রীতিনীতির বিপর্যয় সহ্য করিয়াও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই সেই ভূমি, যাহা নিজ অবিনাশী বীর্য ও জীবন লইয়া পর্বত অপেক্ষা দৃঢ়তর ভাবে এখনও দণ্ডায়মান। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট আত্মা যেমন অনাদি অনন্ত ও অমৃতস্বরূপ, আমাদের এই ভারতভূমির জীবনও সেইরূপ। আর আমরা এই দেশের সন্তান।

হে ভারতসন্তানগণ, আমি তোমাদিগকে আজ কতকগুলি কাজের কথা বলিতে আসিয়াছি; ভারতভূমির পুর্ব গৌরব স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্য—তোমাদিগকে প্রকৃত কার্যের পথে আহ্বান করা ব্যতীত আর কিছু নহে। লোকে আমাকে অনেকবার বলিয়াছে, কেবল পুর্বগৌরব-স্মরণে মনের অবনতি হয়, উহাতে কোন ফল হয় না, অতএব আমাদিগকে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য করিতে হইবে। সত্য কথা; কিন্তু ইহাও বুঝিতে হইবে, অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম। অতএব যতদূর পারো অতীতের দিকে তাকাও, পশ্চাতে যে অনন্ত নির্ঝরিণী প্রবাহিত, প্রাণ ভরিয়া আকণ্ঠ তাহার জল পান কর, তারপর সম্মুখ-প্রসারিত দৃষ্টি লইয়া অগ্রসর হও এবং ভারত প্রাচীনকালে যতদূর উচ্চ গৌরবশিখরে আরূঢ় ছিল, তাহাকে তদপেক্ষা উচ্চতর, উজ্জ্বলতর, মহত্তর, অধিকতর মহিমামণ্ডিত করিবার চেষ্টা কর। আমাদের পূর্বপুরুষগণ মহাপুরুষ ছিলেন, আমাদিগকে প্রথমেই ইহা স্মরণ করিতে হইবে। প্রথমেই জানিতে হইবে, আমরা কি উপাদানে গঠিত, কোন্ রক্ত আমাদের ধমনীতে বহিতেছে। তারপর সেই পূর্বপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত শোণিতে বিশ্বাসী হইয়া, তাঁহাদের সেই অতীত কার্যে বিশ্বাসী হইয়া, সেই বিশ্বাসবলে অতীত মহত্ত্বের চেতনা হইতেই পূর্বে যাহা ছিল, তাহা অপেক্ষাও মহত্তর নূতন ভারত গঠন করিতে হইবে। অবশ্য মাঝে মাঝে এখানে অবনতির যুগ আসিয়াছে। আমি উহা বড় ধর্তব্যের মধ্যে আনি না; আমরা সকলেই সে কথা জানি—ঐ অবনতিরও প্রয়োজন ছিল। এক প্রকাণ্ড মহীরুহ হইতে সুন্দর সুপক্ক ফল জন্মিল, ফলটি মাটিতে পড়িয়া পচিল, তাহা হইতে আবার অঙ্কুর জন্মিয়া হয়তো প্রথম বৃক্ষ অপেক্ষা মহত্তর বৃক্ষের উদ্ভব হইল। এইরূপে যে অবনতি-যুগের মধ্য দিয়া আমাদিগকে আসিতে হইয়াছে, তাহারও প্রয়োজনীয়তা ছিল। সেই অবনতি হইতেই ভাবী ভারতের অভ্যুদয় হইতেছে। এখনই উহার অঙ্কুর দেখা যাইতেছে, উহার নব পল্লব বাহির হইয়াছে—এক মহান্ প্রকাণ্ড 'উর্ধ্বমূলম্' বৃক্ষ উদ্গত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, আর আমি আজ তাহারই সম্বন্ধে তোমাদিগকে বলিতে অগ্রসর হইয়াছি।

অন্যান্য দেশের সমস্যাসমূহ অপেক্ষা এদেশের সমস্যা জটিলতর, গুরুতর। জাতির অবান্তর বিভাগ, ধর্ম, ভাষা, শাসনপ্রণালী—এই সমুদয় লইয়াই একটি জাতি গঠিত। যদি একটি একটি করিয়া জাতি লইয়া এই জাতির সহিত

তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাইবে, অন্যান্য জাতি যে-সকল উপাদানে গঠিত, সেগুলি অপেক্ষাকৃত অল্প। আর্য, দ্রাবিড়, তাতার, তুর্ক, মোগল, ইওরোপীয় —পৃথিবীর সকল জাতির শোণিত যেন এদেশে রহিয়াছে। এখানে নানা ভাষার অপূর্ব সমাবেশ—আর আচার-ব্যবহারে দুইটি ভারতীয় শাখাজাতির যে প্রভেদ, ইওরোপীয় ও প্রাচ্য জাতির মধ্যেও তত প্রভেদ নাই।

কেবল আমাদের জাতির পবিত্র ঐতিহ্য—আমাদের ধর্মই আমাদের সম্মিলনভূমি, ঐ ভিত্তিতেই আমাদিগকে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে। ইওরোপে রাজনীতিই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি। এশিয়ায় কিন্তু ধর্মই ঐ ঐক্যের মূল। অতএব ভাবী ভারত-গঠনে ধর্মের ঐক্যসাধন অনিবার্যরূপে প্রয়োজন। এই ভারতভূমির পূর্ব হইতে পশ্চিম, উত্তর হইতে দক্ষিণ সর্বত্র এক ধর্ম সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। এক ধর্ম—এ কথা আমি কি অর্থে ব্যবহার করিতেছি? খ্রীষ্টান, মুসলমান বা বৌদ্ধগণের ভিতর যে-হিসাবে এক ধর্ম বিদ্যমান, আমি সে-হিসাবে 'এক ধর্ম' কথা ব্যবহার করিতেছি না। আমরা জানি, আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তসমূহ যতই বিভিন্ন হউক, উহাদের যতই বিভিন্ন দাবি থাকুক, তথাপি কতকগুলি সিদ্ধান্ত এমন আছে—যেগুলি সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায়ই একমত। অতএব আমাদের সম্প্রদায়সমূহের এইরূপ কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্ত আছে, আর ঐগুলি স্বীকার করিবার পর আমাদের ধর্ম সকল সম্প্রদায় ও সকল ব্যক্তিকে বিভিন্ন ভাব পোষণ করিবার, ইচ্ছামত চিন্তা ও কাজ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়া থাকে। আমরা সকলেই ইহা জানি, অন্ততঃ আমাদের মধ্যে যাঁহারা একটু চিন্তাশীল, তাঁহারাই ইহা জানেন। আমরা চাই—আমাদের ধর্মের এই জীবনপ্রদ সাধারণ তত্ত্বসমূহ সকলের নিকট, এই দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলের নিকট প্রচারিত হউক, সকলেই সেগুলি জানুক, বুঝুক আর নিজেদের জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করুক। সুতরাং ইহাই আমাদের প্রথম কর্তব্য।

আমরা দেখিতে পাই, এশিয়ায়—বিশেষতঃ ভারতবর্ষে জাতি, ভাষা, সমাজ সম্বন্ধে সমুদয় বাধা ধর্মের সমন্বয়ী শক্তির নিকট তিরোহিত হয়। আমরা জানি, ভারতবাসীর ধারণা—আধ্যাত্মিক আদর্শ হইতে উচ্চতর আদর্শ আর কিছু নাই; ইহাই ভারতীয় জীবনের মূলমন্ত্র, আর ইহাও জানি—আমরা স্বল্পতম বাধার পথেই কার্য করিতে পারি।

ধর্ম যে সর্বোচ্চ আদর্শ—ইহা তো সত্যই, কিন্তু আমি এখানে সে-কথা বলিতেছি না ; আমি বলিতেছি, ভারতের পক্ষে কাজ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়—প্রথমে ধর্মের দিকটা দৃঢ় না করিয়া এখানে অন্য কোন বিষয় চেষ্টা করিতে গেলে সর্বনাশ হইবে। সুতরাং ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়-সাধনই ভবিষ্যৎ ভারত-গঠনের প্রথম কর্মসূচী, যুগযুগান্তধরিয়া অবস্থিত কালজয়ী ঐ মহাচল হইতেই এই প্রথম সোপান প্রস্তুত করিতে হইবে। আমাদিগকে জানিতে হইবে যে—দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, শৈব, বৈষ্ণব, পাশুপত প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুর মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ ভাব আছে ; আর নিজেদের কল্যাণের জন্য, জাতির কল্যাণের জন্য আমাদিগকে পরস্পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বিবাদ ও পরস্পর ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিবার সময় আসিয়াছে। নিশ্চয় জানিও, এই-সকল বিবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, আমাদের শাস্ত্র ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকে, আমাদের পূর্বপুরুষগণের ইহা সম্পূর্ণ অননুমোদিত, আর যাঁহাদের বংশধর বলিয়া আমরা দাবি করিয়া থাকি, যাঁহাদের রক্ত আমাদের শিরায় শিরায় প্রবহমান, সেই মহাপুরুষগণ তাঁহাদের সন্তানগণের অতি সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া এইরূপ বিবাদকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

এই-সকল দ্বেষ ও দ্বন্দ্ব পরিত্যক্ত হইলে অন্যান্য বিষয়ে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। যদি রক্ত তাজা ও পরিষ্কার হয়, সে দেহে কোন রোগের বীজ বাস করিতে পারে না। ধর্মই আমাদের শোণিতস্বরূপ। যদি সেই রক্তপ্রবাহ চলাচলের কোন বাধা না থাকে, যদি রক্ত বিশুদ্ধ ও সতেজ হয়, তবে সকল বিষয়েই কল্যাণ হইবে। যদি এই 'রক্ত' বিশুদ্ধ হয়, তবে রাজনীতিক, সামাজিক বা অন্য কোনরূপ বাহ্য দোষ, এমন কি আমাদের দেশের ঘোর দ্রারিদ্র্যদোষ—সবই সংশোধিত হইয়া যাইবে। কারণ যদি রোগের বীজই শরীর হইতে বহিষ্কৃত হইল, তখন আর সেই রক্তে অন্য কিছু বাহ্য বস্তু কি করিয়া প্রবেশ করিবে? আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি উপমার সাহায্যে বলা যায়, রোগ হইতে হইলে তুইটি জিনিসের প্রয়োজন—বাহিরে কোন বিষাক্ত জীবাণু এবং সেই শরীরের অবস্থাবিশেষ। যতক্ষণ না দেহ রোগের বীজকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয়, যতদিন না দেহের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া রোগের বীজ প্রবেশের ও তাহার বৃদ্ধির অনুকূল হয়, ততদিন জগতের কোন জীবাণুর শক্তি নাই যে শরীরে রোগ উৎপন্ন করিতে পারে। বাস্তবিক প্রত্যেকের শরীরের মধ্য

দিয়া লক্ষ লক্ষ বীজাণু ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে; যতদিন শরীর সতেজ থাকে, ততদিন কেহ ঐগুলির অস্তিত্বই বুঝিতে পারে না। শরীর যখন দুর্বল হয়, তখনই বীজাণুগুলি শরীরে প্রবেশ করিয়া রোগ উৎপন্ন করে। জাতীয়-জীবনসম্বন্ধে ঠিক সেইরূপ। যখনই জাতীয় শরীর দুর্বল হয়, তখনই সেই জাতির রাজনীতিক, সামাজিক, মানসিক ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় সকল ক্ষেত্রেই সর্বপ্রকার রোগবীজাণু প্রবেশ করে ও রোগ উৎপন্ন করে। অতএব ইহার প্রতীকারের জন্য রোগের মূল কারণ কি, দেখিতে হইবে এবং রক্তের সর্ববিধ মলিনতা দূর করিতে হইবে। একমাত্র কর্তব্য হইবে—লোকের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করা, রক্তকে বিশুদ্ধ করা, শরীরকে সতেজ করা, যাহাতে উহা সর্বপ্রকার বাহ্য বিষের প্রবেশ প্রতিরোধ করিতে পারে ও ভিতরের বিষকে বাহির করিয়া দিতে পারে।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, আমাদের ধর্মই আমাদের তেজ, বীর্য, এমন কি জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি। আমি এখন এ বিচার করিতে যাইতেছি না যে, ধর্ম সত্য কি মিথ্যা; আমি বিচার করিতে যাইতেছি না যে, ধর্মেই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিস্থাপন করায় পরিণামে আমাদের কল্যাণ বা অকল্যাণ হইবে; ভালই হউক বা মন্দই হউক, ধর্মে আমাদের জাতীয় ভিত্তি রহিয়াছে, তোমরা উহা ত্যাগ করিতে পার না, চিরকালের জন্য উহাই তোমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিস্বরূপ রহিয়াছে, সুতরাং আমাদের ধর্মে আমার যেমন বিশ্বাস আছে, তোমাদের যদি তেমন না-ও থাকে, তথাপি তোমাদিগকে এই ধর্ম অবলম্বন করিয়াই থাকিতে হইবে। তোমরা এই ধর্মবন্ধনে চির আবদ্ধ; যদি ধর্ম পরিত্যাগ কর, তবে তোমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। ধর্মই আমাদের জাতির জীবনস্বরূপ, ইহাকে দৃঢ় করিতে হইবে। তোমরা যে শত শতাব্দীর অত্যাচার সহ্য করিয়া এখনও অক্ষতভাবে দাঁড়াইয়া আছ, তাহার কারণ তোমরা সযত্নে এই ধর্ম রক্ষা করিয়াছ, উহার জন্য অন্য সকল স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছ। এই ধর্মরক্ষার জন্য তোমাদের পূর্বপুরুষগণ সাহসপূর্বক সকলই সহ্য করিয়াছিলেন, এমন কি মৃত্যুকে পর্যন্ত আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

বৈদেশিক বিজেতাগণ আসিয়া মন্দিরের পর মন্দির ভাঙিয়াছে—কিন্তু এই অত্যাচারস্রোত যেই একটু বন্ধ হইয়াছে, আবার সেইখানে মন্দিরের চূড়া উঠিয়াছে। অনেক গ্রন্থপাঠে যাহা না শিখিতে পারো, গুজরাটের সোমনাথ-

মন্দিরের মতো দাক্ষিণাত্যের অনেক প্রাচীন মন্দির তোমাদিগকে অধিকতর শিক্ষা দিতে পারে, তোমাদের জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে। লক্ষ্য করিয়া দেখ, ঐ মন্দির শত শত আক্রমণের ও শত শত পুনরভ্যুদয়ের চিহ্ন ধারণ করিয়া আছে—বার বার নষ্ট হইতেছে, আবার সেই ধ্বংসাবশেষ হইতে উত্থিত হইয়া, নূতন জীবনলাভ করিয়া পূর্বেরই মতো অচল অটলভাবে বিরাজ করিতেছে।

সুতরাং এখানেই—এই ধর্মেই আমাদের জাতীয় মন, জাতীয় প্রাণপ্রবাহ দেখিতে পাইবে। ধর্ম অনুসরণ কর, তোমরা গৌরবান্বিত হইবে। ধর্ম পরিত্যাগ কর, তোমাদের মৃত্যু নিশ্চয়। এই জাতীয় জীবন-প্রবাহের বিরুদ্ধে যাইতে চেষ্টা করিলে তাহার একমাত্র পরিণাম হইবে 'বিনাশ'—আমি অবশ্য এ-কথা বলিতেছি না যে, আর কিছুর প্রয়োজন নাই। আমি এ-কথা বলিতেছি না যে, রাজনীতিক বা সামাজিক উন্নতিব কোন প্রয়োজন নাই; আমার এইটুকু বক্তব্য—আর আমার ইচ্ছা, তোমরা ইহা ভুলিও না যে ঐগুলি গৌণমাত্র, ধর্মই মুখ্য। ভারতবাসী প্রথম চায় ধর্ম, তারপর অন্যান্য বস্তু। ঐ ধর্মভাবকে বিশেষরূপে জাগাইতে হইবে।

কিরূপে উহা সাধিত হইবে? আমি তোমাদের নিকট আমার সমুদয় কার্যপ্রণালী বলিব। আমেরিকা যাইবার জন্য মাদ্রাজ ছাড়িবার অনেক বৎসর পূর্ব হইতেই আমার মনে এই সঙ্কল্পগুলি ছিল, এই ভাব প্রচার করিবার জন্যই আমি আমেরিকা ও ইংলণ্ডে গিয়াছিলাম। ধর্মমহাসভা প্রভৃতির জন্য আমার বড় ভাবনা হয় নাই—উহা শুধু একটি সুযোগরূপে উপস্থিত হইয়াছিল। আমার মনে যে সঙ্কল্প ঘুরিতেছিল, তাহাই আমাকে সমগ্র পৃথিবীতে ঘুরাইয়াছে। আমার সঙ্কল্প এই: প্রথমতঃ আমাদের শাস্ত্রভাণ্ডারে সঞ্চিত, মঠ ও অরণ্যে গুপ্তভাবে রক্ষিত, অতি অল্প লোকের দ্বারা অধিকৃত ধর্মরত্নগুলিকে প্রকাশ্যে বাহির করা, ঐ শাস্ত্রনিবদ্ধ তত্ত্বগুলিকে—শুধু যাহাদের হাতে গুপ্তভাবে রহিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতেই বাহির করিলে হইবে না, উহা অপেক্ষাও দুর্ভেদ্য পেটিকায় অর্থাৎ যে সংস্কৃত ভাষায় ঐ তত্ত্বগুলি রক্ষিত, সেই সংস্কৃত শব্দের শত শত শতাব্দীর কঠিন আবরণ হইতে বাহির করিতে হইবে। এক কথায়—আমি ঐ তত্ত্বগুলিকে সর্বসাধারণের বোধগম্য করিতে চাই; আমি চাই ঐ ভাবগুলি সর্বসাধারণের—প্রত্যেক ভারতবাসীর সম্পত্তি হউক, তা সে সংস্কৃত ভাষা জানুক

বা না জানুক। এই সংস্কৃত ভাষায়—আমাদের গৌরবের বস্তু এই সংস্কৃত ভাষার কাঠিন্যই এই-সকল ভাবপ্রচারের এক মহান্ অন্তরায়, আর যতদিন না আমাদের সমগ্র জাতি উত্তমরূপে সংস্কৃতভাষা শিখিতেছে, ততদিন ঐ অন্তরায় দূরীভূত হইবার নহে। সংস্কৃতভাষা যে কঠিন, তাহা তোমরা এই কথা বলিলেই বুঝিবে যে, আমি সারাজীবন ধরিয়া ঐ ভাষা অধ্যয়ন করিতেছি, তথাপি প্রত্যেক নূতন সংস্কৃত গ্রন্থই আমার কাছে নূতন ঠেকে। যাহাদের ঐ ভাষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করিবার অবসর কখনই হয় নাই, তাহাদের পক্ষে উহা কিরূপ কঠিন হইবে, তাহা তোমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারো। সুতরাং তাহাদিগকে অবশ্যই চলিত ভাষায় এই-সকল তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষাও চলিবে। কারণ সংস্কৃতশিক্ষায়, সংস্কৃতশব্দগুলির উচ্চারণমাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব—একটা শক্তির ভাব জাগিবে। মহানুভব রামানুজ, চৈতন্য ও কবীর ভারতের নিম্নজাতিগুলিকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চেষ্টার ফলে সেই মহাপুরুষগণের জীবৎকালে অদ্ভুত ফল-লাভ হইয়াছিল। কিন্তু পরে তাঁহাদের কার্যের এরূপ শোচনীয় পরিণাম কেন হইল, নিশ্চয় তাহার কিছু কারণ আছে; এই মহান্ আচার্যগণের তিরোভাবের পর এক শতাব্দী যাইতে না যাইতে কেন সেই উন্নতি বন্ধ হইল? ইহার উত্তর এই—তাঁহারা নিম্নজাতিগুলিকে উন্নত করিয়াছিলেন বটে, তাহারা উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় হউক, ইহা তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষা-বিস্তারের জন্য শক্তি-প্রয়োগ তাঁহারা করেন নাই। এমন কি, মহান্ বুদ্ধও সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষার বিস্তার বন্ধ করিয়া একটি ভুল পথ ধরিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কার্যের আশু ফল-লাভ চাহিয়াছিলেন, সুতরাং সংস্কৃতভাষায় নিবদ্ধ ভাবসমূহ তখনকার প্রচলিত ভাষা পালিতে অনুবাদ করিয়া প্রচার করিলেন। অবশ্য ভালই করিয়াছিলেন—লোকে তাঁহার ভাব বুঝিল, কারণ তিনি সর্বসাধারণের ভাষায় উপদেশ দিয়াছিলেন। এ খুব ভালই হইয়াছিল—তাঁহার প্রচারিত ভাবসকল শীঘ্রই চারিদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল; অতি দূরে দূরে তাঁহার ভাবসমূহ ছড়াইয়া পড়িল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতভাষার বিস্তার হওয়া উচিত ছিল। জ্ঞানের বিস্তার হইল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'গৌরব-বোধ' ও 'সংস্কার' জন্মিল না। শিক্ষা মজ্জাগত হইয়া কৃষ্টিতে পরিণত হইলে ভাববিপ্লবের

ধাক্কা সহ্য করিতে পারে, শুধু বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানরাশি তাহা পারে না। জগতের লোককে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান দিয়া যাইতে পারো, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কল্যাণ হইবে না ; ঐ জ্ঞান মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত হওয়া চাই। আমরা সকলেই আধুনিক কালের এমন অনেক জাতির বিষয় জানি, যাহাদের এইরূপ অনেক জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহাতে কি? সে-সকল জাতি ব্যাঘ্রতুল্য নৃশংস—অসভ্য, কারণ তাহাদের কৃষ্টির অভাব। সভ্যতার ন্যায় তাহাদের জ্ঞানও গভীর নয়, একটু নাড়া দিলেই ভিতরের আদিম অসভ্য প্রকৃতি জাগিয়া উঠে।

এরূপ ব্যাপার জগতে ঘটিয়া থাকে ; এই বিপদ সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হইবে। সাধারণকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দাও, তাহাদিগকে ভাব দাও, তাহারা অনেক বিষয় অবগত হউক ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু প্রয়োজন। তাহাদিগকে কৃষ্টি দিতে চেষ্টা কর। যতদিন পর্যন্ত না তাহা করিতে পারিতেছ, ততদিন সাধারণের স্থায়ী উন্নতির আশা নাই। উপরন্তু একটি নূতন জাতির সৃষ্টি হইবে, যাহারা সংস্কৃত ভাষার সুবিধা লইয়া অপর সকলের উপরে উঠিবে ও পূর্বের মতোই প্রভুত্ব করিবে। নিম্নজাতীয় ব্যক্তিদের বলিতেছি—তোমাদের অবস্থা উন্নত করিবার একমাত্র উপায় সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করা, আর উচ্চতর জাতিগণের বিরুদ্ধে এই যে লেখালেখি দ্বন্দ্ব-বিবাদ চলিতেছে, উহা বৃথা ; উহাতে কোনরূপ কল্যাণ হয় নাই, হইবেও না ; উহাতে অশান্তির অনল আরও জ্বলিয়া উঠিবে, আর দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্ব হইতেই নানা ভাগে বিভক্ত এই জাতি ক্রমশঃ আরও বিভক্ত হইয়া পড়িবে। জাতিভেদের বৈষম্য দূর করিয়া সমাজে সাম্য আনিবার একমাত্র উপায় উচ্চবর্ণের শক্তির কারণস্বরূপ শিক্ষা ও কৃষ্টি আয়ত্ত করা ; তাহা যদি করিতে পারো, তবে তোমরা যাহা চাহিতেছ, তাহা পাইবে।

এই সঙ্গে আমি আর একটি প্রশ্নের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। অবশ্য মাদ্রাজের সহিতই এই প্রশ্নের বিশেষ সম্বন্ধ। একটি মত আছে—দাক্ষিণাত্যে আর্যাবর্তনিবাসী আর্যগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ দ্রাবিড়জাতির নিবাস ছিল ; দাক্ষিণাত্যের এই ব্রাহ্মণগণ শুধু আর্যাবর্তনিবাসী ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য জাতি দক্ষিণী ব্রাহ্মণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এখন প্রত্নতাত্ত্বিক মহাশয় আমাকে ক্ষমা করিবেন—আমি বলি এই মত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাঁহাদের একমাত্র প্রমাণ এই যে, আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের ভাষায় প্রভেদ আছে ; আমি তো আর কোন প্রভেদ দেখিতে পাই না।

আমরা এতগুলি আর্যাবর্তের লোক এখানে রহিয়াছি, আর আমি আমার ইওরোপীয় বন্ধুগণকে এই সমবেত লোকগুলির মধ্য হইতে আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য-বাসী বাছিয়া লইতে আহ্বান করি। উহাদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? একটু ভাষার প্রভেদমাত্র। পুর্বোক্ত-মতবাদীরা বলেন, দক্ষিণী ব্রাহ্মণেরা আর্যাবর্ত হইতে যখন আসেন, তখন তাঁহারা সংস্কৃতভাষী ছিলেন, এখন এখানে আসিয়া দ্রাবিড়ভাষা বলিতে বলিতে সংস্কৃত ভুলিয়া গিয়াছেন। যদি ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে ইহা সত্য হয়, তবে অন্যান্য জাতির সম্বন্ধেই বা ও-কথা খাটিবে না কেন? অন্যান্য জাতিও আর্যাবর্তনিবাসী ছিল, তাহারাও দাক্ষিণাত্যে আসিয়া সংস্কৃত ভুলিয়া গিয়া দ্রাবিড়ভাষা লইয়াছে—এ কথাই বা বলা যাইবে না কেন? যে-যুক্তি দ্বারা তুমি দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণেতর জাতিকে অনার্য বলিয়া প্রমাণ করিতে যাইতেছ, সেই যুক্তিদ্বারাই আমি তাহাদিগকে আর্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারি। ও-সব আহাম্মকের কথা, ও-সব কথায় বিশ্বাস করিও না। হইতে পারে একটি দ্রাবিড় জাতি ছিল—তাহারা এখন লোপ পাইয়াছে; যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহারা বনজঙ্গলে বাস করিতেছে। খুব সম্ভব ঐ দ্রাবিড় ভাষাও সংস্কৃতের পরিবর্তে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু সকলেই আর্য, আর্যাবর্ত হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিয়াছে। সমগ্র ভারত আর্যময়, এখানে অপর কোন জাতি নাই।

আবার আর এক মত আছে যে, শূদ্রেরা নিশ্চয় অনার্য জাতি—তাহারা আর্যগণের দাসস্বরূপ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিতেছেন—ইতিহাসে একবার যাহা ঘটিয়াছে, তাহার পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। যেহেতু মার্কিন, ইংরেজ, পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজ জাতি আফ্রিকান হতভাগ্যদের ধরিয়া জীবদ্দশায় কঠোর পরিশ্রম করাইয়াছে এবং মরিলে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছে; যেহেতু ঐ আফ্রিকানদের সহিত সঙ্করোৎপন্ন তাহাদের সন্তানগণকে ক্রীতদাস করা হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে ঐ অবস্থায় অনেক দিন ধরিয়া রাখা হইয়াছিল, যেহেতু এই ঘটনার সহিত তুলনা করিয়া মন হাজার হাজার বৎসর অতীতে ছুটিয়া গিয়া এরূপ কল্পনা করে যে, ঐরূপ ব্যাপার এখানেও ঘটিয়াছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন যে, ভারত কৃষ্ণচক্ষু আদিম জাতিসমূহে পরিপূর্ণ ছিল—উজ্জ্বলকায় আর্যগণ আসিয়া সেখানে বাস করিলেন; তাঁহারা কোথা হইতে যে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলেন, তাহা ঈশ্বরই জানেন

কাহারও কাহারও মতে মধ্য-তিব্বত হইতে, আবার কেহ কেহ বলেন মধ্য-এশিয়া হইতে। অনেক স্বদেশপ্রেমিক ইংরেজ আছেন, যাঁহারা মনে করেন আর্যগণ সকলেই হিরণ্যকেশ ছিলেন। অপরে আবার নিজ নিজ পছন্দ-মত তাঁহাদিগকে কৃষ্ণকেশ বলিয়া স্থির করেন। লেখকের নিজের চুল কালো হইলে তিনি আর্যগণকেও কৃষ্ণকেশ করিয়া বসেন। আর্যগণ সুইজরলণ্ডের হ্রদগুলির তীরে বাস করিতেন—সম্প্রতি এরূপ প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। তাঁহারা সকলে মিলিয়া যদি এই-সব মতামতের সঙ্গে সেখানে ডুবিয়া মরিতেন, তাহা হইলে আমি দুঃখিত হইতাম না! আজকাল কেহ কেহ বলেন, আর্যগণ উত্তর-মেরুনিবাসী ছিলেন। আর্যগণ ও তাঁহাদের বাসভূমির উপর ভগবানের আশীর্বাদ বর্ষিত হউক! আমাদের শাস্ত্রে এই-সকল বিষয়ের কোন প্রমাণ আছে কি না যদি অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখিতে পাইবে—আমাদের শাস্ত্রে ইহার সমর্থক কোন বাক্য নাই; এমন কোন বাক্য নাই, যাহাতে আর্যগণকে ভারতের বাহিরে কোন স্থানের অধিবাসী মনে করা যাইতে পারে; আর আফগানিস্থান প্রাচীন ভারতের অন্তর্ভূত ছিল। শূদ্রজাতি যে সকলেই অনার্য এবং তাহারা যে বহুসংখ্যক ছিল, এ-সব কথাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সে সময়ে সামান্য কয়েকজন উপনিবেশকারী আর্যের পক্ষে শত সহস্র অনার্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বাস করাই অসম্ভব হইত। উহারা পাঁচ মিনিটে আর্যদের চাটনির মতো খাইয়া ফেলিত। জাতিভেদের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা মহাভারতেই পাওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছে: সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। জাতিভেদ-সমস্যার যত প্রকার ব্যাখ্যা শুনা যায়, তন্মধ্যে ইহাই একমাত্র সত্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা। আগামী সত্যযুগে আবার ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই ব্রাহ্মণে পরিণত হইবেন।

সুতরাং ভারতের জাতিভেদ-সমস্যার মীমাংসা এরূপ দাঁড়াইতেছে—উচ্চবর্ণগুলিকে হীনতর করিতে হইবে না, ব্রাহ্মণজাতিকে ধ্বংস করিতে হইবে না। ভারতে ব্রাহ্মণই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ—শঙ্করাচার্য তাঁহার গীতাভাষ্যের ভূমিকায় ইহা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কারণ বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ইহাই তাঁহার অবতরণের মহান্ উদ্দেশ্য। এই ব্রাহ্মণ, এই দিব্য-

মানব, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, এই আদর্শ ও পূর্ণমানবকে থাকিতে হইবে; তাঁহার লোপ হইলে চলিবে না। আধুনিক জাতিভেদ-প্রথার যতই দোষ থাকুক, আমরা জানি—ব্রাহ্মণজাতির পক্ষে এইটুকু বলিতেই হইবে যে, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তাঁহাদের মধ্যেই অধিকতর সংখ্যায় প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব-সম্পন্ন মানুষের জন্ম হইয়াছে, ইহা সত্য। অন্যান্য জাতির নিকট ব্রাহ্মণদের এ গৌরব প্রাপ্য। যথেষ্ট সাহস অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের দোষ দেখাইতে হইবে, কিন্তু যেটুকু প্রশংসা—যেটুকু গৌরব তাঁহাদের প্রাপ্য, সেটুকু তাঁহাদিগকে দিতে হইবে। 'প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহার ন্যায্য প্রাপ্য দাও'—এই ইংরেজী প্রবাদ-বাক্যটি মনে রাখিও।

অতএব বন্ধুগণ, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদের প্রয়োজন নাই। বিবাদে কি ফল হইবে? উহা আমাদিগকে আরও বিভক্ত করিবে, দুর্বল করিয়া ফেলিবে, আরও অবনত করিয়া ফেলিবে। একচেটিয়া অধিকারের—একচেটিয়া দাবির দিন চলিয়া গিয়াছে, ভারত হইতে চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছে, আর ইহা ভারতে ইংরেজ-শাসনের অন্যতম সুফল। মুসলমান শাসনকালেও এই একচেটিয়া অধিকার-লোপের যে সুফল ফলিয়াছে, সে-জন্য আমরা ঋণী। তাহাদের রাজত্বে যে সবই মন্দ ছিল, তাহা নহে। জগতের কোন জিনিসই সম্পূর্ণ মন্দও নহে, সম্পূর্ণ ভালও নহে। মুসলমানের ভারতাধিকার দরিদ্র পদদলিতদের উদ্ধারের কারণ হইয়াছিল। এ দারিদ্র্য ও অবহেলার জন্যই আমাদের এক-পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান হইয়া গিয়াছে। কেবল তরবারির বলে ইহা সাধিত হয় নাই। কেবল তরবারি ও অগ্নির বলে ইহা সাধিত হইয়াছিল, এ-কথা মনে করা নিতান্ত পাগলামি।

আর তোমরা যদি সাবধান না হও, তবে মাদ্রাজের পঞ্চমাংশ, এমন কি অর্ধেক লোক খ্রীষ্টান হইয়া যাইবে। মালাবার দেশে আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা অপেক্ষা অধিক আহাম্মকি জগতে আর কিছু কি থাকিতে পারে? 'পারিয়া' বেচারাকে উচ্চবর্ণের সঙ্গে এক রাস্তায় যাইতে দেওয়া হয় না, কিন্তু যে-মুহূর্তে সে খ্রীষ্টান হইয়া পূর্বনাম বদলাইয়া একটা যা হোক ইংরেজী নাম লইল বা মুসলমান হইয়া মুসলমানী নাম লইল, আর কোন গোল নাই, সব ঠিক। এইরূপ দেখিয়া ইহা ছাড়া আর কি সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, মালাবার-বাসীরা সব পাগল, তাহাদের গৃহগুলি এক একটি উন্মাদ আশ্রম, আর যতদিন

যতদিন তাহারা নিজেদের প্রথা ও আচারাদির সংশোধন না করিতেছে, ততদিন তাহারা ভারতের প্রত্যেক জাতির ঘৃণার পাত্র হইয়া থাকিবে। এরূপ দূষিত ও পৈশাচিক প্রথাসমূহ যে এখনও অবাধে রাজত্ব করিতেছে, ইহা কি তাহাদের ঘোরতর লজ্জার বিষয় নহে? নিজেদেরই সন্তানগণ অনাহারে মরিতেছে— আর যে মুহূর্তে তাহারা অন্য ধর্ম গ্রহণ করে, অমনি তাহারা পেট পুরিয়া খাইতে পায়! বিভিন্ন জাতির ভিতর দ্বেষ-দ্বন্দ্ব আর থাকা উচিত নয়।

উচ্চতর বর্ণকে নীচে নামাইয়া এ সমস্যার মীমাংসা হইবে না, নিম্নজাতিকে উন্নত করিতে হইবে। আর যদিও কতকগুলি লোক—অবশ্য ইহাদের শাস্ত্রজ্ঞান এবং প্রাচীনদের মহান্ উদ্দেশ্য বুঝিবার ক্ষমতা কিছুই নাই—অন্যরূপ বলিয়া থাকেন, তথাপি ইহাই আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট কার্যপ্রণালী। তাহারা উহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু যাঁহাদের মস্তিষ্ক আছে, যাঁহাদের ধারণাশক্তি আছে, তাঁহারাই ঐ কার্যের ব্যাপক উদ্দেশ্য বুঝিতে সমর্থ। তাঁহারা দূরে থাকিয়া—যুগ যুগ ধরিয়া জাতীয় জীবনের যে অপূর্ব শোভাযাত্রা চলিয়াছে, তাহার আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত অনুধাবন করেন। তাঁহারা প্রাচীন ও আধুনিক সকল গ্রন্থের মাধ্যমে জাতীয় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন।

কি সেই কার্যপ্রণালী? একদিকে ব্রাহ্মণ, অপর দিকে চণ্ডাল; চণ্ডালকে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করাই তাঁহাদের কার্যপ্রণালী। যেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক শাস্ত্র, সেগুলিতে দেখিবে নিম্নতর জাতিদের ক্রমশঃ উচ্চাধিকার দেওয়া হইতেছে। এমন শাস্ত্রও আছে, যাহাতে এইরূপ কঠোর বাক্য বলা হইয়াছে যে, যদি শূদ্র বেদ শ্রবণ করে, তাহার কর্ণে তপ্ত সীসা ঢালিয়া দিতে হইবে, যদি তাহার বেদ কিছু স্মরণ থাকে, তবে তাহাকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে। যদি সে ব্রাহ্মণকে 'ওহে ব্রাহ্মণ' বলিয়া সম্বোধন করে, তবে তাহার জিহ্বা ছেদন করিতে হইবে। ইহা প্রাচীন আসুরিক বর্বরতা সন্দেহ নাই, আর ইহা বলাও বাহুল্য-মাত্র। কিন্তু ইহাতে ব্যবস্থাপকগণের কোন দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তাঁহারা সমাজের অংশবিশেষের প্রথাবিশেষ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। এই প্রাচীনদের ভিতর কখন কখন অসুর-প্রকৃতি লোকের জন্ম হইয়াছিল। সকল যুগে সর্বত্রই অল্পবিস্তর অসুর-প্রকৃতির লোক বর্তমান ছিল। পরবর্তী স্মৃতিসমূহে আবার দেখিবে, শূদ্রের প্রতি ব্যবস্থার কঠোরতা কিছু কমিয়াছে—'শূদ্রগণের

প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাহাদিগকে বেদাদি শিক্ষা দিবে না।' ক্রমশঃ আমরা আরও আধুনিক, বিশেষতঃ যেগুলি এই যুগের জন্য বিশেষভাবে উপদিষ্ট, সেই-সকল স্মৃতিতে দেখিতে পাই—'যদি শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের আচার-ব্যবহার অনুকরণ করে, তাহারা ভালই করিয়া থাকে, তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া উচিত।' এইরূপে ক্রমশঃ যতই দিন যাইতেছে, ততই শূদ্রদিগকে বেশী বেশী অধিকার দেওয়া হইতেছে। এইরূপে মূল কার্যপ্রণালীর এবং বিভিন্ন সময়ে উহার বিভিন্ন পরিণতির, অথবা কিরূপে বিভিন্ন শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া উহাদের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইবে, তাহা দেখাইবার সময় আমার নাই; কিন্তু এ বিষয়ে স্পষ্ট ঘটনা বিচার করিয়া দেখিলেও বুঝিতে পারা যায় যে, সকল জাতিকেই ধীরে ধীরে উঠিতে হইবে।

এখনও যে সহস্র সহস্র জাতি রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার ব্রাহ্মণজাতিতে উন্নীত হইতেছে। কারণ জাতিবিশেষ যদি নিজদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করে, তাহাতে কে কি বলিবে? জাতিভেদ যতই কঠোর হউক, উহা এইরূপেই সৃষ্ট হইয়াছে। মনে কর, কতকগুলি জাতি রহিয়াছে—প্রত্যেক জাতিতে দশ হাজার লোক। উহারা যদি সকলে মিলিয়া নিজদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করে, তবে কেহই তাহাদিগকে বাধা দিতে পারে না। আমি নিজ জীবনে ইহা দেখিয়াছি। কতকগুলি জাতি শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠে, আর যখনই তাহারা সকলে একমত হয়, তখন তাহাদিগকে আর কে বাধা দিতে পারে? কারণ আর যাহাই হউক, প্রত্যেক জাতির সহিত অপর জাতির কোন সম্পর্ক নাই। এক জাতি অপর জাতির কাজে হস্তক্ষেপ করে না—এমন কি, এক জাতির বিভিন্ন শাখাগুলিও পরস্পরের কাজে হস্তক্ষেপ করে না। ৮

শঙ্করাচার্য প্রভৃতি যুগাচার্য—জাতিগঠনকারী ছিলেন। তাঁহারা যে-সব অদ্ভুত ব্যাপার করিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাদিগকে বলিতে পারি না, আর তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ, আমি যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহাতে বিরক্ত হইতে পারো। কিন্তু আমার ভ্রমণ ও অভিজ্ঞতায় আমি ইহার সন্ধান পাইয়াছি, আর আমি ঐ গবেষণায় অদ্ভুত ফল লাভ করিয়াছি। সময়ে সময়ে তাঁহারা দলকে দল বেলুচি লইয়া এক মুহূর্তে তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় করিয়া ফেলিতেন; দলকে দল জেলে লইয়া এক মুহূর্তে ব্রাহ্মণ করিয়া ফেলিতেন। তাঁহারা সকলেই

ঋষি-মুনি ছিলেন—আমাদিগকে তাঁহাদের কার্যকলাপ ভক্তিশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে।

তোমাদিগকেও ঋষি-মুনি হইতে হইবে। ইহাই কৃতকার্য হইবার গোপন রহস্য। অল্পাধিক পরিমাণে সকলকেই ঋষি হইতে হইবে। 'ঋষি' শব্দের অর্থ কি? বিশুদ্ধস্বভাব ব্যক্তি। আগে শুদ্ধচিত্ত হও—তোমাতেই শক্তি আসিবে। কেবল 'আমি ঋষি' বলিলেই চলিবে না; যখনই তুমি যথার্থ ঋষিত্ব লাভ করিবে, দেখিবে—অপরে তোমার কথা কোন না কোন ভাবে শুনিতেছে। তোমার ভিতর হইতে এক আশ্চর্য শক্তি আসিয়া অপরের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে; তাহারা বাধ্য হইয়া তোমার অনুবর্তী হইবে, বাধ্য হইয়া তোমার কথা শুনিবে, এমন কি তাহাদের অজ্ঞাতসারে নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তোমার সংকল্পিত কার্যে সহায়ক হইবে। ইহাই ঋষিত্ব।

অবশ্য যাহা বলিলাম তাহাতে কার্যপ্রণালী বিশেষ কিছু বর্ণনা করা হইল না। বংশপরম্পরাক্রমে পূর্বোক্ত ভাব লইয়া কাজ করিতে করিতে বিশেষ বিশেষ কার্যপ্রণালী আবিষ্কৃত হইবে। বিবাদ-বিসংবাদের যে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তাহা দেখাইবার জন্য আমি দুই-একটি কথার আভাস দিলাম মাত্র। আমার অধিকতর দুঃখের কারণ এই যে, আজকাল বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর ঘোর বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছে। এটি বন্ধ হওয়া চাই। কোন পক্ষেরই ইহাতে কিছু লাভ নাই। উচ্চতর বর্ণের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ইহাতে লাভ নাই; কারণ একচেটিয়া অধিকারের দিন গিয়াছে। প্রত্যেক অভিজাত জাতির কর্তব্য—নিজের সমাধি নিজে খনন করা; আর যত শীঘ্র তাহারা এ-কার্য করে, ততই তাহাদের পক্ষে মঙ্গল। যত বিলম্ব হইবে, ততই তাহারা পচিবে আর ধ্বংসও তত ভয়ানক হইবে। এই কারণে ব্রাহ্মণজাতির কর্তব্য—ভারতের অন্যান্য সকলজাতির উদ্ধারের চেষ্টা করা; ব্রাহ্মণ যদি উদ্ধারের চেষ্টা করেন এবং যতদিনই ইহা করেন, ততদিনই তিনি ব্রাহ্মণ; তিনি যদি শুধু টাকার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ান, তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। আবার তোমাদেরও প্রকৃত ব্রাহ্মণকেই সাহায্য করা উচিত, তাহাতে স্বর্গলাভ হইবে। কিন্তু অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে দান করিলে স্বর্গলাভ না হইয়া বিপরীত ফল হয়—আমাদের শাস্ত্র এই কথা বলে। এই বিষয়ে তোমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে।

তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ, যিনি বৈষয়িক কোন কর্ম করেন না। সাংসারিক কার্য অপর জাতির জন্য, ব্রাহ্মণের জন্য নহে। ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া আমি বলিতেছি—তাঁহারা যাহা জানেন অপর জাতিকে তাহা শিখাইয়া, শত শতাব্দীর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহারা যাহা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা অপরকে দান করিয়া ভারতবাসীকে উন্নত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রাণপণ কাজ করিতে হইবে। ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের কর্তব্য—প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব কি, তাহা স্মরণ করা। মনু বলিয়াছেন :

ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে ॥[১]

—ব্রাহ্মণকে যে এত সম্মান ও বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহার কারণ—তাঁহার নিকট ধর্মের ভাণ্ডার রহিয়াছে। তাঁহাকে ঐ ভাণ্ডার খুলিয়া রত্নরাজি জগতে বিতরণ করিতে হইবে। এ কথা সত্য যে, ভারতীয় অন্যান্য জাতির নিকট ব্রাহ্মণই প্রথম ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করেন, আর তিনিই সর্বাগ্রে জীবনের গূঢ়তম সমস্যাগুলির রহস্য উপলব্ধি করিবার জন্য সর্বত্যাগ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ যে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার অপরাধ কি? অন্য জাতিরা কেন জ্ঞান লাভ করিল না, কেন তাহাদের মতো অনুষ্ঠান করিল না? কেন তাহারা প্রথমে অলসভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ব্রাহ্মণদিগকে জয়লাভের সুযোগ দিয়াছিল?

তবে অধিকতর সুবিধা লাভ করা এক কথা, আর অসদ্ব্যবহারের জন্য ঐগুলিকে রক্ষা করা আর এক কথা। ক্ষমতা যখন অসদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তখন উহা আসুরিক ভাব ধারণ করে; কেবল সদুদ্দেশ্যে ক্ষমতার ব্যবহার করিতে হইবে। অতএব এই শত শতাব্দীর সঞ্চিত শিক্ষা ও সংস্কার—তাঁহারা এতদিন যাহার রক্ষক হইয়া আছেন, তাহা আজ সর্বসাধারণকে দিতে হইবে; তাঁহারা সর্বসাধারণকে উহা এতদিন দেন নাই বলিয়াই মুসলমান-আক্রমণ সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহারা গোড়া হইতেই সর্বসাধারণের নিকট এই ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করেন নাই—এই জন্যই সহস্র বৎসর যাবৎ যে-কেহ ইচ্ছা

১ মনুসংহিতা, ১।৯৯

করিয়াছে, সে-ই ভারতে আসিয়া আমাদিগকে পদদলিত করিয়াছে। ইহাতেই আমাদের এইরূপ অবনতি ঘটিয়াছে।

আর আমাদের সর্বপ্রথম কার্য এই যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে নিরাপদ স্থানে ধর্মরূপ অপূর্ব রত্নরাজি গোপনে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেগুলি বাহির করিয়া প্রত্যেককে দিতে হইবে এবং ব্রাহ্মণকেই এই কার্য আগে করিতে হইবে। বাঙলাদেশে একটি প্রাচীন বিশ্বাস আছে—যে গোখুরা সাপ কামড়াইয়াছে, সে যদি নিজেই নিজের বিষ উঠাইয়া লয়, তবেই রোগী বাঁচিবে। সুতরাং ব্রাহ্মণকে তাঁহার নিজের বিষ নিজেকেই উঠাইয়া লইতে হইবে।

ব্রাহ্মণেতর জাতিকে আমি বলিতেছি—অপেক্ষা কর, ব্যস্ত হইও না। সুবিধা পাইলেই ব্রাহ্মণজাতিকে আক্রমণ করিতে যাইও না। কারণ আমি তোমাদিগকে দেখাইয়াছি, তোমরা নিজেদের দোষেই কষ্ট পাইতেছ। তোমাদিগকে আধ্যাত্মিকতা অর্জন করিতে ও সংস্কৃত শিখিতে কে নিষেধ করিয়াছিল? এতদিন তোমরা কি করিতেছিলে? কেন তোমরা এতদিন উদাসীন ছিলে? আর অপরে তোমাদের চেয়ে অধিক মস্তিষ্ক, অধিক বীর্য, অধিক সাহস ও অধিক ক্রিয়াশক্তির পরিচয় দিয়াছে বলিয়া এখন বিরক্তি প্রকাশ কর কেন? সংবাদপত্রে এই-সকল বাদ-প্রতিবাদ, বিবাদ-বিসংবাদে বৃথা শক্তিক্ষয় না করিয়া, নিজগৃহে এইরূপ বিবাদে লিপ্ত না থাকিয়া সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া ব্রাহ্মণ যে-শিক্ষাবলে এত গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন, তাহা অর্জন করিবার চেষ্টা কর, তবেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তোমরা সংস্কৃত-ভাষায় পণ্ডিত হও না কেন? তোমরা ভারতের সকল বর্ণের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষা-বিস্তারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় কর না কেন? আমি তোমাদিগকে ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। যখনই এইগুলি করিবে, তখনই তোমরা ব্রাহ্মণের তুল্য হইবে। ভারতে শক্তিলাভের ইহাই রহস্য।

ভারতে সংস্কৃতভাষা ও মর্যাদা সমার্থক। সংস্কৃতভাষায় জ্ঞান লাভ হইলে কেহই তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহসী হইবে না। ইহাই একমাত্র রহস্য—এই পথ অবলম্বন কর। অদ্বৈতবাদের প্রাচীন উপমার সাহায্যে বলিতে গেলে বলিতে হয়, সমগ্র জগৎ নিজ মায়ায় নিজে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সঙ্কল্পই জগতে অমোঘ শক্তি। দৃঢ়-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষের শরীর হইতে যেন এক প্রকার তেজ নির্গত হইতে থাকে; আর তাঁহার নিজের মন ভাবের যে স্তরে অবস্থিত,

উহা অন্যের মনে ঠিক সেই স্তরের ভাব উৎপন্ন করে ; এইরূপ প্রবল-ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন পুরুষ মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। আর যখনই একজন শক্তিমান্ পুরুষের শক্তিতে অনেকের ভিতর সেই একই প্রকার ভাবের উদয় হয়, তখনই আমরা শক্তিশালী হইয়া উঠি। একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখ—চার কোটি ইংরেজ ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উপর কিরূপে প্রভুত্ব করিতেছে! সংহতিই শক্তির মূল—এ কথা বলিলে তোমরা হয়তো বলিবে, উহা তো জড়শক্তি-বলেই সাধিত হয় ; সুতরাং আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন কোথায় রহিল ? আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন আছে বইকি ! এই চার কোটি ইংরেজ তাঁহাদের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি একযোগে প্রয়োগ করিতে পারেন, এবং উহার দ্বারাই তাঁহাদের অসীম শক্তিলাভ হইয়া থাকে ; তোমাদের ত্রিশ কোটি লোকের প্রত্যেকেরই ভাব ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিতে হইলে তাহার মূল রহস্যই এই সংহতি, শক্তিসংগ্রহ, বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তির একত্র মিলন।

আর এখনই আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ঋগ্বেদ-সংহিতার সেই অপূর্ব শ্লোক প্রতিভাত হইতেছে : সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্। দেবা ভাগং যথা পূর্বে ইত্যাদি।[১]—তোমরা সকলে এক-অন্তঃকরণবিশিষ্ট হও, কারণ পূর্বকালে দেবগণ একমনা হইয়াই তাঁহাদের যজ্ঞভাগ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেবগণ একচিত্ত বলিয়াই মানবের উপাসনার যোগ্য হইয়াছেন। একচিত্ত হওয়াই সমাজগঠনের রহস্য। আর যতই তোমরা আর্য-দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ প্রভৃতি তুচ্ছ বিষয় লইয়া বিবাদে ব্যস্ত থাকিবে, ততই তোমরা ভবিষ্যৎ ভারত-গঠনের উপযোগী শক্তি-সংগ্রহ হইতে অনেক দূরে সরিয়া যাইবে। কারণ এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, ভারতের ভবিষ্যৎ ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে। এই ইচ্ছাশক্তিসমূহের একত্র সম্মিলন, এককেন্দ্রীকরণ—ইহাই রহস্য। প্রত্যেকটি চীনার মনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন, আর মুষ্টিমেয় কয়েকটি জাপানী একচিত্ত – ইহার ফল কি হইয়াছে, তাঁহা তোমরা জানো। জগতের ইতিহাসে চিরকালই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। দেখিবে, ক্ষুদ্র জাতিগুলি চিরকালই বড় বড় প্রকাণ্ড জাতিগুলির উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে, আর ইহা

১ ঋগ্বেদ, ১০।১৯১।২

খুবই স্বাভাবিক ; কারণ ক্ষুদ্র সংহত জাতিগুলির বিভিন্ন ভাব ও ইচ্ছাশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা অতি সহজ—আর তাহাতেই তাহারা সহজে উন্নত হইয়া থাকে। আর যে জাতির লোকসংখ্যা যত অধিক, তাহার পক্ষে সমবেতভাবে কার্য পরিচালনা করা তত কঠিন। উহা যেন একটা অনিয়ন্ত্রিত জনতা, তাহারা কখন একত্র মিলিতে পারে না। যাহা হউক, এই সব মত-বিরোধের ইতি করিতে হইবে।

আমাদের ভিতর আর একটি দোষ আছে। ভদ্রমহিলাগণ, আমায় ক্ষমা করিবেন, কিন্তু শত শতাব্দী দাসত্বের ফলে আমরা যেন একটা স্ত্রীলোকের জাতিতে পরিণত হইয়াছি। এদেশে বা অপর যে-কোন দেশে যাও, দেখিবে—তিনজন স্ত্রীলোক যদি পাঁচ মিনিটের জন্য একত্র হইয়াছে তো বিবাদ করিয়া বসিয়াছে! পাশ্চাত্য-দেশগুলিতে বড় বড় সভা করিয়া তাহারা নারী-জাতির ক্ষমতা ও অধিকার-ঘোষণায় আকাশ ফাটাইয়া দেয়—তারপর দুইদিন যাইতে না যাইতে পরস্পর বিবাদ করিয়া বসে, তখন কোন পুরুষ আসিয়া তাহাদের সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে থাকে। সমগ্র জগতেই এইরূপ দেখা যায়—নারীজাতিকে শাসনে রাখিতে এখনও পুরুষের প্রয়োজন! আমরা এইরূপ স্ত্রীলোকের তুল্য হইয়াছি। যদি কোন নারী আসিয়া নারীর উপর নেতৃত্ব করিতে যায়, অমনি সকলে মিলিয়া তাহার সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা করিতে থাকে, তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলে, তাহাকে দাঁড়াইতে দেয় না, জোর করিয়া বসাইয়া দেয়। কিন্তু যদি একজন পুরুষ আসিয়া তাহাদের প্রতি একটু কর্কশ ব্যবহার করে, মধ্যে মধ্যে গালমন্দ করে, তবেই তাহারা মনে করে, ঠিক হইয়াছে। তাহারা যে ঐরূপ ব্যবহারে—ঐরূপ প্রভাবে অভ্যস্ত হইয়াছে! সমগ্র জগৎই জাদুকর ও সম্মোহনকারী দ্বারা পূর্ণ—শক্তিশালী ব্যক্তি সর্বদা এইরূপে অপরকে বশীভূত করিতেছে। যদি আমাদের দেশে একজন কেহ বড় হইতে চেষ্টা করে, তোমরা সকলেই তাহাকে নামাইয়া আনিতে চেষ্টা কর, কিন্তু একজন বিদেশী আসিয়া যদি লাথি মারে, মনে কর—ঠিকই হইয়াছে। তোমরা ইহাতে অভ্যস্ত হইয়াছ। এই দাসত্বতিলক কপালে লইয়া তোমরা আবার বড় বড় নেতা হইতে চাও? অতএব দাস-মনোভাব ছাড়িয়া দাও।

আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোন

ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন ; তোমার স্বজাতি—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত ; সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন। কোন্ অকেজো দেবতার অন্বেষণে তুমি ধাবিত হইতেছ, আর তোমার সম্মুখে, তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না? যখন তুমি এই দেবতার উপাসনায় সমর্থ হইবে, তখনই অন্যান্য দেবতাকেও পূজা করিবার ক্ষমতা তোমার হইবে। তোমরা আধ মাইল পথ হাঁটিতে পার না, হনুমানের মতো সমুদ্র পার হইতে চাহিতেছ! তাহা কখনই হইতে পারে না। সকলেই যোগী হইতে চায়, সকলেই ধ্যান করিতে অগ্রসর! তাহা হইতেই পারে না। সারাদিন সংসারের সঙ্গে—কর্মকাণ্ডে মিশিয়া সন্ধ্যাবেলায় খানিকটা বসিয়া নাক টিপিলে কি হইবে? এ কি এতই সোজা ব্যাপার নাকি—তিনবার নাক টিপিয়াছ, আর অমনি ঋষিগণ উড়িয়া আসিবেন! এ কি তামাসা? এ-সব অর্থহীন বাজে কথা! আবশ্যক —চিত্তশুদ্ধি। কিরূপে এই চিত্তশুদ্ধি হইবে? প্রথম পূজা—বিরাটের পূজা ; তোমার সম্মুখে—তোমার চারিদিকে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের পূজা ; ইঁহাদের পূজা করিতে হইবে—সেবা নহে ; 'সেবা' বলিলে আমার অভিপ্রেত ভাবটি ঠিক বুঝাইবে না, 'পূজা' শব্দেই ঐ ভাবটি ঠিক প্রকাশ করা যায়। এই-সব মানুষ ও পশু—ইহারাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম উপাস্য। পরস্পরের প্রতি দ্বেষ-হিংসা পরিত্যাগ করিয়া ও পরস্পর বিবাদ না করিয়া প্রথমেই এই স্বদেশবাসিগণের পূজা করিতে হইবে। তোমরা নিজেদের ঘোর কুকর্মের ফলে কষ্ট পাইতেছ, এত কষ্টেও তোমাদের চোখ খুলিতেছে না।

বিষয় প্রকাণ্ড—কোন্খানে থামিব তাহা জানি না। সুতরাং মাদ্রাজে আমি যেভাবে কার্য করিতে চাই, দু-চার কথায় তাহা তোমাদের নিকট বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিব। আমাদিগকে সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক ও লৌকিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। এটি কি বুঝিতেছ? তোমাদিগকে উহার বিষয়ে কল্পনা করিতে হইবে, আলোচনা করিতে হইবে, উহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে, পরিশেষে উহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে। যতদিন না তাহা করিতেছ, ততদিন এ জাতির উদ্ধার নাই। তোমরা এখন যে-শিক্ষা পাইতেছ, তাহার কতকগুলি গুণ আছে বটে, কিন্তু আবার কতকগুলি বিশেষ

দোষও আছে; আর দোষগুলি এত বেশী যে, গুণভাগ নগণ্য হইয়া যায়। প্রথমতঃ ঐ শিক্ষায় মানুষ তৈরী হয় না—ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ নাস্তিভাবপূর্ণ। এইরূপ শিক্ষায় অথবা অন্য যে-কোন নেতিমূলক শিক্ষায় সব ভাঙিয়া-চুরিয়া যায়—মৃত্যু অপেক্ষাও তাহা ভয়ানক। বালক স্কুলে গিয়া প্রথম শিখিল—তাহার বাপ একটা মূর্খ, দ্বিতীয়তঃ তাহার পিতামহ একটা পাগল, তৃতীয়তঃ প্রাচীন আচার্যগণ সব ভণ্ড, আর চতুর্থতঃ শাস্ত্র সব মিথ্যা। ষোল বৎসর বয়স হইবার পূর্বেই সে একটা প্রাণহীন, মেরুদণ্ডহীন 'না'-এর সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, এইরূপ পঞ্চাশ বৎসরের শিক্ষায় ভারতের তিনটি প্রেসিডেন্সির ভিতরে মৌলিকচিন্তাযুক্ত একটি মানুষও পাওয়া যায় না। যিনি মৌলিকভাবপূর্ণ, তিনি অন্যত্র শিক্ষালাভ করিয়াছেন, এদেশে নয়; অথবা তিনি নিজেকে কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। মাথায় কতকগুলো তথ্য ঢুকানো হইল, সারাজীবন হজম হইল না—অসম্বদ্ধভাবে মাথায় ঘুরিতে লাগিল—ইহাকে শিক্ষা বলে না। বিভিন্ন ভাবকে এমনভাবে নিজের করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে আমাদের জীবন গঠিত হয়, যাহাতে মানুষ তৈরী হয়, চরিত্র গঠিত হয়। যদি তোমরা পাঁচটি ভাব হজম করিয়া জীবন ও চরিত্র ঐ ভাবে গঠিত করিতে পারো, তবে যে-ব্যক্তি একটি গ্রন্থাগারের সবগুলি পুস্তক মুখস্থ করিয়াছে, তাহার অপেক্ষা তোমার অধিক শিক্ষা হইয়াছে বলিতে হইবে। যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।'—চন্দনভারবাহী গর্দভ যেমন উহার ভারই বুঝিতে পারে, অন্যান্য গুণ বুঝিতে পারে না, ইত্যাদি।

যদি শিক্ষা বলিতে কতকগুলি বিষয় জানা মাত্র বুঝায়, তবে লাইব্রেরিগুলিই তো জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, অভিধানসমূহই তো ঋষি। সুতরাং আদর্শ হওয়া উচিত যে, আমাদের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক সর্বপ্রকার শিক্ষা নিজেদের হাতে লইতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব জাতীয়ভাবে ঐ শিক্ষা দিতে হইবে। অবশ্য ইহা একটি গুরুতর ব্যাপার—কঠিন সমস্যা। জানি না, ইহা কখন কার্যে পরিণত হইবে কি না। কিন্তু আমাদিগকে কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে।

কিভাবে আমাদের কাজ করিতে হইবে? দৃষ্টান্তস্বরূপ এই মাদ্রাজের কথাই ধর। আমাদিগকে একটি মন্দির নির্মাণ করিতে হইবে—কারণ হিন্দুগণ সকল

কাজেরই প্রথমে ধর্মকে লইয়া থাকে। তোমরা বলিতে পারো, ঐ মন্দিরে কোন্ দেবতার পূজা হইবে—এই বিষয় লইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় বিবাদ করিতে পারে। এরূপ হইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। আমরা যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার কথা বলিতেছি, উহা অসাম্প্রদায়িক হইবে, ইহাতে সকল সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ উপাস্য ওঙ্কারেরই কেবল উপাসনা হইবে। যদি কোন সম্প্রদায়ের ওঙ্কারোপাসনায় আপত্তি থাকে, তবে তাহার নিজেকে হিন্দু বলিবার কোন অধিকার নাই। যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হউক না কেন, সকলেই নিজ নিজ সম্প্রদায়গত ভাব অনুসারে ঐ ওঙ্কারের ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্তু সর্বসাধারণের উপযোগী একটি মন্দিরের প্রয়োজন। অন্যান্য স্থানে তোমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পৃথক্ পৃথক্ দেবপ্রতিমা থাকিতে পারে, কিন্তু এখানে ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিগণের সহিত বিরোধ করিও না। এখানে আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহের সাধারণ মতসমূহ শিক্ষা দেওয়া হইবে, অথচ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ঐ স্থানে আসিয়া তাঁহাদের মতসমূহ শিক্ষা দিবার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে, কেবল একটি বিষয়ে নিষেধ—অন্য সম্প্রদায়ের সহিত মতবিরোধ থাকিলে বিবাদ করিতে পারিবে না। তোমার যাহা বক্তব্য আছে বলিয়া যাও, জগৎ উহা শুনিতে চায়। কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তি-সম্বন্ধে তোমার কি মত, জগতের তাহা শুনিবার অবকাশ নাই, ওটি তোমার নিজের মনের ভিতরই থাকুক।

দ্বিতীয়তঃ এই মন্দিরের সঙ্গে শিক্ষক ও প্রচারক গঠন করিবার জন্য একটি বিদ্যালয় থাকিবে। এখান হইতে যে-সকল আচার্য শিক্ষিত হইবেন, তাঁহারা সর্বসাধারণকে ধর্ম ও অপরা বিদ্যা শিক্ষা দিবেন। আমরা এখন যেমন দ্বারে দ্বারে ধর্ম প্রচার করিতেছি, তাহাদিগকে সেইরূপ ধর্ম ও বিদ্যা উভয়ই প্রচার করিতে হইবে। আর ইহা অতি সহজেই হইতে পারে। এই-সকল আচার্য ও প্রচারকগণের চেষ্টায় যেমন কার্য বিস্তৃত হইতে থাকিবে, অমনি এইরূপ আচার্য ও প্রচারকের সংখ্যাও বাড়িতে থাকিবে, ক্রমশঃ অন্যান্য স্থানে এইরূপ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে, যতদিন না আমরা সমগ্র ভারত ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিতে পারি। ইহাই আমার প্রণালী।

ইহা অতি প্রকাণ্ড ব্যাপার বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহা প্রয়োজন। তোমরা বলিতে পারো, টাকা কোথায়? টাকার প্রয়োজন নাই; টাকায় কি

হইবে? গত বারো বৎসর যাবৎ কাল কি খাইব, তাহার ঠিক ছিল না, কিন্তু আমি জানিতাম—অর্থ এবং আমার যাহা কিছু আবশ্যক সে-সব আসিবেই আসিবে, কারণ অর্থাদি আমার দাস, আমি তো তাহাদের দাস নহি। আমি বলিতেছি নিশ্চয় আসিবে। জিজ্ঞাসা করি মানুষ কোথায়? আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে, তাহা তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি;—মানুষ কোথায়?

হে মাদ্রাজের যুবকবৃন্দ, আমার আশা তোমাদের উপর, তোমরা কি তোমাদের সমগ্র জাতির আহ্বানে সাড়া দিবে না? তোমরা যদি ভরসা করিয়া আমার কথায় বিশ্বাস কর, তবে আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের প্রত্যেকেরই ভবিষ্যৎ বড় গৌরবময়। নিজেদের উপর প্রবল বিশ্বাস রাখো, যেমন বাল্যকালে আমার ছিল। আর সেই বিশ্বাসবলেই আমি এখন এই-সকল কঠিন কার্যসাধনে সমর্থ হইতেছি। তোমরা প্রত্যেকে নিজের প্রতি এই বিশ্বাস-সম্পন্ন হও যে, অনন্ত শক্তি তোমাদের সকলের মধ্যে রহিয়াছে। তোমরা সমগ্র ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিবে। হাঁ, আমরা জগতের সকল দেশে যাইব, আর আগামী দশ বৎসরের মধ্যে যে-সকল বিভিন্ন শক্তি-সহযোগে জগতের প্রত্যেক জাতি গঠিত হইতেছে, আমাদের ভাব তাহার উপাদান-স্বরূপ হইবে। আমাদিগকে ভারতে বা ভারতের বাহিরে প্রত্যেক জাতির জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে—আর এই অবস্থা আনিবার জন্য আমাদিগকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে।

ইহার জন্য আমি চাই কয়েকটি যুবক। বেদ বলিতেছেন, 'আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠো মেধাবী'[১]—আশাপূর্ণ বলিষ্ঠ দৃঢ়চেতা ও মেধাবী যুবকগণই ঈশ্বরলাভ করিবে। তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনগতি স্থির করিবার এই সময়; যতদিন যৌবনের তেজ রহিয়াছে, যতদিন না তোমরা কর্মশ্রান্ত হইতেছ, যতদিন তোমাদের ভিতর যৌবনের নবীনতা ও সতেজ ভাব রহিয়াছে; কাজে লাগো—এই-তো সময়। কারণ নবপ্রস্ফুটিত অস্পৃষ্ট অনাঘ্রাত পুষ্পই কেবল প্রভুর পাদপদ্মে অর্পণের যোগ্য—তিনি তাহা গ্রহণ করেন। তবে ওঠ, ওকালতির চেষ্টা বা বিবাদ-বিসংবাদ প্রভৃতি করা অপেক্ষা বড় বড় কাজ রহিয়াছে। আয়ু স্বল্প, সুতরাং তোমাদের জাতির কল্যাণের জন্য—সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের

১ তৈত্তিরীয় উপ., ২।৮।১

জন্য আত্মবলিদানই তোমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম। এই জীবনে আছে কি? তোমরা হিন্দু আর তোমাদের মজ্জাগত বিশ্বাস যে, দেহের নাশে জীবনের নাশ হয় না। সময়ে সময়ে মাদ্রাজী যুবকগণ আসিয়া আমার নিকট নাস্তিকতার কথা বলিয়া থাকে। আমি বিশ্বাস করি না যে, হিন্দু কখনও নাস্তিক হইতে পারে। পাশ্চাত্য গ্রন্থাদি পড়িয়া সে মনে করিতে পারে, সে জড়বাদী হইয়াছে। কিন্তু তাহা দু-দিনের জন্য, এ-ভাব তোমাদের মজ্জাগত নহে; তোমাদের ধাতে যাহা নাই, তাহা তোমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পার না, তাহা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব চেষ্টা। ঐরূপ করিবার চেষ্টা করিও না। আমি বাল্যাবস্থায় একবার ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য হই নাই। উহা যে হইবার নয়। জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আত্মা অবিনাশী ও অনন্ত; অতএব যখন মৃত্যু নিশ্চয়, তখন এস, একটি মহান্ আদর্শ লইয়া উহাতেই সমগ্র জীবন নিয়োজিত করি। ইহাই আমাদের সঙ্কল্প হউক। সেই ভগবান্, যিনি শাস্ত্রমুখে বলিয়াছেন, 'আমি নিজ ভক্তদের পরিত্রাণের জন্য বার বার ধরাধামে আবির্ভূত হই,' সেই মহান্ কৃষ্ণ আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন এবং আমাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায় হউন।

দান-প্রসঙ্গে

মাদ্রাজে অবস্থানকালে স্বামীজী 'চেন্নাপুরী অন্নদান-সমাজম্' নামক এক দাতব্য ভাণ্ডারের সাংবৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি হন। ব্রাহ্মণজাতিকে বিশেষভাবে ভিক্ষাদান-প্রথা ঠিক নহে—পূর্ববর্তী বক্তা এই মর্মে বলিলে স্বামীজী বলেন:

এই প্রথার ভাল-মন্দ দুই দিকই আছে। ব্রাহ্মণগণই হিন্দুজাতির সমুদয় জ্ঞান ও চিন্তা-সম্পত্তির রক্ষক। যদি তাঁহাদিগকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অন্নের সংস্থান করিতে হয়, তবে তাঁহাদিগের জ্ঞানচর্চার বিশেষ ব্যাঘাত হইবে ও সমগ্র হিন্দুজাতি তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

ভারতের অবিচারিত দান ও অন্যান্য জাতির বিধিবদ্ধ দান-প্রথার তুলনা করিয়া স্বামীজী বলিলেন: ভারতের দরিদ্র মুষ্টিভিক্ষা লইয়া সন্তোষ ও শান্তিতে

জীবনযাপন করে, পাশ্চাত্যদেশের আইন দরিদ্রকে 'গরীবখানায়' (poor-house) যাইতে বাধ্য করে ; মানুষ কিন্তু খাদ্য অপেক্ষা স্বাধীনতা ভালবাসে, সুতরাং সে গরীবখানায় না গিয়া সমাজের শত্রু—চোর ডাকাত হইয়া দাঁড়ায়। ইহাদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য আবার অতিরিক্ত পুলিস ও জেল প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে সমাজকে অতিশয় বেগ পাইতে হয়। সভ্যতা নামে পরিচিত ব্যাধি যতদিন সমাজ-শরীর অধিকার করিয়া থাকিবে, ততদিন দারিদ্র্য থাকিবেই, সুতরাং দরিদ্রকে সাহায্যদানেরও আবশ্যকতা থাকিবে। এখন হয় ভারতের মতো নির্বিচারে দান করিতে হইবে, যাহার ফলে অন্ততঃ সন্ন্যাসিগণকে —তাঁহারা সকলে অকপট না হইলেও—আহার সংগ্রহ করিবার জন্য শাস্ত্রের দু-চারটা কথাও শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছে ; অথবা পাশ্চাত্যজাতির মতো বিধিবদ্ধভাবে দান করিতে হইবে, যাহার ফলে অতি ব্যয়সাধ্য দারিদ্র্য-দুঃখ-নিবারণ-প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে এবং যে-আইন ভিক্ষুককে চোর-ডাকাতে পরিণত করিয়াছে। এই দুইটি ছাড়া পথ নাই। এখন কোন্ পথ অবলম্বনীয়, একটু ভাবিলেই বুঝা যাইবে।

কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তর

১৮৯৭ খৃঃ ফেব্রুআরির শেষ সপ্তাহে মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় পৌঁছিলে স্বামীজী বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হন। ২৬শে ফেব্রুআরি শোভাবাজার রাজবাটীতে কলিকাতাবাসিগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে এক অভিনন্দন-পত্র প্রদত্ত হয়। সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী বলেন :

মানুষ নিজের মুক্তির চেষ্টায় জগৎপ্রপঞ্চের সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ করিতে চায়, মানুষ নিজ আত্মীয় স্বজন স্ত্রী-পুত্র বন্ধু-বান্ধবের মায়া কাটাইয়া সংসার হইতে দূরে—অতি দূরে পলাইয়া যায় ; চেষ্টা করে দেহগত সকল সম্বন্ধ—পুরাতন সকল সংস্কার ত্যাগ করিতে, এমন কি সে নিজে যে সার্ধ-ত্রিহস্ত-পরিমিত দেহধারী মানুষ, ইহাও ভুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে ; কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে সর্বদাই সে একটি মৃদু অস্ফুট ধ্বনি শুনিতে পায়, তাহার কর্ণে একটি সুর সর্বদা

বাজিতে থাকে, কে যেন দিবারাত্র তাহার কানে কানে মৃদু স্বরে বলিতে থাকে, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' হে ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানীর[1] অধিবাসিগণ! তোমাদের নিকট আমি সন্ন্যাসিভাবে উপস্থিত হই নাই, ধর্ম-প্রচারকরূপেও নহে, কিন্তু পূর্বের মতো সেই কলিকাতার বালকরূপে তোমাদের সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছি। হে ভ্রাতৃগণ! আমার ইচ্ছা হয়, এই নগরীর রাজপথের ধূলির উপর বসিয়া বালকের মতো সরলপ্রাণে তোমাদিগকে আমার মনের কথা সব খুলিয়া বলি। অতএব তোমরা যে আমাকে 'ভাই' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ, সেজন্য তোমাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। হাঁ, আমি তোমাদের ভাই, তোমরাও আমার ভাই। পাশ্চাত্যদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে একজন ইংরেজ বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'স্বামীজী, চার বৎসর বিলাসের লীলাভূমি, গৌরবের মুকুটধারী মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণের পর মাতৃভূমি আপনার কেমন লাগিবে?' আমি বলিলাম, পাশ্চাত্যভূমিতে আসিবার পূর্বে ভারতকে আমি ভালবাসিতাম, এখন ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার নিকট পবিত্র, ভারতের বায়ু আমার নিকট এখন পবিত্রতা-মাখা, ভারত আমার নিকট এখন তীর্থস্বরূপ। ইহা ব্যতীত আর কোন উত্তর আমার মনে আসিল না।

হে কলিকাতাবাসী আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছ, সেজন্য তোমাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসাধ্য। অথবা তোমাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়াই বাহুল্যমাত্র, কেন না তোমরা আমার ভাই, যথার্থ ভ্রাতার কাজই করিয়াছ—অহো! হিন্দুভ্রাতারই কাজ। কারণ এরূপ পারিবারিক বন্ধন, এরূপ সম্পর্ক, এরূপ ভালবাসা আমাদের মাতৃভূমির চতুঃসীমার বাহিরে আর কোথাও নাই।

এই চিকাগো ধর্মমহাসভা একটি বিরাট ব্যাপার হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের বহু নগর হইতে আমরা এই সভার উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ দিয়াছি। তাহারা আমাদের প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশের জন্য ধন্যবাদার্হও বটে। কিন্তু এই ধর্ম-মহাসভার যথার্থ ইতিহাস যদি জানিতে চাও, যথার্থ উদ্দেশ্য যদি জানিতে চাও, তবে আমার নিকট শোন। তাহাদের ইচ্ছা ছিল নিজেদের প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠা।

---

১ কলিকাতা তখন ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল।

সেখানকার অধিকাংশ লোকের ইচ্ছা ছিল খ্রীষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য ধর্মগুলিকে হাস্যাস্পদ করা। কার্যতঃ ফল তাহাদের ইচ্ছানুরূপ না হইয়া অন্যরূপ হইয়াছিল। বিধির বিধানে আর কিছু হইবার উপায়ই ছিল না। অনেকেই সদয় ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাদিগকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে। আসল কথা এই—আমার আমেরিকা-যাত্রা ধর্ম-মহাসভার জন্য নয়। এই সভার দ্বারা আমাদের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে, কাজেরও সুবিধা হইয়াছে বটে। সেইজন্য আমরাও উক্ত মহাসভার সভ্যগণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু ঠিক ঠিক বলিতে গেলে আমাদের ধন্যবাদ যুক্তরাষ্ট্রনিবাসী সহৃদয় অতিথিবৎসল উন্নত মার্কিনজাতির প্রাপ্য—যাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব অপর জাতি অপেক্ষা বিশেষরূপে বিকশিত হইয়াছে। কোন মার্কিনের সহিত ট্রেনে পাঁচ মিনিটের জন্য আলাপ হইলেই তিনি তোমার বন্ধু হইবেন এবং অতিথিরূপে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া প্রাণের কথা খুলিয়া বলিবেন। ইহাই মার্কিন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—ইহাই তাঁহাদের পরিচয়। তাঁহাদের ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের কর্ম নয়। আমার প্রতি তাঁহাদের সহৃদয়তা বর্ণনাতীত, আমার প্রতি তাঁহারা যে অপূর্ব সদয় ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিতে আমার বহু বৎসর লাগিবে।

কিন্তু শুধু মার্কিনগণকে ধন্যবাদ দিলেই চলিবে না; তাঁহারা যতদূর ধন্যবাদার্হ, আটলান্টিকের অপরপারে সেই ইংরেজজাতিকেও আমাদের সেরূপ বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। ইংরেজজাতির প্রতি আমা অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণা পোষণ করিয়া কেহই কখন ইংলণ্ডে পদার্পণ করে নাই; এই সভামঞ্চে যে-সকল ইংরেজ বন্ধু রহিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার সাক্ষ্য দিবেন। কিন্তু যত আমি তাঁহাদের সহিত একত্র বাস করিতে লাগিলাম, যতই তাঁহাদের সহিত মিশিতে লাগিলাম, যতই দেখিতে লাগিলাম ব্রিটিশজাতির জীবনযন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে, যতই ঐ জাতির হৃৎস্পন্দন কোথায় হইতেছে বুঝিতে লাগিলাম, ততই তাহাদিগকে ভালবাসিতে লাগিলাম। আর হে ভ্রাতৃগণ, এখানে এমন কেহই উপস্থিত নাই, যিনি ইংরেজ জাতিকে এখন আমা অপেক্ষা বেশী ভালবাসেন। তাঁহাদের বিষয় ঠিক ঠিক জানিতে হইলে সেখানে কি কি ব্যাপার ঘটিতেছে, দেখিতে হইবে এবং তাঁহাদের সহিত মিশিতে হইবে। আমাদের জাতীয় দর্শনশাস্ত্র বেদান্ত যেমন সমুদয় দুঃখই অজ্ঞানপ্রসূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেইরূপ ইংরেজ ও আমাদের মধ্যে বিরোধভাবও

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজ্ঞানজনিত বলিয়া জানিতে হইবে। আমরা তাহাদের জানি না, তাহারাও আমাদের জানে না।

দুর্ভাগ্যক্রমে পাশ্চাত্যদেশবাসিগণের ধারণা এই যে, আধ্যাত্মিকতা—এমন কি চরিত্র-নীতি পর্যন্ত সাংসারিক উন্নতির সঙ্গে চিরসংশ্লিষ্ট। আর যখনই কোন ইংরেজ বা অপর কোন পাশ্চাত্যদেশবাসী ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন এবং দেখিতে পান—এখানে দুঃখ-দারিদ্র্য অপ্রতিহতভাবে রাজত্ব করিতেছে, অমনি তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে, এ দেশে ধর্মের কি কথা, নীতি পর্যন্ত থাকিতে পারে না। তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা সত্য। ইওরোপের শীতপ্রধান জলবায়ু-বশতঃ এবং অন্যান্য নানা কারণে সেখানে দারিদ্র্য ও পাপ একত্র অবস্থান করে—দেখা যায়, ভারতবর্ষে কিন্তু তাহা নহে। আমার অভিজ্ঞতা এই, ভারতবর্ষে যে যত দরিদ্র, সে তত বেশী সাধু, কিন্তু ইহা ঠিক ঠিক উপলব্ধি করা সময়সাপেক্ষ। আর ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের এই গুপ্ত রহস্য বুঝিবার জন্য দীর্ঘকাল ভারতে বাস করিয়া সময় নষ্ট করিতে কয়জন বিদেশী প্রস্তুত আছেন? এই জাতির চরিত্র ধৈর্যসহকারে অধ্যয়ন ও উপলব্ধি করিবার লোক অল্পই আছেন। এখানে—কেবল এখানেই এমন এক জাতির বাস, যাহাদের নিকট দারিদ্র্য বলিলে পাপ বুঝায় না; কেবল তাহাই নহে, দারিদ্র্যকে এখানে অতি উচ্চাসন দেওয়া হয়। এখানে দরিদ্র সন্ন্যাসীর বেশই শ্রেষ্ঠ সম্মান পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আমাদিগকেও পাশ্চাত্য সমাজের রীতিনীতি অতি ধৈর্যসহকারে পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে। তাঁহাদের সম্বন্ধে হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলে চলিবে না। তাঁহাদের স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা এবং অন্যান্য আচার-ব্যবহার সবগুলিরই অর্থ আছে, সবগুলিরই ভাল দিক আছে, কেবল তোমাদিগকে যত্নপূর্বক ধৈর্য-সহকারে ঐগুলি আলোচনা করিতে হইবে। আমার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, আমরা তাঁহাদের আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করিব বা তাঁহারা আমাদের অনুকরণ করিবেন; সকল দেশেরই আচার-ব্যবহার শত শতাব্দীর অতি মৃদুগতি ক্রমবিকাশের ফলস্বরূপ এবং সবগুলির গভীর অর্থ আছে। সুতরাং আমরাও যেন তাঁহাদের আচার-ব্যবহারগুলি উপহাস না করি, তাঁহারাও যেন আমাদের আচারগুলি উপহাস না করেন।

আমি এই সভায় আর একটি কথা বলিতে চাই। আমার মতে আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডে আমার প্রচারকার্য অধিকতর সন্তোষজনক হইয়াছে। অকুতোভয়

দৃঢ় অধ্যবসায়শীল ইংরেজজাতির মস্তিষ্কে কোন ভাব যদি একবার প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়—তাঁহার মস্তিষ্কের খুলি যদিও অন্য জাতি অপেক্ষা স্থূলতর, সহজে কোন ভাব ঢুকিতে চায় না, কিন্তু যদি অধ্যবসায় সহকারে তাঁহাদের মস্তিষ্কে কোন ভাব প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়—উহা তাঁহাদের মস্তিষ্কে থাকিয়াই যায়, কখনও বাহির হয় না, আর ঐ জাতির অসীম কার্যকরী শক্তিবলে বীজভূত সেই ভাব হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইয়া অবিলম্বে ফল প্রসব করে'; অন্য কোন দেশে সেরূপ নহে। এই জাতির যেমন অপরিসীম কার্যকরী শক্তি, এই জাতির যেমন অনন্ত জীবনীশক্তি, অপর কোন জাতির মধ্যে সেরূপ দেখিতে পাইবে না। এই জাতির কল্পনাশক্তি অল্প, কার্যকরী শক্তি অগাধ। আর এই ইংরেজ-হৃদয়ের মূল উৎস কোথায়, তাহা কে জানে? তাহার হৃদয়ের গভীরে যে কত কল্পনা ও ভাবোচ্ছ্বাস লুক্কায়িত, তাহা কে বুঝিতে পারে? ইংরেজ বীরের জাতি, প্রকৃত ক্ষত্রিয়, তাঁহাদের শিক্ষাই ভাব গোপন করা; ভাব কখন না দেখানো—বাল্যকাল হইতেই তাঁহারা এই শিক্ষা পাইয়াছেন। দেখিবেন, খুব কম ইংরেজ এরূপ কখন নিজ হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন; পুরুষের কথা কেন, ইংরেজ নারীও কখন হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করেন না। আমি ইংরেজ নারীকে এমন কাজ করিতে দেখিয়াছি, যাহা করিতে অতি সাহসী বাঙালীও পশ্চাৎপদ হইবে। কিন্তু এই বীরত্বের পিছনে এই ক্ষত্রসুলভ কঠিনতার অন্তরালে ইংরেজ হৃদয়ের ভাব-ধারার গভীর উৎস লুক্কায়িত। যদি আপনি একবার সেখানে পৌঁছিতে পারেন, যদি ইংরেজের সহিত আপনার একবার ঘনিষ্ঠতা হয়, যদি তাঁহার সহিত মেশেন, যদি একবার আপনার নিকট তাঁহাকে তাঁহার হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করাইতে পারেন, তবে তিনি আপনার চিরবন্ধু, তবে তিনি আপনার চিরদাস। এই জন্য আমার মতে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ইংলণ্ডে আমার প্রচারকার্য অধিকতর সন্তোষজনক হইয়াছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কাল যদি আমার দেহত্যাগ হয়, ইংলণ্ডে আমার প্রচারকার্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকিবে।

ভ্রাতৃগণ! তোমরা আমার হৃদয়ের আর একটি তন্ত্রীতে—গভীরতম তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছ, আমার গুরুদেব, আমার আচার্য, আমার জীবনের আদর্শ, আমার ইষ্ট, আমার প্রাণের দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম উল্লেখ করিয়া। যদি কায়মনোবাক্যে আমি কোন সৎকার্য করিয়া থাকি, যদি আমার

মুখ হইতে এমন কোন কথা বাহির হইয়া থাকে, যাহা দ্বারা জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোন গৌরব নাই, তাহা তাঁহারই। কিন্তু যদি আমার জিহ্বা কখন অভিশাপ বর্ষণ করিয়া থাকে, যদি আমার মুখ হইতে কখন কাহারও প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহা আমার, তাঁহার নহে। যাহা কিছু দুর্বল, যাহা কিছু দোষযুক্ত সবই আমার। যাহা কিছু জীবনপ্রদ, যাহা কিছু বলপ্রদ, যাহা কিছু পবিত্র, সকলই তাঁহার প্রেরণা, তাঁহারই বাণী এবং তিনি স্বয়ং। সত্যই বন্ধুগণ, জগৎ এখনও সেই মহামানবকে জানিতে পারে নাই। আমরা জগতের ইতিহাসে শত শত মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিতেছি। এখন আমরা যে-আকারে সেই-সকল জীবনী পাই, সেগুলিতে শত শতাব্দী যাবৎ শিষ্যপ্রশিষ্যগণের পরিবর্তন-পরিবর্ধনরূপ লেখনী-চালনার পরিচয় পাওয়া যায়। সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ প্রাচীন মহাপুরুষগণের জীবন-চরিতগুলি ঘষিয়া-মাজিয়া কাটিয়া-ছাটিয়া মসৃণ করা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি যে-জীবন আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যাঁহার ছায়ায় আমি বাস করিয়াছি, যাঁহার পদতলে বসিয়া আমি সব শিখিয়াছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন যেমন উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত, আমার মতে আর কোন মহাপুরুষের জীবন তেমন নহে।

বন্ধুগণ! তোমাদের সকলেরই ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত গীতার সেই প্রসিদ্ধ বাণী জানা আছে:

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

—যখনই যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি শরীরধারণ করি। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টের দমন ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।

এই সঙ্গে আর একটি কথা তোমাদিগকে বুঝিতে হইবে, বিষয়টি এখনও আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। এইরূপ একটি ধর্মের প্রবল বন্যা আসিবার পূর্বে সমাজের সর্বত্র ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ-পরম্পরার আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একটি তরঙ্গ—প্রথমে যাহার অস্তিত্বই হয়তো কাহারও

চক্ষে পড়ে নাই, যাহাকে কেহ ভাল করিয়া দেখে নাই, যাহার গূঢ় শক্তিসম্বন্ধে কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই,—সেটিই ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে এবং অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিকে যেন গ্রাস করিয়া নিজ অঙ্গে মিলাইয়া লয়। এইরূপে বিপুল ও প্রবল হইয়া উহা মহাবন্যায় পরিণত হয় এবং সমাজের উপর এরূপ বেগে পতিত হয় যে, কেহ উহার গতিরোধ করিতে পারে না। এরূপ ব্যাপারই এক্ষণে ঘটিতেছে। যদি তোমাদের চক্ষু থাকে তবেই দেখিবে, যদি তোমাদের হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত থাকে তবেই উহা গ্রহণ করিবে, যদি সত্যানুসন্ধিৎসু হও তবেই উহার সন্ধান পাইবে।

অন্ধ—সে অতি অন্ধ, যে সময়ের সঙ্কেত দেখিতেছে না, বুঝিতেছে না; দেখিতেছে না, সুদূরগ্রামজাত দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতামাতার এই সন্তান এখন সেই-সকল দেশে সত্য সত্যই পূজিত হইতেছেন, যে-সকল দেশের লোকেরা শত শতাব্দী যাবৎ পৌত্তলিক উপাসনার বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া আসিতেছে। ইহা কাহার শক্তি? ইহা কি তোমাদের শক্তি না আমার? না, ইহা আর কাহারও শক্তি নহে; যে-শক্তি এখানে—রামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, এ সেই শক্তি। কারণ তুমি আমি, সাধু মহাপুরুষ, এমন কি অবতারগণ—সকলেই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই শক্তির বিকাশমাত্র; সেই শক্তি কোথাও বা কম, কোথাও বা বেশী ঘনীভূত, পুঞ্জীকৃত। এখন আমরা সেই মহাশক্তির খেলার আরম্ভমাত্র দেখিতেছি। আর বর্তমান যুগের অবসান হইবার পূর্বেই তোমরা ইহার আশ্চর্য—অতি আশ্চর্য খেলা প্রত্যক্ষ করিবে। ভারতবর্ষের পুনরুত্থানের জন্য এই শক্তির বিকাশ ঠিক সময়েই হইয়াছে। যে প্রাণশক্তি ভারতকে সর্বদা সঞ্জীবিত রাখিবে, তাহার কথা সময়ে সময়ে আমরা ভুলিয়া যাই।

প্রত্যেক জাতিরই উদ্দেশ্য-সাধনের ভিন্ন ভিন্ন কার্যপ্রণালী আছে। কেহ রাজনীতি, কেহ সমাজসংস্কার, কেহ বা অপর কিছুকে প্রধান উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া কাজ করিতেছে। আমাদিগের পক্ষে ধর্মের মধ্য দিয়া ছাড়া কাজ করিবার অন্য উপায় নাই। ইংরেজ রাজনীতির মাধ্যমে ধর্ম বোঝে; বোধ হয় সমাজ-সংস্কারের সাহায্যে মার্কিন সহজে ধর্ম বুঝিতে পারে; কিন্তু হিন্দু রাজনীতি, সমাজসংস্কার ও অন্যান্য যাহা কিছু—সবই ধর্মের ভিতর দিয়া ছাড়া বুঝিতে পারে না। জাতীয় জীবন-সঙ্গীতের এইটিই যেন প্রধান সুর, অন্যগুলি

যেন তাহারই একটু বৈচিত্র্য মাত্র। আর ঐটিই নষ্ট হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল। আমরা যেন আমাদের জাতীয় জীবনের এই মূল ভাবটিকে সরাইয়া উহার স্থানে অন্য একটি ভাব স্থাপন করিতে যাইতেছিলাম, যে-মেরুদণ্ডের বলে আমরা দণ্ডায়মান, আমরা যেন তাহার পরিবর্তে অপর একটি মেরুদণ্ড স্থাপন করিতে যাইতেছিলাম, আমাদের জাতীয় জীবনের ধর্মরূপ মেরুদণ্ডের স্থানে আমরা রাজনীতিরূপ মেরুদণ্ড স্থাপন করিতে যাইতেছিলাম। যদি আমরা ইহাতে কৃতকার্য হইতাম, তবে আমাদের সমূলে বিনাশ হইত। কিন্তু তাহা তো হইবার নয়। তাই এই মহাশক্তির প্রকাশ হইয়াছিল। এই মহাপুরুষকে যেভাবেই লও, তাহা আমি গ্রাহ্য করি না! তাঁহাকে কতটা ভক্তিশ্রদ্ধা কর, তাহাতেও কিছু আসে যায় না, কিন্তু আমি জোর করিয়া বলিতেছি, কয়েক শতাব্দী যাবৎ ভারতে এরূপ অদ্ভুত মহাশক্তির বিকাশ আর কখন হয় নাই। আর তোমরা যখন হিন্দু, তখন এই শক্তির দ্বারা শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র মানবজাতির উন্নতি ও মঙ্গল কিরূপে সাধিত হইতেছে, ইহা জানিবার জন্য এই শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ইহাকে বুঝিবার চেষ্টা করা তোমাদের কর্তব্য। অহো, জগতের কোন দেশে সার্বভৌম ধর্ম এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের প্রসঙ্গ আলোচিত হইবার অনেক পূর্বেই এই নগরীর সন্নিকটে এমন একব্যক্তি বাস করিতেন, যাঁহার সমস্ত জীবনটাই একটি ধর্মমহাসভা-স্বরূপ ছিল।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের শাস্ত্র নির্গুণ ব্রহ্মকেই আমাদের চরম লক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আর ঈশ্বরেচ্ছায় সকলেই যদি সেই নির্গুণ ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন, তবে বড়ই ভাল হইত; কিন্তু তাহা যখন হইবার নয়, তখন আমাদের মনুষ্যজাতির অনেকেরই পক্ষে একটি সগুণ আদর্শ না থাকিলে একেবারেই চলিবে না। এইরূপ কোন মহান্ আদর্শ পুরুষের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়া তাঁহার পতাকাতলে দণ্ডায়মান না হইয়া কোন জাতিই উঠিতে পারে না, কোন জাতিই বড় হইতে পারে না, এমন কি কোন কাজই করিতে পারে না। রাজনীতিক, এমন কি সামাজিক বা বাণিজ্য-জগতেরও কোন আদর্শ পুরুষ কখন ভারতে সর্বসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না। আমরা চাই আধ্যাত্মিক আদর্শ। উচ্চ অধ্যাত্মসম্পদের অধিকারী মহাপুরুষগণের নামে আমরা সম্মিলিত হইতে চাই—সকলে মাতিতে চাই। ধর্মবীর না হইলে আমরা তাঁহাকে আদর্শ করিতে

পারি না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মধ্যে আমরা এমন এক ধর্মবীর—এমন একটি আদর্শ পাইয়াছি। যদি এই জাতি উঠিতে চায়, তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি—এই নামে সকলকে মাতিতে হইবে। রামকৃষ্ণ পরমহংসকে আমি বা অপর যে-কেহ প্রচার করুক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমি তোমাদের নিকট এই মহান্ আদর্শ পুরুষকে স্থাপন করিলাম। এখন বিচারের ভার তোমাদের উপর। এই মহান্ আদর্শ পুরুষকে লইয়া কি করিবে, আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য তোমাদের এখনই তাহা স্থির করা উচিত। একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক—তোমরা যত মহাপুরুষকে দেখিয়াছ, অথবা স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি, যত মহাপুরুষের জীবনচরিত পাঠ করিয়াছ, তন্মধ্যে ইঁহার জীবন পবিত্রতম। আর ইহা তো স্পষ্টই দেখিতেছ যে, এরূপ অত্যদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের কথা তোমরা তো কখন পাঠও কর নাই, দেখিবার আশা তো দূরের কথা। তাঁহার তিরোভাবের পর দশ বৎসর যাইতে না যাইতে এই শক্তি জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, তাহা তো তোমরা প্রত্যক্ষই দেখিতেছ।

এই কারণে আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য, আমাদের ধর্মের উন্নতির জন্য কর্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া আমি এই মহান্ আধ্যাত্মিক আদর্শ তোমাদের সম্মুখে স্থাপন করিতেছি। আমাকে দেখিয়া তাঁহার বিচার করিও না। আমি অতি ক্ষুদ্র যন্ত্রমাত্র, আমাকে দেখিয়া তাঁহার চরিত্রের বিচার করিও না। তাঁহার চরিত্র এত উন্নত ছিল যে, আমি অথবা তাঁহার অপর কোন শিষ্য যদি শত শত জীবনব্যাপী চেষ্টা করি, তথাপি তিনি যথার্থ যাহা ছিলেন, তাহার কোটি ভাগের এক ভাগেরও তুল্য হইতে পারিব না। তোমরাই বিচার কর, তোমাদের অন্তরের অন্তস্তলে যিনি সনাতন সাক্ষিস্বরূপ বর্তমান আছেন, আর আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করিতেছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাদের জাতির কল্যাণের জন্য, আমাদের দেশের উন্নতির জন্য, সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্য তোমাদের হৃদয় খুলিয়া দিন; আর আমরা কিছু করি বা না করি, যে মহাযুগান্তর অবশ্যম্ভাবী তাহার সহায়তার জন্য তোমাদিগকে অকপট ও দৃঢ়ব্রত করুন। তোমার আমার ভাল লাগুক বা নাই লাগুক, সে-জন্য প্রভুর কাজ আটকাইয়া থাকে না। তিনি সামান্য ধূলি হইতেও তাঁহার কাজের জন্য শত সহস্র কর্মী সৃষ্টি করিতে পারেন। তাঁহার অধীনে থাকিয়া কাজ করা তো আমাদের পক্ষে সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয়।

এইরূপে ভাব চারিদিকে ছড়াইতে থাকে। তোমরা বলিয়াছ, আমাদিগকে সমগ্র জগৎ জয় করিতে হইবে। হাঁ, আমাদিগকে তাহা করিতেই হইবে; ভারতকে অবশ্যই পৃথিবী জয় করিতে হইবে—ইহা অপেক্ষা নিম্নতর আদর্শে আমি কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারি না। আদর্শটি হয়তো খুব বড় হইতে পারে, তোমাদের অনেকের এ-কথা শুনিয়া আশ্চর্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু তথাপি ইহাই আমাদিগকে আদর্শ করিতে হইবে। আমাদিগকে হয় সমগ্র জগৎ জয় করিতে হইবে, নতুবা মরিতে হইবে; ইহা ছাড়া আর কোন পথ নাই। বিস্তৃতিই জীবনের চিহ্ন। আমাদিগকে ক্ষুদ্র গণ্ডির বাহিরে যাইতে হইবে, হৃদয়ের প্রসার করিতে হইবে; আমাদের যে জীবন আছে, তাহা দেখাইতে হইবে; নতুবা আমরা অতি হীন অবস্থায় পচিয়া মরিব, আর অন্য উপায় নাই। দুয়ের মধ্যে একটা কর—হয় বাঁচো, না হয় মর।

সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া আমাদের দেশে কলহের কথা কাহারও অবিদিত নাই; কিন্তু আমার কথা শোন, ইহা সব দেশেই আছে। রাজনীতি যে-সকল জাতির জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, সেই-সকল জাতি আত্মরক্ষার জন্য বৈদেশিক নীতি (Foreign Policy) অবলম্বন করিয়া থাকে। যখন তাহাদের নিজ দেশে পরস্পরের মধ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়, তখন তাহারা কোন বৈদেশিক জাতির সহিত বিবাদের সূচনা করে, অমনি গৃহবিবাদ থামিয়া যায়। আমাদের গৃহবিবাদ আছে, কিন্তু উহা থামাইবার কোন বৈদেশিক নীতি নাই। জগতের সমুগ্রজাতির মধ্যে আমাদের শাস্ত্রে নিবদ্ধ সত্যসমূহের প্রচারই আমাদের সনাতন বৈদেশিক নীতি হউক। ইহা যে আমাদিগকে একটি অখণ্ড জাতিরূপে মিলিত করিবে, তাহার কি অন্য কোন প্রমাণ চাও? তোমাদের মধ্যে যাহারা রাজনীতি-ঘেঁষা, তাহাদিগকেই আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। অদ্যকার সভাই যে এ-বিষয়ের চূড়ান্ত প্রমাণ।

দ্বিতীয়তঃ এই-সব স্বার্থের বিচার ছাড়িয়া দিলেও আমাদের পিছনে নিঃস্বার্থ মহান্ জীবন্ত দৃষ্টান্তসকল রহিয়াছে। ভারতের পতন ও দুঃখ-দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, ভারত নিজ কার্যক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিয়াছিল, শামুকের মতো দরজায় খিল দিয়া বসিয়াছিল, আর্যেতর অন্যান্য সত্যপিপাসু জাতির নিকট নিজ রত্নভাণ্ডার—জীবনপ্রদ সত্যরত্নের ভাণ্ডার—উন্মুক্ত করে নাই। আমাদের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, আমরা বাহিরে যাইয়া অপর জাতির

সহিত নিজেদের তুলনা করি নাই; আপনারা সকলেই জানেন, যে-দিন হইতে রাজা রামমোহন রায় এই সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভাঙিলেন, সেই দিন হইতেই ভারতের সর্বত্র আজ যে-একটু স্পন্দন, একটু জীবন অনুভূত হইতেছে, তাহার আরম্ভ হইয়াছে। সেইদিন হইতেই ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছে এবং ভারত এখন ক্রমবর্ধমান গতিতে উন্নতির পথে চলিয়াছে। অতীত কালে যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী দেখা গিয়া থাকে, তবে জানিবেন—এখন মহা বন্যা আসিতেছে, আর কেহই উহার গতিরোধ করিতে পারিবে না। অতএব আমাদিগকে বিদেশে যাইতে হইবে।

আর আদান-প্রদানই অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র। আমরা কি চিরকালই পাশ্চাত্যের পদতলে বসিয়া সব জিনিস, এমন কি ধর্ম পর্যন্ত শিখিব? অবশ্য তাহাদের নিকট আমরা কলকব্জা শিখিতে পারি, আরও অন্যান্য অনেক জিনিস শিখিতে পারি, কিন্তু আমাদেরও তাহাদিগকে কিছু শিখাইতে হইবে। আমরা তাহাদিগকে আমাদের ধর্ম, আমাদের গভীর আধ্যাত্মিকতা শিখাইব। জগৎ পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার অপেক্ষায় রহিয়াছে। পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে ভারত যে ধর্মরূপ অমূল্য রত্ন পাইয়াছে, তাহার দিকে জগৎ সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে। হিন্দুজাতি শত শতাব্দীর অবনতি ও দুঃখ-দুর্বিপাকের মধ্যেও যে আধ্যাত্মিকতা সযত্নে হৃদয়ে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, জগৎ সেই রত্নের আশায় সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিয়াছে।

তোমাদের পূর্বপুরুষগণের সেই অপূর্ব রত্নরাজির জন্য ভারতের বাহিরের লোকেরা কতখানি উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে, তাহা তোমরা কি বুঝিবে? আমরা এখানে অনর্গল বাক্যব্যয় করিতেছি, পরস্পর বিবাদ করিতেছি, যাহা কিছু গভীর শ্রদ্ধার বস্তু সব হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছি—এখন এই হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াটা একটা জাতীয় পাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষগণ এই ভারতে যে অমৃত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার এক বিন্দু পান করিবার জন্য ভারতের বাহিরের লক্ষ লক্ষ নরনারী কতটা আগ্রহের সহিত হাত বাড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা আমরা কিরূপে বুঝিব? অতএব আমাদিগকে ভারতের বাহিরে যাইতে হইবে। আমাদের আধ্যাত্মিকতার বিনিময়ে তাহারা যাহা কিছু দিতে পারে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। অধ্যাত্ম জগতের অপূর্ব তত্ত্বসমূহের বিনিময়ে আমরা জড়রাজ্যের অদ্ভুত আবিষ্কারগুলি শিক্ষা করিব।

চিরকাল শিষ্য থাকিলে চলিবে না, আমাদিগকে গুরুও হইতে হইবে। সমভাবাপন্ন না হইলে কখনও বন্ধুত্ব হয় না; আর যখন একদল লোক সর্বদাই আচার্যের আসন গ্রহণ করে এবং অপর দল সর্বদাই তাহাদের পদতলে বসিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়, তখন উভয়ের মধ্যে কখনও সমভাব আসিতে পারে না। যদি ইংরেজ বা মার্কিনদের সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাদিগকে উহাদের নিকট যেমন শিখিতে হইবে, তেমনি তাহাদিগকে শিখাইতেও হইবে। আর এখনও শত শতাব্দী যাবৎ জগৎকে শিখাইবার জিনিস তোমাদের যথেষ্ট আছে। এখন তাহাই করিতে হইবে।

হৃদয়ে উৎসাহাগ্নি জ্বালিতে হইবে। লোকে বলিয়া থাকে, বাঙালী জাতির কল্পনাশক্তি অতি প্রখর, আমি উহা বিশ্বাস করি। আমাদিগকে লোকে কল্পনাপ্রিয় ভাবুক জাতি বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। কিন্তু বন্ধুগণ! আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ইহা উপহাসের বিষয় নয়, কারণ প্রবল উচ্ছ্বাসেই হৃদয়ে তত্ত্বালোকের স্ফুরণ হয়। বুদ্ধিবৃত্তি—বিচারশক্তি খুব ভাল জিনিস, কিন্তু এগুলি বেশী দূর যাইতে পারে না। ভাবের মধ্য দিয়াই গভীরতম রহস্যসমূহ উদ্‌ঘাটিত হয়। অতএব বাঙালীর দ্বারাই—ভাবুক বাঙালীর দ্বারাই—ঐ কার্য সাধিত হইবে। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'—উঠ, জাগো, যতদিন না অভীপ্সিত বস্তু লাভ করিতেছ, ততদিন ক্রমাগত সেই উদ্দেশ্যে চলিতে থাকো, ক্ষান্ত হইও না।

কলিকাতাবাসী যুবকগণ, উঠ—জাগো, কারণ শুভ মুহূর্ত আসিয়াছে। এখন আমাদের সকল বিষয়ে সুবিধা হইয়া আসিতেছে। সাহস অবলম্বন কর, ভয় পাইও না, কেবল আমাদের শাস্ত্রেই ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া 'অভীঃ' এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদিগকে 'অভীঃ'—নির্ভীক হইতে হইবে, তবেই আমরা কার্যে সিদ্ধিলাভ করিব। উঠ—জাগো, কারণ তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করিতেছেন। যুবকগণের দ্বারা এই কার্য সাধিত হইবে। 'আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী' যুবকদের দ্বারাই এই কার্য সাধিত হইবে। আর কলিকাতায় এইরূপ শত সহস্র যুবক রহিয়াছে। তোমরা বলিয়াছ, আমি কিছু কাজ করিয়াছি। যদি তাহাই হয়, তবে ইহাও স্মরণ রাখিও যে, আমিও এক সময় অতি নগণ্য বালকমাত্র ছিলাম—আমিও এক সময় এই কলিকাতার রাস্তায় তোমাদের মতো খেলিয়া বেড়াইতাম। যদি আমি এতখানি করিয়া থাকি, তবে

তোমরা আমা অপেক্ষা কত অধিক কাজ করিতে পারো। উঠ—জাগো, জগৎ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। ভারতের অন্যান্য স্থানে বুদ্ধিবল আছে, ধনবল আছে, কিন্তু কেবল আমার মাতৃভূমিতেই উৎসাহাগ্নি বিদ্যমান। এই উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত কবিতে হইবে; অতএব হে কলিকাতাবাসী যুবকগণ! হৃদয়ে এই উৎসাহের আগুন জ্বালিয়া জাগরিত হও।

ভাবিও না তোমরা দরিদ্র, ভাবিও না তোমরা বন্ধুহীন; কে কোথায় দেখিয়াছ—টাকায় মানুষ করিয়াছে? মানুষই চিরকাল টাকা করিয়া থাকে। জগতের যাহা কিছু উন্নতি, সব মানুষের শক্তিতে হইয়াছে, উৎসাহের শক্তিতে হইয়াছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হইয়াছে। তোমাদের মধ্যে যাহারা উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে মনোরম কঠোপনিষৎ পাঠ করিয়াছ, তাহাদের অবশ্যই স্মরণ আছে: এক রাজর্ষি এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ভাল ভাল জিনিস দক্ষিণা না দিয়া অতি বৃদ্ধ, কার্যের অনুপযুক্ত কতকগুলি গাভী দক্ষিণা দিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার পুত্র নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধা প্রবেশ করিল। এই 'শ্রদ্ধা' শব্দ আমি তোমাদের নিকট ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া বলিব না; অনুবাদ করিলে ভুল হইবে। এই অপূর্ব শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা কঠিন; এই শব্দের প্রভাব ও কার্যকারিতা অতি বিস্ময়কর। নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধা জাগিবামাত্র কি ফল হইল, দেখ। শ্রদ্ধা জাগিবামাত্রই নচিকেতার মনে হইল—আমি অনেকের মধ্যে প্রথম, অনেকের মধ্যে মধ্যম: অধম আমি কখনই নহি; আমিও কিছু কার্য করিতে পারি। তাঁহার এইরূপ আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়িতে লাগিল, তখন যে-সমস্যার চিন্তায় তাঁহার মন আলোড়িত হইতেছিল, তিনি সেই মৃত্যুতত্ত্বের মীমাংসা করিতে উদ্যত হইলেন; যমগৃহে গমন ব্যতীত এই সমস্যার মীমাংসা হইবার অন্য উপায় ছিল না, সুতরাং তিনি যম-সদনে গমন করিলেন। সেই নির্ভীক বালক নচিকেতা যমগৃহে তিন দিন অপেক্ষা করিলেন। তোমরা জানো, কিরূপে তিনি যমের নিকট হইতে সমুদয় তত্ত্ব অবগত হইলেন। আমাদের চাই এই শ্রদ্ধা। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত হইতে এই শ্রদ্ধা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। সেজন্যই আমাদের এই বর্তমান দুর্দশা। মানুষে মানুষে প্রভেদ এই শ্রদ্ধার তারতম্য লইয়া, আর কিছুতেই নহে। এই শ্রদ্ধার তারতম্যেই কেহ বড় হয়, কেহ ছোট হয়। আমার গুরুদেব বলিতেন, যে আপনাকে দুর্বল ভাবে, সে দুর্বলই হইবে—ইহা অতি সত্য কথা। এই শ্রদ্ধা তোমাদের ভিতর প্রবেশ

করুক। পাশ্চাত্যজাতি জড়জগতে যে আধিপত্য লাভ করিয়াছে, তাহা এই শ্রদ্ধার ফলে; তাহারা শারীরিক বলে বিশ্বাসী। তোমরা যদি আত্মাতে বিশ্বাসী হও, তাহা হইলে তাহার ফল আরও অদ্ভুত হইবে। তোমাদের শাস্ত্র, তোমাদের ঋষিগণ একবাক্যে যাহা প্রচার করিতেছেন, সেই অনন্ত শক্তির আধার আত্মায় বিশ্বাসী হও—যে আত্মাকে কেহ নাশ করিতে পারে না, যাঁহাতে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে। কেবল আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। এখানেই অন্যান্য দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ। দ্বৈতবাদীই হউন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীই হউন, আর অদ্বৈতবাদীই হউন, সকলেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, আত্মার মধ্যেই সমগ্র শক্তি রহিয়াছে; কেবল উহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। অতএব আমি চাই এই শ্রদ্ধা। আমাদের সকলেরই আবশ্যক—এই আত্মবিশ্বাস; আর এই বিশ্বাস অর্জনরূপ মহৎকার্য তোমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের জাতীয় শোণিতে এক ভয়ানক রোগের বীজ প্রবেশ করিতেছে—সকল বিষয় হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া, গাম্ভীর্যের অভাব। এই দোষটি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। বীর হও, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও, আর যাহা কিছু সব আসিবেই আসিবে।

আমি তো এখনও কিছুই করিতে পারি নাই, তোমাদিগকেই সব করিতে হইবে। যদি কাল আমার দেহত্যাগ হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই কার্য লোপ পাইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জনসাধারণের মধ্য হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি আসিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিবে এবং এই কার্যের এতদূর উন্নতি ও বিস্তার হইবে যে, আমি তাহা কখন কল্পনাও করি নাই। আমার দেশের উপর আমি বিশ্বাস রাখি, বিশেষতঃ আমার দেশের যুবকদলের উপর। বঙ্গীয় যুবকগণের স্কন্ধে অতি গুরুভার সমর্পিত। আর কখনও কোন দেশের যুবকদলের উপর এত গুরুভার পড়ে নাই। আমি প্রায় গত দশ বৎসর যাবৎ সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি—তাহাতে আমার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর দিয়াই সেই শক্তি প্রকাশিত হইবে, যাহা ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবে। নিশ্চয় বলিতেছি, এই হৃদয়বান্ উৎসাহী বঙ্গীয় যুবকগণের মধ্য হইতেই শত শত বীর উঠিবে, যাহারা আমাদের পূর্বপুরুষগণের প্রচারিত সনাতন আধ্যাত্মিক সত্য প্রচার করিয়া ও শিক্ষা দিয়া জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত—এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্যন্ত ভ্রমণ করিবে। তোমাদের

সম্মুখে এই মহান্ কর্তব্য রহিয়াছে। অতএব আর একবার তোমাদিগকে সেই মহতী বাণী—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' স্মরণ করাইয়া দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

ভয় পাইও না, কারণ মনুষ্য-জাতির ইতিহাসে দেখা যায়; যত কিছু শক্তির প্রকাশ হইয়াছে, সবই সাধারণ লোকের ভিতরে। জগতে যত বড় বড় প্রতিভাশালী পুরুষ জন্মিয়াছেন, সবই সাধারণ লোকের মধ্য হইতে; আর ইতিহাসে একবার যাহা ঘটিয়াছে, পুনরায় তাহা ঘটিবে। কিছুতেই ভয় পাইও না। তোমরা অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য করিবে। যে মুহূর্তে তোমাদের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে, সেই মুহূর্তেই তোমরা শক্তিহীন। ভয়ই জগতের সমুদয় দুঃখের মূল কারণ, ভয়ই সর্বাপেক্ষা বড় কুসংস্কার; নির্ভীক হইলে মুহূর্ত মধ্যেই স্বর্গ আমাদের করতলগত হয়। অতএব 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, সেজন্য আপনাদিগকে পুনরায় ধন্যবাদ দিতেছি। আমি আপনাদিগকে কেবল বলিতে পারি—আমার ইচ্ছা, আমার প্রবল আন্তরিক ইচ্ছা আমি যেন জগতের, সর্বোপরি আমার স্বদেশের ও স্বদেশবাসিগণের যৎসামান্য সেবায় লাগিতে পারি।

সর্বাবয়ব বেদান্ত

[কলিকাতা স্টার থিয়েটারে প্রদত্ত বক্তৃতা]

দূরে—অতি দূরে, লিপিবদ্ধ ইতিহাস, এমন কি ঐতিহ্যের ক্ষীণ রশ্মিজাল পর্যন্ত যেখানে প্রবেশ করিতে অসমর্থ—অনন্তকাল স্থিরভাবে সেই আলোক জ্বলিতেছে, বহিঃপ্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যে কখন কিছুটা ক্ষীণ, কখন অতি উজ্জ্বল কিন্তু চিরকাল অনির্বাণ ও স্থির থাকিয়া শুধু সমগ্র ভারতে নয়, সমগ্র ভাবরাজ্যে উহার পবিত্র রশ্মি, নীরব অননুভূত, শান্ত অথচ সর্বশক্তিমান্ পবিত্র রশ্মি বিকিরণ করিতেছে; ঊষাকালীন শিশিরসম্পাতের ন্যায় অশ্রুত ও অলক্ষ্যভাবে পড়িয়া অতি সুন্দর গোলাপ-কলিকে প্রস্ফুটিত করিতেছে—ইহাই উপনিষদের ভাবরাশি, ইহাই বেদান্তদর্শন। কেহই জানে না, কবে উহা প্রথম ভারতক্ষেত্রে আবির্ভূত

হইয়াছিল। অনুমান-বলে এ তত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। বিশেষতঃ এ বিষয়ে পাশ্চাত্য লেখকগণের অনুমানসমূহ এতই পরস্পরবিরুদ্ধ যে, এগুলির উপর নির্ভর করিয়া কোনরূপ সময় নির্দেশ করা অসম্ভব। আমরা হিন্দুগণ কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে উহার কোন উৎপত্তি স্বীকার করি না। আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি, মানব আধ্যাত্মিক রাজ্যের যাহা কিছু পাইয়াছে বা পাইবে, ইহাই তাহার প্রথম ও ইহাই শেষ। এই বেদান্তসমুদ্র হইতে সময়ে সময়ে জ্ঞানালোকের তরঙ্গরাজি উত্থিত হইয়া কখন পূর্বে কখন বা পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়াছে। অতি প্রাচীনকালে এই তরঙ্গের প্রবাহ পশ্চিমে এথেন্স, আলেকজান্দ্রিয়া ও এণ্টিওকে (Antioch) যাইয়া গ্রীকদিগের চিন্তার গতি নিয়মিত করিয়াছে।

সাংখ্যদর্শন যে প্রাচীন গ্রীকদের মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, ইহা নিশ্চিত। সাংখ্য ও ভারতীয় অন্যান্য ধর্ম বা দার্শনিক মত উপনিষদ্ বা বেদান্তরূপ একমাত্র প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতেও প্রাচীন বা আধুনিক কালে নানা বিরোধী সম্প্রদায় বর্তমান থাকিলেও ইহাদের সবগুলিই উপনিষদ্ বা বেদান্তরূপ একমাত্র প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। তুমি দ্বৈতবাদী হও, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হও, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী হও, অথবা অন্য কোন প্রকারের অদ্বৈতবাদী বা দ্বৈতবাদী হও, অথবা তুমি যে নামেই নিজেকে অভিহিত কর না কেন, তোমার শাস্ত্র উপনিষদই প্রমাণস্বরূপ তোমার পিছনে রহিয়াছে। যদি ভারতের কোন সম্প্রদায় উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার না করে, তবে সেই সম্প্রদায়কে 'সনাতন'-মতাবলম্বী বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। জৈন এবং বৌদ্ধ মতও উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার করে নাই বলিয়া ভারতভূমি হইতে বিদূরিত হইয়াছিল; অতএব জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বেদান্ত ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। আমরা যাহাকে হিন্দুধর্ম বলি, এই অনন্তশাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট মহান্ অশ্বত্থবৃক্ষরূপ হিন্দুধর্ম বেদান্তের প্রভাবে সম্পূর্ণ অনুপ্রাণিত। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বেদান্তই আমাদের জীবন, বেদান্তই আমাদের প্রাণ, আমরণ আমরা বেদান্তের উপাসক; আর হিন্দু বলিলেই 'বেদান্তী' বুঝাইয়া থাকে।

অতএব ভারতভূমিতে ভারতীয় শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে বেদান্ত প্রচার করা আপাতদৃষ্টিতে অসঙ্গত বোধ হয়, কিন্তু যদি কিছু প্রচার করিতে হয়, তবে তাহা

এই বেদান্ত। বিশেষতঃ এই যুগে ইহার প্রচার বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কারণ আমি তোমাদিগকে এইমাত্র বলিয়াছি, ভারতীয় সকল সম্প্রদায়েরই উপনিষদের প্রামাণ্য মানিয়া চলা উচিত বটে, কিন্তু এই-সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা আপাততঃ অনেক বিরোধ দেখিতে পাই। উপনিষদ্-সমূহের মধ্যে যে অপূর্ব সমন্বয় রহিয়াছে, অনেক সময় প্রাচীন বড় বড় ঋষিগণ পর্যন্ত তাহা ধরিতে পারেন নাই। অনেক সময় মুনিগণ পর্যন্ত পরস্পর মতভেদ-হেতু বিবাদ করিয়াছেন। এই মতবিরোধ এক সময়ে এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, ইহা একটি চলিত বাক্য হইয়া গিয়াছিল—যাঁহার মত অপরের মত হইতে ভিন্ন নহে, তিনি মুনিই নহেন—'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।' কিন্তু এখন ও-রূপ বিরোধে আর চলিবে না। উপনিষদের মন্ত্রগুলির মধ্যে গূঢ়রূপে যে সমন্বয়ভাব রহিয়াছে, এখন তাহার ব্যাখ্যা ও প্রচার আবশ্যক। দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে-সমন্বয় রহিয়াছে, তাহা জগতের কাছে স্পষ্টরূপে দেখাইতে হইবে। শুধু ভারতের নয়, সমগ্র জগতের সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহাই দেখাইতে হইবে।

ঈশ্বর-কৃপায় আমার এমন এক ব্যক্তির পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল, যাঁহার সমগ্র জীবনই উপনিষদের এই মহাসমন্বয়ের ব্যাখ্যা-স্বরূপ—যাঁহার জীবন উপদেশ অপেক্ষা সহস্রগুণে উপনিষদ্‌মন্ত্রের জীবন্ত ভাষ্য-স্বরূপ। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, উপনিষদের ভাবগুলি বাস্তবিকই যেন মানবমূর্তি ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ সেই সমন্বয়ের ভাব আমার ভিতরেও কিছু আসিয়াছে। আমি জানি না, জগতের কাছে উহা প্রকাশ করিতে পারিব কি না, কিন্তু বৈদান্তিক সম্প্রদায়গুলি যে পরস্পরবিরোধী নহে, পরস্পর-সাপেক্ষ, একটি যেন অন্যটির পরিণতি-স্বরূপ, একটি যেন অন্যটির সোপান-স্বরূপ এবং সর্বশেষ চরম লক্ষ্য অদ্বৈতে 'তত্ত্বমসি'তে পর্যবসিত, ইহা দেখানোই আমার জীবনব্রত।

এমন এক সময় ছিল, যখন ভারতে কর্মকাণ্ড প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিত। বেদের ঐ কর্মকাণ্ডে অনেক উচ্চ উচ্চ আদর্শ ছিল সন্দেহ নাই, আমাদের বর্তমান দৈনন্দিন কতকগুলি পূজার্চনা এখনও ঐ বৈদিক কর্মকাণ্ড অনুসারে নিয়মিত হইয়া থাকে ; কিন্তু তথাপি বেদের কর্মকাণ্ড ভারতভূমি হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুশাসন অনুসারে আমাদের জীবন আজকাল

খুব সামান্যই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেকেই পৌরাণিক বা তান্ত্রিক। কোন কোন স্থলে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ বৈদিক মন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন বটে ; কিন্তু সে-সকল স্থলেও উক্ত বৈদিক মন্ত্রগুলির ক্রম-সন্নিবেশ অধিকাংশস্থলে বেদানুযায়ী নহে, তন্ত্র বা পুরাণ অনুযায়ী। অতএব বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের অনুবর্তী, এই অর্থে আমাদিগকে 'বৈদিক' নামে অভিহিত করা আমার বিবেচনায় সঙ্গত বোধ হয় না। কিন্তু আমরা যে সকলেই বৈদান্তিক, ইহা নিশ্চিত। 'হিন্দু'নামে যাহারা পরিচিত, তাহাদিগকে 'বৈদান্তিক' আখ্যা দিলে ভাল হয়। আর আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি, দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী সকল সম্প্রদায়ই বৈদান্তিক-নামে অভিহিত হইতে পারে।

বর্তমান কালে ভারতে যে-সকল সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে প্রধানতঃ দ্বৈত ও অদ্বৈত এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহাদের অন্তর্গত কতকগুলি সম্প্রদায় যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদের উপর অধিক ঝোঁক দেন এবং সেগুলির উপর নির্ভর করিয়া বিশুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি নূতন নূতন নাম গ্রহণ করিতে চান, তাহাতে বড় কিছু আসে যায় না। মোটের উপর উহাদিগকে হয় দ্বৈতবাদী, না হয় অদ্বৈতবাদী—এই দুই শ্রেণীর ভিতর ফেলিতে পারা যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে কতকগুলি নূতন, কতকগুলি অতি প্রাচীন সম্প্রদায়ের নূতন সংস্করণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রামানুজের জীবন ও তাঁহার দর্শনকে পূর্বোক্ত এক শ্রেণীর এবং শঙ্করাচার্যকে অপর শ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। রামানুজ অনতিপ্রাচীন ভারতের প্রধান দ্বৈতবাদী দার্শনিক, অন্যান্য দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়গুলি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাঁহার উপদেশাবলীর সারাংশ, এমন কি—সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়মাবলী পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। রামানুজ ও তাঁহার প্রচারকার্যের সহিত ভারতের অন্যান্য দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের তুলনা করিলে দেখিয়া আশ্চর্য হইবে, উহাদের পরস্পরের উপদেশ, সাধনপ্রণালী এবং সাম্প্রদায়িক নিয়মাবলীতে কতদূর সাদৃশ্য আছে। অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্যগণের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের আচার্যপ্রবর মধ্বমুনি এবং তাঁহার অনুবর্তী আমাদের বঙ্গদেশের মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। চৈতন্যদেব মধ্বাচার্যের মত-ই বাঙলা দেশে প্রচার করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে আরও কয়েকটি সম্প্রদায় আছে, যথা—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শৈব। সাধারণতঃ শৈবগণ অদ্বৈতবাদী ; সিংহল এবং

দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থান ব্যতীত ভারতের সর্বত্র এই অদ্বৈতবাদী শৈব সম্প্রদায় বর্তমান। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শৈবগণ 'বিষ্ণু' নামের পরিবর্তে 'শিব' নাম বসাইয়াছেন মাত্র, আর জীবাত্মার পরিণামবিষয়ক মতবাদ ব্যতীত অন্যান্য সর্ববিষয়েই রামানুজ-মতাবলম্বী। রামানুজের মতানুবর্তিগণ আত্মাকে 'অণু' অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র বলিয়া থাকেন; কিন্তু শঙ্করাচার্যের অনুবর্তিগণ তাঁহাকে 'বিভু' অর্থাৎ সর্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার করেন। প্রাচীনকালে অদ্বৈতমতানুবর্তী সম্প্রদায়ের সংখ্যা অনেক ছিল। এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, প্রাচীনকালে এমন অনেক সম্প্রদায় ছিল, যাঁহাদিগকে শঙ্করাচার্যের সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত করিয়াছে। কোন কোন বেদান্তভাষ্যে বিশেষতঃ বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্যে শঙ্করের উপর সময় সময় আক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়; এখানে বলা আবশ্যক, বিজ্ঞানভিক্ষু যদিও অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তথাপি শঙ্করের মায়াবাদ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্পষ্টই বোধ হয়, এমন অনেক সম্প্রদায় ছিল, যাহারা এই মায়াবাদ স্বীকার করিত না; এমন কি তাহারা শঙ্করকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। তাহাদের ধারণা ছিল যে, মায়াবাদ বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে লইয়া বেদান্তের ভিতর প্রবেশ করানো হইয়াছে। যাহাই হউক, বর্তমান কালে অদ্বৈতবাদিগণ সকলেই শঙ্করাচার্যের অনুবর্তী, আর শঙ্করাচার্য এবং তাঁহার শিষ্যগণ আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য—উভয়ত্রই অদ্বৈতবাদ বিশেষরূপে প্রচার করিয়াছেন। শঙ্করাচার্যের প্রভাব আমাদের বাঙলাদেশ, কাশ্মীর ও পঞ্জাবে বেশী বিস্তৃত হয় নাই; কিন্তু দাক্ষিণাত্যে স্মার্তগণ সকলেই শঙ্করাচার্যের অনুবর্তী; আর বারাণসী অদ্বৈত-বাদের একটি কেন্দ্র বলিয়া আর্যাবর্তের অনেক স্থলে ইহার প্রভাব খুবই বেশী।

এখন আর একটি কথা বুঝিতে হইবে যে, শঙ্কর ও রামানুজ কেহই নিজেকে নূতন তত্ত্বের আবিষ্কারক বলিয়া দাবি করেন নাই। রামানুজ স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, তিনি বোধায়নের ভাষ্যের অনুসরণ করিয়া তদনুসারেই বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'ভগবদ্বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্বাচার্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে' ইত্যাদি কথা তাঁহার ভাষ্যের প্রারম্ভেই আমরা দেখিতে পাই। বোধায়নের ভাষ্য আমার কখনও দেখিবার সুযোগ হয় নাই। আমি সমগ্র ভারতে ইহার অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু আমার অদৃষ্টে উক্ত ভাষ্যের দর্শনলাভ ঘটে নাই। পরলোকগত

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ব্যাসসূত্রের বোধায়নভাষ্য ব্যতীত অন্য কোন ভাষ্য মানিতেন না; আর যদিও তিনি সুবিধা পাইলেই রামানুজের উপর কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই, কিন্তু তিনি নিজেই কখনও বোধায়নভাষ্য সাধারণের কাছে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। রামানুজ কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, তিনি বোধায়নের ভাব, স্থানে স্থানে ভাষা পর্যন্ত লইয়া তাঁহার বেদান্তভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্যও প্রাচীন ভাষ্যকারগণের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তাঁহার ভাষ্য প্রণয়ন করেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার ভাষ্যের কয়েক স্থলে প্রাচীনতর ভাষ্যসমূহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আরও যখন তাঁহার গুরু এবং গুরুর গুরু তাঁহার মতোই অদ্বৈত-মতাবলম্বী বৈদান্তিক ছিলেন, বরং সময়ে সময়ে এবং কোন কোন বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষাও অদ্বৈততত্ত্বপ্রকাশে অধিকতর অগ্রসর ও সাহসী ছিলেন, তখন ইহা স্পষ্টই বোধ হয়, তিনিও বিশেষ কিছু নূতন জিনিস প্রচার করেন নাই। রামানুজ যেমন বোধায়নভাষ্য-অবলম্বনে তাঁহার ভাষ্য লিখিয়াছেন, শঙ্করও ঐরূপ কাজই করিয়াছিলেন, তবে কোন্ ভাষ্য-অবলম্বনে ভাষ্য লিখিয়াছিলেন, তাহা এখন নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

তোমরা যে-সকল দর্শনের কথা শুনিয়াছ বা যেগুলি দেখিয়াছ, উপনিষদ্‌ই এগুলির ভিত্তি। যখনই তাঁহারা শ্রুতির দোহাই দিয়াছেন, তখনই তাঁহারা উপনিষদ্‌কে লক্ষ্য করিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য দর্শনও উপনিষদ্ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু ব্যাস-প্রণীত বেদান্তদর্শনের ন্যায় আর কোন দর্শনই ভারতে তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। বেদান্তদর্শনও কিন্তু প্রাচীনতর সাংখ্যদর্শনের চরম পরিণতিমাত্র। আর সমগ্র ভারতের, এমন কি সমগ্র জগতের সকল দর্শন ও সকল মতই কপিলের নিকট বিশেষ ঋণী। সম্ভবতঃ মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক দিক দিয়া ভারতের ইতিহাসে কপিলেরই নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। জগতে সর্বত্রই কপিলের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে কোন সুপরিচিত দার্শনিক মত বিদ্যমান, সেইখানেই তাঁহার প্রভাব দেখিতে পাইবে। উহা সহস্র বৎসরের প্রাচীন হইতে পারে, তথাপি সেখানে সেই কপিলের—সেই তেজস্বী মহামহিমময় অপূর্বপ্রতিভাসম্পন্ন কপিলের প্রভাব দেখিতে পাইবে। তাঁহার মনোবিজ্ঞান ও দর্শনের অধিকাংশ অতি সামান্য সামান্য পরিবর্তন করিয়া ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের বাঙলার নৈয়ায়িকগণ ভারতীয় দর্শন-জগতের উপর বিশেষ প্রভাব

বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্য, বিশেষ, জাতি, দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি গুরুভার পারিভাষিক শব্দনিচয়—যাহা রীতিমত আয়ত্ত করিতে সমগ্র জীবন কাটিয়া যায়—লইয়াই বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা বৈদান্তিকদের উপর দর্শনালোচনার ভার দিয়া নিজেরা 'ন্যায়' লইয়া ব্যস্ত ছিলেন; কিন্তু আধুনিক কালে ভারতীয় সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ই বঙ্গদেশীয় নৈয়ায়িকদিগের বিচারপ্রণালী-সম্বন্ধীয় পরিভাষা গ্রহণ করিয়াছেন। জগদীশ, গদাধর ও শিরোমণির নাম নদীয়ার মতো মালাবার দেশেরও কোন কোন নগরে সুপরিচিত। এই তো গেল অন্যান্য দর্শনের কথা; ব্যাসপ্রণীত বেদান্তদর্শন কিন্তু ভারতে সর্বত্র দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, আর উহার যাহা উদ্দেশ্য অর্থাৎ প্রাচীন সত্যসমূহকে দার্শনিকভাবে বিবৃত করা, তাহা সাধন করিয়া ভারতে উহা স্থায়িত্বলাভ করিয়াছে। এই বেদান্তদর্শনে যুক্তিকে সম্পূর্ণরূপে শ্রুতির অধীন করা হইয়াছে; শঙ্করাচার্যও এক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন, ব্যাস বিচারের চেষ্টা মোটেই করেন নাই, তাঁহার সূত্রপ্রণয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য—বেদান্তমন্ত্ররূপ পুষ্পসমূহকে এক সূত্রে গাঁথিয়া একটি মালা প্রস্তুত করা। তাঁহার সূত্রগুলির প্রামাণ্য ততটুকু, যতটুকু সেগুলি উপনিষদের অনুসরণ করিয়া থাকে; ইহার অধিক নহে।

ভারতের সকল সম্প্রদায়ই এখন এই ব্যাসসূত্রকে শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। আর এখানে যে-কোন নূতন সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়, সেই সম্প্রদায়ই নিজ রুচি অনুযায়ী ব্যাসসূত্রের একটি নূতন ভাষ্য লিখিয়া সম্প্রদায় পত্তন করে। সময় সময় এই ভাষ্যকারগণের মধ্যে অতিশয় প্রবল মতভেদ দেখা যায়। সময় সময় মূলের অর্থবিকৃতি অতিশয় বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, সেই ব্যাসসূত্র এখন ভারতে প্রধান প্রামাণিক গ্রন্থের আসন গ্রহণ করিয়াছে। ব্যাসসূত্রের উপর একটি নূতন ভাষ্য না লিখিলে ভারতে কেহই সম্প্রদায়-স্থাপনের আশা করিতে পারে না। ব্যাসসূত্রের নীচেই জগদ্বিখ্যাত গীতার প্রামাণ্য। শঙ্করাচার্য গীতার প্রচার করিয়াই মহা গৌরবের ভাগী হইয়াছিলেন। এই মহাপুরুষ তাঁহার মহৎ জীবনে যে-সকল বড় বড় কাজ করিয়াছিলেন, সেগুলির মধ্যে গীতাপ্রচার ও গীতার একটি অতি সুন্দর ভাষ্যপ্রণয়ন অন্যতম। ভারতের সনাতন-পন্থাবলম্বী প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাই পরবর্তী কালে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া গীতার এক একটি ভাষ্য লিখিয়াছেন।

উপনিষদ্ সংখ্যায় অনেক। কেহ কেহ বলেন ১০৮, কেহ কেহ আবার উহাদের সংখ্যা আরও অধিক বলিয়া থাকেন। উহাদের মধ্যে কতকগুলি স্পষ্টই আধুনিক, যথা—আল্লোপনিষৎ। উহাতে আল্লার স্তুতি আছে এবং মহম্মদকে 'রজসুল্লা' বলা হইয়াছে। শুনিয়াছি, ইহা নাকি আকবরের রাজত্বকালে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিলন-সাধনের জন্য রচিত হইয়াছিল। সংহিতাভাগে আল্লা বা ইল্লা অথবা এরূপ কোন শব্দ পাইয়া তদবলম্বনে এইরূপ উপনিষৎসমূহ রচিত হইয়াছে। এইরূপে এই আল্লোপনিষদে মহম্মদ রজসুল্লা হইয়াছেন। ইহার তাৎপর্য যাহাই হউক, এই জাতীয় আরও অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক উপনিষদ্ আছে। স্পষ্টই বোধ হয়, এগুলি সম্পূর্ণ আধুনিক, আর এইরূপ উপনিষদ্-রচনা বড় কঠিনও ছিল না। কারণ বেদের সংহিতাভাগের ভাষা এত প্রাচীন যে, ইহাতে ব্যাকরণের বড় বাঁধাবাঁধি ছিল না। কয়েক বৎসর পূর্বে আমার একবার বৈদিক ব্যাকরণ শিখিবার ইচ্ছা হয় এবং আমি অতি আগ্রহের সহিত পাণিনি এবং মহাভাষ্য পড়িতে আরম্ভ করি। কিন্তু কিছুটা পাঠে অগ্রসর হইবার পর দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম যে, বৈদিক ব্যাকরণের প্রধান ভাগ কেবল ব্যাকরণের সাধারণ বিধিসমূহের ব্যতিক্রম-মাত্র। ব্যাকরণে একটি সাধারণ বিধি করা হইল, তারপরেই বলা হইল বেদে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে। সুতরাং দেখিতেছ, যে-কোন ব্যক্তি যাহা কিছু লিখিয়া কত সহজে উহাকে বেদ বলিয়া প্রচার করিতে পারে। কেবল যাস্কের 'নিরুক্ত' থাকাতেই একটু রক্ষা। কিন্তু ইহাতে কতকগুলি সমার্থক শব্দের সন্নিবেশ আছে মাত্র। যেখানে এতগুলি সুযোগ, সেখানে তোমার যত ইচ্ছা উপনিষদ্ রচনা করিতে পারো। একটু সংস্কৃতজ্ঞান যদি থাকে, তবে প্রাচীন বৈদিক শব্দের মতো গোটাকতক শব্দ রচনা করিতে পারিলেই হইল। ব্যাকরণের তো আর কোন ভয় নাই, তখন রজসুল্লাই হউক বা যে-কোন সুল্লাই হউক, তুমি উহাতে অনায়াসে ঢুকাইতে পারো। এইরূপে অনেক নূতন উপনিষদ্ রচিত হইয়াছে, আর শুনিয়াছি, এখনও হইতেছে। আমি নিশ্চিতরূপে জানি ভারতের কোন কোন প্রদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও এইভাবে নূতন উপনিষদ্ রচিত হইতেছে। কিন্তু এমন কতকগুলি উপনিষদ্ আছে, সেগুলি স্পষ্টই খাঁটি জিনিস বলিয়া বোধ হয়। শঙ্কর, রামানুজ ও অন্যান্য বড় বড় ভাষ্যকারেরা সেইগুলির উপর ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

এই উপনিষদের আর দু-একটি তত্ত্বসম্বন্ধে আমি তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি, কারণ উপনিষৎসমূহ অনন্ত জ্ঞানের সমুদ্র, আর আমার ন্যায় একজন অযোগ্য ব্যক্তিরও উহার সকল তত্ত্ব বলিতে গেলে বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইবে, একটি বক্তৃতায় কিছু হইবে না। এই কারণে উপনিষদের আলোচনায় যে-সকল বিষয় আমার মনে উদিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে শুধু দুই-একটি বিষয় তোমাদের নিকট বলিতে চাই। প্রথমতঃ জগতে ইহার ন্যায় অপূর্ব কাব্য আর নাই। বেদের সংহিতাভাগ আলোচনা করিয়া দেখিলে তাহাতেও স্থানে স্থানে অপূর্ব কাব্য-সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণ-স্বরূপ ঋগ্বেদ-সংহিতার 'নাসদীয় সূক্তের' বিষয় আলোচনা কর। উহার মধ্যে প্রলয়ের গভীর-অন্ধকারবর্ণনাত্মক সেই শ্লোক আছে : তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে ইত্যাদি। যখন অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল—এটি পড়িলেই অনুভব হয় যে, ইহাতে কবিত্বের অপূর্ব গাম্ভীর্য নিহিত রহিয়াছে। তোমরা কি ইহা লক্ষ্য করিয়াছ যে, ভারতের বাহিরে এবং ভারতের অভ্যন্তরেও গম্ভীর ভাবের চিত্র অঙ্কিত করিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছে? ভারতের বাহিরে এই চেষ্টা সর্বদাই জড় প্রকৃতির অনন্ত ভাব-বর্ণনার আকার ধারণ করিয়াছে—কেবল অনন্ত বহিঃপ্রকৃতি, অনন্ত জড়, অনন্ত দেশের বর্ণনা। যখনই মিল্টন বা দান্তে বা অপর কোন প্রাচীন বা আধুনিক বড় ইওরোপীয় কবি অনন্তের চিত্র আঁকিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তখনই তিনি তাঁহার কবিত্বের পক্ষসহায়ে নিজের বাহিরে সুদূর আকাশে বিচরণ করিয়া অনন্ত বহিঃপ্রকৃতির কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ চেষ্টা এখানেও হইয়াছে। বেদসংহিতায় এই বহিঃপ্রকৃতির অনন্ত বিস্তার যেমন অপূর্ব ভাবে চিত্রিত হইয়া পাঠকদের নিকট স্থাপিত হইয়াছে, আর কোথাও এমনটি দেখিতে পাইবে না। সংহিতার এই 'তম আসীৎ তমসা গূঢ়ম্' বাক্যটি স্মরণ রাখিয়া তিন জন বিভিন্ন কবির অন্ধকারের বর্ণনা তুলনা করিয়া দেখ। আমাদের কালিদাস বলিয়াছেন, 'সূচীভেদ্য অন্ধকার', মিল্টন বলিতেছেন, 'আলোক নাই, দৃশ্যমান অন্ধকার।' কিন্তু ঋগ্বেদসংহিতা বলিতেছেন, 'অন্ধকার—অন্ধকারের দ্বারা আবৃত, অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার লুক্কায়িত।' গ্রীষ্মপ্রধানদেশবাসী আমরা ইহা সহজেই বুঝিতে পারি। যখন হঠাৎ নূতন বর্ষাগম হয়, তখন সমস্ত দিগ্বলয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠে এবং সঞ্চরণশীল শ্যাম মেঘপুঞ্জ ক্রমশঃ অন্য মেঘরাশি আচ্ছন্ন করিতে থাকে। যাহা

হউক, সংহিতার এই কবিত্ব অতি অপূর্ব বটে, কিন্তু এখানেও বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনার চেষ্টা। অন্যত্র যেমন বহিঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণদ্বারা মানবজীবনের মহান্ সমস্যাসমূহের সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে, এখানেও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক বা আধুনিক ইওরোপীয়গণ যেমন বহির্জগৎ অনুসন্ধান করিয়া জীবনের এবং পারমার্থিক তত্ত্ববিষয়ক সকল সমস্যার সমাধান করিতে চহিয়াছিলেন, আমাদের পূর্বপুরুষগণও তাহাই করিয়াছিলেন, আর ইওরোপীয়-গণের ন্যায় তাঁহারাও বিফল হইয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্যজাতি এ বিষয়ে আর কোন চেষ্টা করিল না; যেখানে ছিল, সেখানেই পড়িয়া রহিল। বহির্জগতে জীবন-মরণের বড় বড় সমস্যাগুলির সমাধান করিবার চেষ্টায় বিফল হইয়া তাহারা আর অগ্রসর হইল না; আমাদের পূর্বপুরুষগণও ইহা অসম্ভব বলিয়া জানিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা এই সমস্যা-সমাধানে ইন্দ্রিয়গণের সম্পূর্ণ অক্ষমতার কথা জগতের নিকট নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিলেন। উপনিষৎ নির্ভীকভাবে বলিলেন: যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।[১] —ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি।[২]

—মনের সহিত বাক্য তাঁহাকে না পাইয়া যেখান হইতে ফিরিয়া আসে, সেখানে চক্ষুও যাইতে পারে না, বাক্যও যাইতে পারে না। এইরূপ বহু বাক্যের দ্বারা সেই মহা সমস্যা-সমাধানে ইন্দ্রিয়গণের সম্পূর্ণ অক্ষমতার কথা তাঁহারা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এই পর্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তাঁহারা বহিঃপ্রকৃতি ছাড়িয়া অন্তঃপ্রকৃতির দিকে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহারা এই প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য আত্মাভিমুখী হইলেন, অন্তর্মুখী হইলেন; তাঁহারা বুঝিলেন, প্রাণহীন জড় হইতে তাঁহারা কখনই সত্য লাভ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা দেখিলেন, বহিঃপ্রকৃতিকে প্রশ্ন করিয়া কোন উত্তর পাওয়া যায় না, বহিঃপ্রকৃতি তাঁহাদিগকে কোন আশার বাণী শোনায় না, সুতরাং তাঁহারা উহা হইতে সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা বৃথা জানিয়া বহিঃপ্রকৃতিকে ছাড়িয়া সেই জ্যোতির্ময় জীবাত্মার দিকে ফিরিলেন; সেখানে তাঁহারা উত্তর পাইলেন: তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ।[৩] —একমাত্র সেই আত্মাকেই অবগত হও, আর সমস্ত বৃথা বাক্য পরিত্যাগ কর।

১ তৈত্তি উপ. ২।৯ ২ কেন উপ. ১।৩ ৩ মুণ্ডক উপ ২।২।৫

তাঁহারা আত্মাতেই সকল সমস্যার সমাধান পাইলেন; তাঁহারা এই আত্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়াই বিশ্বেশ্বর পরমাত্মাকে জানিলেন এবং জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ, তাঁহার প্রতি আমাদের কর্তব্য এবং এই জ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ, সকলই অবগত হইলেন। আর এই আত্মতত্ত্বের বর্ণনার মতো গাম্ভীর্যপূর্ণ কবিতা জগতে আর নাই। জড়ের ভাষায় এই আত্মাকে চিত্রিত করিবার চেষ্টা আর রহিল না; এমন কি আত্মার বর্ণনায় নির্দিষ্ট গুণবাচক শব্দ তাঁহারা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। তখন আর অনন্তের ধারণা করিবার জন্য ইন্দ্রিয়ের সহায়তা-লাভের চেষ্টা রহিল না। বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অচেতন মৃত জড়ভাবাপন্ন অবকাশরূপ অনন্তের বর্ণনা লোপ পাইল; তৎপরিবর্তে আত্মতত্ত্ব এমন ভাষায় বর্ণিত হইতে লাগিল যে, উপনিষদের সেই শব্দগুলির উচ্চারণমাত্রই যেন এক সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় রাজ্যে অগ্রসর করাইয়া দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই অপূর্ব শ্লোকটির কথা স্মরণ কর:

> ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
> তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥[১]

—সূর্য সেখানে কিরণ দেয় না, চন্দ্র-তারকাও নহে, এই বিদ্যুৎ তাঁহাকে আলোকিত করিতে পারে না, এই অগ্নির আর কথা কি? জগতে আর কোন্ কবিতা ইহা অপেক্ষা গম্ভীরভাবদ্যোতক?

এইরূপ কবিতা আর কোথাও পাইবে না। সেই অপূর্ব কঠোপনিষদের কথা ধর। এই কাব্যটি কি অপূর্ব ও সর্বাঙ্গসুন্দর! ইহাতে কি বিস্ময়কর কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে! ইহার আরম্ভই অপূর্ব! সেই বালক নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধার আবির্ভাব, তাহার যমপুরীতে যাইবার ইচ্ছা, আর সেই 'আশ্চর্য' তত্ত্ববক্তা স্বয়ং যম তাহাকে জন্ম-মৃত্যু-রহস্যের উপদেশ দিতেছেন! আর বালক তাঁহার নিকট কি জানিতে চাহিতেছে?—মৃত্যু-রহস্য।

উপনিষদ্-সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা, যে বিষয়ে তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই, তাহা এই—ঐগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষা নহে। যদিও

১ মুণ্ডক উপ ২।২।১০

আমরা উহাতে অনেক আচার্য ও বক্তার নাম পাইয়া থাকি, তথাপি তাঁহাদের কাহারও বাক্যের উপর উপনিষদের প্রামাণ্য নির্ভর করে না। একটি মন্ত্রও তাঁহাদের কাহারও ব্যক্তিগত জীবনের উপর নির্ভর করে না। এই-সকল আচার্য ও বক্তা যেন ছায়ামূর্তির ন্যায় রঙ্গমঞ্চের পশ্চাদ্‌ভাগে রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে কেহ যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে না, তাঁহাদের সত্তা যেন কেহ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে না, কিন্তু প্রকৃত শক্তি রহিয়াছে উপনিষদের সেই অপূর্ব মহিমময় জ্যোতির্ময় তেজোময় মন্ত্রগুলির ভিতর—ব্যক্তিবিশেষের সহিত উহাদের যেন কোন সম্পর্ক নাই। বিশ জন যাজ্ঞবল্ক্য থাকুন বা না থাকুন—কোন ক্ষতি নাই, মন্ত্রগুলি তো রহিয়াছে। তথাপি উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের বিরোধী নহে। জগতে প্রাচীনকালে যে-কোন মহাপুরুষ বা আচার্যের অভ্যুদয় হইয়াছে বা ভবিষ্যতে হইবে, উহার বিশাল ও উদার বক্ষে তাঁহাদের সকলেরই স্থান হইতে পারে। উপনিষদ্ অবতার বা মহাপুরুষগণের পূজার বিরোধী নহে, বরং উহার পক্ষে। অপরদিকে উহা আবার সম্পূর্ণ ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। উপনিষদের ঈশ্বর যেমন ব্যক্তিভাবের ঊর্ধ্বে, তেমনি সমগ্র উপনিষদ্‌ই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ অপূর্ব ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহাতে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যতটা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ভাব আশা করেন, জ্ঞানী চিন্তাশীল দার্শনিক ও যুক্তিবাদিগণের নিকট এই উপনিষদ্ ততটা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ।

আর ইহাই আমাদের শাস্ত্র। তোমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, খ্রীষ্টানগণের পক্ষে যেমন বাইবেল, মুসলমানের পক্ষে যেমন কোরান, বৌদ্ধদের যেমন ত্রিপিটক, পার্শীদের যেমন জেন্দাবেস্তা, আমাদের পক্ষেও উপনিষদ্ সেইরূপ। এইগুলি—একমাত্র এইগুলিই আমাদের শাস্ত্র। পুরাণ, তন্ত্র ও অন্যান্য সমুদয় গ্রন্থ, এমন কি ব্যাসসূত্র পর্যন্ত প্রামাণ্যবিষয়ে গৌণমাত্র, আমাদের মুখ্য প্রমাণ বেদ। মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণ প্রভৃতির যতটুকু উপনিষদের সহিত মেলে, ততটুকুই গ্রহণীয়; যেখানে উভয়ের বিরোধ হইবে, সেখানে স্মৃতি প্রভৃতির প্রমাণ নির্দয়ভাবে পরিত্যাজ্য। আমাদিগকে এই বিষয়টি সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। কিন্তু ভারতের দুরদৃষ্টক্রমে আমরা বর্তমানে ইহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। সামান্য সামান্য গ্রাম্য আচার এখন উপনিষদের স্থলাভিষিক্ত হইয়া প্রমাণস্বরূপ হইয়াছে। বাঙলার কোন সুদূর পল্লীগ্রামে হয়তো কোন বিশেষ আচার এক মত প্রচলিত, সেইটি যেন বেদবাক্য, এমন কি তদপেক্ষা

অধিক। আর 'সনাতন-মতাবলম্বী' এই কথাটির কি অদ্ভুত প্রভাব!—কর্ম-কাণ্ডের বিশেষ বিশেষ নিয়মগুলি একটিও বাদ না দিয়া যে পালন করে, একজন গ্রাম্যলোকের নিকট সে-ই খাঁটি সনাতনপন্থী, আর যে পালন না করে, সে হিন্দুই নয়। অতি দুঃখের বিষয় যে, আমার মাতৃভূমিতে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা কোন তন্ত্রবিশেষ অবলম্বন করিয়া সর্বসাধারণকে সেই তন্ত্রমতে চলিতে উপদেশ দেন; যে না চলে, সে তাঁহাদের মতে খাঁটি হিন্দু নয়। সুতরাং আমাদের পক্ষে এখন এইটি স্মরণ রাখা বিশেষ আবশ্যক যে, উপনিষদই মুখ্য প্রমাণ, গৃহ্য ও শ্রৌতসূত্র পর্যন্ত বেদ-প্রমাণের অধীন। এই উপনিষদ্ আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিগণের বাক্য, আর যদি তোমরা হিন্দু হইতে চাও, তবে তোমাদিগকে উহা বিশ্বাস করিতেই হইবে। তোমরা ঈশ্বর-সম্বন্ধে যাহা খুশি তাহাই বিশ্বাস করিতে পারো, কিন্তু বেদের প্রামাণ্য স্বীকার না করিলে তোমরা নাস্তিক। খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ বা অন্যান্য শাস্ত্র হইতে আমাদের শাস্ত্রের এইটুকু পার্থক্য। ঐগুলিকে শাস্ত্র আখ্যা না দিয়া 'পুরাণ' বলাই উচিত। কারণ উহাতে জলপ্লাবনের ইতিহাস, রাজা ও রাজবংশের ইতিহাস, মহাপুরুষগণের জীবনচরিত প্রভৃতি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এগুলি পুরাণের লক্ষণ, সুতরাং যতটা বেদেব সহিত মিলে, উহাদের মধ্যে ততটাই গ্রাহ্য। বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র যতটা বেদের সহিত মিলে ততটা গ্রাহ্য, কিন্তু যেখানে না মিলে সেখানটা মানিবার প্রয়োজন নাই। কোরান-সম্বন্ধেও এই কথা। এই-সকল গ্রন্থে অনেক নীতি-উপদেশ আছে; সুতরাং বেদের সহিত উহাদের যতটা ঐক্য হয়, ততটা পুরাণবৎ প্রামাণিক, অবশিষ্টাংশ পরিত্যাজ্য।

বেদ-সম্বন্ধে আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে, বেদ কখনও লিখিত হয় নাই, বেদের উৎপত্তি নাই। জনৈক খ্রীষ্টান মিশনরী আমাকে এক সময় বলিয়াছিল, তাহাদের বাইবেল ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, অতএব সত্য। তাহাতে আমি উত্তর দিয়াছিলাম: আমাদের শাস্ত্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি কিছু নাই বলিয়াই উহা সত্য। তোমাদের শাস্ত্র যখন ঐতিহাসিক, তখন নিশ্চয়ই কিছুদিন পূর্বে উহা কোন মনুষ্য দ্বারা রচিত হইয়াছিল। তোমাদের শাস্ত্র মনুষ্যপ্রণীত, আমাদের শাস্ত্র নহে। আমাদের শাস্ত্রের অনৈতিহাসিকতাই উহার সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বেদের সহিত আজকালকার অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের এই সম্বন্ধ।

উপনিষদে যে-সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, এখন আমরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব। উহাতে নানাবিধ ভাবের শ্লোক দেখা যায়; কোন কোনটি সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদাত্মক। দ্বৈতবাদাত্মক বলিলে আমি কি লক্ষ্য করিতেছি? কতকগুলি বিষয়ে ভারতের সকল সম্প্রদায় একমত। প্রথমতঃ সকল সম্প্রদায়ই 'সংসারবাদ' বা পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানেও সকল সম্প্রদায়ের একরূপ। প্রথমতঃ এই স্থূলশরীর, ইহার পশ্চাতে সূক্ষ্মশরীর বা মন। জীবাত্মা সেই মনেরও পারে। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় মনোবিজ্ঞানের মধ্যে এইটি বিশেষ প্রভেদ যে, পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে মন ও জীবাত্মার মধ্যে কিছু প্রভেদ করা হয় নাই, কিন্তু এখানে তাহা নহে। ভারতীয় মনোবিজ্ঞানের মতে মন বা অন্তঃকরণ যেন জীবাত্মার যন্ত্রস্বরূপ। ঐ যন্ত্রসহায়ে উহা শরীর অথবা বাহ্য জগতের উপর কাজ করিয়া থাকে। এই বিষয়ে সকলেই একমত। বিভিন্ন সম্প্রদায় ইহাকে জীব, আত্মা, জীবাত্মা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। কিন্তু সকলেই স্বীকার করেন যে, জীবাত্মা অনাদি অনন্ত; যতদিন না শেষ মুক্তিলাভ হয়, ততদিন তিনি পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন।

আর একটি মুখ্য বিষয়ে সকলেই একমত, আর ইহাই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর মৌলিক প্রভেদ যে, তাঁহারা জীবাত্মাতে পূর্ব হইতেই সকল শক্তি অবস্থিত বলিয়া স্বীকার করেন। ইন্‌স্‌পিরেশন (inspiration)-শব্দ দ্বারা ইংরেজীতে যে ভাবের প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহাতে বুঝায় যেন বাহির হইতে কিছু আসিতেছে; কিন্তু আমাদের শাস্ত্রানুসারে সকল শক্তি, সর্ববিধ মহত্ত্ব ও পবিত্রতা আত্মার মধ্যেই রহিয়াছে। যোগীরা বলিবেন, অণিমা লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধি, যাহা তিনি লাভ করিতে চান, তাহা প্রকৃতপক্ষে লাভ করিবার নহে, তাহারা পূর্ব হইতেই আত্মাতে বিদ্যমান, ব্যক্ত করিতে হইবে মাত্র। পতঞ্জলির মতে তোমার পদতলচারী অতি ক্ষুদ্রতম কীটে পর্যন্ত অষ্টসিদ্ধি রহিয়াছে; কেবল তাহার দেহরূপ আধার অনুপযুক্ত বলিয়া উহারা প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না। উন্নততর শরীর পাইলেই সেই শক্তিগুলি প্রকাশিত হইবে, কিন্তু উহারা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান। তিনি তাঁহার সূত্রের একস্থলে বলিয়াছেন, 'নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ'।[১]

১ যোগসূত্র, ৪।৩

—যেমন কৃষককে তাহার ক্ষেত্রে জল আনিতে হইলে কেবল তাহার ক্ষেত্রে আল ভাঙিয়া দিয়া নিকটস্থ জলপ্রণালীর সহিত উহার যোগ করিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে জল যেমন তাহার নিজ বেগে আসিয়া উপস্থিত হয়, তেমনি জীবাত্মাতে সকল শক্তি, পূর্ণতা ও পবিত্রতা পূর্ব হইতে বিদ্যমান, কেবল মায়াবরণের দ্বারা উহা প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না। একবার এই আবরণ অপসারিত হইলে আত্মা তাঁহার স্বাভাবিক পবিত্রতা লাভ করেন এবং তাঁহার শক্তিসমূহ জাগরিত হইয়া উঠে। তোমাদের মনে রাখা উচিত যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর ইহাই বিশেষ পার্থক্য। পাশ্চাত্যগণ এই ভয়ানক মত শিখাইয়া থাকে যে, আমরা সকলেই জন্মপাপী। আর যাহারা এইরূপ ভয়াবহ মতসমূহে বিশ্বাস করিতে পারে না, তাহাদের প্রতি অতিশয় বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে। তাহারা কখনও ইহা ভাবিয়া দেখে না—যদি আমরা স্বভাবতঃ মন্দই হই, তবে আর আমাদের ভাল হইবার আশা নাই, কারণ প্রকৃতি কি ভাবে পরিবর্তিত হইতে পারে? 'প্রকৃতির পরিবর্তন' হয়—এই বাক্যটি স্ববিরোধী। যাহার পরিবর্তন হয়, তাহাকে আর প্রকৃতি বলা যায় না। এই বিষয়টি আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। এই বিষয়ে দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী এবং ভারতের সকল সম্প্রদায় একমত।

ভারতের আধুনিক সকল সম্প্রদায় আর এক বিষয়ে একমত—ঈশ্বরের অস্তিত্ব। অবশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা সকল সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন। দ্বৈতবাদী সগুণ ঈশ্বরই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। আমি এই সগুণ-কথাটি তোমাদিগকে আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চাই। এই সগুণ বলিতে দেহধারী সিংহাসনে উপবিষ্ট জগৎশাসনকারী পুরুষবিশেষকে বুঝায় না। সগুণ অর্থে গুণযুক্ত। শাস্ত্রে এই সগুণ ঈশ্বরের বর্ণনা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আর সকল সম্প্রদায়ই এই জগতের শাস্তা, সৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্তাস্বরূপ সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদীরা এই সগুণ ঈশ্বরের উপর আরও কিছু অধিক বিশ্বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই সগুণ ঈশ্বরের উচ্চতর অবস্থাবিশেষে বিশ্বাসী—উহাকে 'সগুণ-নির্গুণ' নাম দেওয়া যাইতে পারে। যাঁহার কোন গুণ নাই, তাঁহাকে কোন বিশেষণের দ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব। আর অদ্বৈতবাদী তাঁহার প্রতি 'সৎ-চিৎ-আনন্দ' ব্যতীত অন্য কোন বিশেষণ প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত নন। শঙ্কর ঈশ্বরকে সচ্চিদানন্দ-বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন; কিন্তু

উপনিষৎসমূহে ঋষিগণ আরও অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন, 'নেতি, নেতি' অর্থাৎ ইহা নহে, ইহা নহে। যাহাই হউক, সকল সম্প্রদায়ই ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে একমত।

এখন দ্বৈতবাদীদের মত একটু আলোচনা করিব। পূর্বেই বলিয়াছি, এ-যুগে রামানুজকে দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়সমূহের মহান্ প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিব। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বঙ্গদেশের লোক ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বড় বড় ধর্মাচার্যগণ-সম্বন্ধে অতি অল্পই সংবাদ রাখেন। সমগ্র মুসলমান রাজত্বকালে এক আমাদের শ্রীচৈতন্য ব্যতীত বড় বড় ধর্মাচার্যগণ সকলেই দাক্ষিণাত্যে জন্মিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যবাসীর মস্তিষ্কই এখন প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভারত শাসন করিতেছে। কারণ চৈতন্যদেবও দাক্ষিণাত্যেরই সম্প্রদায়[১]-বিশেষভুক্ত ছিলেন।

রামানুজের মতে নিত্য পদার্থ তিনটি—ঈশ্বর, জীব ও জগৎ। জীবাত্মা-সকল নিত্য, আর চিরকালই পরমাত্মা হইতে তাহাদের পার্থক্য থাকিবে, তাহাদের স্বতন্ত্রত্ব কখনও লোপ পাইবে না। রামানুজ বলেন, তোমার আত্মা আমার আত্মা হইতে চিরকালই পৃথক্ থাকিবে। আর এই জগৎপ্রপঞ্চ—এই প্রকৃতিও চিরকালই পৃথক্‌রূপে বিদ্যমান থাকিবে। তাঁহার মতে জীবাত্মা ও ঈশ্বর যেমন সত্য, জগৎপ্রপঞ্চও সেইরূপ। ঈশ্বর সকলের অন্তর্যামী, আর এই অর্থে রামানুজ কখন কখন পরমাত্মাকে জীবাত্মার সহিত অভিন্ন—জীবাত্মার স্বরূপ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রলয়কালে যখন সমগ্র জগৎ সঙ্কুচিত হয়, তখন জীবাত্মাসকলও সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইয়া কিছুদিন ঐভাবে অবস্থান করে। পর কল্পের প্রারম্ভে আবার তাহারা বাহির হইয়া তাহাদের পূর্ব কর্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। রামানুজের মতে যে-কোন কার্যের দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক পবিত্রতা ও পূর্ণত্ব সঙ্কুচিত হয়, তাহাই অসৎকর্ম; আর যাহা দ্বারা উহা বিকশিত হয়, তাহাই সৎকার্য। যাহা আত্মার বিকাশের সহায়তা করে, তাহাই ভাল; আর যাহা উহার সঙ্কোচের সহায়তা করে, তাহাই মন্দ। এইরূপে আত্মার কখন সঙ্কোচ, কখন বিকাশ হইতেছে; অবশেষে ঈশ্বরকৃপায় মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। রামানুজ বলেন, যাহারা শুদ্ধস্বভাব এবং ঐ ঈশ্বরের কৃপালাভের চেষ্টা করে, তাহারাই উহা লাভ করে।

১ মধ্বাচার্যের সম্প্রদায়

শ্রুতিতে একটি প্রসিদ্ধ বাক্য আছে, 'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।' যখন আহার শুদ্ধ হয়, তখন সত্ত্ব শুদ্ধ হয়, এবং সত্ত্ব শুদ্ধ হইলে স্মৃতি অর্থাৎ ঈশ্বর-স্মরণ অথবা অদ্বৈতবাদীর মতে নিজ পূর্ণতার স্মৃতি অচল ও স্থায়ী হয়। এই বাক্যটি লইয়া ভাষ্যকারদিগের মধ্যে মহা বিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ কথা এই—এই 'সত্ত্ব' শব্দের অর্থ কি? আমরা জানি, সাংখ্য-দর্শনমতে এবং ভারতীয় সকল দর্শনসম্প্রদায়ই এ-কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, এই দেহ ত্রিবিধ উপাদানে গঠিত হইয়াছে—গুণে নহে। সাধারণ লোকের ধারণা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তিনটি গুণ, কিন্তু তাহা নহে; উহারা জগতের উপাদান-কারণ। আর আহার শুদ্ধ হইলে সত্ত্ব-পদার্থ নির্মল হইবে। শুদ্ধ সত্ত্ব লাভ করাই বেদান্তের অন্যতম বিষয়বস্তু। আমি তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, জীবাত্মা স্বভাবতঃ পূর্ণ ও শুদ্ধস্বরূপ, আর বেদান্তমতে উহা রজঃ ও তমঃ পদার্থদ্বয় দ্বারা আবৃত। সত্ত্ব-পদার্থ অতিশয় প্রকাশস্বভাব এবং যেমন আলোক সহজেই কাচকে ভেদ করে, তেমনি আত্মচৈতন্যও সহজেই সত্ত্ব-পদার্থকে ভেদ করিয়া থাকে। অতএব যদি রজঃ ও তমঃ দূর হইয়া কেবল সত্ত্ব-দ্রব্য অবশিষ্ট থাকে, তবে জীবাত্মার শক্তি ও বিশুদ্ধত্ব প্রকাশিত হইবে এবং তিনি তখন অধিক পরিমাণে ব্যক্ত হইবেন। অতএব এই সত্ত্ব লাভ করা অতি আবশ্যক। আর শ্রুতি এই সত্ত্ব-লাভের উপায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন, আহার শুদ্ধ হইলে সত্ত্ব শুদ্ধ হয়। রামানুজ এই 'আহার' শব্দ খাদ্য-অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ইহাকে তিনি তাঁহার দর্শনের একটি প্রধান অবলম্বন ও স্তম্ভ করিয়াছেন; শুধু তাহাই নহে, সমগ্র ভারতের সকল সম্প্রদায়েই এই মতের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এখানে আহার-শব্দের অর্থ কি, এইটি আমাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ রামানুজের মতে এই আহারশুদ্ধি আমাদের জীবনের একটি অতি-প্রয়োজনীয় বিষয়। রামানুজ বলিতেছেন, খাদ্য তিন কারণে অশুদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ জাতিদোষ—খাদ্যের জাতি অর্থাৎ প্রকৃতিগত দোষ, যথা—পেঁয়াজ রসুন প্রভৃতি স্বভাবতই অশুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ আশ্রয়দোষ—যে-ব্যক্তির হাত হইতে খাওয়া যায়, সে-ব্যক্তিকে আশ্রয় বলে; সে মন্দ লোক হইলে সেই খাদ্যও দুষ্ট হইয়া থাকে। আমি ভারতে এমন অনেক মহাপুরুষ দেখিয়াছি, যাঁহারা সারা জীবন ঠিক ঠিক এই উপদেশ অনুসারে কাজ করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য তাঁহাদের এ ক্ষমতা ছিল—তাঁহারা যে-ব্যক্তি খাদ্য

আনিয়াছে, এমন কি যে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার গুণদোষ বুঝিতে পারিতেন, এবং আমি নিজ জীবনে একবার নয়, শতবার ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তৃতীয়তঃ নিমিত্তদোষ—খাদ্যদ্রব্যে কেশ কীট আবর্জনাদি কিছু পড়িলে তাহাকে খাদ্যের নিমিত্তদোষ বলে। আমাদিগকে এখন এই শেষ দোষটি নিবারণ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতে আহারে এই দোষটি বিশেষভাবে প্রবেশ করিয়াছে। এই ত্রিবিধদোষনির্মুক্ত খাদ্য আহার করিতে পারিলে সত্ত্বশুদ্ধি হইবে।

তবে তো ধর্মটা বড় সোজা ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল! যদি বিশুদ্ধ খাদ্য খাইলেই ধর্ম হয়, তবে সকলেই তো ইহা করিতে পারে। জগতে এমন কে দুর্বল বা অক্ষম লোক আছে, যে আপনাকে এই দোষসমূহ হইতে মুক্ত করিতে না পারে? অতএব শঙ্করাচার্য এই আহার-শব্দের কি অর্থ করিয়াছেন, দেখা যাউক। তিনি বলেন, 'আহার' শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়দ্বারা মনের মধ্যে যে চিন্তারাশি আহৃত হয়। চিন্তাগুলি নির্মল হইলে সত্ত্ব নির্মল হইবে, তাহার পূর্বে নহে। তুমি যাহা ইচ্ছা খাইতে পারো। যদি শুধু পবিত্র ভোজনের দ্বারা সত্ত্ব শুদ্ধ হয়, তবে বানরকে সারা জীবন দুধভাত খাওয়াইয়া দেখ না কেন, সে একজন মস্ত যোগী হয় কি না! এরূপ হইলে তো গাভী হরিণ প্রভৃতিই সকলের অগ্রে বড় যোগী হইয়া দাঁড়াইত।

'নিত নহ্‌নেসে হরি মিলে তো জলজন্তু হোই
ফলমূল খাকে হরি মিলে তো বাদুড় বান্দরাই
তিরন ভখনসে হরি মিলে তো বহুত মৃগী অজা।'[১] ইত্যাদি

যাহা হউক এই সমস্যার সমাধান কি? উভয়ই আবশ্যক। অবশ্য শঙ্করাচার্য আহার-শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন, উহাই মুখ্য অর্থ; তবে ইহাও সত্য যে, বিশুদ্ধ ভোজন বিশুদ্ধ চিন্তার সহায়তা করে। উভয়ের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। দুই-ই চাই। তবে গোল এইটুকু দাঁড়াইয়াছে যে, বর্তমানকালে আমরা শঙ্করাচার্যের উপদেশ ভুলিয়া গিয়া শুধু 'খাদ্য' অর্থটি লইয়াছি। এই জন্যই যখন আমি বলি—ধর্ম রান্নাঘরে ঢুকিয়াছে, তখন লোকে আমার বিরুদ্ধে খেপিয়া উঠে। কিন্তু যদি মাদ্রাজে যাও, তবে তোমরাও আমার সহিত একমত হইবে। তোমরা

১ মীরাভজন

বাঙালীরা তাহাদের চেয়ে ঢের ভাল। মাদ্রাজে যদি কোন ব্যক্তি খাদ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তবে উচ্চবর্ণের লোকেরা সেই খাদ্য ফেলিয়া দিবে। কিন্তু তথাপি সেখানকার লোকেরা এইরূপ খাদ্যাখাদ্য-বিচারের দরুন যে বিশেষ কিছু উন্নত হইয়াছে, তাহা তো দেখিতে পাইতেছি না। যদি কেবল এ-খাওয়া ও-খাওয়া ছাড়িলেই, এর তার দৃষ্টিদোষ হইতে বাঁচিলেই লোকে সিদ্ধ হইত, তবে দেখিতে মাদ্রাজীরা সকলেই সিদ্ধ পুরুষ, কিন্তু তাহা নহে। অবশ্য আমাদের সম্মুখে যে কয়জন মাদ্রাজী বন্ধু রহিয়াছেন, তাহাদিগকে বাদ দিয়া আমি এই কথা বলিতেছি। তাঁহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

অতএব যদিও আহার সম্বন্ধে এই উভয় মত একত্র করিলেই একটি সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলেও ‘উলটা বুঝিলি রাম’ করিও না। আজকাল এই খাদ্যের বিচার লইয়া ও বর্ণাশ্রম লইয়া খুব রব উঠিয়াছে। আর এ বিষয় লইয়া বাঙালীরাই সর্বাপেক্ষা অধিক চীৎকার করিতেছেন। আমি তোমাদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমরা এই বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে কি জানো, বলো দেখি। এ দেশে এখন সেই চাতুর্বণ্য কোথায়? আমার কথার উত্তর দাও। আমি চাতুর্বণ্য দেখিতে পাইতেছি না। যেমন কথায় বলে, ‘মাথা নেই তার মাথা ব্যথা’, এখানে তোমাদের বর্ণাশ্রমধর্ম-প্রচারের চেষ্টাও সেইরূপ। এখানে তো চারি বর্ণ নাই; আমি এখানে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র জাতি দেখিতেছি। যদি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি থাকে, তবে তাহারা কোথায়?—হিন্দুধর্মের নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণগণ কেন তাঁহাদিগকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া বেদপাঠ করিতে আদেশ করেন না? আর যদি এদেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্য না থাকে, যদি কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্রই থাকে, তবে শাস্ত্রানুসারে যে-দেশে কেবল শূদ্রের বাস, এমন দেশে ব্রাহ্মণের বাস করা উচিত নয়। অতএব তল্পিতল্পা বাঁধিয়া তোমাদের এ দেশ হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত। যাহারা ম্লেচ্ছখাদ্য আহার করে এবং ম্লেচ্ছরাজ্যে বাস করে, তাহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলিয়াছেন, তাহা কি তোমরা জানো? তোমরা তো বিগত সহস্র বৎসর যাবৎ ম্লেচ্ছখাদ্য আহার ও ম্লেচ্ছরাজ্যে বাস করিতেছ। ইহার প্রায়শ্চিত্ত কি, তাহা কি তোমরা জানো? ইহার প্রায়শ্চিত্ত তুষানল। তোমরা আচার্যের আসন গ্রহণ করিতে চাও, কিন্তু কার্যে কেন কপটাচারী হও? যদি তোমরা তোমাদের শাস্ত্রে বিশ্বাসী হও, তবে তোমরাও সেই ব্রাহ্মণবরিষ্ঠের মতো হও—যিনি মহাবীর আলেকজাণ্ডারের

সহিত গ্রীসদেশে গিয়াছিলেন এবং ম্লেচ্ছখাদ্য-ভোজনের জন্য নিজেকে তুষানলে দগ্ধ করেন। এইরূপ কর দেখি! দেখিবে, সমগ্রজাতি তোমাদের পদতলে আসিয়া পড়িবে। তোমরা নিজেরাই তোমাদের শাস্ত্রে বিশ্বাস কর না—আবার অপরকে বিশ্বাস করাইতে চাও! যদি তোমরা মনে কর যে, এ যুগে ও-রূপ কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে তোমরা সমর্থ নও, তবে তোমাদের দুর্বলতা স্বীকার কর এবং অপরের দুর্বলতা ক্ষমা কর, অন্যান্য জাতির উন্নতির জন্য যতদূর পারো সহায়তা কর। তাহাদিগকে বেদ পড়িতে দাও। জগতের অন্যান্য স্থানের আর্যগণের মতো সৎ আর্য হও। আর হে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ, আমি আপনাদিগকে বিশেষভাবে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি, আপনারা প্রকৃত আর্য হউন।

যে জঘন্য বামাচার তোমাদের দেশকে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে, উহা অবিলম্বে পরিত্যাগ কর। তোমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান বিশেষভাবে দেখ নাই। তোমরা পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের যতই বড়াই কর না কেন, যখন আমি স্বদেশে প্রবেশ করি—যখন আমি দেখি আমাদের সমাজে বামাচার কি ভয়ানকভাবে প্রবেশ করিয়াছে, তখন এদেশ আমার কাছে অতি ঘৃণিত নরকতুল্য স্থান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই বামাচার-সম্প্রদায়সমূহ আমাদের বাঙলাদেশের সমাজকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। আর যাহারা রাত্রে অতি বীভৎস লাম্পট্যাদি কার্যে ব্যাপৃত থাকে, তাহারাই আবার দিনে আচার সম্বন্ধে উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করে এবং অতি ভয়ানক গ্রন্থসকল তাহাদের কার্যের সমর্থক। তাহাদের শাস্ত্রের আদেশেই তাহারা এমন সব বীভৎস কাজ করিয়া থাকে। বাঙলাদেশের লোক—সকলেই ইহা জানে। বামাচার-তন্ত্রগুলিই বাঙালীর শাস্ত্র। এই তন্ত্র রাশি রাশি প্রকাশিত হইতেছে এবং শ্রুতিশিক্ষার পরিবর্তে এগুলি আলোচনা করিয়া তোমাদের পুত্রকন্যাগণের চিত্ত কলুষিত হইতেছে।

হে কলিকাতাবাসী ভদ্রমহোদয়গণ! আপনাদের কি লজ্জা হয় না যে, এই সানুবাদ বামাচারতন্ত্ররূপ ভয়ানক জিনিস আপনাদের পুত্রকন্যাগণের হস্তে পড়িয়া তাহাদের চিত্ত কলুষিত করিতেছে এবং বাল্যকাল হইতেই ঐ-গুলি হিন্দুর শাস্ত্র বলিয়া তাহাদিগকে শেখানো হইতেছে? যদি আপনারা সত্যই লজ্জিত হন, তবে তাহাদের নিকট হইতে ঐগুলি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে প্রকৃত শাস্ত্র—বেদ, উপনিষদ্, গীতা পড়িতে দিন।

ভারতের দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়সমূহের মতে জীবাত্মা চিরকাল জীবাত্মাই থাকিবে। ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ; তিনি পূর্ব হইতেই অবস্থিত উপাদান-কারণ হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীদের মতে কিন্তু ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ দুই-ই। তিনি শুধু জগতের সৃষ্টিকর্তা নহেন, কিন্তু তিনি উপাদানভূত নিজ সত্তা হইতেই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; ইহাই অদ্বৈতবাদীর মত। কতকগুলি কিম্ভূতকিমাকার দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় আছে, তাহারা বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর নিজ সত্তা হইতেই এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ তিনি জগৎ হইতে চির পৃথক্। আবার সকলেই সেই জগৎপতির চির অধীন। আবার অনেক সম্প্রদায় আছে, যেগুলির মত এই যে, ঈশ্বর নিজেকে উপাদান করিয়া এই জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন, আর জীবগণ কালে সান্তভাব পরিত্যাগ করিয়া অনন্তে মিশিয়া নির্বাণলাভ করিবে। কিন্তু এই-সকল সম্প্রদায় এখন লোপ পাইয়াছে। বর্তমান ভারতে যে-সব অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা সকলেই শঙ্করের অনুগামী। শঙ্করের মতে ঈশ্বর মায়াবশেই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ হইয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে নহে। ঈশ্বর যে এই জগৎ হইয়াছেন, তাহা নহে; কিন্তু বস্তুতঃ জগৎ নাই, ঈশ্বরই আছেন।

অদ্বৈত বেদান্তের এই মায়াবাদ বুঝা কঠিন। এই বক্তৃতায় আমাদের দর্শনের এই দুরূহ বিষয় আলোচনা করিবার সময় নাই। তোমাদের মধ্যে যাহারা পাশ্চাত্য-দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাহারা কাণ্টের (Kant) দর্শনে কতকটা এই ধরনের মত দেখিতে পাইবে। তবে তোমাদের মধ্যে যাহারা কাণ্ট সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের লেখা পড়িয়াছ, তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, তাঁহার লেখায় একটা মস্ত ভুল আছে। অধ্যাপকের মতে দেশ-কাল-নিমিত্ত যে আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, তাহা কাণ্টই প্রথম আবিষ্কার করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। শঙ্করই ইহার আবিষ্কর্তা। তিনি দেশ-কাল-নিমিত্তকে মায়ার সহিত অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে শঙ্করভাষ্যে এই ভাবের কথা দুই-এক জায়গায় দেখিতে পাইয়া আমি বন্ধুবর অধ্যাপক মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলাম। অতএব দেখিতেছ, কাণ্টের পূর্বেও এই তত্ত্ব ভারতে অজ্ঞাত ছিল না। অদ্বৈতবেদান্তীদের এই মায়াবাদ মতটি একটু অপূর্ব ধরনের। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্তু, ভেদ মায়াপ্রসূত।

এই একত্ব, এই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মই আমাদের চরম লক্ষ্য। আবার এইখানেই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে চিরদ্বন্দ্ব। সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ ভারত সমগ্র জগতের নিকট এই মায়াবাদ ঘোষণা করিয়া আহ্বান করিয়াছে—যাহার ক্ষমতা আছে ইহা খণ্ডন কর। জগতের বিভিন্ন জাতি ঐ আহ্বানে ভারতীয় মতের প্রতিবাদে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু তাহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তোমরা এখনও জীবিত আছ। ভারত জগতের নিকট ঘোষণা করিয়াছে—সবকিছুই ভ্রান্তি, সবকিছুই মায়ামাত্র। মৃত্তিকা হইতে ভাত কুড়াইয়াই খাও, অথবা স্বর্ণপাত্রে ভোজন কর, মহারাজ-চক্রবর্তী হইয়া রাজপ্রাসাদেই বাস কর, অথবা অতি দরিদ্র ভিক্ষুক হও, মৃত্যুই একমাত্র পরিণাম। সকলেরই সেই এক গতি, সবই মায়া। ইহাই ভারতের অতি প্রাচীন কথা। বারবার বিভিন্ন জাতি উঠিয়া উহা খণ্ডন করিবার, উহা ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে; তাহারা বড় হইয়া নিজেদের হাতে সমুদয় ক্ষমতা লইয়াছে, ভোগকেই তাহাদের মূলমন্ত্র করিয়াছে। যতদূর সাধ্য তাহারা সেই ক্ষমতা পরিচালনা করিয়াছে, যতদুর সাধ্য ভোগ করিয়াছে, কিন্তু পর মুহূর্তে তাহারা মরিয়াছে। আমরা চিরকাল অক্ষত রহিয়াছি, তাহার কারণ আমরা দেখিতেছি—সবই মায়া। মহামায়ার সন্তানগণ চিরকাল বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু অবিদ্যার সন্তানগণের পরমায়ু অতি অল্প।

এখানে আবার আর একটি বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রাচীন ভারতেও জার্মান দার্শনিক হেগেল ও শোপেনহাওয়ার-এর মতের ন্যায় মতবাদের বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ হেগেলীয় মতবাদ এখানে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছিল; উহার অঙ্কুর উদ্গত হইয়া বৃক্ষাকারে পরিণত হইতে, উহার সর্বনাশা শাখাপ্রশাখাকে আমাদের এ মাতৃভূমিতে বিস্তৃত হইতে দেওয়া হয় নাই। হেগেলের মূল কথাটা এই: সেই এক নিরপেক্ষ সত্তা বিশৃঙ্খলামাত্র; আর সাকার ব্যষ্টি উহা হইতে মহত্তর। অর্থাৎ অ-জগৎ হইতে জগৎ শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ হইতে সংসার শ্রেষ্ঠ। ইহাই হেগেলের মূল কথা; সুতরাং তাঁহার মতে যতই তুমি সংসারসমুদ্রে ঝাঁপ দিবে, তোমার আত্মা যতই জীবনের বিভিন্ন কর্মজালে আবৃত হইবে, ততই তুমি উন্নত হইবে। পাশ্চাত্যেরা বলেন, তোমরা কি দেখিতেছ না, আমরা কেমন ইমারত বানাইতেছি, কেমন রাস্তা সাফ রাখিতেছি, কেমন ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ

করিতেছি! ইহার পশ্চাতে—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ভোগের পশ্চাতে ঘোর দুঃখ-যন্ত্রণা, পৈশাচিকতা, ঘৃণা-বিদ্বেষ লুকাইয়া থাকিতে পারে,—কিন্তু তাহাতে কোন্ ক্ষতি নাই!

অপরদিকে আমাদের দেশের দার্শনিকগণ প্রথম হইতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্রত্যেক অভিব্যক্তিই—যাহাকে তোমরা ক্রমবিকাশ বলো—তাহা সেই অব্যক্তকে ব্যক্ত করিবার বৃথা চেষ্টামাত্র। এই জগতের সর্বশক্তিমান্ কারণ-স্বরূপ তুমি নিজেকে ক্ষুদ্র পঙ্কিল ডোবায় প্রতিবিম্বিত করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছ। কিছুদিন ঐ চেষ্টা করিয়া তুমি বুঝিবে, উহা অসম্ভব। তখন যেখান হইতে আসিয়াছিলে, পলাইয়া সেইখানেই ফিরিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই বৈরাগ্য—এই বৈরাগ্য আসিলেই ধর্ম আরম্ভ হইল বুঝিতে হইবে। ত্যাগ ব্যতীত কিরূপে ধর্ম বা নীতির আরম্ভ হইতে পারে? ত্যাগেই ধর্মের আরম্ভ, ত্যাগেই উহার সমাপ্তি। ত্যাগ কর। বেদ বলিতেছেন: ত্যাগ কর—ইহা ব্যতীত অন্য পথ নাই।—ন প্রজয়া ধনেন ন চেজ্যায়া ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ ॥[১] —সন্তানের দ্বারা নহে, ধনের দ্বারা নহে, যজ্ঞের দ্বারা নহে, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

ইহাই সকল ভারতীয় শাস্ত্রের আদেশ। অবশ্য অনেকে রাজসিংহাসনে বসিয়াও মহাত্যাগীর জীবন দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু জনককেও কিছুদিনের জন্য সংসারের সহিত সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, এবং তাঁহার অপেক্ষা বড় ত্যাগী কে ছিলেন? কিন্তু আজকাল আমরা সকলেই 'জনক' বলিয়া পরিচিত হইতে চাই। তাহারা জনক বটে, কিন্তু তাহারা কতকগুলি হতভাগা সন্তানের জনকমাত্র—তাহারা তাহাদের পেটের ভাত ও পরনের কাপড় জোগাইতেও অসমর্থ। ঐটুকুই তাহাদের জনকত্ব, পুর্বকালীন জনকের মতো তাঁহাদের ব্রহ্মনিষ্ঠা নাই। আমাদের আজকালকার জনকদের এই ভাব! এখন জনক হইবার চেষ্টা একটু কম করিয়া লক্ষ্যের দিকে সোজা অগ্রসর হও দেখি। যদি ত্যাগ করিতে পারো, তবেই তোমার ধর্ম হইবে। যদি না পারো, তবে তুমি প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্য পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে যত পুস্তকালয় আছে,

১ নারায়ণ উপ. ১২।৩

সেগুলির যাবতীয় গ্রন্থ পড়িয়া দিগ্‌গজ পণ্ডিত হইতে পারো, কিন্তু যদি শুধু কর্মকাণ্ড লইয়াই থাকো, তবে বুঝিতে হইবে তোমার কিছুই হয় নাই, তোমার ভিতর ধর্মের বিকাশ কিছুমাত্র হয় নাই।

কেবল ত্যাগের দ্বারাই এই অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে, ত্যাগই মহাশক্তি। যাহার ভিতর এই মহাশক্তির আবির্ভাব হয়, সে সমগ্র জগৎকে পর্যন্ত গ্রাহ্য করে না। তখন তাহার নিকট সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদতুল্য হইয়া যায়—'ব্রহ্মাণ্ডং গোষ্পদায়তে'। ত্যাগই ভারতের সনাতন পতাকা। যে-সকল জাতি মরিতে বসিয়াছে, ঐ পতাকা সমগ্র জগতে উড়াইয়া ভারত তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে—সর্বপ্রকার অত্যাচার, সর্বপ্রকার অসাধুতার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে; তাহাদিগকে যেন বলিতেছে: সাবধান! ত্যাগের পথ, শান্তির পথ অবলম্বন কর, নতুবা মরিবে।

হিন্দুগণ, ঐ ত্যাগের পতাকা পরিত্যাগ করিও না—সকলের সমক্ষে উহা তুলিয়া ধর। তুমি যদিও দুর্বল হও এবং ত্যাগ না করিতে পারো, তবু আদর্শকে খাটো করিও না। বলো, আমি দুর্বল—আমি সংসার ত্যাগ করিতে পারিতেছি না, কিন্তু কপটতার আশ্রয় করিবার চেষ্টা করিও না—শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করিয়া, আপাতমধুর যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়া লোকের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করিও না; অবশ্য যাহারা এইরূপ যুক্তিতে মুগ্ধ হইয়া যায়, তাহাদেরও উচিত নিজে নিজে শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করা। যাহা হউক, এরূপ কপটতা করিও না, বলো যে আমি দুর্বল। কারণ এই ত্যাগ বড়ই মহান্ আদর্শ। যদি যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সৈন্যের পতন হয়, তাহাতে ক্ষতি কি—যদি দশ জন, দু-জন, এক জন সৈন্যও জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসে।

যুদ্ধে যে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়, তাহারা ধন্য; কারণ তাহাদের শোণিতমূল্যেই জয়লাভ হয়। একটি ব্যতীত ভারতের সকল বৈদিক সম্প্রদায়ই এই ত্যাগকে প্রধান আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। একমাত্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বল্লভাচার্য সম্প্রদায় তাহা করেন নাই। আর তোমাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিতে পারিতেছ, যেখানে ত্যাগ নাই, সেখানে শেষে কি দাঁড়ায়। এই ত্যাগের আদর্শ রক্ষা করিতে গিয়া যদি গোঁড়ামি—অতি বীভৎস গোঁড়ামি আশ্রয় করিতে হয়, ভস্মমাখা ঊর্ধ্ববাহু জটাজুটধারীদিগকে প্রশ্রয় দিতে হয়, সেও ভাল। কারণ যদিও ঐগুলি অস্বাভাবিক, তথাপি যে ললনাসুলভ

বিলাসিতা ভারতে প্রবেশ করিয়া আমাদের মজ্জা মাংস পর্যন্ত শুষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে এবং সমগ্র ভারতীয় জাতিকে কপটতায় পূর্ণ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে, সেই বিলাসিতার স্থানে ত্যাগের আদর্শ ধরিয়া সমগ্র জাতিকে সাবধান করিবার জন্য একটু কৃচ্ছ্রসাধন প্রয়োজন। আমাদিগকে ত্যাগের আদর্শ অবলম্বন করিতে হইবেই হইবে। প্রাচীনকালে এই ত্যাগ সমগ্র ভারতকে জয় করিয়াছিল, এখনও এই ত্যাগই আবার ভারতকে জয় করিবে। এই ত্যাগ এখনও ভারতীয় সকল আদর্শের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ। ভগবান্ বুদ্ধ, ভগবান্ রামানুজ, ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মভূমি, ত্যাগের লীলাভূমি এই ভারত—যেখানে অতি প্রাচীনকাল হইতে কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ চলিতেছে, যেখানে এখনও শত শত ব্যক্তি সর্বত্যাগ করিয়া জীবন্মুক্ত হইতেছেন, সেই দেশ কি এখন তাহার আদর্শ জলাঞ্জলি দিবে? কখনই নহে। হইতে পারে—পাশ্চাত্য বিলাসিতার আদর্শে কতকগুলি ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে, হইতে পারে—সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই ইন্দ্রিয়ভোগরূপ পাশ্চাত্য গরল আকণ্ঠ পান করিয়াছে, তথাপি আমার মাতৃভূমিতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি নিশ্চয়ই আছেন, যাঁহাদের নিকট ধর্ম কেবল কথার কথা মাত্র থাকিবে না, যাঁহারা প্রয়োজন হইলে ফলাফল বিচার না করিয়াই সর্বত্যাগে প্রস্তুত হইবেন।

আর একটি বিষয়ে আমাদের সকল সম্প্রদায় একমত—সেটি আমি তোমাদের সকলের সমক্ষে বলিতে ইচ্ছা করি। এই বিষয়টিও বিরাট। ধর্মকে সাক্ষাৎ করিতে হইবে—এই ভাবটি ভারতের বিশেষ সম্পত্তি।

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।'

—অধিক বাক্যব্যয়ের দ্বারা অথবা কেবল বুদ্ধিবলে বা অনেক শাস্ত্র পাঠ করিয়া এই আত্মাকে লাভ করা যায় না। শুধু তাহাই নহে, জগতের মধ্যে একমাত্র আমাদের শাস্ত্রই ঘোষণা করেন, শাস্ত্রপাঠের দ্বারাও আত্মাকে লাভ করিতে পারা যায় না, বৃথা বাক্যব্যয় ও বক্তৃতা দ্বারাও আত্মজ্ঞানলাভ হয় না; আত্মাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে। গুরু হইতে শিষ্যে এই শক্তি সংক্রামিত হয়। শিষ্যের যখন এই অন্তর্দৃষ্টি হয়, তখন তাঁহার নিকট সব পরিষ্কার হইয়া যায়, তিনি তখন সাক্ষাৎ আত্মোপলব্ধি করেন।

আর এক কথা। বাঙলা দেশে এক অদ্ভুত প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়—উহার নাম কুলগুরুপ্রথা। আমার পিতা তোমার গুরু ছিলেন—এখন আমিও

তোমার গুরু হইব। আমার পিতা তোমার পিতার গুরু ছিলেন, সুতরাং আমিও তোমার গুরু হইব। গুরু কাহাকে বলে? এ সম্বন্ধে প্রাচীন বৈদিক মত আলোচনা কর: যিনি বেদের রহস্য জানেন—গ্রন্থকীট, বৈয়াকরণ বা সাধারণ পণ্ডিতগণ গুরু হইবার যোগ্য নহেন—কিন্তু যিনি বেদের যথার্থ তাৎপর্য জানেন, তিনিই গুরু। 'যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।' —যেমন চন্দনভারবাহী গর্দভ চন্দনের ভারই জানে, কিন্তু চন্দনের গুণাবলী অবগত নহে। এই পণ্ডিতেরাও সেইরূপ। ইঁহাদের দ্বারা আমাদের কোন কাজ হইবে না। তাঁহারা যদি প্রত্যক্ষ অনুভব না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা কি শিখাইবেন? বালক-বয়সে এই কলিকাতা শহরে আমি ধর্মান্বেষণে এখানে ওখানে ঘুরিতাম আর বড় বড় বক্তৃতা শুনিবার পর বক্তাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, 'আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?' ঈশ্বর-দর্শনের কথায় সে ব্যক্তি চমকিয়া উঠিত; একমাত্র রামকৃষ্ণ পরমহংসই আমাকে বলিয়াছিলেন, 'আমি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি।' শুধু তাহাই নহে, তিনি আরও বলিয়াছিলেন, 'আমি তোমাকে তাঁহার দর্শনলাভ করিবার পথ দেখাইয়া দিব।' শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করিতে পারিলেই যথার্থ গুরুপদবাচ্য হওয়া যায় না।

বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে ॥[1]

—নানা প্রকারে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার কৌশল কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্য, মুক্তির জন্য নহে।

'শ্রোত্রিয়'—যিনি বেদের রহস্যবিৎ, 'অবৃজিন'—নিষ্পাপ, 'অকামহত'—যিনি তোমাকে উপদেশ দিয়া অর্থসংগ্রহের বাসনা করেন না, তিনিই শান্ত, তিনিই সাধু। বসন্তকাল আসিলে যেমন বৃক্ষে পত্রমুকুলোদয় হয়, অথচ উহা যেমন বৃক্ষের নিকট ঐ উপকারের পরিবর্তে কোন প্রত্যুপকার চাহে না, কারণ উহার প্রকৃতিই অপরের হিতসাধন, তেমনি পরের হিত করিব, কিন্তু তাহার প্রতিদানস্বরূপ কিছু চাহিব না। প্রকৃত গুরু এইরূপ।[2]

তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনাঃ।
অহেতুনান্যানপি তারয়ন্তঃ ॥[3]

---

১ বিবেকচূড়ামণি, ৬০ ২ শান্তাঃ মহান্তঃ নিবসন্তি সন্তঃ বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।—ঐ, ৩৯ ৩ ঐ, ৩৯

—তাঁহারা স্বয়ং ভীষণ জীবনসমুদ্র পার হইয়া গিয়াছেন এবং নিজেদের কোন লাভের আশা না রাখিয়া অপরকে ত্রাণ করেন। এইরূপ ব্যক্তিগণই গুরু, এবং ইহাও বুঝিও যে, আর কেহই গুরু হইতে পারে না। কারণ,

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দংদ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়াঃ অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥[১]

—নিজেরা অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে, কিন্তু অহঙ্কারবশতঃ মনে করিতেছে, তাহারা সব জানে; শুধু ইহা ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত নহে, তাহারা আবার অপরকে সাহায্য করিতে যায়। তাহারা নানারূপ কুটিল পথে ভ্রমণ করিতে থাকে। এইরূপ অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় তাহারা উভয়েই খানাডোবায় পড়িয়া যায়।

তোমাদের বেদ এই কথা বলেন। এই বাক্যের সহিত তোমাদের আধুনিক প্রথার তুলনা কর। তোমরা বৈদান্তিক, তোমরা খাঁটি হিন্দু, তোমরা সনাতন-পন্থার পক্ষপাতী। আমি তোমাদিগকে সনাতন আদর্শের আরও অধিক পক্ষপাতী করিতে চাই। যতই তোমরা সনাতন পন্থার অধিকতর পক্ষপাতী হইবে, ততই অধিকতর বুদ্ধিমানের মতো কাজ করিবে; আর যতই তোমরা আজকালকার গোঁড়ামির অনুসরণ করিবে, ততই তোমরা অধিক নির্বোধের মতো কাজ করিবে। তোমাদের সেই অতি প্রাচীন সনাতন পন্থা অবলম্বন কর; কারণ তখনকার শাস্ত্রের প্রত্যেক বাণী বীর্যবান্ স্থির অকপট হৃদয় হইতে উত্থিত, উহার প্রত্যেক স্বরটিই অমোঘ। তাহার পর জাতীয় অবনতি আসিল —শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম সকল বিষয়েই অবনতি হইল। উহার কারণ-পরম্পরা বিচার করিবার সময় আমাদের নাই, কিন্তু তখনকার লিখিত সকল পুস্তকেই আমাদের এই জাতীয় ব্যাধির, জাতীয় অবনতির প্রমাণ পাওয়া যায়; জাতীয় বীর্যের পরিবর্তে উহাতে কেবল রোদনধ্বনি। সেই প্রাচীনকালের ভাব লইয়া আইস, যখন জাতীয় শরীরে বীর্য ও জীবন ছিল। তোমরা আবার বীর্যবান্ হও, সেই প্রাচীন নির্ঝরিণীর জল আবার প্রাণ ভরিয়া পান কর। ইহা ব্যতীত ভারতের বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই।

১ কঠ উপ., ১।২।৫

আমি অবান্তর প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রস্তাবিত বিষয় একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলাম; বিষয়টি বিস্তীর্ণ এবং আমার তোমাদিগকে এত কথা বলিবার আছে যে, আমি সব ভুলিয়া যাইতেছি। যাহা হউক, অদ্বৈতবাদীর মতে—আমাদের যে ব্যক্তিত্ববোধ রহিয়াছে, তাহা ভ্রমমাত্র। সমগ্র জগতের পক্ষেই এই কথাটি ধারণা করা অতি কঠিন। যখনই তুমি কাহাকেও বলো যে, সে 'ব্যক্তি' নহে, সে ঐ কথায় এত ভীত হইয়া উঠে যে, সে মনে করে, তাহার আমিত্ব—তাহা যাহাই হউক না কেন—বুঝি নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু অদ্বৈতবাদী বলেন, প্রকৃতপক্ষে তোমার 'আমিত্ব' বলিয়া কিছুই নাই। জীবনের প্রতি মুহূর্তেই তোমার পরিবর্তন হইতেছে। তুমি এক সময় বালক ছিলে, তখন একভাবে চিন্তা করিয়াছ; এখন তুমি যুবক, এখন একভাবে চিন্তা করিতেছ; আবার যখন বৃদ্ধ হইবে, তখন আর একভাবে চিন্তা করিবে। সকলেরই পরিণাম হইতেছে। ইহাই যদি হয়, তবে আর তোমার 'আমিত্ব' কোথায়? এই 'আমিত্ব' বা 'ব্যক্তিত্ব' তোমার দেহগত নহে, মনোগতও নহে। এই দেহমনের পারে তোমার আত্মা; আর অদ্বৈতবাদী বলেন, এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ। দুইটি অনন্ত কখন থাকিতে পারে না। একজন ব্যক্তিই আছেন—তিনি অনন্তস্বরূপ।

সাদা কথায় বুঝাইতে গেলে বলিতে হয়, আমরা বিচারশীল প্রাণী, আমরা সব জিনিসই বিচার করিয়া বুঝিতে চাই। এখন বিচার বা যুক্তি কাহাকে বলে? যুক্তি-বিচারের অর্থ—অল্প-বিস্তর শ্রেণীভুক্তকরণ, ক্রমশঃ পদার্থনিচয়কে উচ্চ উচ্চ শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করিয়া শেষে এমন একস্থানে পৌছানো, যাহার উপর আর যাওয়া চলে না। সসীম বস্তুকে যদি অনন্তের পর্যায়ভুক্ত করিতে পারা যায়, তবে উহার চরম বিশ্রাম হয়। একটি সসীম বস্তু লইয়া উহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া যাও, কিন্তু যতক্ষণ না তুমি চরমে অর্থাৎ অনন্তে পৌছিতেছ, ততক্ষণ কোথাও শান্তি পাইবে না। আর অদ্বৈতবাদী বলেন: এই অনন্তেরই একমাত্র অস্তিত্ব আছে; আর সবই মায়া, আর কিছুরই সত্তা নাই। যে-কোন জড়বস্তু হউক, তাহার যথার্থ স্বরূপ যাহা, তাহা এই ব্রহ্ম। আমরা এই ব্রহ্ম; নামরূপাদি আর যাহা কিছু সবই মায়া, ঐ নামরূপ তুলিয়া লও, তাহা হইলে আর তোমার আমার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু আমাদিগকে এই 'আমি' শব্দটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ লোকে বলে, যদি আমি ব্রহ্মই

হই, তবে আমি যাহা ইচ্ছা করিতে পারি না কেন? কিন্তু এখানে এই 'আমি' শব্দটি অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। তুমি যখন নিজেকে বদ্ধ বলিয়া মনে কর, তখন তুমি আর আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম নও—ব্রহ্মের কোন অভাব নাই, তিনি অন্তর্জ্যোতিঃ, তিনি অন্তরারাম, আত্মতৃপ্ত; তাঁহার কোন অভাব নাই, তাঁহার কোন কামনা নাই, তিনি সম্পূর্ণ নির্ভয় ও সম্পূর্ণ স্বাধীন; তিনিই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মস্বরূপে আমরা সকলেই এক।

সুতরাং দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর মধ্যে এইটি বিশেষ পার্থক্য বলিয়া বোধ হয়। তোমরা দেখিবে, শঙ্করাচার্যের মতো বড় বড় ভাষ্যকারেরা পর্যন্ত নিজেদের মত সমর্থন করিবার জন্য স্থানে স্থানে শাস্ত্রের এরূপ অর্থ করিয়াছেন, যাহা আমার সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। রামানুজও শাস্ত্রের এমন অর্থ করিয়াছেন, যাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। আমাদের পণ্ডিতদের ভিতরেও এই ধারণা দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে একটি মতই সত্য হইতে পারে, আর সবগুলিই মিথ্যা, যদিও তাঁহারা শ্রুতি হইতে এই তত্ত্ব পাইয়াছেন —যে অপূর্ব তত্ত্ব ভারতের এখনও জগৎকে শিক্ষা দিতে হইবে—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব, প্রকৃত সত্তা এক, মুনিগণ তাঁহাকেই নানারূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র, আর এই মূলতত্ত্বটিকে কার্যে পরিণত করাই আমাদের জাতির প্রধান জীবন-সমস্যা। ভারতে কয়েকজন মাত্র পণ্ডিত ব্যতীত আমরা সকলেই সর্বদা এই তত্ত্ব ভুলিয়া যাই—আমি পণ্ডিত অর্থে প্রকৃত ধার্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিতেছি। আমরা এই মহান্ তত্ত্বটি সর্বদাই ভুলিয়া যাই, আর তোমরা দেখিবে অধিকাংশ পণ্ডিতের—আমার বোধ হয় শতকরা ৯৮ জনের—মত এই যে, হয় অদ্বৈতবাদ সত্য, নয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সত্য, নতুবা দ্বৈতবাদ সত্য। যদি বারাণসীধামে পাঁচ মিনিটের জন্য কোন ঘাটে গিয়া উপবেশন কর, তবে তুমি আমার কথার প্রমাণ পাইবে; দেখিবে, এই-সকল বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মত লইয়া রীতিমত যুদ্ধ চলিয়াছে। আমাদের সমাজের ও পণ্ডিতদের তো এই অবস্থা!

এই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক কলহ-দ্বন্দ্বের ভিতর এমন একজনের অভ্যুদয় হইল, যিনি ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে, সেই সামঞ্জস্য কার্যে পরিণত করিয়া নিজ জীবনে দেখাইয়াছিলেন। আমি রামকৃষ্ণ

পরমহংসদেবকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিতেছি। তাঁহার জীবন আলোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, উভয় মতই আবশ্যক ; উহারা গণিতজ্যোতিষের ভূকেন্দ্রিক (Geocentric) ও সূর্য-কেন্দ্রিক (Heliocentric) মতের ন্যায়। বালককে যখন প্রথম জ্যোতিষ শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন তাহাকে ঐ ভূকেন্দ্রিক মতই শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু যখন সে জ্যোতিষের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন ঐ সূর্যকেন্দ্রিক মত শিক্ষা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে, সে তখন জ্যোতিষের তত্ত্বসমূহ পূর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে বুঝিতে পারে। পঞ্চেন্দ্রিয়াবদ্ধ জীব স্বভাবতই দ্বৈতবাদী হইয়া থাকে। যতদিন আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আবদ্ধ, ততদিন আমরা সগুণ ঈশ্বরই দর্শন করিব—সগুণ ঈশ্বরের অতিরিক্ত আর কোন ভাব উপলব্ধি করিতে পারি না, আমরা জগৎকে ঠিক এইরূপই দেখিতে পাইব। রামানুজ বলেন, যতদিন তুমি আপনাকে দেহ মন বা জীব বলিয়া জানি করিতেছ, ততদিন তোমার প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ায় জীব জগৎ এবং এই উভয়ের কারণস্বরূপ বস্তুবিশেষের জ্ঞান থাকিবে। কিন্তু মনুষ্যজীবনে কখন কখন এমন সময় আসে, যখন দেহের জ্ঞান একেবারে চলিয়া যায়, যখন মন পর্যন্ত ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া প্রায় অন্তর্হিত হয়, যখন যে-সকল বস্তু আমাদের ভীতি উৎপাদন করে, আমাদিগকে দুর্বল করে এবং এই দেহে আবদ্ধ করিয়া রাখে, সেগুলি চলিয়া যায়। তখন—কেবল তখনই সে সেই প্রাচীন মহান্ উপদেশের সত্যতা বুঝিতে পারে। সেই উপদেশ কি ?

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥[১]

—যাঁহাদের মন সাম্যভাবে অবস্থিত, তাঁহারা এইখানেই সংসার জয় করিয়াছেন। ব্রহ্ম নির্দোষ এবং সর্বত্র সম, সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্মে অবস্থিত।

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥[২]

—ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া তিনি আত্মা দ্বারা আত্মাকে হিংসা করেন না, সুতরাং পরম গতি প্রাপ্ত হন।

১ গীতা, ৫।১৯ ২ গীতা, ১৩।২৮

গীতাতত্ত্ব

স্বামীজী কলিকাতায় অবস্থানকালে অধিকাংশ সময়ই তদানীন্তন আলমবাজারের মঠে বাস করিতেন। এই সময় কলিকাতাবাসী কয়েকজন যুবক, যাঁহারা পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন, স্বামীজীর নিকট ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হন। স্বামীজী ইঁহাদিগকে ধ্যান-ধারণা এবং গীতা বেদান্ত প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া ভবিষ্যতে কর্মের উপযুক্ত করিতে লাগিলেন। একদিন গীতাব্যাখ্যাকালে তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ জনৈক ব্রহ্মচারী কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। তাহাই এখানে 'গীতাতত্ত্ব' নামে সংকলিত হইল।

গীতাগ্রন্থখানি মহাভারতের অংশবিশেষ। এই গীতা বুঝিতে চেষ্টা করিবার পূর্বে কয়েকটি বিষয় জানা আবশ্যক। প্রথম—গীতাটি মহাভারতের ভিতর প্রক্ষিপ্ত অথবা মহাভারতেরই অংশবিশেষ অর্থাৎ উহা বেদব্যাস-প্রণীত কি না? দ্বিতীয়—কৃষ্ণ নামে কেহ ছিলেন কি না? তৃতীয়—যে যুদ্ধের কথা গীতায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যথার্থ ঘটিয়াছিল কি না? চতুর্থ—অর্জুনাদি যথার্থ ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না? প্রথমতঃ সন্দেহ হইবার কারণগুলি কি, দেখা যাক।

প্রথম প্রশ্ন

বেদব্যাস নামে পরিচিত অনেকে ছিলেন, তন্মধ্যে বাদরায়ণ ব্যাস বা দ্বৈপায়ন ব্যাস—কে ইহার প্রণেতা? ব্যাস একটি উপাধিমাত্র। যিনি কোন পুরাণাদি শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তিনি 'ব্যাস' নামে পরিচিত। যেমন বিক্রমাদিত্য—এই নামটিও একটি সাধারণ নাম। শঙ্করাচার্য ভাষ্য রচনা করিবার পূর্বে গীতা গ্রন্থখানি সর্বসাধারণে ততদূর পরিচিত ছিল না। তাঁহার পরেই গীতা সর্বসাধারণে বিশেষরূপে পরিচিত হয়। অনেকে বলেন, গীতার বোধায়ন-ভাষ্য পূর্বে প্রচলিত ছিল। এ কথা প্রমাণিত হইলে গীতার প্রাচীনত্ব ও ব্যাসকর্তৃত্ব কতকটা সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু বেদান্তদর্শনের যে বোধায়ন-ভাষ্য ছিল বলিয়া শুনা যায়, যদবলম্বনে রামানুজ 'শ্রীভাষ্য' প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়াছেন, শঙ্করের ভাষ্যের মধ্যে উদ্ধৃত যে ভাষ্যের অংশবিশেষ উক্ত বোধায়ন-কৃত বলিয়া

অনেকে অনুমান করেন, যাহার কথা লইয়া দয়ানন্দ স্বামী প্রায় নাড়াচাড়া করিতেন, তাহা আমি সমুদয় ভারতবর্ষ খুঁজিয়া এ পর্যন্ত দেখিতে পাই নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, রামানুজও অপর লোকের হস্তে একটি কীটদষ্ট পুঁথি দেখিয়া তাহা হইতে তাঁহার ভাষ্য রচনা করেন। বেদান্তের বোধায়ন-ভাষ্যই যখন এতদূর অনিশ্চয়ের অন্ধকারে, তখন গীতাসম্বন্ধে তৎকৃত ভাষ্যের উপর কোন প্রমাণ স্থাপন করিবার চেষ্টা বৃথা প্রয়াসমাত্র। অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে, গীতাখানি শঙ্করাচার্য-প্রণীত। তাঁহাদের মতে—তিনি উহা প্রণয়ন করিয়া মহাভারতের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

কৃষ্ণসম্বন্ধে সন্দেহ এই: ছান্দোগ্য উপনিষদে এক স্থলে পাওয়া যায়, দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ঘোরনামা কোন ঋষির নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন। মহাভারতে কৃষ্ণ দ্বারকার রাজা, আর বিষ্ণুপুরাণে গোপীদের সহিত বিহারকারী কৃষ্ণের কথা বর্ণিত আছে। আবার ভাগবতে কৃষ্ণের রাসলীলা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে মদনোৎসব নামে এক উৎসব প্রচলিত ছিল। সেইটিকেই লোকে দোলরূপে পরিণত করিয়া কৃষ্ণের ঘাড়ে চাপাইয়াছে। রাসলীলাদিও যে ঐরূপে চাপানো হয় নাই, কে বলিতে পারে? পূর্বকালে আমাদের দেশে ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি অতি সামান্যই ছিল। সুতরাং যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। আর পূর্বকালে লোকের নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা খুব অল্পই ছিল। এরূপ অনেক হইয়াছে, যেখানে একজন কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গুরু অথবা অপর কাহারও নামে চালাইয়া দিয়া গেলেন। এইরূপ স্থলে সত্যানুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের বড় বিপদ। পূর্বকালে ভূগোলের জ্ঞানও কিছুমাত্র ছিল না —অনেকে কল্পনাবলে ইক্ষুসমুদ্র, ক্ষীরসমুদ্র, দধিসমুদ্রাদি রচনা করিয়াছেন। পুরাণে দেখা যায়, কেহ অযুত বর্ষ, কেহ লক্ষ বর্ষ জীবনধারণ করিতেছেন; কিন্তু আবার বেদে পাই, 'শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ'। আমরা এখানে কাহার অনুসরণ করিব? সুতরাং কৃষ্ণসম্বন্ধে সঠিক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করা একরূপ অসম্ভব। লোকের একটা স্বভাবই এই যে, কোন মহাপুরুষের প্রকৃত চরিত্রের চতুর্দিকে তাহারা নানাবিধ অস্বাভাবিক কল্পনা করে।

কৃষ্ণসম্বন্ধে এই বোধ হয় যে তিনি একজন রাজা ছিলেন। ইহা খুব সম্ভব এই জন্য যে, প্রাচীন কালে আমাদের দেশে রাজারাই ব্রহ্মজ্ঞান-প্রচারে উদ্যোগী ছিলেন। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক—গীতাকার যিনিই হউন, গীতার মধ্যে যে শিক্ষা, সমুদয় মহাভারতের মধ্যেও সেই শিক্ষা দেখিতে পাই। তাহাতে বোধ হয়, সেই সময় কোন মহাপুরুষ নূতনভাবে সমাজে এই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন। আরও দেখা যায়, প্রাচীনকালে এক একটি সম্প্রদায় উঠিয়াছে—তাহার মধ্যে এক একখানি শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে। কিছুদিন পরে সম্প্রদায় ও শাস্ত্র উভয়ই লোপ পাইয়াছে, অথবা সম্প্রদায়টি লোপ পাইয়াছে, শাস্ত্রখানি রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং অনুমান হয়, গীতা সম্ভবতঃ এমন এক সম্প্রদায়ের শাস্ত্র, যাহা এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, কিন্তু যাহার মধ্যে খুব উচ্চ ভাবসকল নিবিষ্ট ছিল।

তৃতীয় প্রশ্ন

কুরুপাঞ্চাল-যুদ্ধের বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে কুরুপাঞ্চাল নামে যুদ্ধ যে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর এক কথা—যুদ্ধের সময় এত জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের কথা আসিল কোথা হইতে? আর সেই সময় কি কোন সাঙ্কেতিক-লিপি-কুশল ব্যক্তি (Short-hand writer) উপস্থিত ছিলেন, যিনি সে-সমস্ত টুকিয়া লইয়াছিলেন? কেহ কেহ বলেন, এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ রূপকমাত্র। ইহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য—সদসৎপ্রবৃত্তির সংগ্রাম। এ অর্থও অসঙ্গত না হইতে পারে।

চতুর্থ প্রশ্ন

অর্জুন প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা-সম্বন্ধে সন্দেহ এই যে, 'শতপথব্রাহ্মণ' অতি প্রাচীন গ্রন্থ, উহাতে সমস্ত অশ্বমেধযজ্ঞকারিগণের নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু সে স্থলে অর্জুনাদির নামগন্ধও নাই, অথচ পরীক্ষিৎ জনমেজয়ের নাম উল্লিখিত আছে। এ দিকে মহাভারতাদিতে বর্ণনা—যুধিষ্ঠির অর্জুনাদি অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন।

এখানে একটি কথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই-সকল ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধানের সহিত আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্থাৎ ধর্মসাধনা-

শিক্ষার কোন সম্ভব নাই। ঐগুলি যদি আজই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলেও আমাদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। তবে এত ঐতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে—আমাদিগকে সত্য জানিতে হইবে, কুসংস্কারে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। এদেশে এ সম্বন্ধে সামান্য ধারণা আছে। অনেক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এই যে, কোন একটি ভাল বিষয় প্রচার করিতে হইলে একটি মিথ্যা বলিলে যদি সেই প্রচারের সাহায্য হয়, তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই, অর্থাৎ The end justifies the means; এই কারণে অনেক তন্ত্রে 'পার্বতীং প্রতি মহাদেব উবাচ' দেখা যায়। কিন্তু আমাদের উচিত সত্যকে ধারণা করা, সত্যে বিশ্বাস করা। কুসংস্কার মানুষকে এতদূর আবদ্ধ করিয়া রাখে যে, যীশুখ্রীষ্ট মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণও অনেক কুসংস্কারে বিশ্বাস করিতেন। তোমাদিগকে সত্যের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কুসংস্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে।

গীতার বিশেষত্ব

এক্ষণে কথা হইতেছে—গীতা জিনিসটিতে আছে কি? উপনিষদ্ আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহার মধ্যে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা চলিতে চলিতে হঠাৎ এক মহাসত্যের অবতারণা। যেমন জঙ্গলের মধ্যে অপূর্ব সুন্দর গোলাপ—তাহার শিকড় কাঁটা পাতা সব সমেত। আর গীতাটি কি—গীতার মধ্যে এই সত্যগুলি লইয়া অতি সুন্দররূপে সাজানো—যেন ফুলের মালা বা সুন্দর ফুলের তোড়া। উপনিষদে শ্রদ্ধার কথা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু ভক্তি সম্বন্ধে কোন কথা নাই বলিলেই হয়। গীতায় কিন্তু এই ভক্তির কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত আছে এবং এই ভক্তির ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে।

এক্ষণে গীতা যে কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, দেখা যাউক। পূর্ব পূর্ব ধর্মশাস্ত্র হইতে গীতার নূতনত্ব কি? নূতনত্ব এই যে, পূর্বে যোগ জ্ঞান ভক্তি-আদি প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সকলের মধ্যেই পরস্পর বিবাদ ছিল, ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা কেহ করেন নাই। গীতাকার এই সামঞ্জস্যের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি তদানীন্তন সমুদয় সম্প্রদায়ের ভিতর যাহা কিছু ভাল ছিল, সব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও যে

সমন্বয়ের ভাব দেখাইতে পারেন নাই, এই উনবিংশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসের দ্বারা তাহা সাধিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ নিষ্কাম কর্ম—এই নিষ্কাম কর্ম অর্থে আজকাল অনেকে অনেকরূপ বুঝিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, নিষ্কাম হওয়ার অর্থ—উদ্দেশ্যহীন হওয়া। বাস্তবিক তাহাই যদি ইহার অর্থ হয়, তাহা হইলে তো হৃদয়শূন্য পশুরা এবং দেয়ালগুলিও নিষ্কাম কর্মী; অনেকে আবার জনকের উদাহরণে নিজেকে নিষ্কাম কর্মিরূপে পরিচিত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু জনক তো পুত্রোৎপাদন করেন নাই, কিন্তু ইঁহারা পুত্রোৎপাদন করিয়াই জনকবৎ পরিচিত হইতে চাহেন। প্রকৃত নিষ্কাম কর্মী পশুবৎ জড়প্রকৃতি বা হৃদয়শূন্য নহেন। তাঁহার অন্তর এতদূর ভালবাসায় ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ যে, তিনি সমগ্র জগৎকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিতে পারেন। এরূপ প্রেম ও সহানুভূতি লোকে সচরাচর বুঝিতে পারে না। এই সমন্বয়ভাব ও নিষ্কাম কর্ম—এই দুইটি গীতার বিশেষত্ব।

গীতার একটি শ্লোক

এক্ষণে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে একটু পাঠ করা যাক। 'তং তথা কৃপয়াবিষ্টম্' ইত্যাদি শ্লোকে কি সুন্দর কবিত্বের ভাবে অর্জুনের অবস্থাটি বর্ণিত হইয়াছে! তারপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিতেছেন, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'—এই স্থানে অর্জুনকে ভগবান যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিতেছেন কেন? অর্জুনের বাস্তবিক সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত হইয়া যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি হয় নাই; তমোগুণ হইতেই যুদ্ধে অনিচ্ছা হইয়াছিল। সত্ত্বগুণী ব্যক্তিদের স্বভাব এই যে, তাঁহারা অন্য সময়ে যেরূপ শান্ত, বিপদের সময়ও সেরূপ ধীর। অর্জুনের ভয় আসিয়াছিল। আর তাঁহার ভিতরে যে যুদ্ধপ্রবৃত্তি ছিল, তাহার প্রমাণ এই—তিনি যুদ্ধ করিতেই যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। সচরাচর আমাদের জীবনেও এইরূপ ব্যাপার দেখা যায়।

অনেকে মনে করেন, আমরা সত্ত্বগুণী; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা তমোগুণী। অনেকে অতি অশুচি ভাবে থাকিয়া মনে করেন, আমরা পরমহংস। কারণ, শাস্ত্রে আছে—পরমহংসেরা 'জড়োন্মত্তপিশাচবৎ' হইয়া থাকেন। পরমহংস-দিগের সহিত বালকের তুলনা করা হয়, কিন্তু তথায় বুঝিতে হইবে ঐ তুলনা একদেশী। পরমহংস ও বালক কখনই অভিন্ন নহে। একজন জ্ঞানের অতীত

অবস্থায় পঁহুছিয়াছেন, আর একজনের জ্ঞানোন্মেষ মোটেই হয় নাই। আলোকের পরমাণুর অতি তীব্র স্পন্দন ও অতি মৃদু স্পন্দন উভয়ই দৃষ্টির বহির্ভূত। কিন্তু একটিতে তীব্র উত্তাপ ও অপরটিতে তাহার অত্যন্তাভাব বলিলেই হয়। সত্ত্ব ও তমোগুণ কিয়দংশে একরূপ দেখাইলেও উভয়ে অনেক প্রভেদ। তমোগুণ সত্ত্বগুণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আসিতে বড় ভালবাসে; এখানে দয়ারূপ আবরণে উপস্থিত হইয়াছেন।

অর্জুনের এই মোহ অপনয়ন করিবার জন্য ভগবান কি বলিলেন? আমি যেমন প্রায়ই বলিয়া থাকি যে, লোককে পাপী না বলিয়া তাহার ভিতর যে মহাশক্তি আছে, সেই দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট কর, ঠিক সেই ভাবেই ভগবান্ বলিতেছেন, 'নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে'—তোমাতে ইহা সাজে না। তুমি সেই আত্মা, তুমি স্বরূপকে ভুলিয়া আপনাকে পাপী রোগী শোকগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছ—এ তো তোমার সাজে না। তাই ভগবান বলিতেছেন, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।' জগতে পাপতাপ নাই, রোগশোক নাই; যদি কিছু পাপ জগতে থাকে, তাহা এই 'ভয়'। যে-কোন কার্য তোমার ভিতরে শক্তির উদ্রেক করিয়া দেয়, তাহাই পুণ্য; আর যাহা তোমার শরীর-মনকে দুর্বল করে, তাহাই পাপ। এই দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ', তুমি বীর, তোমার এ (ক্লীবতা) সাজে না।

তোমরা যদি জগৎকে এ-কথা শুনাইতে পারো—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে', তাহা হইলে তিন দিনের ভিতর এ-সকল রোগ-শোক, পাপ-তাপ কোথায় চলিয়া যাইবে। এখানকার বায়ুতে ভয়ের কম্পন বহিতেছে। এ কম্পন উলটাইয়া দাও। তুমি সর্বশক্তিমান্—যাও, তোপের মুখে যাও, ভয় করিও না। মহাপাপীকে ঘৃণা করিও না, তাহার বাহির দিক দেখিও না। ভিতরের দিকে যে পরমাত্মা রহিয়াছেন, সেই দিকে দৃষ্টিপাত কর; সমগ্র জগৎকে বলো—তোমাতে পাপ নাই, তাপ নাই, তুমি মহাশক্তির আধার।

এই একটি শ্লোক পড়িলেই সমগ্র গীতাপাঠের ফল পাওয়া যায়, কারণ এই শ্লোকের মধ্যেই গীতার সমগ্র ভাব নিহিত।

আলমোড়া অভিনন্দনের উত্তর

স্বাস্থ্যলাভের জন্য দার্জিলিঙ-এ দুই মাস অবস্থানের পর স্বামীজী নিমন্ত্রিত হইয়া হিমালয়ের আলমোড়া শহরে যান। জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে হিন্দীতে একটি অভিনন্দন প্রদত্ত হয়। উত্তরে স্বামীজী বলেন:

আমাদের পূর্বপুরুষগণ শয়নে-স্বপনে যে-ভূমির বিষয় ধ্যান করিতেন, এই সেই ভূমি—ভারতজননী পার্বতী দেবীর জন্মভূমি। এই সেই পবিত্র ভূমি, যেখানে ভারতের প্রত্যেক যথার্থ সত্যপিপাসু ব্যক্তি জীবন-সন্ধ্যায় আসিয়া শেষ অধ্যায় সমাপ্ত করিতে অভিলাষী হয়। এই পবিত্র ভূমির গিরিশিখরে, গভীর গহ্বরে, দ্রুতগামিনী স্রোতস্বতীসমূহের তীরে সেই অপূর্ব তত্ত্বরাশি চিন্তিত হইয়াছিল—যে-তত্ত্বগুলির কণামাত্র বৈদেশিকগণের নিকট হইতেও গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে এবং যেগুলিকে যোগ্যতম বিচারকগণ অতুলনীয় বলিয়া নিজেদের মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই সেই ভূমি—অতি বাল্যকাল হইতেই আমি যেখানে বাস করিবার কল্পনা করিতেছি এবং তোমরা সকলেই জানো, আমি এখানে বাস করিবার জন্য কতবারই না চেষ্টা করিয়াছি; আর যদিও উপযুক্ত সময় না আসায় এবং আমার কর্ম থাকায় আমি এই পবিত্র ভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, তথাপি আমার প্রাণের বাসনা—ঋষিগণের প্রাচীন বাসভূমি, দর্শনশাস্ত্রের জন্মভূমি এই পর্বতরাজের ক্রোড়ে আমার জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাইব। বন্ধুগণ, সম্ভবতঃ পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় এবারও বিফল-মনোরথ হইব, নির্জনে নিস্তব্ধতার মধ্যে অজ্ঞাতভাবে থাকা হয়তো আমার ঘটিবে না, কিন্তু আমি অকপটভাবে প্রার্থনা ও আশা করি, শুধু তাহাই নহে, একরূপ বিশ্বাস করি যে, জগতের অন্য কোথাও নয়, এইখানেই আমার জীবনের শেষ দিনগুলি কাটিবে।

এই পবিত্র ভূমির অধিবাসিগণ, পাশ্চাত্যদেশে আমার সামান্য কার্যের জন্য তোমরা কৃপা করিয়া আমার যে প্রশংসা করিয়াছ, সেই জন্য তোমাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু এখন আমার মন—কি পাশ্চাত্য, কি প্রাচ্য কোন দেশের কার্য-সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহিতেছে না। যতই এই শৈলরাজের চূড়ার পর চূড়া নয়নগোচর হইতে লাগিল, ততই আমার কর্মপ্রবৃত্তি—বৎসরের

পর বৎসর ধরিয়া আমার মাথায় যে আলোড়ন চলিতেছিল, তাহা যেন শান্ত হইয়া আসিল, এবং আমি কি কাজ করিয়াছি, ভবিষ্যতেই বা আমার কি কাজ করিবার সঙ্কল্প আছে, ঐ-সকল বিষয়ের আলোচনায় না গিয়া এখন আমার মন—হিমালয় যে এক সনাতন সত্য অনন্তকাল ধরিয়া শিক্ষা দিতেছে, যে এক সত্য এই স্থানের হাওয়াতে পর্যন্ত খেলিতেছে, ইহার নদীসমূহের বেগশীল আবর্তসমূহে আমি যে এক তত্ত্বের মৃদু অস্ফুটধ্বনি শুনিতেছি—সেই ত্যাগের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে। 'সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্' —এই জগতে সকল জিনিসই ভয়ের কারণ, কেবল বৈরাগ্যই ভয়শূন্য।

হাঁ, সত্যই ইহা বৈরাগ্য-ভূমি। এখন আমার মনের ভাবসমূহ বিস্তারিতভাবে বলিবার সময় বা সুযোগ নাই। অতএব উপসংহারে বলিতেছি যে, এই হিমালয়পর্বত বৈরাগ্য ও ত্যাগের সাকার মূর্তিরূপে দণ্ডায়মান, আর মানবজাতিকে এই ত্যাগ অপেক্ষা আর কিছু উচ্চতর ও মহত্তর শিক্ষা দিবার আমাদের নাই। যেমন আমাদের পূর্বপুরুষগণ তাঁহাদের জীবনের শেষভাগে এই হিমালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতেন, সেইরূপ ভবিষ্যতে পৃথিবীর সর্বস্থান হইতে বীরহৃদয় ব্যক্তিগণ এই শৈলরাজের দিকে আকৃষ্ট হইবেন—যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধ ও মতপার্থক্য লোকের স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হইবে, যখন তোমার ধর্মে ও আমার ধর্মে যে বিবাদ তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইবে, যখন মানুষ বুঝিবে, এক সনাতন ধর্মই বিদ্যমান—সেটি অন্তরে ব্রহ্মানুভূতি, আর যাহা কিছু সব বৃথা। এইরূপ সত্যপিপাসু ব্যক্তিগণ সংসার মায়ামাত্র এবং ঈশ্বর—শুধু ঈশ্বরের উপাসনা ব্যতীত আর সবই বৃথা জানিয়া এখানে আসিবে।

বন্ধুগণ, তোমরা অনুগ্রহপূর্বক আমার একটি সঙ্কল্পের বিষয় উল্লেখ করিয়াছ। আমার মাথায় এখনও হিমালয়ে একটি কেন্দ্র স্থাপন করিবার সঙ্কল্প আছে; আর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই স্থানটি এই সার্বভৌম ধর্মশিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে কেন নির্বাচিত করিয়াছি, তাহাও সম্ভবতঃ তোমাদিগকে ভালরূপে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছি। এই হিমালয়ের সহিত আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ স্মৃতিসমূহ জড়িত। যদি ভারতের ধর্মেতিহাস হইতে হিমালয়কে বাদ দেওয়া যায়, তবে উহার অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকিবে। অতএব এখানে একটি কেন্দ্র চাই-ই চাই—এই কেন্দ্র কর্মপ্রধান হইবে না—এখানে নিস্তব্ধতা শান্তি ও ধ্যানশীলতা অধিক মাত্রায় বিরাজ করিবে, আর আমি আশা করি, একদিন না একদিন আমি ইহা কার্যে

পরিণত করিতে পারিব। আরও আশা করি, আমি অন্য সময়ে তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া এ-সকল বিষয় আলোচনা করিবার অধিক অবকাশ পাইব। এখন তোমরা আমার প্রতি যে সহৃদয় ব্যবহার করিয়াছ, সেজন্য তোমাদিগকে আবার ধন্যবাদ দিতেছি, আর ইহা আমি কেবল আমার প্রতি ব্যক্তিগত সদয় ব্যবহাররূপে গ্রহণ করিতে চাই না; আমি মনে করি, আমাদের ধর্মের প্রতিনিধি বলিয়াই তোমরা আমার প্রতি এরূপ সহৃদয় ব্যবহার করিয়াছ। প্রার্থনা করি, এই ধর্মভাব তোমাদিগকে যেন পরিত্যাগ না করে। প্রার্থনা করি, এখন আমরা যেরূপ ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত, সর্বদা যেন এই ভাবে থাকিতে পারি।

স্বামীজী আলমোড়ায় আরও দুইটি বক্তৃতা দেন—একটি স্থানীয় জেলা স্কুলে, অন্যটি ইংলিশ ক্লাবে। জেলা স্কুলে ওজস্বিনী হিন্দী ভাষায় স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হন। ইংলিশ ক্লাবে বক্তৃতার বিষয় ছিল: বেদের উপদেশ—তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক। এই প্রসঙ্গে তিনি উপজাতীয় দেবতা-উপাসনা, বেদ ও আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। স্থানীয় ইংরেজ অধিবাসীরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শিয়ালকোটে বক্তৃতা—ভক্তি

স্বামীজী নিমন্ত্রিত হইয়া পঞ্জাব ও কাশ্মীরের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন এবং ইংরেজী ও হিন্দীতে অনেক স্থানে বক্তৃতা দেন ও আলোচনাদি করেন; শিয়ালকোটে দুইটি বক্তৃতা দেন—একটি ইংরেজীতে এবং অপরটি হিন্দীতে। এটি হিন্দী বক্তৃতার অনুবাদ।

জগতে বিভিন্ন ধর্মের উপাসনা-প্রণালী বিভিন্ন হইলেও প্রকৃতপক্ষে সেগুলি এক। কোথাও লোকে মন্দির নির্মাণ করিয়া উপাসনা করিয়া থাকে, কোথাও বা অগ্নি-উপাসনা প্রচলিত, কোথাও বা লোকে প্রতিমাপূজা করিয়া থাকে, আবার অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বই বিশ্বাস করে না। সত্য বটে এই-সকল প্রবল বিভিন্নতা বিদ্যমান, কিন্তু যদি প্রত্যেক ধর্মে ব্যবহৃত যথার্থ কথাগুলি, উহাদের মূল তথ্য, উহাদের সার সত্যের দিকে লক্ষ্য কর, দেখিবে তাহারা বাস্তবিক অভিন্ন। এমন ধর্মও আছে, যাহা ঈশ্বরোপাসনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না, এমন কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত মানে না, কিন্তু দেখিবে ঐ ধর্মাবলম্বীরা

সাধু-মহাত্মাদিগকে ঈশ্বরের ন্যায় উপাসনা করিতেছে। বৌদ্ধধর্মই এই বিষয়ের প্রসিদ্ধ উদাহরণ।

ভক্তি সকল ধর্মেই রহিয়াছে—কোথাও এই ভক্তি ঈশ্বরে, কোথাও বা মহাপুরুষে অর্পিত। সর্বত্রই এই ভক্তিরূপ উপাসনার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, আর জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি লাভ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। জ্ঞানলাভ করিতে দৃঢ় অভ্যাস, অনুকূল অবস্থা প্রভৃতি নানা বিষয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও রোগশূন্য না হইলে এবং মন সম্পূর্ণরূপে বিষয়াসক্তিশূন্য না হইলে যোগ অভ্যাস করা যাইতে পারে না। কিন্তু সকল অবস্থার লোক অতি সহজেই ভক্তিসাধন করিতে পারে। ভক্তিমার্গের আচার্য শাণ্ডিল্য ঋষি বলিয়াছেন, ঈশ্বরে পরমানুরাগই ভক্তি। প্রহ্লাদও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি একদিন খাইতে না পায়, তবে তাহার মহাকষ্ট হয়। সন্তানের মৃত্যু হইলে লোকের প্রাণে কী যন্ত্রণা হয়! যে ভগবানের প্রকৃত ভক্ত, তাহারও প্রাণ ভগবানের বিরহে এরূপ ছটফট করিয়া থাকে। ভক্তির মহৎ গুণ এই যে, উহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, আর পরমেশ্বরে দৃঢ় ভক্তি হইলে কেবল উহা দ্বারাই চিত্ত শুদ্ধ হইয়া থাকে।

'নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তিঃ' [১] ইত্যাদি :

—হে ভগবান্, তোমার অসংখ্য নাম আর তোমার প্রত্যেক নামেই তোমার অনন্ত শক্তি বর্তমান। প্রত্যেক নামেরই গভীর তাৎপর্য আছে, আর তোমার নাম উচ্চারণ করিবার স্থান কাল কিছু বিচার করিবার নাই।' মৃত্যু যখন স্থান-কাল বিচার না করিয়াই মানুষকে আক্রমণ করে, তখন ঈশ্বরের নাম করিবার স্থান-কাল-বিচার কি হইতে পারে?

ঈশ্বর বিভিন্ন সাধক কর্তৃক বিভিন্ন নামে উপাসিত হন বটে, কিন্তু এই ভেদ আপাতদৃষ্টমাত্র, বাস্তব নহে। কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহাদের সাধনপ্রণালীই অধিক কার্যকর, অপরে আবার তাঁহাদের সাধনপ্রণালীকেই আশু মুক্তিলাভের সহজ উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি তাঁহাদের সাধন-পদ্ধতির মূল ভিত্তি অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে—উভয় পদ্ধতিই এক প্রকার। শৈবগণ শিবকে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বলিয়া বিশ্বাস

১ শিক্ষাষ্টকম্, শ্রীচৈতন্য

করেন; বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের সর্বশক্তিমান্ বিষ্ণুতেই অনুরক্ত, আর দেবীর উপাসকগণ দেবীকেই সর্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্না বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু যদি স্থায়ী ভক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে এই দ্বেষভাব একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। দ্বেষ ভক্তিপথের মহান্ প্রতিবন্ধক—যে ব্যক্তি উহা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই ঈশ্বরলাভ করেন। যদিও দ্বেষভাব পরিত্যাজ্য, তথাপি ইষ্টনিষ্ঠার প্রয়োজন। ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমান বলিয়াছেন:

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ॥

—আমি জানি যিনি লক্ষ্মীপতি, তিনিই সীতাপতি; পরমাত্মা-দৃষ্টিতে উভয়ে এক, তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্বস্ব।

মানুষের প্রত্যেকেরই ভাব ভিন্ন ভিন্ন। এই-সকল বিভিন্ন ভাব লইয়া মানুষ জন্মিয়া থাকে। সে কখনও ঐ ভাবকে অতিক্রম করিতে পারে না। জগৎ যে কখনও একধর্মাবলম্বী হইতে পারে না, ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। ঈশ্বর করুন, জগৎ যেন কখন একধর্মাবলম্বী না হয়। তাহা হইলে জগতে এই সামঞ্জস্যের পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। সুতরাং মানুষ যেন নিজ নিজ প্রকৃতির অনুসরণ করে; আর যদি এমন গুরু পায়, যিনি তাঁহার ভাবানুযায়ী এবং সেই ভাবের পুষ্টিবিধায়ক উপদেশ দেন, তবেই সে উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে। তাহাকে সেই ভাবের বিকাশ-সাধন করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি যে পথে চলিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে সেই পথে চলিতে দিতে হইবে; কিন্তু যদি আমরা তাহাকে অন্য পথে টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করি, তবে তাহার যাহা আছে সে তাহাও হারাইবে; সে একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়িবে।

একজনের মুখ আর একজনের মুখের সঙ্গে মেলে না, সেইরূপ একজনের প্রকৃতি আর একজনের প্রকৃতির সঙ্গে মেলে না। আর তাহাকে তাহার নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী চলিতে দিতে বাধা কি? কোন নদী এক বিশেষ দিকে প্রবাহিত হইতেছে—যদি উহাকে সেই দিকেই একটি নির্দিষ্ট খাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করা যায়, তবে উহার স্রোত আরও প্রবল হয়, উহার বেগ বর্ধিত হয়; কিন্তু উহা স্বভাবতঃ যে দিকে প্রবাহিত হইতেছে, সেই দিক হইতে সরাইয়া অন্যদিকে প্রবাহিত করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে দেখিবে কি ফল

হয়। উহার স্রোত ক্ষীণতর হইয়া যাইবে, স্রোতের বেগও হ্রাস পাইবে। এই জীবন একটা গুরুতর ব্যাপার—নিজ ভাবানুযায়ী ইহাকে পরিচালিত করিতে হইবে। যে-দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয়, সে-দেশ ক্রমশঃ ধর্মহীন হইয়া দাঁড়ায়। ভারতে কখনও এরূপ চেষ্টা করা হয় নাই। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কখন বিরোধ ছিল না, অথচ প্রত্যেক ধর্মই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কার্যসাধন করিয়া গিয়াছে—সেইজন্যই এখানে প্রকৃত ধর্মভাব এখনও জাগ্রত। এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিভিন্ন ধর্মে বিরোধ দেখা দেয় কারণ—একজন মনে করিতেছে—সত্যের চাবি আমার কাছে, আর যে আমায় বিশ্বাস না করে, সে মূর্খ। অপর ব্যক্তি আবার মনে করিতেছে—ও-ব্যক্তি কপট, কারণ তাহা না হইলে সে আমার কথা শুনিত।

সকল ব্যক্তিই এক ধর্মের অনুসরণ করুক, ইহাই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হইত, তবে এত বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি হইল কিরূপে? তোমরা কি সেই সর্বশক্তিমানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারো? সকলকে একধর্মাবলম্বী করিবার জন্য অনেক প্রকার উদ্যোগ ও চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এমন কি, তরবারি-বলে সকলকে একধর্মাবলম্বী করিবার চেষ্টাও যেখানে হইয়াছে, ইতিহাস বলে—সেখানেও একবাড়িতে দশটি ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। সমগ্র জগতে একটি ধর্ম কখনও থাকিতে পারে না। বিভিন্ন শক্তি মানবমনে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করিলে মানুষ চিন্তা করিতে সমর্থ হয়। এই বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া না থাকিলে মানুষ চিন্তা করিতেই সমর্থ হইত না, এমন কি মনুষ্যপদবাচ্যই হইত না। 'মন্' ধাতু হইতে মনুষ্য-শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে—মনুষ্য শব্দের অর্থ মননশীল। মনের পরিচালনা না থাকিলে চিন্তাশক্তিও লোপ পায়, তখন সেই ব্যক্তিতে এবং একটা সাধারণ পশুতে কোন প্রভেদ থাকে না। তখন এরূপ ব্যক্তিকে দেখিয়া সকলেরই ঘৃণার উদ্রেক হয়। ঈশ্বরেচ্ছায় ভারতের যেন কখন এমন অবস্থা না হয়!

অতএব মনুষ্যত্ব যাহাতে থাকে, সেজন্য এই একত্বের মধ্যে বহুত্বের প্রয়োজন। সকল বিষয়েই এই বহুত্ব বা বৈচিত্র্য-রক্ষার প্রয়োজন; কারণ যতদিন এই বহুত্ব থাকিবে; ততদিনই জগতের অস্তিত্ব। অবশ্য বহুত্ব বা বৈচিত্র্য বলিলে ইহা বুঝায় না যে, উহার মধ্যে ছোট-বড় আছে। যদি সকলেই সমানও হয়,

তথাপি এই বৈচিত্র্য থাকিবার কোন বাধা নাই। সকল ধর্মে ভাল ভাল লোক আছে, এই কারণেই সেই সব ধর্ম লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে, সুতরাং কোন ধর্মকেই ঘৃণা করা উচিত নয়।

এখানে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে-ধর্ম অন্যায় কার্যের পোষকতা করিয়া থাকে, সেই ধর্মের প্রতিও কি সম্মান দেখাইতে হইবে? অবশ্য, ইহার উত্তর 'না' ব্যতীত আর কি হইতে পারে? এইরূপ ধর্মকে যত শীঘ্র সম্ভব দূরীভূত করিতে পারা যায়, ততই ভাল; কারণ উহা দ্বারা লোকের অকল্যাণই হইয়া থাকে। নীতির উপরই যেন সকল ধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, আর ব্যক্তিগত পবিত্রতা বা শুদ্ধ আচারকে ধর্ম অপেক্ষা উচ্চতর মনে করা উচিত। এখানে ইহাও বলা কর্তব্য যে, 'আচার' অর্থে বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয় প্রকার শুদ্ধি। জল এবং শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য বস্তুসংযোগে শরীরের শুদ্ধিবিধান করা যাইতে পারে। আভ্যন্তর শুদ্ধির জন্য মিথ্যাভাষণ সুরাপান ও অন্যান্য গর্হিত কার্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে পরোপকার করিতে হইবে। মদ্যপান চৌর্য দ্যূতক্রীড়া মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি অসৎকার্য হইতে যদি বিরত থাকো, তবে তো ভালই—উহা তো তোমার কর্তব্য। ইহার জন্য তুমি কোনরূপ প্রশংসা পাইতে পার না। অপরেরও যাহাতে কল্যাণ হয়, তাহার জন্য কিছু করিতে হইবে।

এখানে আমি ভোজনের নিয়ম সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। ভোজন সম্বন্ধে প্রাচীন বিধি সবই এখন লোপ পাইয়াছে; কেবল এই ব্যক্তির সঙ্গে খাইতে নাই, উহার সঙ্গে খাইতে নাই—এইরূপ একটা অস্পষ্ট ধারণা লোকের মধ্যে রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। শত শত বৎসর পূর্বে আহার সম্বন্ধে যে-সকল সুন্দর নিয়ম ছিল, এখন ঐগুলির ভগ্নাবশেষরূপে এই স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট বিচারমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে খাদ্যের ত্রিবিধ দোষ কথিত আছে: জাতিদোষ—যে-সকল আহার্য-বস্তু স্বভাবতই অশুদ্ধ, যেমন পেঁয়াজ রশুন প্রভৃতি, সেগুলি খাইলে জাতিদুষ্ট খাদ্য খাওয়া হইল। যে-ব্যক্তি ঐ-সকল খাদ্য অধিক পরিমাণে খায়, তাহার কামের প্রাবল্য হয় এবং সে-ব্যক্তি ঈশ্বর ও মানুষের চক্ষে ঘৃণিত অসৎ কর্মসকল করিতে থাকে। আবর্জনা-কীটাদি-পূর্ণ স্থানে আহারকে নিমিত্তদোষ বলে। এই দোষবর্জনের জন্য আহারের এমন স্থান নির্দিষ্ট করিতে হইবে, যে-স্থান খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আশ্রয়দোষ—অসৎ ব্যক্তি কর্তৃক স্পৃষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করিতে হইবে, কারণ এরূপ অন্ন ভোজন

করিলে মনে অপবিত্র ভাব উদিত হয়। ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়াও সে-ব্যক্তি যদি লম্পট ও কুক্রিয়াসক্ত হয়, তবে তাহার হাতে খাওয়া উচিত নয়।

এখন এ-সব চলিয়া গিয়াছে—এখন শুধু এইটুকু অবশিষ্ট আছে যে, আমাদের আত্মীয়-স্বজন না হইলে তাহার হাতে আর খাওয়া হইবে না—সে-ব্যক্তি হাজার জ্ঞানী ও উপযুক্ত লোক হউক না কেন। এই-সকল নিয়ম যে কিভাবে উপেক্ষিত হইয়া থাকে, ময়রার দোকানে গেলে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইবে। দেখিবে মাছিগুলি চারিদিকে ভন্ ভন্ করিয়া উড়িয়া দোকানের সব জিনিসে বসিতেছে—রাস্তার ধূলি উড়িয়া মিঠাই-এর উপর পড়িতেছে, আর ময়রার কাপড়খানা এমনি যে, চিমটি কাটিলে ময়লা উঠে। কেন, খরিদ্দারেরা সকলে মিলিয়া বলুক না—দোকানে গ্লাসকেস না বসাইলে আমরা কেহ মিঠাই কিনিব না। এইরূপ করিলে আর মাছি আসিয়া খাবারের উপর বসিতে পারিবে না এবং কলেরা ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের বীজ ছড়াইবে না। পূর্বকালে লোক-সংখ্যা অল্প ছিল—তখন যে-সকল নিয়ম ছিল, তাহাতেই কাজ চলিয়া যাইত। এখন লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে, অন্যান্য অনেক প্রকার পরিবর্তনও ঘটিয়াছে। সুতরাং এই-সকল বিষয়ে আমাদের এতদিন উৎকৃষ্টতর বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা উন্নতি না করিয়া ক্রমশঃ অবনতই হইয়াছি। মনু বলিয়াছেন, 'জলে থুথু ফেলিও না'; আর আমরা করিতেছি কি? আমরা গঙ্গায় ময়লা ফেলিতেছি। এই-সকল বিবেচনা করিয়া স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, বাহ্য শৌচের বিশেষ আবশ্যক। শাস্ত্রকারেরাও তাহা জানিতেন, কিন্তু এখন এই-সকল শুচি-অশুচি-বিচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য লোপ পাইয়াছে—এখন শুধু উহার খোসাটা পড়িয়া আছে। চোর, লম্পট, মাতাল, অতি ভয়ানক জেলখাটা আসামী—ইহাদিগকে আমরা স্বচ্ছন্দে জাতিতে লইব, কিন্তু একজন সৎ ও সম্ভ্রান্ত লোক যদি নিম্নবর্ণের অথচ তাহার মতো সমমর্যাদাসম্পন্ন কোন ব্যক্তির সঙ্গে বসিয়া খায়, তবে সে তৎক্ষণাৎ জাতিচ্যুত হইবে—চিরদিনের জন্য পতিত হইয়া রহিল। ইহাতেই আমাদের দেশে ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে। সুতরাং এইটি স্পষ্টরূপে জানা উচিত যে, পাপীর সংসর্গে পাপ এবং সাধুর সঙ্গে সাধুতা আসিয়া থাকে, এবং অসৎ-সংসর্গ দূর হইতে পরিহার করাই বাহ্য শৌচ। আভ্যন্তর শুদ্ধি আরও কঠিন। অন্তঃশৌচসম্পন্ন হইতে গেলে সত্যভাষণ, দরিদ্রসেবা এবং বিপন্ন ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা আবশ্যক।

কিন্তু আমরা সচরাচর কি করিয়া থাকি? লোকে নিজের কোন কাজের জন্য কোন ধনী লোকের বাড়ি গেল এবং তাঁহাকে 'গরীবের বন্ধু' প্রভৃতি উচ্চ বিশেষণে বিশেষিত করিল। কিন্তু কোন গরীব তাঁহার বাটীতে আসিলে তিনি হয়তো তাহার গলা কাটিতে প্রস্তুত। অতএব ঐরূপ ধনী ব্যক্তিকে 'দরিদ্রের বন্ধু' বলিয়া সম্বোধন করা তো স্পষ্টই মিথ্যা কথা। আর ইহাই আমাদের মনকে মলিন করিয়া ফেলিতেছে। এই জন্যই শাস্ত্র সত্যই বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি বারো বৎসর ধরিয়া সত্যভাষণাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করেন, আর এই দ্বাদশবর্ষকাল যদি তাঁহার মনে কখনও কুচিন্তার উদয় না হইয়া থাকে, তবে তাঁহার বাক্‌সিদ্ধি হইবে—তাঁহার মুখ দিয়া যে-কথা বাহির হইবে, তাহাই ফলিবে। সত্যভাষণের এমনই অমোঘ শক্তি, এবং যিনি নিজের অন্তর বাহির উভয়ই শুদ্ধ করিয়াছেন, তিনিই ভক্তির অধিকারী।

তবে ভক্তিরও এমনই মাহাত্ম্য যে, ভক্তি নিজেই মনকে অনেক পরিমাণে শুদ্ধ করিয়া দেয়। তুমি যে-ধর্ম সম্বন্ধেই বিচার করিয়া দেখ না, দেখিবে সকল ধর্মেই ভক্তির প্রাধান্য এবং সকল ধর্মই বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া থাকে। যদিও য়াহুদী, মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণ বাহ্য শৌচের বাড়াবাড়ির বিরোধী, তথাপি তাহারাও কোন না কোনরূপে কিছু না কিছু বাহ্য শৌচ অবলম্বন করিয়া থাকে; তাহারা মনে করে, সর্বদাই কিছু না কিছু পরিমাণে বাহ্য শৌচের প্রয়োজন।

য়াহুদীদের মধ্যে প্রতিমাপূজা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু তথাপি তাহাদের এক মন্দিরে 'আর্ক' নামক এক সিন্দুক এবং ঐ সিন্দুকের ভিতর 'মুশার দশটি আদেশ' (Tables of the Law) রক্ষিত থাকিত। ঐ সিন্দুকের উপর বিস্তারিত-পক্ষযুক্ত দুইটি স্বর্গীয় দূতের মূর্তি থাকিত, এবং উহাদের ঠিক মধ্যস্থলে তাঁহারা ঈশ্বরাবির্ভাব দর্শন করিতেন। অনেক দিন হইল য়াহুদীদের সেই প্রাচীন মন্দির নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নূতন নূতন মন্দিরগুলিও সেই প্রাচীন ধরনেই নির্মিত হইয়া থাকে, আর এখন খ্রীষ্টানদের মধ্যে ঐ সিন্দুকে ধর্মপুস্তক রাখা হয়। রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীক খ্রীষ্টানদের মধ্যে প্রতিমাপূজা অনেক পরিমাণে প্রচলিত। উহারা যীশুর এবং তাঁহার মাতার প্রতিমূর্তি পূজা করিয়া থাকে। প্রোটেষ্টাণ্টদের মধ্যে প্রতিমাপূজা নাই, কিন্তু তাহারাও ঈশ্বরকে ব্যক্তিবিশেষ-রূপে উপাসনা করিয়া থাকে। উহাও প্রতিমাপূজার রূপান্তর মাত্র। পারসী ও

ইরানীদের মধ্যে অগ্নিপূজা খুব প্রচলিত। মুসলমানেরা বড় বড় সাধু মহাপুরুষদের পূজা করিয়া থাকেন, আর প্রার্থনার সময় 'কাবা'র দিকে মুখ ফিরান। এই-সকল দেখিয়া মনে হয় যে, ধর্মসাধনের প্রথমাবস্থায় লোকের কিছু বাহ্য সহায়তার প্রয়োজন থাকে। যখন চিত্ত অনেকটা শুদ্ধ হইয়া আসে, তখন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বিষয়সমূহে ক্রমশঃ মন নিবিষ্ট করা যাইতে পারে।

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজাধমাধমা॥[১]

—ব্রহ্মভাবে অবস্থিতিই সর্বোৎকৃষ্ট, ধ্যান মধ্যম, স্তুতি ও জপ অধম এবং বাহ্যপূজা অধমাধম।

কিন্তু এখানে এই কথাটি বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে যে, বাহ্যপূজা অধমাধম হইলেও ইহাতে কোন পাপ নাই। যে যেমন পারে, তাহার তেমন করা উচিত। যদি তাহাকে সেই পথ হইতে নিবৃত্ত করা যায়, তবে সে নিজের কল্যাণের জন্য—নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অন্য কোনরূপে উহা করিবে। এই জন্য যে প্রতিমাপূজা করিতেছে, তাহার নিন্দা করা উচিত নয়। সে উন্নতির ঐ সোপান পর্যন্ত আরোহণ করিয়াছে, সুতরাং তাহার বাহ্যপূজা চাই-ই চাই। যাঁহারা সমর্থ, তাঁহারা ঐ-সকল ব্যক্তির চিত্তের অবস্থার উন্নতিসাধনের চেষ্টা করুন—তাঁহাদের দ্বারা ভাল ভাল কাজ করাইয়া লউন। কিন্তু তাঁহাদের উপাসনা-প্রণালী লইয়া বিবাদের প্রয়োজন কি?

কেহ ধন, কেহ বা পুত্রলাভের জন্য ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকে। আর উপাসনা করে বলিয়া তাহারা নিজেদের 'ভাগবত' বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু উহা প্রকৃত ভক্তি নহে, তাহারাও যথার্থ ভাগবত নহে। যদি তাহারা শুনিতে পায়, অমুক স্থানে এক সাধু আসিয়াছে—সে তামাকে সোনা করিতে পারে, অমনি তাহার নিকট তাহারা দলে দলে ছুটিতে থাকে। তথাপি তাহারা নিজেদের 'ভাগবত' বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না। পুত্রলাভের জন্য ঈশ্বরের উপাসনাকে ভক্তি বলা যায় না, ধনী হইবার জন্য ঈশ্বরের উপাসনাকে ভক্তি বলা যায় না, স্বর্গলাভের জন্য ঈশ্বরের উপাসনাকেও ভক্তি বলা যায় না, এমন কি নরকযন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য ঈশ্বরের

১ মহানির্বাণতন্ত্র, ১৪।১২২

উপাসনাকেও ভক্তি নামে অভিহিত করিতে পারা যায় না। ভয় বা কামনা হইতে ভক্তির উদ্ভব হয় না। তিনিই প্রকৃত ভাগবত, যিনি বলিতে পারেন :

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥[1]

—হে জগদীশ্বর, আমি ধন জন পরমাসুন্দরী স্ত্রী অথবা পাণ্ডিত্য কিছুই কামনা করি না, জন্মে জন্মে তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

যখন এই অবস্থা লাভ হয়, যখন মানুষ সর্বভূতে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরে সর্বভূতকে দর্শন করে, তখনই সে পূর্ণ ভক্তি লাভ করে, তখনই সে 'আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সর্বভূতেই বিষ্ণুকে অবতীর্ণ দেখিতে পায়, তখনই সে প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারে ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই, তখন—কেবল তখনই সে নিজেকে দীনের দীন জানিয়া প্রকৃত ভক্তের দৃষ্টিতে ভগবানকে উপাসনা করে; তখন তাহার আর বাহ্য অনুষ্ঠান এবং তীর্থভ্রমণাদির প্রবৃত্তি থাকে না, সে প্রত্যেক মানুষকেই যথার্থ দেবমন্দির বলিয়া মনে করে।

আমাদের শাস্ত্রে ভক্তি নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু যতদিন না আমাদের প্রাণে ভক্তিলাভের জন্য যথার্থ ব্যাকুলতা জাগিতেছে, ততদিন আমরা উহার কোনটিরই প্রকৃত তত্ত্ব যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ, আমরা ঈশ্বরকে আমাদের 'পিতা' বলিয়া থাকি। কেন তাঁহাকে পিতা বলিব? পিতা-শব্দে সচরাচর যাহা বুঝায়, উহা কখনই ঈশ্বরের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে না। ঈশ্বরকে মাতা বলাতেও ঐ আপত্তি। কিন্তু যদি আমরা ঐ দুইটি শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য আলোচনা করি, তবে দেখিব ঐ দুইটি শব্দের যথার্থই সার্থকতা আছে। ঐ দুইটি শব্দ গভীর প্রেমসূচক—প্রকৃত ভাগবত ঈশ্বরকে প্রাণে প্রাণে ভালবাসেন বলিয়াই তিনি তাঁহাকে পিতা বা মাতা না বলিয়া থাকিতে পারেন না। রাসলীলায় রাধাকৃষ্ণের উপাখ্যান আলোচনা কর। ঐ উপাখ্যানে কেবল ভক্তের প্রকৃত ভাব ব্যক্ত হইয়াছে—কারণ সংসারের আর কোন প্রেমই নরনারীর পরস্পরের প্রতি প্রেম অপেক্ষা অধিক নহে। যেখানে এইরূপ প্রবল অনুরাগ, সেখানে কোন ভয় থাকে না, কোন বাসনা থাকে না, এবং কোন আসক্তি থাকে না—শুধু এক অচ্ছেদ্য প্রেমের বন্ধন উভয়কে তন্ময়

১ শিক্ষাষ্টকম্—শ্রীচৈতন্য

করিয়া রাখে। পিতামাতার প্রতি সন্তানের যে ভালবাসা, সে ভালবাসা শ্রদ্ধাজনিত—ভয়-মিশ্রিত। ঈশ্বর কিছু সৃষ্টি করুন বা না-ই করুন, তিনি আমাদের রক্ষাকর্তা হউন বা না-ই হউন, এ-সকল জানিয়া আমাদের কি লাভ? তিনি আমাদের প্রাণের প্রিয়তম আরাধ্য দেবতা, সুতরাং ভয়ের ভাব ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে উপাসনা করা চাই। যখন মানুষের সকল বাসনা চলিয়া যায়, তখন সে অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা করে না; যখন সে ঈশ্বরের জন্য উন্মত্ত হয়, তখনই মানুষ ভগবানকে যথার্থভাবে ভালবাসিয়া থাকে। সংসারে প্রেমিক যেমন তাঁহার প্রেমাস্পদকে ভালবাসিয়া থাকে, তেমনি আমাদের ভগবানকে ভালবাসিতে হইবে। কৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর—রাধা তাঁহার প্রেমে উন্মত্ত। যে-সকল গ্রন্থে রাধা-কৃষ্ণের উপাখ্যান আছে, সে-সকল গ্রন্থ পাঠ কর, তখন বুঝিবে কিরূপে ঈশ্বরকে ভালবাসিতে হয়। কিন্তু এ অপূর্ব প্রেমের তত্ত্ব কে বুঝিবে? অনেক ব্যক্তি আছে, যাহাদের অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত পাপে পূর্ণ—তাহারা পবিত্রতা বা নীতি কাহাকে বলে জানে না; তাহারা কি এই-সব তত্ত্ব বুঝিবে? তাহারা কোনমতেই এ-সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না। যখন লোকে মন হইতে সমুদয় অসৎ চিন্তা দূর করিয়া পবিত্র নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে বাস করে, তখন তাহারা মূর্খ হইলেও শাস্ত্রের অতি জটিল ভাষারও রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এরূপ লোক সংসারে কয়জন?—কয়জনের এরূপ হওয়া সম্ভব?

এমন কোন ধর্ম নাই, যাহা অসৎ লোক কলুষিত না করিতে পারে। জ্ঞানমার্গের দোহাই দিয়া মানুষ অনায়াসেই বলিতে পারে—আত্মা যখন দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, তখন দেহ যাহাই করুক না কেন, আত্মা তাহাতে কখনই লিপ্ত হন না। যদি মানুষ যথার্থভাবে ধর্মের অনুসরণ করিত, তবে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান—যে-কোন ধর্মাবলম্বীই হউক না, সকলেই পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক হইত। কিন্তু প্রকৃতি মন্দ হইলে লোক মন্দ হইয়া থাকে, আর মানুষ নিজ নিজ প্রকৃতি-অনুযায়ী পরিচালিত হয়—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু অসাধু লোকের সংখ্যা বেশী হইলেও সকল ধর্মেই এমন কতকগুলি ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা ঈশ্বরের নাম শুনিলেই মাতিয়া ওঠেন, ঈশ্বরের গুণগান কীর্তন করিতে করিতে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করেন। এরূপ লোকই যথার্থ ভক্ত।

ধর্মজীবনের প্রথম অবস্থায় মানুষ ঈশ্বরকে প্রভু ও নিজেকে তাঁহার দাস মনে করে। সে কৃতজ্ঞচিত্তে বলে, 'হে প্রভু, আজ আমাকে দু-পয়সা দিয়াছ—সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি।' এইভাবে কেহ বলে, 'হে ঈশ্বর, ভরণপোষণের জন্য আমাদিগকে আহার্য প্রদান কর।' কেহ বলে, 'হে প্রভো, এই এই কারণে আমি তোমার প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞ' ইত্যাদি। এই ভাবগুলি একেবারে পরিত্যাগ কর। শাস্ত্র বলেন, জগতে একটিমাত্র আকর্ষণী শক্তি আছে—সেই আকর্ষণী শক্তির বশে সূর্য চন্দ্র এবং অন্যান্য সকলেই বিচরণ করিতেছে। সেই আকর্ষণী শক্তি ঈশ্বর। এই জগতে সকল বস্তু—ভালমন্দ যাহা কিছু সবই ঈশ্বরাভিমুখে চলিতেছে। আমাদের জীবনে যাহা কিছু ঘটিতেছে, ভালই হউক, মন্দই হউক—সবই তাঁহার দিকে লইয়া যাইতেছে। নিজের স্বার্থের জন্য একজন আর একজনকে খুন করিল। অতএব নিজের জন্যই হউক আর অপরের জন্যই হউক, ভালবাসাই ঐ কার্যের মূলে। ভালই হউক, মন্দই হউক, ভালবাসাই সকলকে প্রেরণা দেয়। সিংহ যখন ছাগশিশুকে হত্যা করে, তখন সে নিজে বা তাহার শাবকেরা ক্ষুধার্ত বলিয়াই ঐরূপ করিয়া থাকে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ঈশ্বর কি?—তাহা হইলে বলিতে হইবে, ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। সর্বদা সকল অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত অনাদি অনন্ত ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য কোন নির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী অনুষ্ঠান করিতে হইবে, নতুবা তাঁহাকে লাভ করা যাইবে না—ইহা তাঁহার অভিপ্রায় নয়। মানুষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার দিকে চলিয়াছে। পতির পরম অনুরাগিণী পত্নী জানে না যে, তাহার পতির মধ্যে সেই মহা আকর্ষণী শক্তি রহিয়াছে—তাহাই তাহাকে স্বামীর দিকে টানিতেছে। আমাদের উপাস্য কেবল এই প্রেমের ঈশ্বর। যতদিন আমরা তাঁহাকে স্রষ্টা পাতা ইত্যাদি মনে করি, ততদিন বাহ্য পূজার প্রয়োজন থাকে, কিন্তু যখন ঐ-সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে প্রেমের মূর্ত প্রতীক বলিয়া চিন্তা করি এবং সকল বস্তুতে তাঁহাকে এবং তাঁহাতে সকলকে অবলোকন করি, তখনই আমরা পরা ভক্তি লাভ করিয়া থাকি।

হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি

[লাহোরে ধ্যান সিং-এর হাবেলীতে প্রদত্ত বক্তৃতা]

এই সেই ভূমি—যাহা পবিত্র আর্যাবর্তের মধ্যে পবিত্রতম বলিয়া পরিগণিত; এই সেই ব্রহ্মাবর্ত—যাহার বিষয় আমাদের মনু মহারাজ উল্লেখ করিয়াছেন। এই সেই ভূমি—যেখান হইতে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের জন্য সেই প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগ প্রসূত হইয়াছে, যাহা ভবিষ্যতে সমগ্র জগৎকে তাহার প্রবল বন্যায় ভাসাইয়াছে,- ইতিহাস এ বিষয়ের সাক্ষী। এই সেই ভূমি—যেখানে ইহার বেগশালিনী স্রোতস্বিনীকুলের ন্যায় চতুর্দিকে বিভিন্ন আধারে প্রবল ধর্মানুরাগ বিভিন্নরূপে উৎপন্ন হইয়া, ক্রমশঃ একাধারে মিলিয়া, শক্তিসম্পন্ন হইয়া পরিশেষে জগতের চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে এবং বজ্রনির্ঘোষে উহার মহীয়সী শক্তি সমগ্র জগতে ঘোষণা করিয়াছে। এই সেই বীরভূমি—যাহা যতবার এই দেশ অসভ্য বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, ততবারই বুক পাতিয়া প্রথমে সেই আক্রমণ সহ্য করিয়াছে। এই সেই ভূমি—যাহা এত দুঃখ-নির্যাতনেও উহার গৌরব, উহার তেজ সম্পূর্ণরূপে হারায় নাই। এখানেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক-কালে দয়াল নানক তাঁহার অপূর্ব বিশ্বপ্রেম প্রচার করেন। এখানেই সেই মহাত্মা তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া এবং বাহু প্রসারিত করিয়া সমগ্র জগৎকে—শুধু হিন্দুকে নয়, মুসলমানগণকে পর্যন্ত আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন। এখানেই আমাদের জাতির শেষ এবং মহামহিমান্বিত বীরগণের অন্যতম গুরু গোবিন্দসিংহ জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ধর্মের জন্য নিজের এবং নিজের প্রাণসম প্রিয়তম আত্মীয়বর্গের রক্তপাত করিয়াছিলেন, এবং যাহাদের জন্য এই রক্তপাত করিলেন, তাহারাই যখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, তখন মর্মাহত সিংহের ন্যায় দক্ষিণদেশে যাইয়া নির্জনবাস আশ্রয় করিলেন এবং নিজ দেশের প্রতি বিন্দুমাত্র অভিশাপ-বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, বিন্দুমাত্র অসন্তোষের ভাব প্রকাশ না করিয়া শান্তভাবে মর্ত্যধাম হইতে অপসৃত হইলেন।

হে পঞ্চনদের সন্তানগণ, এখানে—এই আমাদের প্রাচীন দেশে—আমি তোমাদের নিকট আচার্যরূপে উপস্থিত হই নাই, কারণ তোমাদিগকে শিক্ষা

দিবার মতো জ্ঞান আমার অতি অল্পই আছে। দেশের পূর্বাঞ্চল হইতে আমি পশ্চিমাঞ্চলের ভ্রাতৃগণের সহিত সম্ভাষণ বিনিময় করিতে এবং পরস্পরের ভাব মিলাইবার জন্য আসিয়াছি। আমি এখানে আসিয়াছি—আমাদের মধ্যে কি বিভিন্নতা আছে তাহা বাহির করিবার জন্য নহে, আসিয়াছি আমাদের মিলনভূমি কোথায় তাহাই অন্বেষণ করিতে; কোন্ ভিত্তি অবলম্বন করিয়া আমরা চিরকাল সৌভ্রাত্রসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারি, কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে যে-বাণী অনন্তকাল ধরিয়া আমাদিগকে আশার কথা শুনাইয়া আসিতেছে, তাহা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে পারে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে আমি এখানে আসিয়াছি। আমি এখানে আসিয়াছি তোমাদিগের নিকট কিছু গঠনমূলক প্রস্তাব করিতে, কিছু ভাঙিবার পরামর্শ দিতে নয়।

সমালোচনার দিন চলিয়া গিয়াছে, আমরা এখন কিছু গড়িবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছি। জগতে সময় সময় সমালোচনা—এমন কি, কঠোর সমালোচনারও প্রয়োজন হইয়া থাকে, কিন্তু সে অল্প দিনের জন্য। অনন্ত কালের জন্য কার্য—উন্নতির চেষ্টা, গঠন, সমালোচনা বা ভাঙাচোরা নহে। প্রায় বিগত এক শত বর্ষ ধরিয়া আমাদের দেশের সর্বত্র সমালোচনার বন্যা বহিয়াছে—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তীব্র রশ্মিজাল অন্ধকারময় দেশগুলির উপর পড়িয়া অন্যান্য স্থান অপেক্ষা আমাদের আনাচে-কানাচে, গলিঘুঁজিতেই যেন সাধারণের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। স্বভাবতই আমাদের দেশের সর্বত্র মহা মহা মনীষিগণের—শ্রেষ্ঠ মহিমময় সত্যনিষ্ঠ ন্যায়ানুরাগী মহাত্মাগণের অভ্যুদয় হইল। তাঁহাদের হৃদয়ে অপার স্বদেশপ্রেম এবং সর্বোপরি ঈশ্বর ও ধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ ছিল। আর এই মহাপুরুষগণ স্বদেশকে এত প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন বলিয়া, তাঁহাদের প্রাণ স্বদেশের জন্য কাঁদিত বলিয়া, তাঁহারা যাহা কিছু মন্দ বলিয়া বুঝিতেন তাহাই তীব্রভাবে আক্রমণ করিতেন। অতীতকালের এই মহাপুরুষগণ ধন্য—তাঁহারা দেশের অনেক কল্যাণ-সাধন করিয়াছেন; কিন্তু বর্তমান যুগের বাণী আমাদের কাছে আসিয়া বলিতেছে: যথেষ্ট! সমালোচনা যথেষ্ট হইয়াছে, দোষদর্শন যথেষ্ট হইয়াছে; এখন নূতন করিয়া গড়িবার সময় আসিয়াছে, এখন আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সংহত করিবার, এগুলিকে কেন্দ্রীভূত করিবার সময় আসিয়াছে, সেই সমষ্টিশক্তির সহায়তায় শত শতাব্দী ধরিয়া যে জাতীয় অগ্রগতি প্রায় অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহা সম্মুখে

আগাইয়া দিতে হইবে। এখন বাড়ি পরিষ্কার হইয়াছে ; ইহাতে নূতন করিয়া বাস করিতে হইবে। পথ পরিষ্কার হইয়াছে ; আর্যসন্তানগণ, সম্মুখে অগ্রসর হও।

'ভদ্রমহোদয়গণ', এই কথা বলিবার জন্যই আমি আপনাদের কাছে আসিয়াছি, আর প্রথমেই আপনাদিগকে বলিতে চাই যে, আমি কোন দল বা বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত নহি। আমার চক্ষে সকল সম্প্রদায়ই মহান্ ও মহিমময়, আমি সকল সম্প্রদায়কেই ভালবাসি, এবং সমগ্র জীবন ধরিয়া উহাদের মধ্যে যাহা সত্য, যাহা উপাদেয়, তাহাই বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছি। অতএব আজ রাত্রে আমার প্রস্তাব এই যে, তোমাদের নিকট এমন কতকগুলি তত্ত্ব বলিব, যেগুলি সম্বন্ধে আমরা সকলে একমত ; যদি পারি আমাদের পরস্পরের মিলনভূমি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব, এবং যদি ঈশ্বরের কৃপায় ইহা সম্ভব হয়, তবে ঐ তত্ত্ব কার্যে পরিণত করিতে হইবে। আমরা হিন্দু। আমি এই 'হিন্দু' শব্দটি কোন মন্দ অর্থে ব্যবহার করিতেছি না ; আর যাহারা মনে করে, ইহার কোন মন্দ অর্থ আছে, তাহাদের সহিত আমার মতের মিল নাই। প্রাচীনকালে ইহাদ্বারা কেবল সিন্ধুনদের পূর্বতীরবর্তী লোকদিগকে বুঝাইত, আজ যাহারা আমাদিগকে ঘৃণা করে, তাহাদের মধ্যে অনেকে ইহার কুৎসিত ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্তু নামে কিছু আসিয়া যায় না। আমাদিগেরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে— 'হিন্দু' নাম সর্ববিধ মহিমময়, সর্ববিধ আধ্যাত্মিক বিষয়ের বাচক হইবে, অথবা চিরদিনই ঘৃণাসূচক নামেই পর্যবসিত হইবে, অথবা উহা দ্বারা পদদলিত অপদার্থ ধর্মভ্রষ্ট জাতি বুঝাইবে। যদি বর্তমানকালে হিন্দু-শব্দে কোন মন্দ জিনিস বুঝায়, বুঝাক। এস, আমাদের কাজের দ্বারা লোককে দেখাইতে প্রস্তুত হই যে, কোন ভাষাই ইহা অপেক্ষা উচ্চতর শব্দ আবিষ্কার করিতে সমর্থ নহে। যে-সকল নীতি অবলম্বন করিয়া আমার জীবন পরিচালিত হইতেছে, তন্মধ্যে একটি এই যে, আমি কখন আমার পূর্বপুরুষগণকে স্মরণ করিয়া লজ্জিত হই নাই। জগতে যত গর্বিত পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমি তাহাদের অন্যতম ; কিন্তু আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, আমার নিজের কোন গুণ বা শক্তি লইয়া আমি অহঙ্কার করি না, আমি আমার প্রাচীন পিতৃপুরুষগণের গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। যতই আমি অতীতের আলোচনা করি, যতই আমি পিছনের দিকে চাহিয়া দেখি, ততই গৌরব বোধ করি, ইহাতেই আমার বিশ্বাসের

দৃঢ়তা ও সাহস আসিয়াছে, আমাকে পৃথিবীর ধূলি হইতে তুলিয়া আমাদের মহান্ পূর্বপুরুষগণের মহান্ অভিপ্রায় কার্যে পরিণত করিতে নিযুক্ত করিয়াছে। সেই প্রাচীন আর্যদিগের সন্তানগণ, ঈশ্বরের কৃপায় তোমাদেরও হৃদয়ে সেই গর্ব আবির্ভূত হউক, তোমাদের পূর্বপুরুষগণের উপর সেই বিশ্বাস শোণিতের সহিত মিশিয়া তোমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হউক, উহা দ্বারা সমগ্র জগতের উদ্ধার সাধিত হউক।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের সকলের মিলনভূমি ঠিক কোথায়, আমাদের জাতীয় জীবনের সাধারণ ভিত্তি কি, তাহা বাহির করিবার চেষ্টার পূর্বে একটি বিষয় আমাদিগকে মনে রাখিতেই হইবে। যেমন প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্ব আছে, সেইরূপ প্রত্যেক জাতিরও একটি ব্যক্তিত্ব আছে। যেমন এক ব্যক্তির অপর ব্যক্তি হইতে কতকগুলি বিশেষ বিষয়ে পার্থক্য আছে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই যেমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, সেইরূপ একজাতিরও অপর জাতি হইতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণগত প্রভেদ আছে। আর যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রকৃতির কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধন করিতে হয়, যেমন তাহার নিজ অতীত কর্মের দ্বারা নির্দিষ্ট বিশেষ দিকে তাহাকে চলিতে হয়, জাতির পক্ষেও তাহাই। প্রত্যেক জাতিকেই এক একটি বিধিনির্দিষ্ট পথে যাইতে হয়, প্রত্যেক জাতিরই জগতে কিছু বার্তা ঘোষণা করিবার আছে, প্রত্যেক জাতিকেই ব্রতবিশেষের উদ্‌যাপন করিতে হয়। অতএব প্রথম হইতেই আমাদিগকে জানিতে হইবে জাতীয় ব্রত কি, জানিতে হইবে বিধাতা এই জাতিকে কি কার্যের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে বিভিন্ন জাতির প্রগতিতে ইহার স্থান কোথায়, জানিতে হইবে বিভিন্ন জাতির সঙ্গীতের ঐকতানে তাহাকে কোন্ সুর বাজাইতে হইবে। আমাদের দেশে ছেলেবেলায় গল্প শুনিতাম, কতকগুলি সাপের মাথায় মণি আছে—তুমি সাপটিকে লইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারো, কিন্তু যতক্ষণ উহার মাথায় ঐ মণি থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে কোনমতে মারিতে পারিবে না। আমরা অনেক রাক্ষসীর গল্প শুনিয়াছি। তাহাদের প্রাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষের ভিতর থাকিত। যতদিন ঐ পাখিটিকে মারিতে না পারিতেছ, ততদিন সেই রাক্ষসীকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলো, তাহাকে যাহা ইচ্ছা কর, কিন্তু রাক্ষসী মরিবে না। জাতি সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। জাতিবিশেষের জীবন কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে থাকে, সেইখানেই সেই

জাতির জাতীয়ত্ব, আর যতদিন না তাহাতে ঘা পড়ে, ততদিন সেই জাতির মৃত্যু নাই। এই তত্ত্বের আলোকে আমরা জগতের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপারটি বুঝিতে পারিব। বর্বর জাতির আক্রমণ-তরঙ্গ বার বার আমাদের এই জাতির মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। শত শত বৎসর ধরিয়া 'আল্লা হো আকবর'-রবে ভারতগগন মুখরিত হইয়াছে, এবং এমন হিন্দু কেহ ছিল না, যে প্রতিমুহূর্তে নিজের বিনাশ আশঙ্কা না করিয়াছে। জগতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ দেশগুলির মধ্যে ভারতীয়েরাই সর্বাপেক্ষা বেশী অত্যাচার ও নিগ্রহ সহ্য করিয়াছে। তথাপি আমরা পূর্বে যেরূপ ছিলাম, এখনও সেইরূপই আছি, এখনও আমরা নূতন বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত ; শুধু তাহাই নহে, সম্প্রতি আমরা শুধু যে নিজেরাই অক্ষত তাহা নহে, আমরা বাহিরে যাইয়াও অপরকে আমাদের ভাব দিতে প্রস্তুত—তাহার চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি। বিস্তৃতিই জীবনের চিহ্ন। আজ আমরা দেখিতেছি, আমাদের চিন্তা ও ভাবসমূহ শুধু ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, কিন্তু আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, ঐগুলি বাহিরে যাইয়া অপর জাতির সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, অন্যান্য জাতির মধ্যে স্থানলাভ করিতেছে, শুধু তাহাই নহে, কোন কোন স্থলে ভারতীয় ভাবধারা প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ইহার কারণ এই—মানবজাতির মন যে-সকল বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে পারে, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম বিষয়—দর্শন ও ধর্মই জগতের জ্ঞানের ভাণ্ডারে ভারতের মহৎ দান।

আমাদের পূর্বপুরুষগণ অন্যান্য অনেক বিষয়েও উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন —অন্যান্য সকলের ন্যায় তাঁহারাও প্রথমে বহির্জগতের রহস্য আবিষ্কার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন—আমরা সকলেই এ-কথা জানি, আর সেই প্রকাণ্ড মস্তিষ্কশালী অদ্ভুত জাতি চেষ্টা করিলে সেই পথের এমন অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয় আবিষ্কার করিতে পারিতেন, যাহা আজও সমস্ত জগতের স্বপ্নের অগোচর, কিন্তু তাঁহারা উচ্চতর বস্তুলাভের জন্য ঐ পথ পরিত্যাগ করিলেন—বেদের মধ্য হইতে সেই উচ্চতর বিষয়ের প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে—'অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে'।[১] —তাহাই পরা বিদ্যা, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে লাভ করা হয়। এই পরিবর্তনশীল, অনিত্য, প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় বিদ্যা, মৃত্যু-

১ মুণ্ডক উপ, ১।১।৫

দুঃখ-শোকপূর্ণ এই জগতের বিদ্যা খুব বড় হইতে পারে, কিন্তু যিনি অপরিণামী আনন্দময়, একমাত্র যাঁহাতে শান্তি বিরাজিত, একমাত্র যাঁহাতে অনন্ত জীবন ও পূর্ণত্ব, একমাত্র যাঁহার নিকট গেলে সকল দুঃখের অবসান হয়, তাঁহাকে জানাই আমাদের পূর্বপুরুষগণের মতে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যে-সকল বিদ্যা বা বিজ্ঞান আমাদিগকে শুধু অন্ন বস্ত্র দিতে পারে, স্বজনদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবার ক্ষমতা দিতে পারে, যে-সকল বিদ্যা শুধু মানুষকে জয় ও শাসন করিবার এবং দুর্বলের উপর সবলের আধিপত্য করিবার শিক্ষা দিতে পারে; ইচ্ছা করিলে তাঁহারা অনায়াসেই সেই-সকল বিজ্ঞান, সেই-সকল বিদ্যা আবিষ্কার করিতে পারিতেন। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহারা ওদিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া একেবারে অন্য পথ ধরিলেন, যাহা পূর্বোক্ত পথ অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ ও মহৎ, পূর্বোক্ত পথ অপেক্ষা যাহাতে অনন্তগুণ বেশী আনন্দ। ঐ পথ ধরিয়া তাঁহারা এমন একনিষ্ঠভাবে অগ্রসর হইলেন যে, এখন উহা আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পিতা হইতে পুত্রে উত্তরাধিকারসূত্রে আসিয়া আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হইয়াছে, আমাদের ধমনীর প্রত্যেক শোণিতবিন্দুর সহিত মিশিয়া গিয়াছে, আমাদের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। এখন ধর্ম ও হিন্দু—এই দুইটি শব্দ একার্থবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাই আমাদের জাতির বিশেষত্ব, ইহাতে আঘাত করিবার উপায় নাই। অসভ্য জাতিসমূহ তরবারি ও বন্দুক লইয়া বর্বর ধর্ম-সমূহ আমদানি করিয়াছে, একজনও সেই সাপের মাথার মণি ছুঁইতে পারে নাই, একজনও এই জাতির প্রাণপাখিকে মারিতে পারে নাই। অতএব ইহাই আমাদের জাতির জীবনীশক্তি, আর যতদিন ইহা অব্যাহত থাকিবে, ততদিন জগতের কোন শক্তিই এই জাতিকে বিনাশ করিতে পারিবে না। যতদিন আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মহত্তম রত্নস্বরূপ এই ধর্মকে ধরিয়া থাকিব, ততদিন জগতের সর্বপ্রকার অত্যাচার, উৎপীড়ন ও দুঃখের অগ্নিরাশির মধ্য হইতেও প্রহ্লাদের ন্যায় অক্ষত শরীরে বাহির হইয়া আসিব। হিন্দু যদি ধার্মিক না হয়, তবে আমি তাহাকে 'হিন্দু' বলি না। অন্যান্য দেশে রাজনীতি-চর্চা লোকের মুখ্য অবলম্বন হইতে পারে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সে একটু-আধটু ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে, কিন্তু এখানে—এই ভারতে আমাদের জীবনের সর্বপ্রথম কর্তব্য ধর্মানুষ্ঠান, তারপর যদি সময় থাকে, তবে অন্যান্য জিনিস তাহার

সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই। এই বিষয়টি মনে রাখিলে আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব যে, জাতীয় কল্যাণের জন্য অতীতকালে যেমন, বর্তমানকালেও তেমনি, চিরকালই তেমনি আমাদিগকে প্রথমে আমাদের জাতির সমগ্র আধ্যাত্মিক শক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ভারতের বিক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তিগুলিকে একত্র করাই ভারতের জাতীয় একত্ব-সাধনের একমাত্র উপায়। যাহাদের হৃদয়তন্ত্রী একই প্রকার আধ্যাত্মিক সুরে বাঁধা, তাহাদের সম্মিলনেই ভারতের জাতি গঠিত হইবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, এদেশে সম্প্রদায়ের অভাব নাই। এখনই যথেষ্ট রহিয়াছে, আর ভবিষ্যতেও অনেক হইবে। কারণ আমাদের ধর্মের ইহাই বিশেষত্ব যে, মূলতত্ত্বগুলি এত উদার যে যদিও ঐগুলি হইতেই অনেক বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি ব্যাপারের উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু ঐগুলি সেই মূল তত্ত্বসমূহের কার্যে পরিণত রূপ—যে-তত্ত্বগুলি আমাদের মাথার উপরের আকাশের মতো উদার এবং প্রকৃতির মতো নিত্য ও সনাতন। অতএব সম্প্রদায়গুলি যে স্বভাবতই চিরদিন থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া সাম্প্রদায়িক বিবাদের কোন প্রয়োজন নাই। সম্প্রদায় থাকুক, সাম্প্রদায়িকতা দূর হউক। সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা জগতের কিছু উন্নতি হইবে না, কিন্তু সম্প্রদায় না থাকিলেও জগৎ চলিতে পারে না। একদল লোক তো সব কাজ করিতে পারে না। অনন্তপ্রায় শক্তিরাশি অল্প কয়েকটি লোকের দ্বারা কখনই পরিচালিত হইতে পারে না। এই বিষয় বুঝিলেই আমরা বুঝিব, কি প্রয়োজনে আমাদের ভিতর সম্প্রদায়-ভেদরূপ এই শ্রমবিভাগ অবশ্যম্ভাবিরূপে আসিয়াছে। বিভিন্ন আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের সুপরিচালনার জন্য সম্প্রদায় থাকুক, কিন্তু আমাদের পরস্পরের বিবাদ করিবার কি প্রয়োজন আছে, যখন আমাদের অতি প্রাচীন শাস্ত্রসকল ঘোষণা করিতেছে যে, এই ভেদ আপাতপ্রতীয়মান, এই-সকল আপাতদৃষ্ট বিভিন্নতাসত্ত্বেও ঐ-সকলের মধ্যে মিলনের স্বর্ণসূত্র রহিয়াছে, ঐগুলির মধ্যেই সেই পরম মনোহর একত্ব রহিয়াছে। আমাদের অতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহ ঘোষণা করিয়াছেন, 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' জগতে এক বস্তুই বিদ্যমান—ঋষিগণ তাঁহাকেই বিভিন্ন নামে বর্ণনা করেন। অতএব যদি এই ভারতে—যেখানে চিরদিন সকল সম্প্রদায়ই সম্মানিত হইয়া আসিয়াছেন—সেই ভারতে এখনও এই-সকল সাম্প্রদায়িক বিবাদ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর দ্বেষহিংসা

থাকে, তবে ধিক্ আমাদিগকে, যাহারা সেই মহিমান্বিত পূর্বপুরুষগণের বংশধর বলিয়া নিজদিগকে পরিচয় দেয়।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বিশ্বাস—কতকগুলি প্রধান প্রধান মতবাদে আমাদের সকলেরই সম্মতি আছে। আমরা বৈষ্ণব বা শৈব হই, শাক্ত বা গাণপত্য হই, প্রাচীন বৈদান্তিক বা আধুনিকগণ যাঁহাদেরই পদানুসরণ করি না কেন, প্রাচীন গোঁড়া সম্প্রদায়েরই হই, অথবা আধুনিক সংস্কারপন্থী সম্প্রদায়েরই হই, যে আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, আমার ধারণায় সে-ই এ-সকল তত্ত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকে। অবশ্য ঐ তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যাপ্রণালীতে ভেদ থাকিতে পারে, আর থাকাও উচিত ; কারণ আমরা সকলকেই আমাদের ভাবে আনিতে পারি না , আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিব, সকলকেই সেই ব্যাখ্যা লইতে হইবে বা সকলকেই আমাদের প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে—ঐরূপ চেষ্টাই পাপ—জোর করিয়া এরূপ করিবার চেষ্টা পাপ।

ভদ্রমহোদয়গণ, আজ যাঁহারা এখানে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, আমরা বেদকে আমাদের ধর্মরহস্য-সমূহের সনাতন উপদেশ বলিয়া বিশ্বাস করি। আমরা সকলেই বিশ্বাস করি, এই পবিত্র শব্দরাশি অনাদি অনন্ত ; প্রকৃতির যেমন আদি নাই, অন্ত নাই বেদেরও তেমনি ; এবং যখনই আমরা এই পবিত্র গ্রন্থের সান্নিধ্যে দণ্ডায়মান হই, তখনই আমাদের ধর্মসম্বন্ধীয় সকল ভেদ, সকল প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হয়। আমাদের ধর্মসম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার ভেদের শেষ মীমাংসাকারী—শেষ বিচারক এই বেদ। বেদ কি—এই বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে। কোন সম্প্রদায় বেদের অংশবিশেষকে অন্য অংশ অপেক্ষা পবিত্রতর জ্ঞান করিতে পারে। কিন্তু তাহাতে কিছুই আসে যায় না, যতক্ষণ আমরা বলিতে পারি—বেদবিশ্বাসে আমরা সকলেই ভাই ভাই। এই সনাতন পবিত্র অপূর্ব গ্রন্থ হইতেই আজ আমরা যাহা কিছু পবিত্র মহৎ উত্তম বস্তুর অধিকারী, তাহার সবই আসিয়াছে। বেশ, তাই যদি আমরা বিশ্বাস করি, তবে এই তত্ত্বটিই ভারতভূমির সর্বত্র প্রচারিত হউক। যদি ইহা সত্য হয়, তবে বেদ চিরদিনই যে প্রাধান্যের অধিকারী এবং বেদের যে প্রাধান্যে আমরাও বিশ্বাসী, তাহা বেদকে দেওয়া হউক। অতএব আমাদের মিলনের প্রথম ভূমি—বেদ।

দ্বিতীয়তঃ আমরা সকলেই ঈশ্বর বিশ্বাস করিয়া থাকি। যিনি জগতের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারিণী শক্তি—যাঁহাতে কালে সমগ্র জগৎ লয়প্রাপ্ত হইয়া আবার কালে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডরূপ এই অদ্ভুত প্রপঞ্চ বহির্গত হয়। আমাদের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইতে পারে—কেহ বা হয়তো সম্পূর্ণ সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী, কেহ বা আবার সগুণ অথচ ব্যক্তিভাবশূন্য ঈশ্বরে বিশ্বাসী, অপর কেহ আবার সম্পূর্ণ নির্গুণ ঈশ্বর মানিতে পারেন, আর সকলেই বেদ হইতে নিজ নিজ মতের প্রমাণ দেখাইতে পারেন। এ-সকল ভেদ-সত্ত্বেও আমরা সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া থাকি। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, যাঁহা হইতে সকলে উৎপন্ন হইতেছে, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সকলে জীবিত, অন্তে সকলেই যাঁহাতে লীন হইবে, সেই অত্যদ্ভুত অনন্ত শক্তিকে যে বিশ্বাস না করে, তাহাকে হিন্দু বলা যাইতে পারে না। যদি তাহাই হয়, তবে এই তত্ত্বটিও ভারতভূমির সর্বত্র প্রচার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ঈশ্বরের যে-ভাবই তুমি প্রচার কর না কেন, তোমাতে আমাতে প্রকৃতপক্ষে কোন ভেদ নাই—আমরা তোমার সঙ্গে উহা লইয়া বিবাদ করিব না—কিন্তু যেরূপেই হউক, তোমাকে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচার করিতে হইবে। আমরা ইহাই চাই। এগুলির মধ্যে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় কোন একটি ধারণা অপরটি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইতে পারে, কিন্তু মনে রাখিও ইহার কোনটিই মন্দ নহে। একটি উৎকৃষ্ট, অপরটি উৎকৃষ্টতর, অপরটি উৎকৃষ্টতম হইতে পারে, কিন্তু আমাদের ধর্মতত্ত্বের পারিভাষিক শব্দ-নিচয়ের মধ্যে 'মন্দ' শব্দটির স্থান নাই। অতএব যিনি যে ভাবে ইচ্ছা ঈশ্বরের নাম প্রচার করেন, তিনিই ঈশ্বরের আশীর্বাদভাজন। তাঁহার নাম যতই প্রচারিত হইবে, ততই এই জাতির কল্যাণ। আমাদের সন্তানগণ বাল্যকাল হইতে এই ভাব শিক্ষা করুক—এই ঈশ্বরের নাম সর্বাপেক্ষা দরিদ্র ও নীচ ব্যক্তির গৃহ হইতে সর্বাপেক্ষা ধনী ও মানী—সকলের গৃহে প্রবিষ্ট হউক।

ভদ্রমহোদয়গণ, তৃতীয় তত্ত্ব যাহা আমি আপনাদের নিকট বলিতে চাই, তাহা এই—পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মতো আমরা বিশ্বাস করি না যে, জগৎ কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে মাত্র সৃষ্ট হইয়াছে, আর একদিন উহা একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে; আমরা ইহাও বিশ্বাস করি না যে, জীবাত্মা এই জগতের সঙ্গে সঙ্গেই শূন্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। আমার বিবেচনায় এই বিষয়েও সকল হিন্দুই একমত। আমরা বিশ্বাস করি, প্রকৃতি অনাদি অনন্ত, তবে কল্পনাতে এই স্থূল-

বাহ্য জগৎ সূক্ষ্মাবস্থায় পরিণত হয়, কিছুকালের জন্য ঐরূপ অবস্থায় থাকিয়া আবার অভিক্ষিপ্ত হইয়া প্রকৃতি-নামধেয় এই অনন্ত প্রপঞ্চকে প্রকাশ করে এবং তরঙ্গাকার এই গতি অনন্তকাল ধরিয়া—যখন কালেরও আরম্ভ হয় নাই, তখন হইতেই চলিতেছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া চলিবে।

সকল হিন্দুই আরও বিশ্বাস করে যে, স্থূল জড় দেহটা, এমন কি তাহার অভ্যন্তরস্থ মন নামক সূক্ষ্ম শরীরও প্রকৃত মানুষ নহে, কিন্তু প্রকৃত মানুষ এইগুলি অপেক্ষাও মহত্তর। কারণ স্থূলদেহ পরিণামী, মনও তদ্রূপ, কিন্তু এতদুভয়ের অতীত আত্মা নামধেয়—এই 'আত্মা' শব্দটির ইংরেজী অনুবাদ করিতে আমি অক্ষম, যে শব্দের দ্বারাই ইহার অনুবাদ করা যাক না কেন, তাহা ভুল হইবে—সেই অনির্বচনীয় বস্তুর আদি-অন্ত কিছুই নাই, মৃত্যুনামক অবস্থাটির সহিত উহা পরিচিত নহে।

তারপর আর একটি বিশেষ বিষয়ে অন্যান্য জাতির সহিত আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ প্রভেদ, তাহা এই যে, আত্মা এক দেহ-অবসানে আর এক দেহ ধারণ করে; এইরূপ করিতে করিতে তাহার এমন অবস্থা আসে, যখন তাহার কোনরূপ শরীরধারণের প্রয়োজন বা ইচ্ছা থাকে না, তখন সে মুক্ত হইয়া যায়, তাহার আর জন্ম হয় না। আমি আমাদের শাস্ত্রে সংসারবাদ বা পুনর্জন্মবাদ এবং 'নিত্য-আত্মা' সম্বন্ধীয় মতবাদের কথা বলিতেছি। আমরা যে সম্প্রদায়ভুক্তই হই না কেন, এই আর একটি বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। এই আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধবিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে। এক সম্প্রদায়ের মতে এই আত্মা পরমাত্মা হইতে নিত্য ভিন্ন হইতে পারে, কাহারও মতে আবার উহা সেই অনন্ত বহ্নির স্ফুলিঙ্গমাত্র হইতে পারে, অন্যের মতে হয়তো উহা অনন্তের সহিত অভেদ। আমরা এই আত্মার ও পরমাত্মার সম্বন্ধ লইয়া যেরূপ ইচ্ছা ব্যাখ্যা করি না কেন, তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না; কিন্তু যতক্ষণ আমরা এই মূলতত্ত্ব বিশ্বাস করি যে, আত্মা অনন্ত, উহা কখনও সৃষ্ট হয় নাই, সুতরাং কখনই উহার বিনাশ হইবে না, উহাকে বিভিন্ন শরীর ধরিয়া ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতে হইবে, অবশেষে মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া পূর্ণত্বলাভ করিতে হইবে—ততক্ষণ আমরা সকলেই একমত।

তারপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মধ্যে সম্পূর্ণ ভেদসাধক, ধর্মরাজ্যের মহত্তম ও অপূর্বতম আবিষ্কার-রূপ তত্ত্বটির কথা তোমাদিগকে বলিব।

তোমাদের মধ্যে যাহারা পাশ্চাত্য তত্ত্বরাশির আলোচনায় বিশেষভাবে নিযুক্ত, তাহারা ইতঃপূর্বেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, একটা মৌলিক প্রভেদ যেন প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্যকে এক কুঠারাঘাতে পৃথক্ করিয়া দিতেছে ; সেটি এই যে—আমরা ভারতে সকলেই বিশ্বাস করি, আমরা শাক্তই হই, শৈবই হই, বৈষ্ণবই হই, এমন কি বৌদ্ধ বা জৈনই হই—আমরা সকলেই বিশ্বাস করি যে, আত্মা স্বভাবতই শুদ্ধ ও পূর্ণস্বভাব, অনন্তশক্তিসম্পন্ন ও আনন্দময়। কেবল দ্বৈতবাদীর মতে আত্মার এই স্বাভাবিক আনন্দ-স্বভাব অতীত-অসৎকর্মজন্য সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইয়াছে, আর ঈশ্বরানুগ্রহে উহা আবার সঙ্কোচমুক্ত হইবে এবং আত্মা নিজ পূর্ণস্বভাব পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদীর মতে আত্মা কিছুদিনের জন্য সঙ্কোচ প্রাপ্ত হন, এ ধারণাটিও আংশিকভাবে ভ্রমাত্মক—মায়াবৃত হওয়ার ফলেই আমরা ভাবি যে, আত্মা যেন তাঁহার সমুদয় শক্তি হারাইয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তখনও তাঁহার সমুদয় শক্তির পূর্ণ প্রকাশ থাকে। দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদীর মতে এই প্রভেদ থাকিলেও মূল তত্ত্বে অর্থাৎ আত্মার স্বাভাবিক পূর্ণত্বে সকলেই বিশ্বাসী, আর এখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মধ্যে বজ্রদৃঢ় প্রাচীর-ব্যবধান। প্রাচ্য জাতি যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু ভাল, তাহা অন্তরে অন্বেষণ করে। উপাসনার সময় আমরা চক্ষু মুদিয়া ঈশ্বরকে অন্তরে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করি, পাশ্চাত্য জাতি ঈশ্বরকে বাহিরে অন্বেষণ করে। পাশ্চাত্যগণের ধর্মপুস্তক-সমূহ Inspired—সুতরাং শ্বাস-গ্রহণের ন্যায় বাহির হইতে ভিতরে আসিয়াছে। আমাদের ধর্মশাস্ত্রসমূহ কিন্তু Expired—শ্বাসপরিত্যাগের ন্যায় ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়াছে—ঐগুলি ঈশ্বর-নিঃশ্বসিত, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের হৃদয় হইতে উহারা নিঃসৃত হইয়াছে।[১]

এইটিই একটি প্রধান বুঝিবার জিনিস ; হে আমার বন্ধুগণ, আমার ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ভবিষ্যতে এই বিষয়টি আমাদিগকে বিশেষভাবে বার বার লোককে বুঝাইতে হইবে। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং আমি তোমাদিগকেও এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি যে, যে ব্যক্তি দিবারাত্র আপনাকে হীন ভাবে, তাহার দ্বারা ভাল কিছু হইতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি দিবারাত্র আপনাকে দীন দুঃখী হীন ভাবে, সে হীনই

১ বৃহ উপ., ২।৪।১০

হইয়া যায়। যদি তুমি বলো—'আমার মধ্যেও শক্তি আছে', তোমার ভিতর শক্তি জাগিবে ; আর যদি তুমি বলো—'আমি কিছুই নই', ভাবো যে তুমি কিছুই নও, দিবারাত্র যদি ভাবিতে থাকো যে তুমি কিছুই নও, তবে তুমি 'কিছু না' হইয়া দাঁড়াইবে। এই মহান্ তত্ত্বটি তোমাদের মনে রাখা কর্তব্য। আমরা সেই সর্বশক্তিমানের সন্তান, আমরা সেই অনন্ত ব্রহ্মাগ্নির স্ফুলিঙ্গ। আমরা 'কিছু না' কিরূপে হইতে পারি ? আমরা সব করিতে প্রস্তুত, সব করিতে পারি, আমাদিগকে সব করিতেই হইবে। আমাদের পূর্বপুরুষগণের হৃদয়ে এই আত্মবিশ্বাস ছিল, এই আত্মবিশ্বাসরূপ প্রেরণাশক্তিই তাঁহাদিগকে সভ্যতার উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরূঢ় করাইয়াছিল, আর যদি এখন অবনতি হইয়া থাকে, যদি আমাদের ভিতর দোষ আসিয়া থাকে, তবে আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি—যে দিন আমাদের দেশের লোক এই আত্মপ্রত্যয় হারাইয়াছে, সেইদিন হইতেই এই অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। নিজের উপর বিশ্বাস হারানোর অর্থ ঈশ্বরে অবিশ্বাস। তোমরা কি বিশ্বাস কর, সেই অনন্ত মঙ্গলময় বিধাতা তোমাদের মধ্য দিয়া কাজ করিতেছেন ? তোমরা যদি বিশ্বাস কর যে, সেই সর্বব্যাপী অন্তর্যামী প্রত্যেক অণুতে পরমাণুতে, তোমাদেব দেহে মনে আত্মায় ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছেন, তাহা হইলে কি তোমরা নিরুৎসাহ হইতে পারো ? আমি হয়তো একটি ক্ষুদ্র জলবুদবুদ, তুমি হয়তো একটি পর্বতপ্রায় তরঙ্গ। হইলই বা ! সেই অনন্ত সমুদ্র যেমন তোমার আশ্রয়, আমারও সেইরূপ। সেই প্রাণ, শক্তি ও আধ্যাত্মিকতার অনন্ত সমুদ্রে তোমারও যেমন অধিকার আমারও তেমনি। আমার জন্ম হইতেই—আমারও যে জীবন আছে তাহা হইতেই—স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, পর্বতপ্রায় উচ্চ তরঙ্গস্বরূপ তোমার ন্যায় আমিও সেই অনন্ত জীবন, অনন্ত শিব ও অনন্ত শক্তির সহিত নিত্যসংযুক্ত। অতএব হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের সন্তানগণকে—তাহাদের জন্ম হইতেই এই জীবনপ্রদ, মহত্ত্ববিধায়ক, উচ্চ মহান্ তত্ত্ব শিক্ষা দিতে আরম্ভ কর। তাহাদিগকে অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই, তাহাদিগকে দ্বৈতবাদ বা যে-কোন বাদ ইচ্ছা শিক্ষা দাও ; আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, আত্মার পূর্ণত্বরূপ এই অপূর্ব মতটি ভারতে সর্বসাধারণ—সকল সম্প্রদায়ই বিশ্বাস করিয়া থাকে।

আমাদের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কপিল বলিয়াছেন, যদি পবিত্রতা আত্মার স্বরূপ না হয়, তবে আত্মা কখনই পরে পবিত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে না ; কারণ

যে স্বভাবতই পূর্ণ নহে, সে কোনরূপে উহা লাভ করিলেও উহার নিকট হইতে আবার চলিয়া যাইবে। যদি অপবিত্রতাই মানবের স্বভাব হয়, তবে যদিও ক্ষণকালের জন্য সে পবিত্রতা লাভ করে, তথাপি চিরকালের জন্য তাহাকে অপবিত্রই থাকিতে হইবে। এমন সময় আসিবে, যখন এই পবিত্রতা ধুইয়া যাইবে, চলিয়া যাইবে এবং আবার সেই প্রাচীন স্বাভাবিক অপবিত্রতা রাজত্ব করিবে। এজন্য আমাদের সকল দার্শনিক বলেন, পবিত্রতাই আমাদের স্বভাব, অপবিত্রতা নহে ; পূর্ণত্বই আমাদের স্বভাব, অপূর্ণতা নহে—এইটি স্মরণ রাখিও। মৃত্যুকালে যে মহর্ষি তাঁহার নিজ মনকে তাঁহার কৃত উৎকৃষ্ট কার্যাবলী ও উৎকৃষ্ট চিন্তারাশি স্মরণ করিতে বলিতেছেন—তাঁহার কথা স্মরণ রাখিও।[১] কই, তিনি তো তাঁহার মনকে সমুদয় দোষ-দুর্বলতা স্মরণ করিতে বলিতেছেন না। অবশ্য মানুষের জীবনে দোষ-দুর্বলতা যথেষ্ট আছে ; কিন্তু সর্বদাই তোমার প্রকৃত স্বরূপ স্মরণ কর—ঐ দোষ-দুর্বলতা প্রতিকার করিবার ইহাই একমাত্র উপায়।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বোধ হয়, পূর্বকথিত কয়েকটি মত ভারতের সকল বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়া থাকেন, আর সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে এই সাধারণ ভিত্তির উপর গোঁড়া বা উদার, প্রাচীন বা নব্যপন্থী, সকলেই সম্মিলিত হইবেন। কিন্তু সর্বোপরি, আর একটি বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক এবং আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, ইহা আমরা সময় সময় ভুলিয়া যাই—ভারতে ধর্মের অর্থ প্রত্যক্ষানুভূতি, তাহা না হইলে উহা ধর্ম নামেরই যোগ্য নহে। 'এইমতে বিশ্বাস করিলেই তোমার পরিত্রাণ নিশ্চিত'—এ-কথা আমাদিগকে কেহ কখন শিখাইতে পারিবে না ; কারণ আমরা ও-কথায় বিশ্বাসই করি না। তুমি নিজেকে যেরূপ গঠন করিবে, তুমি তাহাই হইবে। তুমি যাহা—তাহা তুমি ঈশ্বরানুগ্রহে এবং নিজ চেষ্টায় হইয়াছ। সুতরাং কেবল কতকগুলি মতামতে বিশ্বাস করিলে তোমার বিশেষ কিছু উপকার হইবে না। ভারতের আধ্যাত্মিক গগন হইতেই এই মহাশক্তিময়ী বাণী আবির্ভূত হইয়াছে—'অনুভূতি' ; আর একমাত্র আমাদের শাস্ত্রই বারবার বলিয়াছেন, 'ঈশ্বরকে দর্শন করিতে হইবে।' খুব সাহসের কথা বটে, কিন্তু উহার একবর্ণও মিথ্যা নয়—

১ ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর। ঈশ উপ., ১৭

আগাগোড়া সত্য। ধর্ম সাক্ষাৎ করিতে হইবে, কেবল শুনিলে হইবে না, কেবল তোতাপাখির মতো কতকগুলি কথা মুখস্থ করিলেই চলিবে না, কেবল বুদ্ধির সায়—বুদ্ধিগত সম্মতি দিলেই চলিবে না; ইহাতে কিছুই হয় না, ধর্ম আমাদের ভিতর প্রবেশ করা চাই। প্রাচীনেরা এবং আধুনিকেরাও 'সেই ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন—ইহাই আমাদের নিকট ঈশ্বরের অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ; আমাদের যুক্তিবিচার এইরূপ বলিতেছে—এ-জন্যই যে আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাহা নহে। আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার উৎকৃষ্ট যুক্তি আছে বলিয়াই যে আমরা আত্মায় বিশ্বাসী, তাহা নহে; আমাদের বিশ্বাসের প্রধান ভিত্তি এই যে, এই ভারতে প্রাচীনকালে সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই আত্মাকে দর্শন করিয়াছেন, বর্তমান্ কালেও খুঁজিলে অন্ততঃ দশজন আত্মজ্ঞ পুরুষের সাক্ষাৎ মিলিবে এবং ভবিষ্যতেও সহস্র সহস্র ব্যক্তির অভ্যুদয় হইবে, যাঁহারা আত্মদর্শন করিবেন। আর যতদিন না মানুষ ঈশ্বরদর্শন করিতেছে, যতদিন না সে আত্মার সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হইতেছে, ততদিন তাহার মুক্তি অসম্ভব। অতএব সর্বাগ্রে এই-বিষয়টি আমাদিগকে বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে এবং আমরা উহা যতই ভাল করিয়া বুঝিব, ততই ভারতে সাম্প্রদায়িকতার হ্রাস হইবে। কারণ সে-ই প্রকৃত ধার্মিক, যে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছে—তাঁহাকে লাভ করিয়াছে।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥[১]

—তাঁহারই হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, তাঁহারই সকল সংশয় চলিয়া যায়, তিনিই কর্মফল হইতে মুক্ত হন, যিনি কার্য ও কারণরূপী পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

হায়, আমরা অনেক সময় অনর্থক বাগাড়ম্বরকে আধ্যাত্মিক সত্য বলিয়া ভ্রম করি, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতার ছটাকে গভীর ধর্মানুভূতি মনে করি; তাই সাম্প্রদায়িকতা, তাই বিরোধ। যদি আমরা একবার বুঝিতে পারি যে প্রত্যক্ষানুভূতিই প্রকৃত ধর্ম, তাহা হইলে নিজ হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব—আমরা ধর্মের সত্যসমূহ উপলব্ধির পথে কতদূর অগ্রসর। তাহা হইলেই আমরা বুঝিব যে, আমরা নিজেরাই অন্ধকারে ঘুরিতেছি ও অপরকেও

১ মুণ্ডক উপ., ২।২।৮

সেই অন্ধকারে ঘুরাইতেছি। আর ইহা বুঝিলেই আমাদের সাম্প্রদায়িকতা ও ও দ্বন্দ্ব বিদূরিত হইবে। কোন ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক বিবাদ করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর: তুমি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছ? তুমি কি আত্মদর্শন করিয়াছ? যদি না করিয়া থাকো, তবে তাঁহাকে প্রচার করিবার তোমার কি অধিকার? তুমি নিজেই অন্ধকারে ঘুরিতেছ, আবার আমাকেও সেই অন্ধকারে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছ? অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায়[১] আমরা উভয়েই যে খানায় পড়িয়া যাইব! অতএব অপরের সহিত বিবাদ করিবার পূর্বে একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া অগ্রসর হও। সকলকেই নিজ নিজ সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রত্যক্ষানুভূতির দিকে অগ্রসর হইতে দাও, সকলেই নিজ নিজ হৃদয়ে সেই সত্যদর্শনের চেষ্টা করুক। আর যখনই তাহারা সেই ভূমা, অনাবৃত সত্য দর্শন করিবে, তখনই তাহারা সেই অপূর্ব আনন্দের আস্বাদ পাইবে;—ভারতে প্রত্যেক ঋষি, যিনিই সত্যকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তিনিই একবাক্যে এ-কথা বলিয়া গিয়াছেন। তখন সেই হৃদয় হইতে কেবল প্রেমের বাণী বাহির হইবে; কারণ যিনি সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপ, তিনি সেই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তখন—কেবল তখনই সকল সাম্প্রদায়িক বিবাদ অন্তর্হিত হইবে এবং তখনই আমরা 'হিন্দু'-শব্দটিকে এবং প্রত্যেক হিন্দুনামধারী ব্যক্তিকে যথার্থরূপে বুঝিতে, হৃদয়ে গ্রহণ করিতে, গভীরভাবে ভালবাসিতে এবং আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইব।

আমার কথা বিশ্বাস কর, তখন—কেবল তখনই তুমি প্রকৃত হিন্দুপদবাচ্য, যখন ঐ নামটিতেই তোমার ভিতরে মহাবৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হইবে; তখন—কেবল তখনই তুমি প্রকৃত হিন্দুপদবাচ্য হইবে, যখন যে-কোন দেশীয়, যে-কোন ভাষাভাষী হিন্দুনামধারী হইলেই অমনি তোমার পরমাত্মীয় বোধ হইবে; তখন—কেবল তখনই তুমি হিন্দুপদবাচ্য, যখন হিন্দুনামধারী যে-কোন ব্যক্তির দুঃখকষ্ট তোমার হৃদয় স্পর্শ করিবে আর তুমি নিজ সন্তান বিপদে পড়িলে যেরূপ উদ্বিগ্ন হও, তাহার কষ্টেও সেইরূপ উদ্বিগ্ন হইবে; তখন—কেবল তখনই তুমি হিন্দুপদবাচ্য, যখন তুমি তাহাদের নিকট হইতে সর্বপ্রকার অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করিতে প্রস্তুত হইবে। ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ

১ কঠ. উপ. ১।২।৫

তোমাদের সেই মহান্ গুরুগোবিন্দসিংহের বিষয় আমি এই বক্তৃতার আরম্ভেই বলিয়াছি।

এই মহাত্মা দেশের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন, হিন্দুধর্মের রক্ষার জন্য নিজ শোণিতপাত করিলেন, নিজ পুত্রগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিতে দেখিলেন, কিন্তু যাহাদের জন্য আপনার এবং আপনার আত্মীয়স্বজনগণের রক্তপাত করিলেন, তাহারা তাঁহার সহায়তা করা দূরে থাক, তাহারাই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, এমন কি, দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল ; অবশেষে এই আহত কেশরী নিজ কার্যক্ষেত্র হইতে ধীরভাবে দক্ষিণদেশে গিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু যাহারা অকৃতজ্ঞভাবে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, তাহাদের প্রতি একটি অভিশাপবাক্যও তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল না।

আমার বাক্য অবধান কর—যদি তোমরা দেশের হিতসাধন করিতে চাও, তোমাদেরও প্রত্যেককে এক এক জন গোবিন্দসিংহ হইতে হইবে। তোমরা স্বদেশবাসীদের ভিতর সহস্র দোষ দর্শন করিতে পারো, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে হিন্দুরক্ত আছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিও। তোমাদের স্বদেশবাসিগণকেই প্রথমে দেবতারূপে পূজা করিতে হইবে, যদিও তাহারা সর্বপ্রকারে তোমাদের অনিষ্টের চেষ্টা করে। যদিও তাহারা প্রত্যেকেই তোমার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করে, তুমি তাহাদের প্রতি প্রেমের বাণী প্রয়োগ করিবে। যদি তাহারা তোমাকে তাড়াইয়া দেয়, তবে সেই বীরকেশরী গোবিন্দসিংহের মতো সমাজ হইতে দূরে যাইয়া নিস্তব্ধতার মধ্যে মৃত্যুর প্রতীক্ষা কর। এইরূপ ব্যক্তিই হিন্দু নামের যোগ্য; আমাদের সম্মুখে সর্বদাই এরূপ আদর্শ থাকা আবশ্যক। পরস্পর বিরোধ ভুলিতে হইবে—চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ বিস্তার করিতে হইবে।

'ভারত-উদ্ধার' সম্বন্ধে, যাহার যাহা ইচ্ছা হয় বলুক। আমি সারা জীবন কার্য করিতেছি, অন্ততঃ কার্য করিবার চেষ্টা করিতেছি—আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যতদিন না তোমরা প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক হইতেছ, ততদিন ভারতের উদ্ধার হইবে না। তোমাদের আধ্যাত্মিকতার উপর শুধু ভারতের নহে, সমগ্র জগতের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। কারণ আমি তোমাদিগকে স্পষ্টই বলিতেছি, এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল ভিত্তি পর্যন্ত বিচলিত হইয়াছে। জড়বাদের শিথিল বালুকাভিত্তির উপর স্থাপিত বড় বড় অট্টালিকা পর্যন্ত একদিন না একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেই হইবে। এ-বিষয়ে জগতের ইতিহাসই আমাদের

প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য। জাতির পর জাতি উঠিয়া জড়বাদের উপর নিজ মহত্ত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহারা জগতের নিকট ঘোষণা করিয়াছিল—মানুষ জড়মাত্র। লক্ষ্য করিয়া দেখ, পাশ্চাত্য মৃত্যুর কথা বলিতে গিয়া বলে, 'মানুষ আত্মা ত্যাগ করে'[১]। আমাদের ভাষা কিন্তু বলে, সে দেহত্যাগ করিল। পাশ্চাত্যদেশীয় লোক নিজের কথা বলিতে গেলে প্রথমে দেহকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে, তাহার পর তাহার একটি আত্মা আছে বলিয়া উল্লেখ করে; কিন্তু আমরা প্রথমেই নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করি, তারপর আমার একটা দেহ আছে—এই কথা বলি। এই দুইটি বিভিন্ন বাক্য আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইবে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর কত পার্থক্য। এই কারণে যে-সকল সভ্যতা দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যরূপ বালির ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাহারা অল্পদিনমাত্র জীবিত থাকিয়া জগৎ হইতে একে একে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ভারত এবং অন্যান্য যে-সকল জাতি ভারতের পদপ্রান্তে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছে—যথা চীন ও জাপান—এখনও জীবিত; এমন কি, উহাদের ভিতর পুনরভ্যুত্থানের লক্ষণসমূহ দেখা যাইতেছে। তাহারা যেন রক্তবীজের ন্যায়; সহস্রবার তাহাদিগকে নষ্ট কর—তাহারা পুনরুজ্জীবিত হইয়া নূতন মহিমায় প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু জড়বাদের উপর যে-সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত, তাহা একবার নষ্ট হইলে আর কখনও জাগে না; একবার সেই অট্টালিকা পড়িয়া গেলে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। অতএব ধৈর্যধারণপূর্বক অপেক্ষা কর; ভবিষ্যৎ গৌরব আমাদের জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে।

ব্যস্ত হইও না; অপর কাহাকেও অনুকরণ করিতে যাইও না। আমাদিগকে এই আর একটি বিশেষ বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে—অপরের অনুকরণ সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে। আমি নিজেকে রাজার বেশে ভূষিত করিতে পারি, তাহাতেই কি আমি রাজা হইব? সিংহচর্মাবৃত গর্দভ কখন সিংহ হয় না। অনুকরণ—হীন কাপুরুষের মতো অনুকরণ কখনই উন্নতির কারণ হয় না, বরং উহা মানুষের ঘোর অধঃপতনের চিহ্ন। যখন মানুষ নিজেকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে, তখন বুঝিতে হইবে তাহার উপর শেষ আঘাত পড়িয়াছে; যখন সে নিজ পূর্বপুরুষগণকে স্বীকার করিতে লজ্জিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে

১ A man gives up the ghost.

তাহার বিনাশ আসন্ন। এই আমি হিন্দুজাতির মধ্যে একজন অতি নগণ্য ব্যক্তি ; তথাপি আমি আমার জাতির—আমার পূর্বপুরুষগণের গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। আমি নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। আমি যে তোমাদের একজন অযোগ্য দাস, ইহাতে আমি গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। তোমরা ঋষির বংশধর, সেই অতিশয় মহিমময় পূর্বপুরুষগণের বংশধর—আমি যে তোমাদের স্বদেশীয়, ইহাতে আমি গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। অতএব তোমরা আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন হও, তোমাদের পূর্বপুরুষগণের নামে লজ্জিত না হইয়া তাঁহাদের নামে গৌরব অনুভব কর ; আর অনুকরণ করিও না, অনুকরণ করিও না। যখনই তোমরা অপরের ভাবানুসারে পরিচালিত হইবে, তখনই তোমরা নিজেদের স্বাধীনতা হারাইবে। এমন কি, আধ্যাত্মিক বিষয়েও যদি তোমরা অপরের আজ্ঞাধীনে কার্য কর, তোমরা সকল শক্তি, এমন কি চিন্তাশক্তি পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিবে।

তোমাদের ভিতরে যাহা আছে, নিজ শক্তিবলে তাহা প্রকাশ কর, কিন্তু অনুকরণ করিও না ; অথচ অপরের যাহা ভাল, তাহা গ্রহণ কর। আমাদিগকে অপরের নিকট শিখিতে হইবে। বীজ মাটিতে পুঁতিলে উহা মৃত্তিকা, বায়ু ও জল হইতে রস সংগ্রহ করে বটে, কিন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইলে কি উহা মাটি, জল বা বায়ুর আকার ধারণ করে? না, তাহা করে না। বীজ মৃত্তিকাদি হইতে প্রয়োজনীয় সারাংশ গ্রহণ করিয়া নিজের প্রকৃতি-অনুযায়ী একটি বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়। তোমরাও এইরূপ কর। অবশ্য অপরের নিকট হইতে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে ; যে শিখিতে চায় না, সে তো পূর্বেই মরিয়াছে। আমাদের মনু বলিয়াছেন :

শ্রদ্দধানো শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥

—নীচ ব্যক্তির সেবা করিয়া তাহার নিকট হইতেও যত্নপূর্বক শ্রেষ্ঠ বিদ্যা শিক্ষা করিবে। হীন চণ্ডালের নিকট হইতেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম শিক্ষা করিবে, ইত্যাদি।

অপরের নিকট ভাল যাহা কিছু পাও শিক্ষা কর, কিন্তু সেইটি লইয়া নিজেদের ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে—অপরের নিকট শিক্ষা করিতে গিয়া তাহার সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইও না। এই ভারতের জাতীয় জীবন হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইও না ; এক মুহূর্তের জন্য মনে করিও

না, যদি ভারতের সকল অধিবাসী অপর জাতিবিশেষের পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিত, তাহা হইলেই ভাল হইত। কয়েক বৎসরের অভ্যাস পরিত্যাগ করাই কি কঠিন ব্যাপার, তাহা তোমরা বেশ জানো। আর ঈশ্বরই জানেন, কত সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এই জাতীয় জীবনস্রোত এক বিশেষ দিকে প্রবাহিত হইতেছে; ঈশ্বর জানেন তোমাদের শোণিতে কত সহস্র বৎসরের সংস্কার রহিয়াছে, আর তোমরা কি সাগরে মিলিতপ্রায় এই শক্তিশালিনী স্রোতস্বতীকে ঠেলিয়া আবার হিমালয়ের সেই তুষাররাশির নিকটে লইয়া যাইতে চাও? ইহা অসম্ভব। এইরূপ করিতে চেষ্টা করিলে তোমরাই বিনষ্ট হইবে। অতএব এই জাতীয় জীবনস্রোতকে প্রবাহিত হইতে দাও। যে-সকল প্রবল অন্তরায় এই বেগবতী নদীর স্রোত অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেগুলিকে সরাইয়া দাও, পথ পরিষ্কার করিয়া দাও, নদীর খাতকে সরল করিয়া দাও, তাহা হইলে উহা নিজ স্বাভাবিক গতিতে প্রবলবেগে অগ্রসর হইবে—এই জাতি সর্ববিধ উন্নতিসাধন করিতে করিতে চরম লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়া চলিবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধানের জন্য আমি পূর্বকথিত উপায়গুলি নির্দেশ করিলাম। আরও অনেক বড় বড় সমস্যা আছে, সেগুলি সময়াভাবে আজ রাত্রে আলোচনা করিতে পারিলাম না—দৃষ্টান্তস্বরূপ, জাতিভেদ-সম্বন্ধীয় অদ্ভুত সমস্যা রহিয়াছে। আমি সারা জীবন ধরিয়া এই সমস্যার সব দিক বিচার করিতেছি। ভারতের প্রায়: প্রত্যেক প্রদেশে গিয়া এই সমস্যার আলোচনা করিয়াছি, এদেশের প্রায় সর্বস্থানে গিয়া সকল জাতির লোকের সঙ্গে মিশিয়াছি; কিন্তু যতই আমি এই সমস্যার আলোচনা করিতেছি, ততই উহার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য পর্যন্ত ধারণা করিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেছি। অবশেষে আমার সম্মুখে যেন ক্ষীণ রশ্মিধারা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, আমি সম্প্রতি ইহার মূল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

তারপর আবার ভোজন-পানাদি-সম্বন্ধীয় গুরুতর সমস্যা রহিয়াছে। বাস্তবিকই ইহা একটি গুরুতর সমস্যা। আমরা সাধারণতঃ যতটা মনে করি, ইহা ততটা অনাবশ্যক নহে। আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আমরা এখন এই আহারাদি সম্বন্ধে যে-বিষয়ে ঝোঁক দিতে যাই, তাহা এক কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার, উহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে অর্থাৎ আমরা ভোজন-

পান-বিষয়ে যথার্থ শুদ্ধতা রক্ষা করিতে অবহেলা করিয়াই এই কষ্ট পাইতেছি—আমরা শাস্ত্রানুমোদিত ভোজন-পান-প্রথা ভুলিয়া গিয়াছি।

আরও কয়েকটি প্রশ্ন আছে, সেগুলিও আমি আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে চাই। আর এই সমস্যাগুলির সমাধানই বা কি, কিরূপেই বা সেগুলি কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহাও আপনাদিগকে বলিতে চাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সুশৃঙ্খলভাবে সভার কার্য আরম্ভ হইতেই বিলম্ব হইয়াছে, আর এখন অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের এবং আপনাদের রাত্রির আহারের আর অধিক বিলম্ব ঘটাইতে ইচ্ছা করি না। অতএব আমি জাতিভেদ ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিলাম। আশা করি, ভবিষ্যতে আমরা সকলেই অপেক্ষাকৃত শান্ত ও সুশৃঙ্খলভাবে সভায় যোগদান করিতে চেষ্টা করিব।

ভদ্রমহোদয়গণ, আর একটি কথা বলিলেই আমার আধ্যাত্মিক তত্ত্বসম্বন্ধে বক্তব্য শেষ হইবে। ভারতে ধর্ম অনেক দিন ধরিয়া নিশ্চল হইয়া আছে—আমরা চাই উহাকে গতিশীল করিতে। আমি প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। অতীতকালে বরাবর যেরূপ হইয়া আসিয়াছে, তেমনি এখনও রাজপ্রাসাদে এবং দরিদ্রের পর্ণকুটিরে ধর্ম যেন সমভাবে প্রবেশ করে। এই জাতির সাধারণ উত্তরাধিকার এবং জন্মগত সর্বজনীন স্বত্বরূপে প্রাপ্ত ধর্মকে প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারে মুক্তহস্তে লইয়া যাইতে হইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে বায়ু যেমন সকলের অনায়াসলভ্য, ভারতের ধর্মকেও ঐরূপ সুলভ করিতে হইবে। ভারতে আমাদিগকে এইভাবেই কাজ করিতে হইবে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গঠন করিয়া এবং মতানৈক্য লইয়া বিবাদ করিয়া নহে।

আমি তোমাদিগকে কার্য-প্রণালীর আভাস এইটুকু দিতে চাই যে, যে-সকল বিষয়ে আমাদের সকলের একমত, সেইগুলি প্রচার করা হউক—যে-সকল বিষয়ে মতভেদ আছে, সেগুলি আপনা-আপনি দূর হইয়া যাইবে। আমি যেমন বরাবর বলিয়াছি, গৃহে যদি শত শত শতাব্দীর অন্ধকার থাকে, এবং যদি আমরা সেই ঘরে গিয়া ক্রমাগত চীৎকার করিয়া বলিতে থাকি, 'উঃ কি অন্ধকার! কি অন্ধকার!' তবে কি অন্ধকার দূর হইবে? আলোক লইয়া আইস, অন্ধকার চিরকালের জন্য চলিয়া যাইবে। মানুষের সংস্কারসাধন করিবার ইহাই রহস্য।

তাহাদিগকে উচ্চতর বিষয়সমূহের আভাস দাও--প্রথমে মানুষের উপর অবিশ্বাস লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইও না। আমি মানুষের উপর—খুব খারাপ মানুষের উপরও—বিশ্বাস করিয়া কখন বিফল হই নাই। সর্বস্থলেই পরিণামে জয়লাভ হইয়াছে। মানুষকে বিশ্বাস কর—তা সে পণ্ডিতই হউক বা অজ্ঞ মূর্খ বলিয়াই প্রতীয়মান হউক। মানুষকে বিশ্বাস কর—তা তাহাকে দেবতা অথবা সাক্ষাৎ শয়তান বলিয়াই বোধ হউক। প্রথমে মানুষের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, তারপর এই বিশ্বাস হৃদয়ে লইয়া ইহাও বুঝিতে চেষ্টা কর—যদি তাহার ভিতর কোন অসম্পূর্ণতা থাকে, যদি সে কিছু ভুল করে, যদি সে অতিশয় ঘৃণিত ও অসার মত অবলম্বন করে, তবে ইহা জানিও—তাহার প্রকৃত স্বভাব হইতে ঐগুলি প্রসূত হয় নাই, উচ্চতর আদর্শের অভাব হইতেই হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যার দিকে যায়, তাহার কারণ এই—সে সত্যকে ধরিতে পারিতেছে না। অতএব মিথ্যাকে দূর করিবার একমাত্র উপায়—যাহা সত্য তাহা তাহাকে দিতে হইবে। সত্য কি তাহাকে জানাইয়া দাও। সত্যের সহিত সে নিজ ভাবের তুলনা করুক। তুমি তাহাকে সত্য জানাইয়া দিলে, ঐখানেই তোমার কাজ শেষ হইয়া গেল। সে এখন মনে মনে তাহার পূর্ব-ধারণার সহিত উহার তুলনা করুক। আর ইহাও নিশ্চিত জানিও যে, যদি তুমি তাহাকে যথার্থ সত্য দিয়া থাকো, তবে মিথ্যা অবশ্যই অন্তর্হিত হইবে; আলোক অন্ধকারকে অবশ্যই দূর করিবে; সত্য অবশ্যই তাহার ভিতরের সদ্ভাবকে প্রকাশিত করিবে। যদি সমগ্র দেশের আধ্যাত্মিক সংস্কার করিতে চাও, তবে ইহাই পথ—ইহাই একমাত্র পথ; বিবাদ-বিসংবাদে কোন ফল হইবে না, অথবা তাহাদিগকে এ-কথা বলিলেও চলিবে না যে, তাহারা যাহা করিতেছে, তাহা মন্দ। তাহাদের সম্মুখে ভালটি ধর, দেখিবে কি আগ্রহের সহিত তাহারা উহা গ্রহণ করে! মানুষের অন্তর্যামী সেই অবিনাশী ঐশীশক্তি জাগ্রত হইয়া যাহা কিছু উত্তম, যাহা কিছু মহিমময়, তাহারই জন্য হস্ত প্রসারণ করে।

যিনি আমাদের সমগ্র জাতির সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষাকর্তা, যিনি আমাদের পূর্বপুরুষগণের ঈশ্বর—যাঁহাকে বিষ্ণু শিব শক্তি বা গণপতি যে নামেই ডাকা হউক না কেন, যাঁহাকে সগুণ বা নির্গুণ যেরূপেই উপাসনা করা হউক না কেন, আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাঁহাকে জানিয়া 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' বলিয়া

গিয়াছেন, তিনি তাঁহার মহান্ প্রেম লইয়া আমাদের ভিতর প্রবেশ করুন, তিনি আমাদের উপর তাঁহার শুভাশীর্বাদ বর্ষণ করুন, তাঁহার কৃপায় আমরা যেন পরস্পরকে বুঝিতে সমর্থ হই, তাঁহার কৃপায় যেন আমরা প্রকৃত প্রেম ও তীব্র সত্যানুরাগের সহিত পরস্পরের জন্য কাজ করিতে পারি, এবং ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনরূপ মহৎ কার্যের মধ্যে যেন আমাদের ব্যক্তিগত যশ ও স্বার্থ, ব্যক্তিগত গৌরবের আকাঙ্ক্ষা প্রবেশ না করে!

ভক্তি

৯ই নভেম্বর, ১৮৯৭, সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের তাঁবুতে 'ভক্তি' সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তৃতা হয়। ইহাই লাহোরে স্বামীজীর দ্বিতীয় বক্তৃতা। লালা বালমুকুন্দ সভাপতি ছিলেন। লাহোর হইতে প্রকাশিত 'ট্রিবিউন'-পত্রে (নভেম্বর, ১৮৯৭) বক্তৃতার সারাংশ প্রকাশিত হয়।

উপনিষৎসমূহের গম্ভীরনাদী প্রবাহের মধ্যে একটি শব্দ দূরাগত প্রতিধ্বনির ন্যায় আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। যদিও উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তথাপি সমগ্র বেদান্ত-সাহিত্যে উহা স্পষ্ট হইলেও তত প্রবল নহে। উপনিষদ্গুলির মুখ্য উদ্দেশ্য মনে হয়—যেন আমাদের সম্মুখে ভূমার ভাব ও চিত্র উপস্থিত করা। তথাপি এই অদ্ভুত ভাবগাম্ভীর্যের পশ্চাতে মধ্যে মধ্যে আমরা কবিত্বেরও আভাস পাই; যথা—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।[১]

—সেখানে সূর্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্রতারকাও নহে, এই-সব বিদ্যুৎও প্রকাশ পায় না, অগ্নির তো কথাই নাই।

এই অপূর্ব পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের হৃদয়স্পর্শী কবিত্ব শুনিতে শুনিতে আমরা যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হইতে, এমন কি মনোরাজ্য হইতে দূরে অতি দূরে নীত

১ কঠ উপ, ২।২।১৫

হই—এমন এক জগতে নীত হই, যাহা কোন কালে বুঝিবার উপায় নাই; অথচ তাহা সর্বদা আমাদের নিকটেই রহিয়াছে। এই মহান্ ভাবের পিছনেও ছায়ার ন্যায় অনুগামী আর এক মহান্ ভাব রহিয়াছে, যাহা মানবজাতির অধিকতর গ্রহণযোগ্য, লোকের প্রাত্যহিক জীবনে অনুসরণের অধিকতর উপযোগী, যাহা মানবজীবনের প্রত্যেক বিভাগে প্রবেশ করানো যাইতে পারে। এই ভক্তিবীজ ক্রমে পুষ্ট হইয়াছে এবং পরবর্তী কালে পূর্ণভাবে ও সুস্পষ্ট ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে—আমরা পুরাণকে লক্ষ্য করিয়া এ-কথা বলিতেছি।

পুরাণেই ভক্তির চরম আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তিবীজ পূর্বাবধি বর্তমান; সংহিতাতেও উহার পরিচয়, উপনিষদে কিঞ্চিৎ অধিক বিকাশ, কিন্তু পুরাণে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। সুতরাং ভক্তি কী বুঝিতে হইলে আমাদের এই পুরাণগুলি বুঝা আবশ্যক। পুরাণের প্রামাণিকত্ব লইয়া ইদানীং বহু বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। এখান হইতে ওখান হইতে অনেক অংশ লইয়া সমালোচনা হইয়াছে, যেগুলির ঠিক অর্থ পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখানো হইয়াছে, ঐ অংশগুলি আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে টিকিতে পারে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এই বাদানুবাদ ছাড়িয়া দিয়া, পৌরাণিক উক্তিগুলির বৈজ্ঞানিক ভৌগোলিক ও জ্যোতিষিক সত্যাসত্য প্রভৃতি ছাড়িয়া দিয়া একটি জিনিস আমরা নিশ্চিতরূপে দেখিতে পাই; প্রায় সকল পুরাণেই আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিলে সর্বত্র এই ভক্তিবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধু-মহাত্মা ও রাজর্ষিগণের চরিত-বর্ণনমুখে উহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ ও আলোচনা করা হইয়াছে এবং দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। সৌন্দর্যের মহান্ আদর্শের—ভক্তির আদর্শের দৃষ্টান্তসমূহ বিবৃত করাই যেন পুরাণগুলির প্রধান কাজ বলিয়া মনে হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই আদর্শ সাধারণ মানবের ধারণার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। এমন লোক অতি অল্পই আছেন, যাঁহারা বেদান্তালোকের পূর্ণচ্ছটার মহিমা বুঝিতে ও উহার আদর করিতে পারেন—উহার তত্ত্বগুলি জীবনে পরিণত করা তো দূরের কথা। কারণ, প্রকৃত বেদান্তীর প্রথম কার্য 'অভীঃ' বা নির্ভীক হওয়া। যদি কেহ বেদান্তী হইবার স্পর্ধা রাখে, তাহাকে হৃদয় হইতে ভয় একেবারে নির্বাসিত করিতে হইবে। আর আমরা জানি,

ইহা কত কঠিন। যাঁহারা সংসারের সমুদয় সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন এবং যাঁহাদের এমন বন্ধন খুব কমই আছে, যাহা তাঁহাদিগকে দুর্বল কাপুরুষ করিয়া ফেলিতে পারে, তাঁহারাও অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন যে, তাঁহারা সময়ে সময়ে কত দুর্বল, কত কোমল হইয়া পড়েন ; সময় সময় তাঁহারাও কতখানি ভয় পান। যাহাদের চারিদিকে বন্ধন, যাহারা অন্তরে বাহিরে শত সহস্র বিষয়ের দাস হইয়া রহিয়াছে, জীবনের প্রতি মুহূর্তেই দাসত্ব যাহাদিগকে ক্রমশঃ নীচের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহারা যে কত দুর্বল, তাহা কি আর বলিতে হইবে? এরূপ ব্যক্তিদের নিকট পুরাণসমূহ ভক্তির অতি মনোহারিণী বার্তা বহন করিয়া আনে।

তাহাদেরই জন্য ভক্তির এই কোমল ও কবিত্বময় ভাব প্রচারিত, তাহাদেরই জন্য ধ্রুব প্রহ্লাদ ও শত সহস্র সাধুগণের এই-সকল অদ্ভুত ও বিস্ময়কর কাহিনী বিবৃত ; এবং এই দৃষ্টান্তগুলির উদ্দেশ্য—যাহাতে লোকে এই ভক্তিকে নিজ নিজ জীবনে বিকাশ করিতে পারে, তাহার পথ প্রদর্শন করা। আপনারা পুরাণগুলির বৈজ্ঞানিক সত্যতায় বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, আপনাদের মধ্যে এমন একজনও নাই, যাঁহাদের জীবনে প্রহ্লাদ ধ্রুব বা ঐ-সকল প্রসিদ্ধ পৌরাণিক মহাত্মাগণের উপাখ্যানের প্রভাব কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না।

আবার শুধু আধুনিক কালেই পুরাণগুলির উপযোগিতা ও প্রভাব স্বীকার করিলে চলিবে না। পুরাণসমূহের প্রতি এই কারণেই আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যে, পরবর্তী অবনত বৌদ্ধধর্ম আমাদিগকে যে-ধর্মের অভিমুখে লইয়া যাইতেছিল, ঐগুলি আমাদিগকে তদপেক্ষা প্রশস্ততর ও উন্নততর সর্বসাধারণের উপযোগী ধর্ম শিক্ষা দিয়াছে। ভক্তির সহজ ও সুখসাধ্য ভাব লিখিত ও আলোচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু শুধু তাহাতেই চলিবে না, এইভাব আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ আমরা পরে দেখিব যে, এই ভক্তির ভাবটি ক্রমে প্রস্ফুটিত হইয়া অবশেষে প্রেমে পরিণত হয়। যতদিন ব্যক্তিগত ও বিষয়গত প্রীতি বলিয়া কিছু থাকিবে, ততদিন কেহ পুরাণের উপদেশাবলী অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবে না। যতদিন সাহায্যের জন্য কোন ব্যক্তির উপর নির্ভর করা-রূপ মানবীয় দুর্বলতা বর্তমান থাকিবে, ততদিন এই-সকল পুরাণ কোন না কোন আকারে থাকিবেই থাকিবে। আপনারা উহাদের নাম পরিবর্তন করিতে পারেন, আপনারা এত কাল যাবৎ প্রচলিত পুরাণগুলির

নিন্দা করিতে পারেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার আপনাদিগকে বাধ্য হইয়া আর একখানি নূতন পুরাণ প্রণয়ন করিতে হইবে। ধরুন, আমাদের মধ্যে কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল—তিনি এই-সকল প্রাচীন পুরাণ অস্বীকার করিলেন; তাঁহার দেহত্যাগের পর বিশ বৎসর যাইতে না যাইতে দেখিবেন, তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার জীবন অবলম্বন করিয়াই একখানি পুরাণ রচনা করিয়া ফেলিবে। পুরাণ ছাড়িবার জো নাই, প্রাচীন পুরাণ ও আধুনিক পুরাণ—এইটুকুমাত্র পার্থক্য। মানুষের প্রকৃতিই ইহা চাহিয়া থাকে। যাঁহারা সমুদয় মানবীয় দুর্বলতার অতীত হইয়া প্রকৃত পরমহংসোচিত নির্ভীকতা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা মায়ার বন্ধন, এমন কি স্বাভাবিক অভাবগুলি পর্যন্ত অতিক্রম করিয়াছেন, শুধু সেই বিজয়মহিমায় মণ্ডিত দেবমানবদেরই পুরাণের প্রয়োজন নাই।

ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরকে উপাসনা না করিলে সাধারণ মানুষের চলে না। যদি সে প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত ভগবানের পূজা না করে, তবে তাহাকে স্ত্রী-পুত্র, পিতা-বন্ধু, আচার্য বা অন্য কোন ব্যক্তিকে ভগবানের স্থলাভিষিক্ত করিয়া পূজা করিতেই হইবে। পুরুষ অপেক্ষা নারীগণের আবার ইহা অধিক আবশ্যক। আলোকের স্পন্দন সর্বত্রই থাকিতে পারে, অন্ধকার স্থানেও থাকিতে পারে; বিড়াল ও অন্যান্য জন্তু অন্ধকারেও দেখিতে পায়, এই ঘটনা হইতেই ইহা অনুমিত হয়। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে হইলে আমরা যে স্তরে রহিয়াছি, আলোককে তদুপযোগী স্তরের স্পন্দনবিশিষ্ট হইতে হইবে। সুতরাং আমরা এক নির্গুণ নিরাকার সত্তা প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা বলিতে পারি বটে, কিন্তু যতদিন আমরা সাধারণ মর্ত্যজীব, ততদিন আমাদিগকে কেবল মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে। অতএব আমাদের ভগবানের ধারণা ও উপাসনা স্বভাবতই মানুষ-ভাবাপন্ন। সত্য সত্যই এই শরীর ভগবানের শ্রেষ্ঠ মন্দির। সেই জন্যই দেখিতে পাই, যুগযুগান্তর ধরিয়া লোকে মানুষের উপাসনা করিয়া আসিতেছে, আর যদিও ঐ সঙ্গে স্বভাবতঃ যে-সকল বাড়াবাড়ি হইয়া থাকে, তাহাদের অনেকগুলি আমরা নিন্দা বা সমালোচনা করিতে পারি, তথাপি আমরা সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাই যে, উহার মর্মদেশ অটুট রহিয়াছে; এই-সব বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও, এই-সকল চরমে উঠা সত্ত্বেও এই প্রচারিত মতবাদে সার আছে, উহার অন্তরতম ভাগ খাঁটি ও সুদৃঢ়—উহার একটা মেরুদণ্ড আছে।

না বুঝিয়া কোন পুরাতন উপকথা বা অবৈজ্ঞানিক দুর্বোধ্য শব্দরাশি আপনাদিগকে গলাধঃকরণ করিতে বলিতেছি না, কতকগুলি পুরাণের ভিতর দুর্ভাগ্যবশতঃ যে-সকল বামাচারী ব্যাখ্যা প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিতে বিশ্বাস করিতে বলিতেছি না; কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, এগুলির ভিতর একটি সারবস্তু আছে, এগুলির লোপ না পাইবার একটি কারণ আছে; আর ভক্তির উপদেশ দেওয়া, ধর্মকে দৈনন্দিন জীবনে পরিণত করা, দার্শনিক উচ্চস্তরে বিচরণশীল ধর্মকে সাধারণ মানবের দৈনন্দিন জীবনে পরিণত করাই পুরাণগুলির স্থায়িত্বের কারণ।

মানুষ এখন যে-অবস্থায় আছে, ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা না হইলে বড় ভাল হইত। কিন্তু বাস্তব ঘটনার প্রতিবাদ করা বৃথা। মানুষ চৈতন্য, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি সম্বন্ধে যতই বাগাড়ম্বর করুক না কেন, এখনও সে জড়ভাবাপন্ন। সেই জড়ভাবাপন্ন মানবকে হাতে ধরিয়া ধীরে ধীরে তুলিতে হইবে, যতদিন না সে চৈতন্যময়, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হয়। আজকালকার দিনে শতকরা নিরানব্বই জন লোকের পক্ষে আধ্যাত্মিকতা বুঝা কঠিন, এ বিষয়ে কিছু বলা আরও কঠিন। যে প্রেরণা-শক্তি আমাদিগকে কার্যক্ষেত্রে আগাইয়া দিতেছে এবং যে-সব ফল আমরা লাভ করিতে চাহিতেছি, সে-সবই জড়।

হার্বার্ট স্পেন্সারের ভাষায় বলি—আমরা কেবল স্বল্পতম বাধার পথে কাজ করিতে পারি। পুরাণকারগণের এই সহজ কাণ্ডজ্ঞান ছিল বলিয়াই তাঁহারা লোককে এই স্বল্পতম বাধার পথে কাজ করিবার প্রণালী দেখাইয়া গিয়াছেন। এইভাবে উপদেশ দেওয়াতে পুরাণগুলি লোকের কল্যাণসাধনে যেরূপ কৃতকার্য হইয়াছে, তাহা বিস্ময়কর ও অভূতপূর্ব; ভক্তির আদর্শ অবশ্য চৈতন্যময় বা আধ্যাত্মিক, কিন্তু তাহার পথ জড়ের ভিতর দিয়া, আর এই জড়ের সহায়তা অবলম্বন করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। অতএব জড়জগতের যাহা কিছু এই আধ্যাত্মিকতা লাভ করিতে সাহায্য করে, সেই-সব লইতে হইবে এবং সেগুলিকে এমনভাবে আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে, যাহাতে জড়ভাবাপন্ন মানুষ ক্রমে উন্নত হইয়া আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হইতে পারে। শাস্ত্র গোড়া হইতেই জাতিবর্ণধর্মনির্বিশেষে স্ত্রীপুরুষ সকলকেই বেদপাঠে অধিকার প্রদান করিয়াছে। যদি জড় বস্তু দ্বারা মন্দির নির্মাণ করিয়া মানুষ ভগবানকে অধিক ভালবাসিতে পারে, সে তো খুব ভাল কথা; যদি ভগবানের প্রতিমা গঠন করিয়া

সে এই প্রেমের আদর্শে উপনীত হইবার সাহায্য পায়, ভগবান্ তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করুন!—সে যদি চায়, তাহাকে বিশটি প্রতিমা পূজা করিতে দাও। যে-কোন বিষয় হউক, যদি ঐগুলি তাহাকে ধর্মের সেই চরম লক্ষ্যবস্তু লাভ করিতে সহায়তা করে, এবং যদি তাহা নীতিবিরুদ্ধ না হয়, তবে অবাধে সে ঐগুলি অবলম্বন করুক। 'নীতিবিরুদ্ধ না হয়'—এ-কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, নীতিবিরুদ্ধ বিষয় আমাদের ধর্মপথে সহায় না হইয়া বরং বহুল বিঘ্নই সৃষ্টি করিয়া থাকে।

ভারতে কবীরই সর্বপ্রথম ঈশ্বরোপাসনায় প্রতিমা-ব্যবহারের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। ভারতে এমন অনেক বড় বড় দার্শনিক ও ধর্মসংস্থাপকের অভ্যুদয় হইয়াছে, যাঁহারা ভগবান যে সগুণ বা ব্যক্তিবিশেষ, ইহা বিশ্বাস করিতেন না এবং অকুতোভয়ে সর্বসাধারণের সমক্ষে সেই মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারাও প্রতিমাপূজায় দোষারোপ করেন নাই। বড় জোর বলা যায়, তাঁহারা উহাকে খুব উচ্চাঙ্গের উপাসনা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কোন পুরাণেই প্রতিমাপূজাকে উচ্চাঙ্গের উপাসনা বলা হয় নাই। যে-সব য়াহুদী বিশ্বাস করিতেন, জিহোবা একটি পেটিকায় অবস্থান করেন, তাঁহারাও মূর্তিপূজক ছিলেন। শুধু অপরে মন্দ বলে বলিয়া মূর্তিপূজায় দোষারোপ করা উচিত নহে। বরং প্রতিমা বা অপর কোন জড়বস্তু যদি মানুষকে ধর্মলাভে সাহায্য করে, তবে স্বচ্ছন্দে উহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। আর আমাদের এমন কোন ধর্মগ্রন্থ নাই, যাহাতে এ-কথা অতি পরিষ্কারভাবে বলা হয় নাই যে, জড়ের সাহায্যে অনুষ্ঠিত বলিয়া উহা অতি নিম্নস্তরের উপাসনা।

সমগ্র ভারতে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর জোর করিয়া প্রতিমাপূজা চাপাইবার যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার দোষ দেখাইবার উপযুক্ত ভাষা আমি খুঁজিয়া পাই না। প্রত্যেক ব্যক্তির কি উপাসনা করা উচিত এবং কোন্ বস্তু-অবলম্বনে উপাসনা করা উচিত, তাহা তাহাকে হুকুম করিবার জন্য অপরের কি মাথাব্যথা পড়িয়াছিল? কি করিয়া সে জানিবে, কিসের সাহায্যে আর একজনের উন্নতি হইবে—প্রতিমাপূজা দ্বারা, না অগ্নিপূজা দ্বারা, না এমন কি একটা স্তম্ভের উপাসনা দ্বারা? আমাদের নিজ নিজ গুরু এবং গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ দ্বারাই এ-সকল বিষয় নির্দিষ্ট ও পরিচালিত হইবে। ভক্তিগ্রন্থে ইষ্টসম্বন্ধে যে-নিয়ম আছে, তাহা হইতেই ইহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অর্থাৎ

প্রত্যেক লোককেই তাহার বিশেষ উপাসনা-পদ্ধতি, ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবার বিশেষ পথ অবলম্বন করিতে হইবে। আর সেই নির্বাচিত পথই তাহার ইষ্ট। অন্য উপাসনাগুলিকে সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে হইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজ উপাসনাপদ্ধতি-অনুসারে সাধন করিতে হইবে, যতদিন না সাধক গন্তব্য স্থলে উপনীত হন, যতদিন না তিনি সেই কেন্দ্রস্থলে উপনীত হন, যেখানে আর জড়ের সাহায্য প্রয়োজন নাই।

এই প্রসঙ্গে ভারতের অনেক স্থানে প্রচলিত কুলগুরুপ্রথা সম্বন্ধে—যে-প্রথা এক প্রকার বংশপরম্পরাগত গুরুগিরিমাত্র—সে সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিবার জন্য দুই-চারিটি কথা বলা আবশ্যক। শাস্ত্রে আমরা পড়িয়া থাকি, যিনি বেদের সার মর্ম বুঝেন, যিনি নিষ্পাপ, যিনি অর্থলোভে বা অপর কোন উদ্দেশ্যে লোককে শিক্ষা দেন না, যাঁহার কৃপা অহৈতুকী, বসন্ত ঋতু যেমন বৃক্ষলতাদির নিকট কিছু প্রার্থনা করে না, কিন্তু যেমন বসন্তাগমে বৃক্ষলতাদি সতেজ হইয়া উঠে, উহাদের নূতন ফলপত্র-মুকুলাদির উদ্গম হয়, সেইরূপ যাঁহার স্বভাবই লোকের কল্যাণসাধন করা, যিনি উহার পরিবর্তে কিছুই চাহেন না, যাঁহার সারাজীবনই অপরের কল্যাণের জন্য, এইরূপ লোকই গুরুপদবাচ্য, অন্যে নহে।[১] অসদ্গুরুর নিকট তো জ্ঞানলাভের সম্ভাবনাই নাই, বরং তাঁহার শিক্ষায় একটি বিপদের আশঙ্কা আছে। কারণ গুরু কেবল শিক্ষক বা উপদেষ্টামাত্র নহেন, শিক্ষকতা তাঁহার কর্তব্যের অতি সামান্য অংশমাত্র। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, গুরু শিষ্যে শক্তিসঞ্চার করেন। একটি সাধারণ জড়জগতের দৃষ্টান্ত ধরুন—যদি কোন ব্যক্তি ভাল বীজের টিকা না লন, তাঁহার শরীরে দূষিত অনিষ্টকর বীজ প্রবেশের ভয় আছে। সেইরূপ অসদ্গুরুর শিক্ষায় কিছু মন্দ শিখিবার আশঙ্কা আছে। সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে এই কুলগুরুর ভাবটি উঠিয়া যাওয়া একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। গুরুর কার্য যেন ব্যবসায়ে পরিণত না হয়। ইহা নিবারণ করিতেই হইবে, ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। নিজেকে গুরু বলিয়া পরিচয় দিবার সময় কুলগুরুপ্রথা যে-অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সমর্থন করা কাহারও উচিত নহে।

আহার সম্বন্ধে আজকাল যে কঠোর নিয়মের উপর ঝোঁক দেওয়া হয়, সেটির অধিকাংশ বাহ্য ব্যাপার এবং যে উদ্দেশ্যে ঐ-সকল নিয়ম প্রথম বিধিবদ্ধ

১ তুলনীয়: বিবেকচূড়ামণি, ৩৯

হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্য এখন লোপ পাইয়াছে। কে খাদ্য স্পর্শ করিতে পাইবে, এই বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ইহার এক অতি গভীর দার্শনিক অর্থ আছে, কিন্তু সাধারণ লোকের প্রাত্যহিক জীবনে এই সাবধানতা রক্ষা করা কঠিন বা অসম্ভব। যে-ভাবটি কেবল ধর্মের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সাধকের পক্ষেই সম্ভব, তাহা সাধারণের জন্য নির্দেশ করা ভুল হইয়াছে। কেন না, জনসাধারণের অধিকাংশই জড়সুখের আস্বাদে অতৃপ্ত; এবং তৃপ্তির পূর্বে জোর করিয়া তাহাদের উপর ধর্ম চাপাইয়া দিবার সঙ্কল্প করা বৃথা।

ভক্তের জন্য বিহিত উপাসনাপদ্ধতিগুলির মধ্যে মানুষের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। বাস্তবিক যদি কোনরূপ পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে অবস্থানুযায়ী একটি, ছয়টি বা দ্বাদশটি দরিদ্রকে প্রত্যহ নিজ গৃহে আনিয়া নারায়ণজ্ঞানে সেবা করিলে ভাল হয়। অনেক দেশে দানের প্রথা দেখিয়া আসিয়াছি, কিন্তু উহাতে তেমন সুফল না হওয়ার কারণ এই যে, উহা যথাযথ ভাবের সহিত অনুষ্ঠিত হয় না। 'এই নিয়ে যা'—এ-ভাবে দান বা দয়াধর্মের অনুষ্ঠান করা যায় না, পরন্তু উহা হৃদয়ের অহঙ্কারের পরিচায়ক; দানের উদ্দেশ্য—জগৎ যেন জানিতে না পারে যে, দাতা দয়াধর্ম করিতেছে। হিন্দুদের অবশ্য জানা উচিত যে, স্মৃতির মতে—দাতা গ্রহীতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট; গ্রহীতা সেই সময় স্বয়ং নারায়ণ, সুতরাং আমার মতে এইরূপ নূতন ধরনের পূজাপদ্ধতি প্রবর্তিত করিলে ভাল হয়—কতিপয় দরিদ্র অন্ধ বা ক্ষুধার্ত নারায়ণকে প্রত্যহ প্রতিগৃহে আনয়ন করিয়া প্রতিমার যেরূপ পূজা করা হয়, অশন-বসন দ্বারা তাহাদের সেইরূপ পূজা করা। পর দিবস আবার কতকগুলি লোককে লইয়া আসিয়া ঐরূপে পূজা করা। আমি কোন উপাসনাপ্রণালীর দোষ দিতেছি না, কিন্তু আমার বলিবার অভিপ্রায় এই যে, এইভাবে নারায়ণপূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা এবং ভারতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী।

উপসংহারে আমি ভক্তিকে একটি ত্রিকোণের সহিত তুলনা করিতেছি। ইহার প্রথম কোণ—প্রকৃত ভক্তি বা প্রেম কিছুই চাহে না। প্রেমে ভয় নাই—ইহাই উহার দ্বিতীয় কোণ। পুরস্কার বা প্রতিদানের উদ্দেশ্যে ভালবাসা ভিক্ষুকের ধর্ম, ব্যবসায়ীর ধর্ম, প্রকৃত ধর্মের সহিত উহার অতি অল্পই সম্বন্ধ। কেহ যেন ভিক্ষুক না হন, কারণ ভিক্ষুকতা নাস্তিকতার চিহ্ন। যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে বসতি করিয়া পানীয় জলের জন্য কূপ খনন করে, সে মূর্খ

নয়তো কি ? তেমনি জড়বস্তুর জন্য ভগবানের নিকট যে প্রার্থনা করে, সে-ও মূর্খ। ভক্তকে সর্বদাই এই কথা বলিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে: প্রভো, আমি তোমার নিকট কিছুই চাহি না, কিন্তু যদি তোমার কিছুর প্রয়োজন থাকে, আমি দিতে প্রস্তুত। প্রেমে ভয় থাকে না। আপনারা কি দেখেন নাই যে, ক্ষীণকায়া অবলা নারী পথ দিয়া যাইতে যাইতে কুকুরের চীৎকারে নিকটতম গৃহে পলাইয়া আশ্রয় লয়? পরদিন সে পথে চলিতেছে—সঙ্গে তাহার শিশুপুত্র। হঠাৎ একটা সিংহ শিশুটিকে আক্রমণ করিল—তখন কি তাহাকে পূর্বদিনের মতো পলাইতে দেখিবেন? কখনই না। সে তাহার সন্তানটিকে রক্ষা করিবার জন্য সিংহের মুখে যাইতেও প্রস্তুত।

তৃতীয় বা সর্বশেষ কোণ এই যে, প্রেমই প্রেমের লক্ষ্য। ভক্ত অবশেষে এইভাবে উপনীত হন যে, শুধু প্রেমই ঈশ্বর, অন্য কিছু নয়। ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে মানুষ আর কোথায় যাইবে? সকল দৃশ্য বস্তুর মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট। তিনিই সেই শক্তি, যাহা চন্দ্র-সূর্য-তারকারাশি পরিচালিত করিতেছে এবং নরনারী ও ইতর প্রাণিগণের মধ্যে, সকল বস্তুতে সর্বত্রই প্রকাশ পাইতেছে, জড়রাজ্যে মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি শক্তিরূপে তিনিই প্রকাশিত। তিনি সকল স্থানেই রহিয়াছেন, প্রতি পরমাণুতে রহিয়াছেন, সকল স্থানেই তাঁহার প্রকাশ। তিনিই সেই অনন্ত প্রেম, যাহা জগতের একমাত্র প্রেরণা-শক্তি এবং সর্বত্র প্রত্যক্ষ স্বয়ং ভগবান্।

বেদান্ত

[লাহোরে প্রদত্ত তৃতীয় বক্তৃতা, ১২ই নভেম্বর, ১৮৯৭]

আমরা দুইটি জগতে বাস করিয়া থাকি—বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ এই উভয় জগতেই প্রায় সমভাবে উন্নতি করিয়া আসিতেছে। প্রথমেই বহির্জগতে গবেষণা আরম্ভ হয় এবং মানুষ প্রথমতঃ বহিঃপ্রকৃতি হইতেই সকল গভীর সমস্যার উত্তর পাইবার চেষ্টা করিয়াছে। সে প্রথমতঃ তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সমুদয় প্রকৃতি হইতে তাহার মহান্ ও সুন্দরের জন্য পিপাসা নিবৃত্তির চেষ্টা করিয়াছে; নিজেকে এবং নিজের ভিতরের সমুদয় বস্তুকে স্থূলের ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়া সে যে-সকল উত্তর পাইয়াছে, ঈশ্বরতত্ত্ব ও উপাসনাতত্ত্বসমূহ সম্বন্ধে যে-সকল অতি অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়াছে, সেই শিবসুন্দরকে যে আবেগময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছে, তাহা অতি অপূর্ব। বহির্জগৎ হইতে মানুষ যথার্থই মহান্ ভাবসমূহ লাভ করিয়াছে। কিন্তু পরে তাহার নিকট অন্য এক জগৎ উন্মুক্ত হইল, তাহা আরও মহত্তর, আরও সুন্দরতর, আরও অনন্তগুণে বিকাশশীল। বেদের কর্মকাণ্ডভাগে আমরা ধর্মের অতি অদ্ভুত তত্ত্বসমূহ বিবৃত দেখিতে পাই, আমরা জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্তা বিধাতার সম্বন্ধে অত্যন্ত বিস্ময়কর তত্ত্বসমূহ দেখিতে পাই, আর এই ব্রহ্মাণ্ডকে যে ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা স্থানে স্থানে অতিশয় প্রাণস্পর্শী। তোমাদের মধ্যে হয়তো অনেকেরই ঋগ্‌বেদ-সংহিতার প্রলয়বর্ণনাত্মক সেই অপূর্ব মন্ত্রটির কথা স্মরণ আছে। বোধ হয় এরূপ মহদ্ভাব-দ্যোতক বর্ণনা করিতে এ পর্যন্ত কেহ চেষ্টা করে নাই। তথাপি উহা কেবল বহিঃপ্রকৃতির মহান্ ভাবের বর্ণনা—উহা স্থূলেরই বর্ণনা, উহাতে যেন এখনও কিছু জড়ভাব লাগিয়া রহিয়াছে। উহা কেবল জড়ের ভাষায়, সীমার ভাষায় অসীমের বর্ণনা; উহা জড় দেহেরই বিস্তারের বর্ণনা—মনের নহে; উহা দেশেরই অনন্তত্বের বর্ণনা, মনের নহে। এই কারণে বেদের দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডে দেখিতে পাই, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে। প্রথম প্রণালী ছিল—বহিঃপ্রকৃতি হইতে বিশ্বের প্রকৃত সত্য অনুসন্ধান করা। জড়জগৎ হইতেই জীবনের সমুদয় গভীর সমস্যার মীমাংসা করিবার চেষ্টা প্রথমে হইয়াছিল। 'যস্যৈতে হিমবন্তো

মহিত্বা'—এই হিমালয় পর্বত যাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে। এ খুব উচ্চ ধারণা বটে, কিন্তু ভারতের পক্ষে ইহা পর্যাপ্ত হয় নাই। ভারতীয় মন ঐ পথ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভারতবাসীর গবেষণা সম্পূর্ণরূপে বহির্জগৎ ছাড়িয়া ভিন্ন দিকে গেল, অন্তর্জগতে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, জড় হইতে তাঁহারা ক্রমশঃ 'চৈতন্যে' আসিলেন। এই প্রশ্ন চতুর্দিক হইতে শ্রুত হইতে লাগিল: মৃত্যুর পর মানুষের কি হয়?—'অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে'।[1] —কেহ বলে, মৃত্যুর পর মানুষের অস্তিত্ব থাকে; কেহ বলে, থাকে না। হে যমরাজ, ইহার মধ্যে সত্য কি? এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে, দেখিতে পাই। ভারতীয় মন বহির্জগৎ হইতে যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছিল, কিন্তু উহাতে সে সন্তুষ্ট হয় নাই, আরও গভীর অনুসন্ধানের প্রয়াসী হইয়াছিল, নিজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া সমস্যা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; শেষে উত্তর আসিল।

বেদের এই ভাগের নাম উপনিষদ্ বা বেদান্ত বা আরণ্যক বা রহস্য। এখানে আমরা দেখিতে পাই যে, ধর্ম বাহ্য ক্রিয়াকলাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এখানে আমরা দেখিতে পাই, আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি জড়ের ভাষায় নহে, চৈতন্যের ভাষায় বর্ণিত—সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ তাহার উপযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এখানে আর কোনরূপ স্থূলভাব নাই, আমরা যে-সকল বিষয় লইয়া সচরাচর ব্যস্ত থাকি, সেই-সকল বিষয়ের সহিত জোড়াতালি দিয়া সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা নাই। উপনিষদের মহামনা ঋষিগণ অত্যন্ত সাহসের সহিত—এখন আমরা এরূপ সাহসের ধারণাই করিতে পারি না—নির্ভয়ে কোনরূপ জোড়াতালি না দিয়া মানবজাতির নিকট মহত্তর সত্যসমূহ প্রচার করিয়াছিলেন; এইরূপ উচ্চতম সত্য জগতে আর কখনও প্রচারিত হয় নাই। হে আমার স্বদেশ-বাসিগণ, আমি তোমাদের নিকট সেইগুলি বিবৃত করিতে চাই।

বেদের এই জ্ঞানকাণ্ড বিশাল সাগরের মতো। উহার বিন্দুমাত্র বুঝিতে হইলেও অনেক জন্ম প্রয়োজন। এই উপনিষদ্ সম্বন্ধে রামানুজ ঠিকই বলিয়াছেন, বেদান্ত বেদের বা শ্রুতির শিরঃস্বরূপ,—আর সত্যই ইহা বর্তমান ভারতের

---

১ কঠ উপ., ১।২০

বাইবেল-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বেদের কর্মকাণ্ডকে হিন্দুরা খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা জানি, প্রকৃতপক্ষে শত শত যুগ ধরিয়া 'শ্রুতি' অর্থে উপনিষদ্—কেবল উপনিষদ্ই বুঝাইয়াছে। আমরা জানি, আমাদের বড় বড় দার্শনিকগণ—ব্যাস, পতঞ্জলি, গৌতম, এমন কি দর্শনশাস্ত্রের জনকস্বরূপ মহাপুরুষ কপিল পর্যন্ত—যখন তাঁহাদের মতের সমর্থক প্রমাণের প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই তাঁহারা উপনিষদ্ হইতেই উহা পাইয়াছেন, অন্য কোথায় নহে; কারণ উপনিষদ্সমূহের মধ্যেই সনাতন সত্য অনন্তকালের জন্য নিহিত রহিয়াছে।

কতকগুলি সত্য আছে, যেগুলি কেবল বিশেষ দেশ-কাল-পাত্রে বিশেষ অবস্থায় সত্য। সেগুলি বিশেষ যুগের বিধান হিসাবে সত্য। আবার কতকগুলি সত্য আছে, সেগুলি মানবপ্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত; যতদিন মানুষের অস্তিত্ব থাকিবে, সেগুলিও ততদিন থাকিবে। এই শেষোক্ত সত্যগুলি সর্বজনীন ও সার্বকালিক; আর যদিও আমাদের ভারতীয় সমাজে নিশ্চয়ই অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, আমাদের আহার-বিহার পোশাক-পরিচ্ছদ উপাসনাপ্রণালী এ-সকলই যদিও অনেক বদলাইয়াছে, কিন্তু এই শ্রৌত সর্বজনীন সত্যসমূহ—বেদান্তের এই অপূর্ব তত্ত্বরাশি—স্বমহিমায় অচল অজেয় ও অবিনাশী হইয়া রহিয়াছে।

উপনিষদের যে-সকল তত্ত্ব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, সেগুলির বীজ কিন্তু কর্মকাণ্ডেই পূর্ব হইতে নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। জগৎ-তত্ত্ব, যাহা সকল সম্প্রদায়ের বৈদান্তিকগণকেই মানিয়া লইতে হইয়াছে; এমন কি মনোবিজ্ঞানতত্ত্ব—যাহা সকল ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীর মূলভিত্তিস্বরূপ, তাহাও কর্মকাণ্ডে বিবৃত ও জগতের সমক্ষে প্রচারিত হইয়াছে। অতএব বেদান্তের আধ্যাত্মিক ভাগের বিষয় বলিবার পূর্বে আপনাদের সমক্ষে কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক, আর বেদান্ত-শব্দটি কি অর্থে আমি ব্যবহার করিতেছি, তাহা প্রথমেই আপনাদের নিকট পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই। দুঃখের বিষয়, আজকাল আমরা প্রায়ই একটি বিশেষ ভ্রমে পতিত হইয়া থাকি—আমরা বেদান্ত-শব্দে কেবল অদ্বৈতবাদ বুঝিয়া থাকি। আপনাদের কিন্তু এইটি সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে, বর্তমান ভারতবর্ষে সকল ধর্মমত অধ্যয়ন করিতে 'প্রস্থানত্রয়' সমভাবে উপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমতঃ শ্রুতি অর্থাৎ উপনিষদ্, দ্বিতীয়তঃ ব্যাসসূত্র। আমাদের দর্শন-শাস্ত্রসমূহের মধ্যে এই ব্যাসসূত্রই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, উহা পূর্ববর্তী অন্যান্য দর্শনসমূহের সমষ্টি ও চরম পরিণতিস্বরূপ। এই দর্শনগুলিও যে পরস্পর-বিরোধী তাহা নহে, উহাদের মধ্যে একটি যেন অপরটির ভিত্তিস্বরূপ, যেন সত্যানুসন্ধিৎসু মানবের নিকট সত্যের ক্রমবিকাশ দেখাইয়া ব্যাসসূত্রে ঐগুলি চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। আর এই উপনিষদ্ এবং বেদান্তের অপূর্ব সত্যসমূহের প্রণালীবদ্ধ বিন্যাসরূপ ব্যাসসূত্রের মাঝখানে বেদান্তের টীকাস্বরূপ ভগবানের মুখনিঃসৃত 'গীতা' বর্তমান।

এই কারণেই দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, বৈষ্ণব—ভারতের যে-কোন সম্প্রদায়ই হউন না কেন, যাঁহারাই নিজদিগকে সনাতন-মতাবলম্বী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান, তাঁহারা সকলেই উপনিষদ্, গীতা ও ব্যাসসূত্রকে তাঁহাদের প্রামাণিক গ্রন্থরূপে ধরিয়া থাকেন। আমরা দেখিতে পাই, কি শঙ্করাচার্য, কি রামানুজ, কি মধ্বাচার্য, কি বল্লভাচার্য, কি শ্রীচৈতন্য—যিনিই নূতন সম্প্রদায়-গঠনের ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহাকেই এই তিনটি 'প্রস্থান' গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং এগুলির উপর একটি করিয়া নূতন ভাষ্য রচনা করিতে হইয়াছে। অতএব উপনিষদ্‌কে অবলম্বন করিয়া যে-সকল বিভিন্ন মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মাত্র একটি মতের উপর 'বেদান্ত'-শব্দটিকে আবদ্ধ করিয়া রাখা অন্যায়। বেদান্ত-শব্দে প্রকৃতপক্ষে এই দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত-গুলিকেই বুঝায়। অদ্বৈতবাদীর যেমন 'বেদান্তী' বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার, রামানুজীরও সেইরূপ। আমি আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই, আমরা প্রকৃতপক্ষে 'হিন্দু'-শব্দের দ্বারা বৈদান্তিকই বুঝিয়া থাকি।

আর এই বিষয়ে আমি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই,—এই তিনটি মত স্মরণাতীত কাল হইতেই ভারতে প্রচলিত। শঙ্কর অদ্বৈতবাদের আবিষ্কারক নহেন, শঙ্করের আবির্ভাবের অনেকদিন পূর্ব হইতে উহা বর্তমান ছিল—শঙ্কর উহার একজন শেষ প্রতিনিধিমাত্র। রামানুজী মতও তাই—রামানুজের জন্মের অনেক পূর্ব হইতেই যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বিদ্যমান ছিল, তাহা তাঁহাদের মতের ভাষ্য হইতেই আমরা জানি। অন্যান্য যে-সকল দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় পাশাপাশি ভারতে বর্তমান রহিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ। আর আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এই-সকল মত

পরস্পরবিরোধী নহে। আমাদের ষড়্‌দর্শন যেমন মহান্ তত্ত্বসমূহের ক্রমবিকাশ-মাত্র, ইহা যেমন অতি মৃদুধ্বনিতে আরম্ভ করিয়া শেষে অদ্বৈতের বজ্রনির্ঘোষে পরিণত হইয়াছে, তেমনি পূর্বোক্ত তিনটি মতেও আমরা দেখিতে পাই, মানব-মন উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শের দিকে অগ্রসর হইয়াছে—অবশেষে সবগুলিই অদ্বৈতবাদের সেই বিস্ময়কর একত্বে পর্যবসিত হইয়াছে। অতএব এই তিনটি পরস্পরবিরোধী নহে।

অপর দিকে আমি বলিতে বাধ্য, অনেকে এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন যে, এগুলি পরস্পরবিরোধী। আমরা দেখিতে পাই, যে শ্লোকগুলিতে বিশেষভাবে অদ্বৈতবাদের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, অদ্বৈতবাদী সেইগুলিকে যথাযথ রাখিয়া দিতেছেন, কিন্তু যেখানে দ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উপদেশ আছে, টানিয়া সেইগুলির অদ্বৈত অর্থ করিতেছেন। আবার দ্বৈতবাদী আচার্যগণ দ্বৈত শ্লোকগুলির যথাযথ অর্থ করিয়া অদ্বৈত শ্লোকগুলি টানিয়া দ্বৈত অর্থ করিতেছেন। অবশ্য ইঁহারা মহাপুরুষ—আমাদের 'গুরুপদবাচ্য'। তবে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, 'দোষা বাচ্যা গুরোরপি'—গুরুরও দোষ বলা উচিত। আমার মত এই যে, কেবল এই বিষয়েই তাঁহারা ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই, কোনরূপ ধর্মীয় অসাধুতার আশ্রয় লইয়া ধর্মব্যাখ্যার আবশ্যক নাই, ব্যাকরণের মারপ্যাচ করিবার দরকার নাই, যে-সকল শ্লোকের দ্বারা যে-সকল ভাব কখনই উদ্দিষ্ট হয় নাই, সেই-সকল শ্লোকের ভিতর আমাদের নিজেদের ভাব প্রবেশ করাইবার কোন প্রয়োজন নাই। শ্লোকের সাদাসিধা অর্থ বুঝা অতি সহজ, আর যখনই তোমরা অধিকার-ভেদের অপূর্ব রহস্য বুঝিবে, তখনই উহা তোমাদের নিকট অতি সহজ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

ইহা সত্য যে, উপনিষদ্‌সমূহের লক্ষ্য একটি : কি সেই বস্তু, যাহাকে জানিলে সমুদয় জানা হয়—'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।'[১] আধুনিক কালের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, উপনিষদের উদ্দিষ্ট বিষয় হইল চরম একত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা। আর বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধান ছাড়া জ্ঞান আর কিছুই নহে। সকল বিজ্ঞানই এই ভিত্তির উপর

১ মুণ্ডক উপ., ১।৩

প্রতিষ্ঠিত—সকল মানবীয় জ্ঞানই বহুত্বের মধ্যে একত্ব অনুসন্ধানের চেষ্টার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর যদি কতকগুলি ঘটনাচক্রের মধ্যে একত্ব অনুসন্ধান করা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবীয় জ্ঞানের কার্য হয়, তবে এই অপূর্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যে —যাহা নামরূপে সহস্র প্রকারে বিভিন্ন, যেখানে জড় ও চৈতন্যে ভেদ, যেখানে প্রত্যেক চিত্তবৃত্তি অপরটি হইতে ভিন্ন, যেখানে প্রত্যেকটি রূপ অপরটি হইতে পৃথক্, যেখানে একটি বস্তুর সহিত অপর বস্তুর পার্থক্য বর্তমান,—সেই জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যে একত্ব আবিষ্কার করা যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে উহা কি গুরুতর ব্যাপার, ভাবিয়া দেখ। কিন্তু এই-সকল ভিন্ন ভিন্ন অনন্ত লোকের মধ্যে, এই-সকল বিভিন্নতার মধ্যে একত্ব আবিষ্কার করাই উপনিষদের লক্ষ্য। আমরা ইহা বুঝি। অন্য দিকে আবার 'অরুন্ধতী-ন্যায়ে'র প্রয়োগ করিতে হইবে। 'অরুন্ধতী-নক্ষত্র কাহাকেও দেখাইতে হইলে উহার নিকটস্থ কোন বৃহত্তর ও উজ্জ্বলতর নক্ষত্র দেখাইয়া উহাতে তাহার দৃষ্টি স্থির হইলে পর ক্ষুদ্রতর অরুন্ধতী দেখাইতে হয়। এভাবেই সূক্ষ্মতম ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার পূর্বে অন্যান্য অনেক স্থূলতর ভাব বুঝাইয়া পরে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর ভাবের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমার এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য আর কিছু করিতে হইবে না—তোমাদিগকে কেবল উপনিষদ্ দেখাইয়া দিলেই হইবে, তাহা হইলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে। প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়ের আরম্ভেই দ্বৈতবাদ—উপাসনার উপদেশ। প্রথমতঃ তাঁহাকে জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্তারূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। তিনি আমাদের উপাস্য, শাস্তা, বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির নিয়ন্তা, তথাপি তিনি যেন প্রকৃতির বাহিরে রহিয়াছেন। আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাই, যে-আচার্য উপরি-উক্ত শিক্ষা দিয়াছেন, তিনিই আবার উপদেশ দিতেছেন যে, ঈশ্বর প্রকৃতির বাহিরে নহেন, প্রকৃতির ভিতরেই বর্তমান রহিয়াছেন। অবশেষে উভয় ভাবই পরিত্যক্ত হইয়াছে,—যাহা কিছু সত্য, সবই তিনি – কোন ভেদ নাই, 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'। যিনি সমগ্র জগতের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, তিনিই যে মানবাত্মার মধ্যে বর্তমান, ইহাই শেষে ঘোষণা করা হইয়াছে। এখানে আর কোন প্রকার আপস্ নাই, এখানে আর অপরের মতামতের অপেক্ষা বা ভয় নাই। সত্য—নিরাবরণ সত্য —এখানে সুস্পষ্ট নির্ভীক ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে, এবং বর্তমানকালেও আমাদের সেইরূপ নির্ভীক ভাষায় সত্য প্রচার করিতে ভয় পাইবার

প্রয়োজন নাই ; ঈশ্বরকৃপায় অন্ততঃ আমি এইরূপ নির্ভীক প্রচারক হইবার ভরসা রাখি।

এখন পূর্বপ্রসঙ্গের অনুবৃত্তি করিয়া প্রথম জ্ঞাতব্য তত্ত্বগুলির আলোচনা করা যাক। প্রথমতঃ সকল বৈদান্তিক সম্প্রদায় যে-বিষয়ে একমত, সেই জগৎসৃষ্টি-প্রকরণ এবং মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। আমি প্রথমে জগৎসৃষ্টিপ্রকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আধুনিক বিজ্ঞানের অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়াসমূহ যেন বজ্রবেগে আমাদের উপর পতিত হইয়া, যাহা আমরা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, আমাদিগকে এমন অদ্ভুত তত্ত্বসমূহের সম্মুখীন করিতেছে। কিন্তু এগুলির অধিকাংশ বহুযুগ পূর্বে আবিষ্কৃত সত্যসমূহের পুনরাবিষ্ক্রিয়ামাত্র। আধুনিক বিজ্ঞান এই সে-দিন আবিষ্কার করিয়াছে যে, বিভিন্ন শক্তিসমূহের মধ্যে একত্ব রহিয়াছে। বিজ্ঞান সবেমাত্র আবিষ্কার করিয়াছে যে, উত্তাপ তড়িৎ, চৌম্বক-শক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত সমুদয় শক্তিকেই একটি শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে ; সুতরাং লোকে উহাদিগকে যে-কোন নামেই অভিহিত করুক না কেন, বিজ্ঞান একটিমাত্র নামের দ্বারাই উহাদিগকে অভিহিত করিয়া থাকে। কিন্তু অতি প্রাচীন হইলেও সংহিতাতেও সেই শক্তির এরূপ ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। মাধ্যাকর্ষণই বলো, উত্তাপই বলো, তড়িৎই বলো, চৌম্বক শক্তিই বলো, অথবা অন্তঃকরণের চিন্তাশক্তিই বলো, সবই এক শক্তির প্রকাশমাত্র এবং সেই এক শক্তির নাম 'প্রাণ'। প্রাণ কি? প্রাণ অর্থে স্পন্দন। যখন সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড লীন হইয়া যায়, তখন এই অনন্ত শক্তিসমূহ কোথায় যায়? এগুলির কি লোপ হয়, মনে কর? কখনই নহে। যদি বলো, শক্তিরাশির একেবারে ধ্বংস হয়, তবে কোন্ বীজ হইতে আবার আগামী জগৎ-তরঙ্গ উদ্ভূত হইবে? কারণ, এই গতি তো চিরকাল ধরিয়া তরঙ্গাকারে চলিয়াছে—একবার উঠিতেছে, আর একবার পড়িতেছে ; আবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে। এমনি ভাবে অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। এই জগৎ-প্রপঞ্চের বিকাশকে আমাদের শাস্ত্রে সৃষ্টি বলে। 'সৃষ্টি' আর ইংরেজী 'creation' শব্দ-দুইটি একার্থক নহে। ইংরেজীতে ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, সংস্কৃত শব্দগুলির যথাসাধ্য অনুবাদ করিয়া বলিতে হয়। 'সৃষ্টি' শব্দের ঠিক অর্থ—প্রকাশ হওয়া, বাহির হওয়া। জগৎপ্রপঞ্চ প্রলয়ের সময় সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া যাহা হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই

প্রাথমিক অবস্থায় পরিণত হয়—কিছুকালের জন্য ঐ অবস্থায় শান্তভাবে থাকে, —আবার ক্রমশঃ প্রকাশোন্মুখ হয়। ইহাই সৃষ্টি। আর এই শক্তিগুলির —প্রাণশক্তির কি হয়? তাহারা আদি-প্রাণে পরিণত হয়; এই প্রাণ তখন প্রায় গতিহীন হয়—সম্পূর্ণরূপে গতিশূন্য কখনই হয় না, আর বৈদিক সূক্তের 'আনীদবাতং'[১] - গতিহীনভাবে স্পন্দিত হইয়াছিল—এই বাক্যের দ্বারা এই তত্ত্বেরই বর্ণনা করা হইয়াছে। বেদের অনেক পারিভাষিক শব্দের অর্থ নির্ণয় করা অতিশয় কঠিন। উদাহরণস্বরূপ এই 'বাত' শব্দ ধর। কখন কখন ইহার দ্বারা বায়ু বুঝায়, কখন কখন গতি বুঝায়। লোকে অনেক সময় এই দুই অর্থ লইয়া গোল করিয়া থাকে। এই বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। আর তখন ভূতের বা জড়পদার্থের কি অবস্থা হয়? শক্তি সর্বভূতে ওতপ্রোত রহিয়াছে। সেই সময় সকলই আকাশে লীন হয়—আবার আকাশ হইতে প্রকাশিত হয়। এই আকাশই আদিভূত। এই আকাশ প্রাণের শক্তিতে স্পন্দিত হইতে থাকে, আর যখন নূতন সৃষ্টি হইতে থাকে, তখন যেমন যেমন স্পন্দন দ্রুত হয়, অমনি এই আকাশ তরঙ্গায়িত হইয়া চন্দ্রসূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদির আকার ধারণ করে।

অন্য স্থলে আছে—'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।' —এই জগতে যাহা কিছু আছে, প্রাণ কম্পিত হইতে থাকিলে সকলই বাহির হয়। এখানে 'এজতি' শব্দটি লক্ষ্য করিও—'এজ্' ধাতুর অর্থ কম্পিত হওয়া। 'নিঃসৃতম্' অর্থ বাহিরে প্রক্ষিপ্ত; 'যদিদং কিঞ্চ'—জগতে যাহা কিছু।

প্রপঞ্চ-সৃষ্টির কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইল। বিস্তার করিয়া বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। কি প্রণালীতে সৃষ্টি হয়, কিভাবে প্রথমে আকাশের এবং আকাশ হইতে অন্যান্য বস্তুর উৎপত্তি হয়, আকাশের কম্পন হইতে বায়ুর উৎপত্তি কিভাবে হয় ইত্যাদি—অনেক কথা বলিতে হয়। তবে ইহার মধ্যে একটি কথা স্পষ্ট যে, সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সর্বশেষে স্থূল ভূত উৎপন্ন হয়। ইহাই সর্বাপেক্ষা বাহিরের বস্তু, আর এই স্থূল ভূতের পশ্চাতে সূক্ষ্ম ভূত রহিয়াছে। এতদূর বিশ্লেষণ করিয়াও কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম, সমুদয় জগৎকে দুই তত্ত্বে পর্যবসিত করা হইয়াছে মাত্র, এখনও চরম একত্বে পৌঁছানো যায় নাই। শক্তিবর্গ প্রাণরূপ এক শক্তিতে এবং জড়বর্গ আকাশরূপ

১ ঋগ্বেদ, ১০।১২৯-৩২

এক বস্তুতে পর্যবসিত হইয়াছে। সেই দুইটির মধ্যে কি আবার কোনরূপ একত্ব বাহির করা যাইতে পারে? ইহাদিগকেও কি এক তত্ত্বে পর্যবসিত করা যাইতে পারে? আমাদের আধুনিক বিজ্ঞান এখানে নীরব—কোনরূপ মীমাংসা করিতে পারে নাই, আর যদি ইহার মীমাংসা করিতে হয়, তবে বিজ্ঞান যেমন প্রাচীনদিগের ন্যায় আকাশ ও প্রাণকেই পুনরাবিষ্কার করিয়াছে, সেইরূপ সেই প্রাচীনদিগের পথেই চলিতে হইবে। আকাশ ও প্রাণ যে এক তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত, তিনি সেই সর্বব্যাপী সত্তা, যাঁহার পৌরাণিক নাম ব্রহ্মা—চতুর্মুখ ব্রহ্মা বলিয়া পরিচিত এবং মনোবিজ্ঞানে যাঁহাকে 'মহৎ' বলা যায়। এখানেই উভয়ের মিলন। দার্শনিক ভাষায় যাহা 'মন' বলিয়া কথিত হয়, তাহা মস্তিষ্করূপ ফাঁদে আবদ্ধ সেই মহতের কিয়দংশ। মস্তিষ্কের জালে আবদ্ধ ব্যষ্টি-মনের যোগফলকে 'সমষ্টি মন' বলা যায়।

কিন্তু বিশ্লেষণ এইখানেই শেষ হয় নাই, আরও দূরে অগ্রসর হইয়াছিল। আমরা প্রত্যেকে যেন এক একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, আর সমগ্র জগৎ একটি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। আর ব্যষ্টিতে যাহা হইতেছে, সমষ্টিতেও তাহা ঘটিতেছে—ইহা আমরা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারি। যদি আমরা আমাদের নিজেদের মন বিশ্লেষণ করিতে পারিতাম, তবে সমষ্টি-মনে কি হইতেছে, তাহাও অনেকটা নিশ্চিতরূপে অনুমান করিতে পারিতাম। এখন প্রশ্ন: এই মন কি? বর্তমানকালে পাশ্চাত্যদেশে জড়বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শরীরবিজ্ঞান যেমন ধীরে ধীরে প্রাচীন ধর্মের একটির পর আর একটি দুর্গ অধিকার করিয়া লইতেছে, পাশ্চাত্য আর দাঁড়াইবার স্থান পাইতেছে না; কারণ আধুনিক শরীরবিজ্ঞান প্রতিপদে মনকে মস্তিষ্কের সহিত মিশাইতেছে দেখিয়া তাহারা হতাশাগ্রস্ত। কিন্তু ভারতবর্ষে আমরা এ-সব তত্ত্ব বরাবর জানি। হিন্দু-বালককে প্রথমেই শিখিতে হয়, মন জড়পদার্থ,—তবে সূক্ষ্মতর জড়। আমাদের এই দেহ স্থূল, কিন্তু এই দেহের পশ্চাতে সূক্ষ্ম শরীর বা মন রহিয়াছে; ইহাও জড়, কিন্তু সূক্ষ্মতর; ইহা আত্মা নহে।

এই 'আত্মা' শব্দটি আমি তোমাদের নিকট ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া বলিতে পারিতেছি না, কারণ ইওরোপে আত্মা-শব্দের প্রতিপাদ্য কোন ভাবই নাই; অতএব এই শব্দের অনুবাদ করা যায় না। জার্মান দার্শনিকগণ আজকাল এই আত্মা-শব্দটি Self-শব্দের দ্বারা অনুবাদ করিতেছেন, কিন্তু যতদিন না এই

শব্দটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, ততদিন উহা ব্যবহার করা অসম্ভব। অতএব উহাকে Self-ই বলো বা আর যাহাই বলো, আমাদের 'আত্মা' ছাড়া উহা আর কিছু নহে। এই আত্মাই মানুষের অন্তরে যথার্থ মানুষ। এই আত্মাই জড় মনকে উহার যন্ত্র, মনোবিজ্ঞানের ভাষায় উহার অন্তঃকরণ-রূপে ব্যবহার করেন, আর মন কতকগুলি আভ্যন্তরিক যন্ত্রসহায়ে দেহের দৃশ্যমান যন্ত্রগুলির উপর কাজ করে। এই মন কি? এই সে দিন পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ জানিতে পারিয়াছেন যে, চক্ষু প্রকৃত দর্শনেন্দ্রিয় নহে, তাহারও পশ্চাতে প্রকৃত ইন্দ্রিয় বর্তমান; আর যদি উহা নষ্ট হইয়া যায়, তবে সহস্রলোচন ইন্দ্রের মতো মানুষের সহস্র চক্ষু থাকিতে পারে, কিন্তু সে কিছুই দেখিতে পাইবে না।

তোমাদের দর্শন এই স্বতঃসিদ্ধ লইয়াই অগ্রসর হয় যে, দৃষ্টি বলিতে বাহ্য দৃষ্টি বুঝায় না। প্রকৃত দৃষ্টি অন্তরিন্দ্রিয়ের—অভ্যন্তরবর্তী মস্তিষ্ককেন্দ্রসমূহের; তুমি তাহাদের যাহা ইচ্ছা নাম দিতে পারো; কিন্তু ইন্দ্রিয়-অর্থে আমাদের এই বাহ্য চক্ষু, নাসিকা বা কর্ণ বুঝায় না। আর এই ইন্দ্রিয়সমূহের সমষ্টি মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কারের সহিত মিলিত হইয়াই ইংরেজীতে Mind নামে অভিহিত হয়। আর যদি আধুনিক শরীরতত্ত্ববিৎ আসিয়া বলেন যে, মস্তিষ্কই মন এবং ঐ মস্তিষ্ক বিভিন্ন যন্ত্র বা কারণসমূহে গঠিত, তাহা হইলে তোমাদের ভীত হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; তাহাদিগকে অনায়াসেই বলিতে পারো, আমাদের দার্শনিকগণ বরাবরই ইহা জানিতেন। ইহা তোমাদের ধর্মের মূলসূত্র।

বেশ কথা, এখন আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, এই মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কি বুঝায়। প্রথমতঃ চিত্ত কি, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। চিত্তই প্রকৃতপক্ষে অন্তঃকরণের মূল উপাদান, ইহা মহত্তেরই অংশ—মনের বিভিন্ন অবস্থাগুলির সাধারণ নাম। গ্রীষ্মের অপরাহ্ণে বিন্দুমাত্র তরঙ্গরহিত স্থির শান্ত একটি হ্রদকে উদাহরণ-স্বরূপ গ্রহণ কর। মনে কর, কোন ব্যক্তি এই হ্রদের উপর একটি প্রস্তর নিক্ষেপ করিল। তাহা হইলে কি কি ঘটিবে? প্রথমতঃ জলে যে আঘাত করা হইল, সেইটিই যেন একটি ক্রিয়া, তারপরই জল উত্থিত হইয়া প্রস্তরটির দিকে প্রতিক্রিয়া করিল, আর সেই প্রতিক্রিয়া তরঙ্গের আকার ধারণ করিল। প্রথমতঃ জল একটু কম্পিত হইয়া উঠে, পরক্ষণেই তরঙ্গাকারে প্রতিক্রিয়া করে। এই চিত্তটি যেন হ্রদ, আর বাহ্য বস্তুগুলি যেন উহার উপর নিক্ষিপ্ত প্রস্তর। যখনই উহা এই ইন্দ্রিয়গুলির সহায়তায়

কোন বাহিরের বস্তুর সংস্পর্শে আসে—বাহ্য বস্তুগুলির অনুভূতি ভিতরে বহন করিবার জন্য ইন্দ্রিয়গুলির প্রয়োজন—তখনই একটি কম্পন উৎপন্ন হয়; উহা সংশয়াত্মক মন। তারপরই একটি প্রতিক্রিয়া হয়—উহা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, আর এই বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অহংজ্ঞান ও বাহ্য বস্তুর জ্ঞান উদিত হয়। মনে কর, আমার হাতের উপর একটি মশা আসিয়া দংশন করিল। এই বাহ্যবস্তু-জনিত বেদনা আমার চিত্তে নীত হইল, উহা একটু কম্পিত হইল—মনোবিজ্ঞানমতে উহার নামই 'মন'। তাহার পরেই একটি প্রতিক্রিয়া হইল এবং তৎক্ষণাৎ আমার ভিতর এই ভাবের উদয় হইল যে, আমার হাতে একটি মশা বসিয়াছে, সেটিকে তাড়াইতে হইবে। তবে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, হ্রদে যে-সকল আঘাত আসে, সেগুলি সবই বহির্জগৎ হইতে; কিন্তু মনোহ্রদে আঘাত বহির্জগৎ হইতেও আসিতে পারে, আবার অন্তর্জগৎ হইতেও আসিতে পারে। চিত্ত এবং উহার বিভিন্ন অবস্থার নাম 'অন্তঃকরণ'।

পূর্বে যাহা বর্ণিত হইল, তাহার সহিত তোমাদিগকে আর একটি বিষয় বুঝিতে হইবে; তাহা হইলে ইহা দ্বারা অদ্বৈতবাদ বুঝিবার বিশেষ সাহায্য হইবে। তোমাদের মধ্যে সকলে নিশ্চয়ই মুক্তা দেখিয়াছ, এবং অনেকেই জানো—মুক্তা কিভাবে নির্মিত হয়। শুক্তির মধ্যে একটু ধূলি ও বালুকণা প্রবেশ করিয়া উহাকে উত্তেজিত করিতে থাকে, আর শুক্তির দেহ উহার উপর প্রতিক্রিয়া করিয়া ঐ ক্ষুদ্র বালুকণাকে নিজ শরীরনিঃসৃত রসে প্লাবিত করিতে থাকে। উহাই তখন নির্দিষ্ট গঠন প্রাপ্ত হইয়া মুক্তারূপে পরিণত হয়। এই মুক্তা যেরূপে গঠিত হয়, আমরা সমগ্র জগৎকে ঠিক সেই ভাবে গঠন করিতেছি। বাহ্যজগৎ হইতে আমরা কেবল উত্তেজনা পাই, এমন কি সেই উত্তেজনার অস্তিত্ব জানিতে হইলেও আমাদিগকে ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়া করিতে হয়; আর যখন আমরা এই প্রতিক্রিয়া করি, তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের নিজ মনের কিছুটাই সেই উত্তেজনার দিকে প্রেরণ করি; আর যখন আমরা উহাকে জানিতে পারি, তখন আমাদের নিজ মন ঐ উত্তেজনা দ্বারা যেভাবে আকারিত হয়, আমরা সেই-ভাবে আকারিত মনকেই জানিতে পারি। যাঁহারা বহির্জগতের বাস্তবতায় বিশ্বাস করিতে চান, তাঁহাদিগকে এ-কথা মানিতে হইবে, আজকাল শরীরবিজ্ঞানের এই উন্নতির দিনে এ-কথা না মানিয়া আর উপায় নাই যে, যদি বহির্জগৎকে আমরা 'ক' বলিয়া নির্দেশ করি, তবে

আমরা প্রকৃতপক্ষে ক+মনকে জানিতে পারি, এবং এই জ্ঞানক্রিয়ার মধ্যে মনের ভাগটি এত অধিক যে, উহা ঐ 'ক'-এর সর্বাংশব্যাপী, আর ঐ 'ক'-এর স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে চিরকালই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়; অতএব যদি বহির্জগৎ বলিয়া কিছু থাকে, তবে উহা চিরকালই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। আমাদের মনের দ্বারা উহা যেরূপ আকারে রূপান্তরিত হয়, উহাকে আমরা সেই ভাবেই জানিতে পারি। অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও সেইরূপ। আমাদের আত্মা সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা খাটে। আত্মাকে জানিতে হইলে উহাকেও আমাদের মনের মধ্য দিয়া জানিতে হয়, অতএব আমরা এই আত্মা সম্বন্ধে যতটুকু জানি, তাহা আত্মা+মন ব্যতীত আর কিছুই নহে। অর্থাৎ মনের দ্বারা আবৃত, মনের দ্বারা পরিণত বা গঠিত আত্মাকেই আমরা জানি। আমরা পরে এই তত্ত্ব-সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিব। তবে এখানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা মনে রাখা আবশ্যক।

তারপর আর একটি বিষয় বুঝিতে হইবে। এই দেহ এক নিরবচ্ছিন্ন জড়স্রোতের নামমাত্র। প্রতিমুহূর্তে আমরা ইহাতে নূতন নূতন উপাদান দিতেছি, প্রতিমুহূর্তে আবার ইহা হইতে অনেক পদার্থ বাহির হইয়া যাইতেছে। যেন একটি সদা-প্রবাহিত নদী—উহার রাশি রাশি জল সর্বদাই এক স্থান হইতে অপর স্থানে চলিয়া যাইতেছে, তথাপি আমরা কল্পনাবলে সমস্তটিকে একবস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া উহাকে সেই একই নদী বলিয়া থাকি। কিন্তু নদীটি প্রকৃতপক্ষে কি? প্রতিমুহূর্তে নূতন নূতন জল আসিতেছে, প্রতি মুহূর্তে নদীর তটভূমি পরিবর্তিত হইতেছে, প্রতি মুহূর্তে তীরবর্তী বৃক্ষলতা এবং পত্রপুষ্পফলাদির পরিবর্তন ঘটিতেছে। তবে নদীটি কি? নদী এই পরিবর্তন-সমষ্টির নামমাত্র। মনের সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। বৌদ্ধেরা এই ক্রমাগত পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াই মহান্ 'ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ' মতের সৃষ্টি করেন। উহা ঠিক ঠিক বুঝা অতি কঠিন ব্যাপার, কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনে এই মত সুদৃঢ় যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর ভারতে বেদান্তের কোন কোন অংশের বিরুদ্ধে এই মত উত্থিত হইয়াছিল। এই মতকে নিরস্ত করার প্রয়োজন হইয়াছিল, আমরা পরে দেখিব, কেবল অদ্বৈতবাদই এই মতকে খণ্ডন করিতে সমর্থ, আর কোন মতই নহে। আমরা পরে ইহাও দেখিব যে, অদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধে লোকের নানাবিধ অদ্ভুত ধারণা সত্ত্বেও, অদ্বৈতবাদের নামে ভয় পাওয়া সত্ত্বেও বাস্তবিক ইহাতেই জগতের পরিত্রাণ; কারণ এই অদ্বৈতবাদেই সব কিছুর যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া

যায়। উপাসনাপ্রণালী হিসাবে দ্বৈতবাদ প্রভৃতি খুব ভাল বটে, ঐগুলি মনের খুব তৃপ্তিকর বটে; হইতে পারে—ঐগুলি মনকে উচ্চতর পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে, কিন্তু যদি কেহ একই সঙ্গে যুক্তিবিচারশীল এবং ধর্মপরায়ণ হইতে চায়, তবে তাহার পক্ষে অদ্বৈতবাদই একমাত্র পন্থা।

যাহা হউক, আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, মনও দেহের মতো একটি নদীস্বরূপ—নিয়তই একদিকে শূন্য হইতেছে, অপরদিকে পূর্ণ হইতেছে; তবে সেই একত্ব কোথায়, যাহাকে আমরা 'আত্মা' বলিয়া অভিহিত করি? আমরা দেখি, আমাদের দেহে ও মনে এইরূপ ক্রমাগত পরিবর্তন হইতে থাকিলেও আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা অপরিবর্তনীয়—যাহার জন্য আমাদের ধারণাগুলি অপরিবর্তনীয় বলিয়া মনে হয়। যদি বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন আলোকরাশি আসিয়া একটি যবনিকা বা দেয়াল বা অপর কোন অচল বস্তুর উপর পড়ে, তখন—কেবল তখনই ঐগুলি এক অখণ্ড সমষ্টির আকার ধারণ করিতে পারে। মানুষের বিভিন্ন শারীরযন্ত্রসমূহের মধ্যে কোথায় সেই নিশ্চল অখণ্ড বস্তু, যাহার উপর বিভিন্ন ভাবরাশি পতিত হইয়া অখণ্ডত্বের ভাব প্রাপ্ত হইতেছে? অবশ্য মন কখনও সেই বস্তু হইতে পারে না, কারণ মনও পরিবর্তনশীল। অতএব এমন কিছু বস্তু অবশ্যই আছে, যাহা দেহও নহে, মনও নহে, যাহার কখন পরিণাম হয় না, যাহার উপর আমাদের সমুদয় ভাবরাশি, সমুদয় বাহ্য বিষয় আসিয়া এক অখণ্ডভাবে পরিণত হয়—ইহাই প্রকৃতপক্ষে আমাদের আত্মা। আর যখন দেখিতে পাইতেছি সমুদয় জড়পদার্থ—তাহাকে সূক্ষ্ম জড় অথবা মন যে-নামেই অভিহিত কর না—এবং সমুদয় স্থূল, জড় বা বাহ্য জগৎ উহার সহিত তুলনায় পরিবর্তনশীল, তখন এই অপরিবর্তনীয় বস্তুটি কখনই জড় পদার্থ হইতে পারে না; অতএব উহা চৈতন্যস্বভাব অর্থাৎ উহা জড় নয়; উহা অবিনাশী ও অপরিণামী।

তাহার পর আর একটি প্রশ্ন আসে। অবশ্য বাহ্য জগৎ দেখিয়া 'কে উহা সৃষ্টি করিল, কে জড় পদার্থ সৃষ্টি করিল?'—এইরূপ প্রশ্ন করিয়া ক্রমশঃ উদ্দেশ্যবাদ আনিবার যে পূর্বপ্রচলিত যুক্তি রহিয়াছে—আমি তাহার কথা বলিতেছি না। মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি হইতেই সত্যকে জানা হইবে—আত্মা সম্বন্ধে যেমন প্রশ্ন উঠিয়াছিল, এ প্রশ্নও ঠিক সেইভাবেই উঠিয়াছিল। যদি স্বীকার করা যায় যে, প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে দেহ ও মন হইতে স্বতন্ত্র এক-একটি অপরিবর্তনীয়

আত্মা আছেন, তথাপি ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, এই-সকল আত্মার মধ্যে ধারণা, ভাব ও সহানুভূতির ঐক্য বিদ্যমান। নতুবা কি করিয়া আমার আত্মা তোমার আত্মার উপর কাজ করিবে? সেই মধ্যবর্তী বস্তু কি, যাহার মধ্য দিয়া এক আত্মা অপর আত্মার উপর কাজ করিবে? তোমাদের আত্মা সম্বন্ধে আমি যে কিছু অনুভব করিতে পারি, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? এমন কি বস্তু আছে, যাহা তোমার ও আমার উভয়ের আত্মাকেই স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে? অতএব অপর একটি আত্মা স্বীকার করিবার দার্শনিক আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে—যে-আত্মা সমুদয় বিভিন্ন আত্মা ও জড় বস্তুর মধ্য দিয়া কাজ করিবে, যে-আত্মা জগতের অসংখ্য আত্মাতে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকিবে, যে-আত্মার সহায়তায় অপর আত্মাসমূহ প্রাণবন্ত হইবে, পরস্পরকে ভালবাসিবে, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবে, পরস্পরের জন্য কাজ করিবে। এই সর্বব্যাপী আত্মাই 'পরমাত্মা' নামে অভিহিত, তিনি সমগ্র জগতের প্রভু, ঈশ্বর। আবার আত্মা যখন জড়পদার্থনির্মিত নহে—চৈতন্যস্বরূপ, তখন উহা জড়ের নিয়মগুলি অনুসরণ করিতে পারে না, জড়ের নিয়মানুসারে উহার বিচার চলিতে পারে না; অতএব আত্মা অবিনাশী ও অপরিণামী।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥[১]

—অগ্নি এই আত্মাকে দগ্ধ করিতে পারে না, কোন অস্ত্র ইহাকে ছিন্ন করিতে পারে না, তরবারি ইহাকে কাটিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না, জল ইহাকে ভিজাইতে পারে না—এই মানবাত্মা নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির, নিশ্চল ও চিরন্তন।

গীতা ও বেদান্তমতে এই জীবাত্মা বিভু, কপিলের মতেও ইহা সর্বব্যাপী। অবশ্য ভারতে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহাদের মতে এই জীবাত্মা অণু, কিন্তু তাহাদেরও মত এই যে, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বিভু, ব্যক্ত অবস্থায় উহা অণু।

১ গীতা, ২।২৩-২৪

তারপর আর একটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে। ইহা সম্ভবতঃ তোমাদের নিকট অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু এই তত্ত্বটিও বিশেষভাবে ভারতীয়—আর এই বিষয়টি আমাদের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বর্তমান। এই জন্য আমি তোমাদিগকে এই তত্ত্বটির প্রতি অবহিত হইতে এবং উহা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি, কারণ ইহা—ভারতীয় বলিতে যাহা কিছু, সে-সকলেরই ভিত্তিস্বরূপ। তোমরা জার্মান ও ইংরেজ পণ্ডিতগণ কর্তৃক পাশ্চাত্যদেশে প্রচারিত শারীর-পরিণামবাদের (doctrine of physical evolution) বিষয় শুনিয়াছ। ঐ মতে সকল প্রাণীর শরীর প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন; আমরা যে ভেদ দেখি, তাহা একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশমাত্র আর ক্ষুদ্রতম কীট হইতে মহত্তম সাধু পর্যন্ত সকলেই প্রকৃতপক্ষে এক, একটি অপরটিতে পরিণত হইতেছে, আর এইরূপ চলিতে চলিতে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া পূর্ণত্ব লাভ করিতেছে। আমাদের শাস্ত্রেও এই পরিণামবাদ রহিয়াছে।

যোগী পতঞ্জলি বলিয়াছেন, 'জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ'।[১] —অর্থাৎ এক জাতি অপর জাতিতে, এক শ্রেণী অপর শ্রেণীতে পরিণত হয়। তবে ইওরোপীয়দিগের সহিত আমাদের প্রভেদ কোন্ খানে?—'প্রকৃত্যাপূরাৎ' —প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা। ইওরোপীয়গণ বলে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রাকৃতিক ও যৌন-নির্বাচন প্রভৃতি এক প্রাণীকে অপর প্রাণীর শরীর গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে এই জাত্যন্তরপরিণামের যে হেতু নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, ভারতীয়েরা ইওরোপীয়গণ অপেক্ষা অধিক বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আরও ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই প্রকৃতির আপূরণের অর্থ কি? আমরা স্বীকার করিয়া থাকি যে, জীবাণু ক্রমশঃ উন্নত হইয়া বুদ্ধ-রূপে পরিণত হয়। আমরা ইহা স্বীকার করিলেও আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, কোন যন্ত্রে কোন না কোন আকারে যদি উপযুক্ত পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ না করা যায়, তবে তাহা হইতে তদনুরূপ কাজ পাওয়া যায় না। যে আকারই ধারণ করুক না, শক্তিসমষ্টি চিরকালই সমান। একপ্রান্তে যদি শক্তির বিকাশ দেখিতে চাও, তবে অপর প্রান্তে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে; হইতে পারে—উহা অন্য আকারে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পরিমাণ এক হওয়া চাই-ই

১ যোগসূত্র, ৪।২

চাই। অতএব বুদ্ধ যদি পরিণামের এক প্রান্ত হন, তবে অপর প্রান্তের জীবাণুও অবশ্য বুদ্ধতুল্য হইবে। বুদ্ধ যদি ক্রমবিকশিত জীবাণু হন, তবে ঐ জীবাণুও নিশ্চয়ই ক্রমসঙ্কুচিত বুদ্ধ। যদি এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত শক্তির বিকাশ হয়, তবে প্রলয়কালেও সেই অনন্তশক্তি সঙ্কুচিতভাবে থাকিবে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অন্য কোন ভাব সম্ভব নয়। অতএব ইহা নিশ্চিত যে, প্রত্যেক আত্মাই অনন্ত। আমাদের পদতলসঞ্চারী ক্ষুদ্রতম কীট হইতে মহত্তম সাধু পর্যন্ত সকলেরই ভিতর অনন্ত শক্তি, অনন্ত পবিত্রতা ও সমুদয় গুণই অনন্ত পরিমাণে রহিয়াছে। প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। কীটে সেই মহাশক্তির অতি অল্প পরিমাণ বিকাশ হইয়াছে, তোমাতে তাহা অপেক্ষা অধিক, আবার অপর একজন দেবতুল্য মানবে তাহা অপেক্ষা অধিকতর শক্তির বিকাশ হইয়াছে—এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু সকলের মধ্যেই সেই এক শক্তি রহিয়াছে।

পতঞ্জলি বলিতেছেন, 'ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ'।[১]
—কৃষক যেরূপ তাহার ক্ষেত্রে জলসেচন করে। কৃষক তাহার ক্ষেত্রে জল আনিবার জন্য কোন নির্দিষ্ট জলাশয় হইতে একটি প্রণালী কাটিয়াছে, ঐ প্রণালীর মুখে একটি কপাট আছে ; পাছে সমুদয় জল গিয়া ক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়া দেয়, এই জন্য ঐ কপাট বন্ধ রাখা হয়। যখন জলের প্রয়োজন হয়, তখন ঐ কপাট খুলিয়া দিলেই জল নিজশক্তিবলেই উহার ভিতরে প্রবেশ করে। জলের শক্তি বাড়াইতে হইবে না, জলাশয়ের জলে পূর্ব হইতেই ঐ শক্তি রহিয়াছে। এইরূপ আমাদের প্রত্যেকের পশ্চাতে অনন্ত শক্তি, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত সত্তা, অনন্ত বীর্য, অনন্ত আনন্দের ভাণ্ডার রহিয়াছে, কেবল এই কপাট, দেহরূপ এই কপাট—আমাদের যথার্থ এবং পূর্ণ বিকাশ হইতে দিতেছে না। আর যতই এই দেহের গঠন উন্নত হইতে থাকে, যতই তমোগুণ রজোগুণে এবং রজোগুণ সত্ত্বগুণে পরিণত হয়, ততই এই শক্তি ও শুদ্ধত্ব প্রকাশিত হইতে থাকে ; এই জন্যই আমরা পানাহার সম্বন্ধে এত সাবধান।

হইতে পারে, আমরা মূল তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছি—যেমন আমাদের বাল্য-বিবাহ-সম্বন্ধে ; যদিও এ-বিষয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক, তথাপি দৃষ্টান্তরূপে আমরা উহা গ্রহণ করিতে পারি। যদি উপযুক্ত অবসর পাই, তবে আমি এই-সকল

১ যোগসূত্র, ৪।৩

বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিব। তবে ইহা বলিয়া রাখি যে, বাল্যবিবাহ-প্রথা যে-সকল মূলভাব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সেই-সকল ভাব অবলম্বন করিয়াই প্রকৃত সভ্যতার সঞ্চার হইতে পারে, অন্য কিছুতেই নহে। যদি প্রত্যেক নর-নারীকে অপর যে-কোন নর-নারীকে পতি বা পত্নীরূপে গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া যায়, যদি ব্যক্তিগত সুখ ও পাশবপ্রকৃতির পরিতৃপ্তি সমাজে অবাধে চলিতে থাকে, তাহার ফল নিশ্চয়ই অশুভ হইবে—দুষ্টপ্রকৃতি অসুরস্বভাব সন্তানসমূহের উৎপত্তি হইবে। একদিকে প্রত্যেক দেশে মানুষ এই-সকল পশু-প্রকৃতি সন্তান উৎপাদন করিতেছে, অপর দিকে তাহাদিগকে বশে রাখিবার জন্য পুলিশ বাড়াইতেছে। এভাবে সামাজিক ব্যাধির প্রতিকারের চেষ্টায় বিশেষ ফল নাই, বরং কিভাবে সমাজ হইতে এই-সকল দোষ, এই-সকল পশুপ্রকৃতি সন্তানের উৎপত্তি নিবারিত হইতে পারে, তাহাই মহাসমস্যা। আর যতদিন তুমি সমাজে বাস করিতেছ, ততদিন তোমার বিবাহের ফল নিশ্চয়ই আমাকে এবং আর সকলকেই ভোগ করিতে হয়, সুতরাং তোমার কিরূপ বিবাহ করা উচিত, কিরূপ উচিত নয়, এ বিষয়ে তোমাকে আদেশ করিবার অধিকার সমাজের আছে। ভারতীয় বাল্যবিবাহ-প্রথার পশ্চাতে এই-সকল উচ্চতর ভাব ও তত্ত্ব রহিয়াছে—কোষ্ঠীতে বরকন্যার যেরূপ 'জাতি' 'গণ' প্রভৃতি লিখিত থাকে, এখনও তদনুসারেই হিন্দুসমাজে বিবাহ হয়। আর প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলিতে চাই যে, মনুর মতে কামোদ্ভূত পুত্র 'আর্য' নহে। যে-সন্তানের জন্মমৃত্যু বেদের বিধানানুযায়ী, সে-ই প্রকৃতপক্ষে আর্য। আজকাল সকল দেশেই এইরূপ আর্যসন্তান খুব অল্পই জন্মিতেছে এবং তাহার ফলেই কলিযুগ নামক দোষরাশির উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা প্রাচীন মহান্ আদর্শ-সমূহ ভুলিয়া গিয়াছি। সত্য বটে যে, আমরা এখন এই-সকল ভাব সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করিতে পারি না; ইহাও সম্পূর্ণ সত্য যে, আমরা এই-সকল মহান্ ভাবের কতকগুলিকে লইয়া একটা বিকৃত হাস্যকর ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছি। অতি দুঃখের বিষয় যে, আজকাল আর প্রাচীন কালের মতো পিতামাতা নাই, সমাজও এখন পূর্বের মতো শিক্ষিত নয়, আর পূর্বে যেমন সমাজভুক্ত সকল লোকের উপর একটা ভালবাসা ছিল, এখনকার সমাজে তাহা নাই। কিন্তু তাহা হইলেও কার্যকালে যে রূপই গ্রহণ করুক না কেন, মূল তত্ত্বটি নির্দোষ, আর যদি ঐ তত্ত্ব ঠিকমত কাজে পরিণত না হইয়া থাকে, যদি প্রণালী-

বিশেষ বিফল হইয়া থাকে, তবে মূল তত্ত্বটি লইয়া যাহাতে উহা ভালভাবে কাজে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর। মূল তত্ত্বটিকে নষ্ট করিয়া ফেলিবার চেষ্টা কর কেন?

খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। ঐ তত্ত্বও যেভাবে কাজে পরিণত হইতেছে, তাহা খুব খারাপ বটে, কিন্তু তাহাতে ঐ তত্ত্বের কোন দোষ নাই। উহা সনাতন, চিরকালই উহা থাকিবে। তত্ত্বটি যাহাতে ভাল করিয়া কাজে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর।

ভারতে আমাদের সকল সম্প্রদায়কে আত্মা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত মহান্ তত্ত্ব বিশ্বাস করিতে হয়। শুধু দ্বৈতবাদীরা বলেন—পরে আমরা ইহা বিশেষভাবে দেখিব—অসৎকর্মের দ্বারা উহা সঙ্কোচপ্রাপ্ত হয়, উহার সমুদয় শক্তি ও স্বভাব সঙ্কুচিত হইয়া যায়, আবার সৎকর্মের দ্বারা সেই স্বভাবের বিকাশ হয়। অদ্বৈতবাদী বলেন, আত্মার কখনই সঙ্কোচ বা বিকাশ কিছুই হয় না, এরূপ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় মাত্র। দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ। তবে সকলেই এ-কথা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, আত্মাতে পূর্ব হইতেই সকল শক্তি অবস্থিত, বাহির হইতে কোন কিছু যে আত্মাতে আসিবে তাহা নহে, কোন জিনিস যে উহাতে আকাশ হইতে পড়িবে, তাহা নহে। এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, তোমাদের বেদসমূহ inspired—বাহির হইতে ভিতরে আসিতেছে এরূপ নহে, expired—ভিতর হইতে বাহিরে আসিতেছে, বেদসমূহ প্রত্যেক আত্মায় নিহিত সনাতন নিয়মাবলী। পিপীলিকা হইতে দেবতা পর্যন্ত সকলেরই আত্মায় বেদ অবস্থিত। পিপীলিকাকে শুধু বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া ঋষিদেহ লাভ করিতে হইবে; তখনই তাহার ভিতর বেদ অর্থাৎ সনাতন নিয়মাবলী প্রকাশিত হইবে। এই মহান্ তত্ত্বটি বুঝা বিশেষ প্রয়োজন যে, আমাদের ভিতরে পূর্ব হইতেই শক্তি বর্তমান, মুক্তি পূর্ব হইতেই আমাদের ভিতরে রহিয়াছে। হয় বলো—শক্তি সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা বলো—মায়ার আবরণে আবৃত হইয়াছে, তাহাতে কিছু আসে যায় না। এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব হইতেই উহা ভিতরে রহিয়াছে। তোমাদিগকে ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে; প্রত্যেকের ভিতরে অনন্ত শক্তি যে গূঢ়ভাবে রহিয়াছে, তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে—বিশ্বাস করিতে হইবে যে, বুদ্ধের ভিতর যে-শক্তি রহিয়াছে, অতি নিম্নতম মানুষের মধ্যেও তাহা রহিয়াছে। ইহাই হিন্দুদের আত্মতত্ত্ব।

কিন্তু এইখানেই বৌদ্ধদের সহিত মহা বিরোধ আরম্ভ। বৌদ্ধেরা দেহকে বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, দেহ একটি জড়স্রোত-মাত্র; সেইরূপ মনকে বিশ্লেষণ করিয়া উহাকেও এইরূপ একটি জড়প্রবাহ বলিয়া বর্ণনা করেন। আত্মার সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন: উহার অস্তিত্ব স্বীকার করা অনাবশ্যক। উহার অস্তিত্ব অনুমান করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। একটি দ্রব্য এবং ঐ দ্রব্যসংলগ্ন গুণরাশির কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? আমরা শুধু গুণই স্বীকার করিয়া থাকি। যেখানে একটি কারণ স্বীকার করিলেই সব কিছুর ব্যাখ্যা হয়, সেখানে দুইটি কারণ স্বীকার করা যুক্তিবিরুদ্ধ। এইরূপে বৌদ্ধদের সঙ্গে বিরোধ আরম্ভ হইল, আর যে-সকল মত দ্রব্যবিশেষের অস্তিত্ব স্বীকার করিত, বৌদ্ধেরা সে-সকল মতই খণ্ডন করিয়া ফেলিয়া দিলেন। যাহারা দ্রব্য ও গুণ উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে, যাহাবা বলে—তোমার একটি আত্মা, আমার একটি আত্মা, প্রত্যেকেরই শরীর ও মন হইতে পৃথক্ একটি একটি আত্মা আছে, প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে, তাহাদের মতে বরাবরই একটু গলদ ছিল। অবশ্য দ্বৈতবাদের মত এ পর্যন্ত ঠিক; ইহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, এই শরীর রহিয়াছে, এই সূক্ষ্ম মন রহিয়াছে, আত্মা রহিয়াছেন, আর সকল আত্মার ভিতর সেই পরমাত্মা রহিয়াছেন। এখানে মুশকিল এইটুকু যে, এই আত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই বস্তু, আর উহাদের উপর দেহ মন প্রভৃতি গুণরূপে লাগিয়া রহিয়াছে—স্বীকার করা হয়। এখন কথা এই—কেহই কখন 'বস্তু' দেখে নাই, উহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতেও পারে না। অতএব তাঁহারা বলেন, ঐ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী হইয়া বলো না কেন যে, মানসিক তরঙ্গরাজি ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই? মানসিক তরঙ্গগুলি কেহই পরস্পরের সহিত সংলগ্ন নহে, উহারা মিলিয়া একটি বস্তু হয় নাই, সমুদ্রের তরঙ্গরাজির ন্যায় একটির পশ্চাতে আর একটি চলিয়াছে, উহারা কখনই সম্পূর্ণ নহে, কখনই উহারা একটি অখণ্ড একত্ব গঠন করে না। মানব কেবল এইরূপ তরঙ্গপরম্পরামাত্র—একটি তরঙ্গ চলিয়া যায়, যাইবার সময় আর একটির জন্ম দিয়া যায়, এইরূপ চলিতে থাকে; আর এই-সকল তরঙ্গের নিবৃত্তিকেই 'নির্বাণ' বলে।

তোমরা দেখিতেছ, দ্বৈতবাদ এই মতের নিকট নীরব; দ্বৈতবাদের পক্ষে ইহার বিরুদ্ধে আর কোন প্রকার যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করা অসম্ভব; দ্বৈতবাদীর

ঈশ্বরও এখানে টিকিতে পারেন না। সর্বব্যাপী অথচ ব্যক্তিবিশেষ, হস্ত বিনা যিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, চরণ বিনা যিনি গমন করেন ইত্যাদি, কুম্ভকার যেমন ঘট প্রস্তুত করে, সেইরূপে যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেন—বৌদ্ধ বলেন, ঈশ্বর যদি এইরূপ হন, তবে তিনি সেই ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত, তাঁহাকে উপাসনা করিতে ইচ্ছুক নহেন। এই জগৎ দুঃখপূর্ণ; ইহা যদি ঈশ্বরের কার্য হয়, বৌদ্ধ বলেন—তবে তিনি এরূপ ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিবেন। আর দ্বিতীয়তঃ এইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অযৌক্তিক ও অসম্ভব। তোমরা সকলেই ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারো। যাঁহারা জগতের রচনাকৌশল দেখিয়া উহার একজন পরমকৌশলী নির্মাতার অস্তিত্ব অনুমান করেন, তাঁহাদের যুক্তিসমূহের দোষ আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই—ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীরাই তাঁহাদের সমুদয় যুক্তিজাল একেবারে খণ্ডন করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর আর টিকিতে পারিলেন না।

তোমরা বলিয়া থাকো যে, সত্য—শুধু সত্যই তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য। 'সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ'।[১] —সত্যেরই জয় হইয়া থাকে, মিথ্যা কখন জয়লাভ করে না, সত্যের দ্বারাই দেবযানমার্গ-লাভ হয়। সকলেই সত্যের পতাকা উড়াইয়া থাকে বটে, কিন্তু উহা কেবল দুর্বল ব্যক্তিকে পদদলিত করিবার জন্য। তোমাদের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় দ্বৈতবাদাত্মক ধারণা লইয়া প্রতিমাপূজক গরীব বেচারার সহিত বিবাদ করিতে যাইতেছ, ভাবিতেছ—তোমরা ভারি যুক্তিবাদী, তাহাকে অনায়াসে পরাস্ত করিয়া দিতে পারো; আর সে যদি ঘুরিয়া তোমার ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া উহাকে কাল্পনিক বলে, তখন তুমি যাও কোথায়? তুমি তখন বিশ্বাসের দোহাই দিতে থাকো, অথবা তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে 'নাস্তিক' নামে অভিহিত করিয়া চীৎকার করিতে থাকো; দুর্বল লোকে তো চিরকালই চীৎকার করিয়া থাকে, যে আমাকে পরাস্ত করিবে—সেই নাস্তিক!

যদি যুক্তিবাদী হইতে চাও, তবে বরাবর যুক্তিবাদী হও, যদি না পারো তবে তুমি নিজের জন্য যেটুকু স্বাধীনতা চাও, অপরকে সেটুকু দাও না কেন? এইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব তুমি কিভাবে প্রমাণ করিবে? অপর দিকে, প্রমাণ করা যাইতে

১ মুণ্ডক উপ., ৩।১।৬

পারে—ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই। তাঁহার অস্তিত্ব-বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, বরং নাস্তিত্ব-বিষয়ে কতকগুলি প্রমাণ আছে। তোমার ঈশ্বর, তাঁহার গুণ, দ্রব্য-স্বরূপ অসংখ্য জীবাত্মা, আবার প্রত্যেক জীবাত্মাই ব্যক্তি—এই-সকল লইয়া তুমি কেমন করিয়া তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারো? তুমি ব্যক্তি কিসে? দেহহিসাবে তুমি ব্যক্তি নও, কারণ তোমরা আজ প্রাচীন বৌদ্ধগণ অপেক্ষাও ভালরূপে জানো যে, এক সময় হয়তো যে পদার্থ সূর্যে ছিল, আজ তাহারা তোমাতে আসিয়া থাকিতে পারে, আর হয়তো এখনই বাহির হইয়া গিয়া বৃক্ষলতাদিতে থাকিতে পারে। তবে তোমার ব্যক্তিত্ব কোথায়? মনের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। তবে তোমার ব্যক্তিত্ব কোথায়? আজ তোমার এক রকম ভাব, আবার কাল আর এক ভাব! যখন শিশু ছিলে তখন যেরূপ চিন্তা করিতে, এখন আর সেরূপ চিন্তা কর না; বৃদ্ধ যেরূপ চিন্তা করে, যুবা-অবস্থায় সে সেরূপ চিন্তা করে নাই। তবে তোমার ব্যক্তিত্ব কোথায়? জ্ঞানেই তোমার ব্যক্তিত্ব—এ-কথা বলিও না, জ্ঞান অহংতত্ত্বমাত্র, আর উহা তোমার প্রকৃত অস্তিত্বের অতি সামান্য-অংশব্যাপী। আমি যখন তোমার সহিত কথা বলি, তখন আমার সকল ইন্দ্রিয় কাজ করিতেছে, কিন্তু আমি সে সম্বন্ধে জানিতে পারি না। যদি জ্ঞানই অস্তিত্বের প্রমাণ হয়, তবে বলিতে হইবে ইন্দ্রিয়সমূহ নাই, কারণ আমি তো উহাদের অস্তিত্ব জানিতে পারি না। তবে আর তোমার ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর সম্বন্ধে মতবাদগুলি কোথায় দাঁড়ায়? এরূপ ঈশ্বর তুমি কিভাবে প্রমাণ করিতে পারো?

আবার বৌদ্ধেরা উঠিয়া বলিলেন: ইহা যে শুধু অযৌক্তিক তাহা নহে, এরূপ বিশ্বাস নীতিবিরুদ্ধও বটে, কারণ উহা মানুষকে কাপুরুষ হইতে এবং বাহিরের সাহায্য প্রার্থনা করিতে শিখায়—কেহই কিন্তু তাহাকে এরূপ সাহায্য করিতে পারে না। এই ব্রহ্মাণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে, মানুষই ইহা এরূপ করিয়াছে। তবে কেন বাহিরের একজন কাল্পনিক ব্যক্তিবিশেষে বিশ্বাস কর, যাঁহাকে কেহ কখন দেখে নাই বা অনুভব করে নাই, অথবা যাঁহার নিকট হইতে কেহ কখনও সাহায্য পায় নাই? তবে কেন নিজেদের কাপুরুষ করিয়া ফেলিতেছ, আর তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে শিখাইতেছ যে, মানুষের সর্বোচ্চ অবস্থা কুকুরের মতো হওয়া, এই কাল্পনিক পুরুষের সম্মুখে নিজেকে দুর্বল, অপবিত্র ও জগতে অতি হেয় অপদার্থ মনে করিয়া হাঁটু গাড়িয়া থাকা?

অপর দিকে বৌদ্ধগণ তোমাকে বলিবেন : তুমি নিজেকে এইরূপ বলিয়া শুধু যে মিথ্যাবাদী হইতেছ তাহা নহে, পরন্তু তোমার সন্তানসন্ততিরও ঘোর অনিষ্টের কারণ হইতেছ। কারণ এইটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিও যে, লোকে যেমন চিন্তা করে, তেমনই হইয়া যায়। নিজেদের সম্বন্ধে তোমরা যেমন বলিবে, ক্রমশঃ তোমাদের তেমনি বিশ্বাস দাঁড়াইবে। ভগবান বুদ্ধের প্রথম কথাই এই—তুমি যাহা ভাবো, তাহাই হইয়াছ ; যাহা ভাবিবে, আবার তাহাই হইবে। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে কখন ভাবিও না যে, তুমি কিছুই নও ; আর যতক্ষণ না তুমি এমন কাহারও সাহায্য পাইতেছ—যিনি এখানে থাকেন না, মেঘরাশির উপর বাস করেন—ততক্ষণ তুমি কিছু করিতে পার না, ইহাও ভাবিও না। ঐরূপ ভাবিলে তাহার ফল হইবে এই যে, তুমি দিন দিন অধিকতর দুর্বল হইয়া যাইবে। আমরা অতি অপবিত্র, হে প্রভো, আমাদিগকে পবিত্র কর—এইরূপ বলিতে বলিতে নিজেকে এমন দুর্বল করিয়া ফেলিবে যে, তাহার ফলে সকল প্রকার পাপের দ্বারা সম্মোহিত হইবে।

বৌদ্ধেরা বলেন : প্রত্যেক সমাজে যে-সকল পাপ দেখিতে পাও, তাহার শতকরা নব্বই ভাগ আসিয়াছে এই ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের ধারণা হইতে, তাহার সম্মুখে কুকুরের মতো হইয়া থাকার ধারণা হইতে ; এই অপূর্ব মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এইরূপ কুকুরের মতো হইয়া থাকা—ইহা অতি ভয়ানক কথা! বৌদ্ধ বৈষ্ণবকে বলেন : যদি তোমার আদর্শ, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই হয় যে, ভগবানের বাসস্থান বৈকুণ্ঠনামক স্থানে গিয়া অনন্তকাল তাঁহার সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, তবে তাহা অপেক্ষা বরং আত্মহত্যা শ্রেয়ঃ। বৌদ্ধ বলিতে পারেন, তিনি এইটি এড়াইবার জন্যই নির্বাণ বা বিলুপ্তির চেষ্টা করিতেছেন।

আমি তোমাদের নিকট ঠিক একজন বৌদ্ধের মতো হইয়া এই কথাগুলি বলিতেছি, কারণ আজকাল লোকে বলিয়া থাকে যে, অদ্বৈতবাদের দ্বারা মানুষ দুর্নীতিপরায়ণ হয়। সেইজন্য অপর পক্ষেরও কি বলিবার আছে, সেইটিই তোমাদের নিকট উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমাদিগকে দুই পক্ষই নির্ভীকভাবে দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ আমরা দেখিয়াছি, একজন ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন—ইহা প্রমাণ করা যায় না। আজকাল কি বালকও এ-কথা বিশ্বাস করিতে পারে—যেহেতু কুম্ভকার ঘট নির্মাণ করে, অতএব ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন? যদি তাহাই হয়, তবে কুম্ভকারও তো একজন ঈশ্বর!

আর যদি কেহ তোমাকে বলে, মাথা ও হাত না থাকিলেও ঈশ্বর কাজ করেন, তবে তাহাকে পাগলা-গারদে পাঠাইতে পারো। তোমার জগৎ-সৃষ্টিকর্তা এই ব্যক্তিবিশেষ—যাঁহার নিকট তুমি সারাজীবন ধরিয়া চীৎকার করিতেছ—তিনি কি কখনও তোমায় সাহায্য করিয়াছেন? যদি করিয়াই থাকেন, তবে তুমি তাঁহার নিকট হইতে কিরূপ সাহায্য পাইয়াছ? আধুনিক বিজ্ঞান তোমাদিগকে এই আর একটি প্রশ্ন করিয়া উত্তর দিবার জন্য আহ্বান করে। বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিয়া দিবে যে, এরূপ যাহা কিছু সাহায্য তুমি পাইয়াছ, তাহা তুমি নিজের চেষ্টাতেই পাইতে পারো। পক্ষান্তরে, তোমার এরূপ বৃথা ক্রন্দনে শক্তিক্ষয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না, এরূপ ক্রন্দনাদি না করিয়াও তুমি অনায়াসে ঐ উদ্দেশ্যসাধন করিতে পারিতে। অধিকন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, এইরূপ ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের ধারণা হইতেই পৌরোহিত্য ও অন্যান্য অত্যাচার আসিয়া থাকে। যেখানেই এই ধারণা ছিল, সেইখানেই অত্যাচার ও পৌরোহিত্য রাজত্ব করিয়াছে, আর যতদিন না এই মিথ্যাভাবকে সমূলে বিনাশ করা হয়, বৌদ্ধগণ বলেন, ততদিন এই অত্যাচারের কখন নিবৃত্তি হইবে না। যতদিন মানুষের এই ধারণা থাকে যে, অপর কোন অলৌকিক পুরুষের নিকট তাহাকে নত হইয়া থাকিতে হইবে, ততদিনই পুরোহিতের অস্তিত্ব থাকিবে। পুরোহিতরা কতকগুলি অধিকার ও সুবিধা দাবি করিবে, যাহাতে মানুষ তাহাদের নিকট মাথা নোয়ায় তাহার চেষ্টা করিবে, আর বেচারা মানুষগুলিও তাহাদের কথা ঈশ্বরকে জানাইবার জন্য একজন পুরোহিত চাহিতে থাকিবে। তোমরা ব্রাহ্মণজাতিকে সমূলে বিনাশ করিয়া ফেলিতে পারো, কিন্তু এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, যাহারা তাহাদিগকে নির্মূল করিবে, তাহারাই আবার তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া লইবে, এবং তাহারা আবার ব্রাহ্মণদের অপেক্ষা বেশী অত্যাচারী হইয়া দাঁড়াইবে। কারণ ব্রাহ্মণদের বরং কতকটা সহৃদয়তা ও উদারতা আছে; কিন্তু এই ভূঁইফোড়েরা চিরকালই অতি ভয়ানক অত্যাচারী হইয়া থাকে। ভিখারী যদি কিছু টাকা পায়, তবে সে সমগ্র জগৎকে খড়কুটা জ্ঞান করিয়া থাকে। অতএব যতদিন এই ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের ধারণা থাকিবে, ততদিন এই-সকল পুরোহিতও থাকিবে, আর সমাজে কোন প্রকার উচ্চনীতির অভ্যুদয়ের আশা করা যাইতে পারিবে না। পৌরোহিত্য ও অত্যাচার চিরকালই এক সঙ্গে থাকিবে।

লোকে কেন এই ঈশ্বর কল্পনা করিল? কারণ প্রাচীনকালে কয়েকজন বলবান্ ব্যক্তি সাধারণ লোককে বশ করিয়া বলিয়াছিল, তোমাদিগকে আমাদের হুকুম মানিয়া চলিতে হইবে, নতুবা তোমাদের সমূলে বিনাশ করিব। এইরূপ লোকই ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছিল—ইহার অন্য কোন কারণ নাই —'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্।' একজন বজ্রহস্ত পুরুষ রহিয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞা যে লঙ্ঘন করে, তাহাকেই তিনি বিনাশ করেন।

বৌদ্ধ বলিতেছেন: তোমরা যুক্তিবাদী হইয়া বলিতেছ, সবই কর্মফলে হইয়াছে। তোমরা সকলেই অসংখ্য জীবাত্মায় বিশ্বাসী, আর তোমাদের মতে এই-সকল জীবাত্মার জন্ম-মৃত্যু নাই। এ পর্যন্ত বেশ যুক্তি ও ন্যায়-সঙ্গত কথা বলিয়াছ, সন্দেহ নাই। কারণ থাকিলেই কার্য থাকিবে; বর্তমানে যাহা ঘটিতেছে, তাহা অতীত কারণের ফল; আবার এই বর্তমান ভবিষ্যতে অন্য ফল প্রসব করিবে। হিন্দু বলিতেছেন: কর্ম জড়, চৈতন্য নহে; সুতরাং কর্মের ফললাভ করিতে হইলে কোনরূপ চৈতন্যের প্রয়োজন।

বৌদ্ধ তাহাতে বলেন: বৃক্ষ হইতে ফললাভ করিতে গেলে কি চৈতন্যের প্রয়োজন হয়? যদি বীজ পুঁতিয়া গাছে জল দেওয়া যায়, তাহার ফল পাইতে তো কোনরূপ চৈতন্যের প্রয়োজন হয় না। বলিতে পারো, আদি চৈতন্যের শক্তিতে এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, কিন্তু জীবাত্মাগণই তো চৈতন্য, অন্য চৈতন্য স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? যদি জীবাত্মাদের চৈতন্য থাকে, তবে ঈশ্বর-বিশ্বাসের প্রয়োজন কি? অবশ্য বৌদ্ধেরা জীবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নহেন; কিন্তু জৈনেরা জীবাত্মায় বিশ্বাসী, অথচ ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না।

তবে হে দ্বৈতবাদিন্, তোমার যুক্তি কোথায় রহিল, তোমার নীতির ভিত্তি কোথায় রহিল? যখন তোমরা অদ্বৈতবাদের উপর দোষারোপ করিয়া বলো যে, অদ্বৈতবাদ হইতে দুর্নীতির সৃষ্টি হইবে, তখন একবার ভারতের দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ; আদালতে দ্বৈতবাদীদের নীতি-পরায়ণতার কিরূপ প্রমাণ পাও, তাহাও আলোচনা করিয়া দেখ। যদি অদ্বৈতবাদী কুড়ি হাজার দুর্বৃত্ত হইয়া থাকে, তবে দ্বৈতবাদীও কুড়ি হাজার দেখিতে পাইবে। মোটামুটি বলিতে গেলে বলিতে হয়, দ্বৈতবাদী দুর্বৃত্তের সংখ্যাই অধিক হইবে; কারণ অদ্বৈতবাদ বুঝিতে উৎকৃষ্টতর চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন, আর তাহাদিগকে সহজে ভয় দেখাইয়া কোন কাজ

করাইবার উপায় নাই। তবে তুমি যাও কোথায়? বৌদ্ধদের হাত এড়াইবে কিরূপে? তুমি বেদের বচন উদ্ধৃত করিতে পারো, কিন্তু বৌদ্ধ তো বেদ মানে না। সে বলিবেঃ আমার ত্রিপিটক এ-কথা বলে না। ত্রিপিটক অনাদি অনন্ত—এমন কি উহা বুদ্ধের লেখাও নহে; কারণ বুদ্ধ বলিয়াছেন, তিনি সনাতন সত্যেরই আবৃত্তি করিতেছেন মাত্র। বৌদ্ধ আরও বলেন, তোমাদের বেদ মিথ্যা, আমাদের ত্রিপিটকই যথার্থ বেদ, তোমাদের বেদ ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণের কল্পিত—সেগুলি দূর করিয়া দাও। এখন তুমি যাও কোথায়?

বৌদ্ধদের যুক্তিজাল কাটিয়া বাহির হইবার উপায় প্রদর্শিত হইতেছে। দ্রব্য ও গুণ ভিন্ন —এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই বৌদ্ধদের প্রথম আপত্তি—এটি একটি দার্শনিক আপত্তি। অদ্বৈতবাদী বলেনঃ না, উহারা ভিন্ন নহে। দ্রব্য ও গুণের মধ্যে কোন ভেদ নাই। তোমরা 'রজ্জুতে সর্পভ্রম'-এর সেই প্রাচীন দৃষ্টান্ত অবগত আছ। যখন তুমি সর্প দেখিতেছ, তখন রজ্জু একেবারেই দেখিতে পাও না, রজ্জু তখন একেবারে উড়িয়া গিয়াছে। কোন বস্তুকে দ্রব্য ও গুণ বলিয়া বিভক্ত করা দার্শনিকদের মস্তিষ্ক-প্রসূত ব্যাপারমাত্র, উহার কোন যথার্থ ভিত্তি নাই, দ্রব্য ও গুণ বলিয়া পৃথক্ দুইটি পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। তুমি যদি একজন সাধারণ ব্যক্তি হও, শুধু গুণরাশিই দেখিবে, আর যদি তুমি একজন মস্ত যোগী হও, কেবল দ্রব্যই দেখিবে, কিন্তু একই সময়ে কখনও দ্রব্য ও গুণ দুই-ই দেখিতে পাইবে না। অতএব হে বৌদ্ধ, তুমি যে দ্রব্য ও গুণ লইয়া বিবাদ করিতেছ, তাহার বাস্তবিক ভিত্তিই নাই; দ্রব্য যদি গুণরহিত হয়, তবে একটি মাত্র দ্রব্যের অস্তিত্বই সিদ্ধ হয়। যদি তুমি আত্মা হইতে গুণরাশি তুলিয়া লইয়া দেখাইতে পারো যে, গুণরাশির অস্তিত্ব কেবল মনে—উহারা প্রকৃতপক্ষে আত্মায় আরোপিত, তাহা হইলে তো দুইটি আত্মারও অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না; কারণ গুণই এক আত্মা হইতে অপর আত্মার পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া থাকে। এক আত্মা যে অপর আত্মা হইতে ভিন্ন, তাহা তুমি কিভাবে জানিতে পারো?—কতকগুলি প্রভেদকারী চিহ্ন দ্বারা, কতকগুলি গুণের দ্বারা। আর যেখানে গুণের সত্তা নাই, সেখানে পার্থক্য কিরূপে থাকিতে পারে? অতএব দুই আত্মা নাই, এক আত্মাই বিদ্যমান; আর পরমাত্মা স্বীকার করা অনাবশ্যক, তোমার এই আত্মাই সেই পরমাত্মা। সেই এক আত্মাকেই পরমাত্মা বলে, তাহাকেই জীবাত্মা এবং অন্যান্য নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

আর হে সাংখ্যবাদী ও অন্যান্য দ্বৈতবাদিগণ, তোমরা বলিয়া থাকো, আত্মা সর্বব্যাপী বিভু, অথচ তোমরা কিরূপে বহু আত্মা স্বীকার কর? অনন্ত কি কখন দুইটি হইতে পারে? অনন্ত সত্তা একটিমাত্র হওয়াই সম্ভব। একমাত্র অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন, আর সব তাঁহারই প্রকাশ।

বৌদ্ধ এই উত্তরে নীরব, কিন্তু অদ্বৈতবাদী শুধু বৌদ্ধকে নিরস্ত করিয়াই ক্ষান্ত নহেন। দুর্বল মতবাদসমূহের ন্যায় কেবল অপর মতের সমালোচনা করিয়াই অদ্বৈতবাদী নিরস্ত নহেন। অদ্বৈতবাদী তখনই অন্যান্য মতাবলম্বীদের সমালোচনা করেন, যখন খুব কাছে আসিয়া তাহারা অদ্বৈতমত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হয়। তিনি তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া দেন, এই পর্যন্তই তাঁহার অন্যান্য মতাবলম্বীদের বাদখণ্ডন। তারপর তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। একমাত্র অদ্বৈতবাদই শুধু পরমত খণ্ডন করিয়া এবং তজ্জন্য শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নিরস্ত থাকে না। অদ্বৈতবাদীর যুক্তি এইরূপ—তিনি বলেন: তুমি বলিতেছ—জগৎ একটি অবিরাম গতিপ্রবাহমাত্র। ভাল, ব্যষ্টিতে সবই গতিশীল বটে। তোমারও গতি আছে; এই টেবিলটি—ইহারও প্রতিনিয়ত গতি বা পরিবর্তন হইতেছে। গতি সর্বত্রই, তাই ইহার নাম সংসার; 'সৃ' ধাতুর অর্থ গমন, তাই ইহার নাম জগৎ—অবিরাম গতি। তাই যদি হইল, তাহা হইলে তো এই জগতে 'ব্যক্তিত্ব' বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না; কারণ ব্যক্তিত্ব বলিতে অপরিণামী কিছু বুঝায়। 'পরিণামশীল ব্যক্তিত্ব' হইতে পারে না, এই বাক্যটি স্ববিরোধী, সুতরাং আমাদের এই ক্ষুদ্র জগতে ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছু নাই। চিন্তা ভাব, মন শরীর, জীব জন্তু—সকলেরই অহরহঃ পরিণাম হইতেছে। যাহা হউক, এখন সমগ্র জগৎকে একটি সমষ্টিরূপে ধর। সমষ্টিরূপে কি এই জগতের পরিণাম বা গতি হইতে পারে? কখনই নহে। কোন অল্প গতিশীল অথবা সম্পূর্ণ গতিহীন বস্তুর সহিত তুলনা করিয়াই গতির ধারণা সম্ভব। অতএব সমষ্টিরূপে জগৎ গতিহীন, পরিণামহীন। সুতরাং তখনই—কেবল তখনই তোমার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব সম্ভব, যখন তুমি নিজেকে সমগ্র জগতের সহিত অভিন্নভাবে জানিতে পারো। এই কারণেই বেদান্তী—অদ্বৈতবাদী বলেন: যতদিন দ্বৈত, ততদিন ভয় দূর হইবার উপায় নাই; মানুষ যখন অপর বলিয়া কিছু দেখে না, অপর বলিয়া কিছু অনুভব করে না, যখন একমাত্র সত্তা থাকে, তখনই তাহার ভয় দূর হয়; তখনই মানুষ মৃত্যুর পারে, সংসারের পারে যাইতে পারে। সুতরাং

অদ্বৈতবাদ আমাদিগকে শিক্ষা দেয়—সমষ্টিজ্ঞানেই মানুষের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব, ব্যষ্টিজ্ঞানে নহে। যখন তুমি নিজেকে সমগ্র জগৎ-রূপে অনুভব করিতে পারিবে, তখনই তোমার প্রকৃত অমৃতত্ব লাভ হইবে। তখনই তুমি ভয়শূন্য ও অমৃতস্বরূপ হইবে, যখন নিজেকে সমগ্র জগৎ-রূপে জানিবে, আর তখনই তোমার সহিত জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদবোধ হইবে। এক অখণ্ড সত্তাকেই আমাদের মতো মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই চন্দ্রসূর্যতারকাদি-সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ড-রূপে দেখিয়া থাকে। যাহারা আর একটু ভাল কাজ করে এবং সেই সৎকর্মবলে অন্যপ্রকার মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়, তাহারা মৃত্যুর পর ইহাকেই ইন্দ্রাদিদেব-সমন্বিত স্বর্গাদিলোক-রূপে দর্শন করে। যাঁহারা আরও উন্নত, তাঁহারা সেই এক বস্তুকেই ব্রহ্মলোক-রূপে দেখেন, এবং যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবী স্বর্গ বা অন্য কোন লোক কিছুই দেখেন না, তাঁহাদের নিকট এই ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্হিত হয়, তাহার পরিবর্তে একমাত্র ব্রহ্মই বিরাজমান থাকেন।

আমরা কি এই ব্রহ্মকে জানিতে পারি? সংহিতায় অনন্তের বর্ণনার কথা আমি তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি, এখানে তাহার ঠিক বিপরীত—এখানে অন্তর্জগতের অনন্তজ্ঞানের চেষ্টা। সংহিতায় বহির্জগতের অনন্ত বর্ণনা; এখানে চিন্তাজগতের, ভাবজগতের অনন্ত বর্ণনা। সংহিতায় অস্তিভাবদ্যোতক ভাষায় অনন্তকে বর্ণনা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল; এখানে সে-ভাষায় কুলাইল না, নাস্তি-ভাবের ভাষায় অনন্তের বর্ণনা করিবার চেষ্টা হইল। এই ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। স্বীকার করিলাম, ইহা ব্রহ্ম। আমরা কি ইহা জানিতে পারি? না, না। তোমাদিগকে আবার এই বিষয়টি স্পষ্টরূপে বুঝিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ তোমাদের মনে এই সন্দেহ আসিবে—যদি ইহা ব্রহ্ম হয়, তবে আমরা কিরূপে উহাকে জানিতে পারি? 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ?'[১]—বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবে? চক্ষু সকল বস্তু দেখিয়া থাকে—চক্ষু কি নিজেকে দেখিতে পায়? পায় না, কারণ জ্ঞানক্রিয়াটিই একটি নিম্ন অবস্থা।

হে আর্যসন্তানগণ, তোমাদিগকে এই বিষয়টি বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে, কারণ এই তত্ত্বটির ভিতর অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। তোমাদের

১ বৃহদারণ্যক উপ., ২।৪।১৪

নিকট যে-সকল পাশ্চাত্যদেশীয় প্রলোভন আসিয়া থাকে, সেগুলির একমাত্র দার্শনিক ভিত্তি এই যে, ইন্দ্রিয়জ্ঞান অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান নাই। প্রাচ্যদেশের কিন্তু অন্য ভাব। আমাদের বেদ বলিতেছেন : বস্তুজ্ঞান বস্তু হইতে নিম্নস্থানীয়, কারণ জ্ঞান-অর্থে সর্বদাই একটা সীমাবদ্ধ ভাব বুঝিতে হইবে। যখনই তুমি কোন বস্তুকে জানিতে চাও, তখনই উহা তোমার মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। পূর্বকথিত দৃষ্টান্তে যেভাবে শুক্তি হইতে মুক্তা নির্মিত হয়, বলা হইয়াছে—সেই কথা চিন্তা কর, তাহা হইলে বুঝিবে জ্ঞান-অর্থে সীমাবদ্ধ করা কিরূপ। একটি বস্তুকে আহরণ করিয়া তোমার চেতনায় আনিলে তাহার সমগ্র ভাবটি জানিতে পারিবে না। সকল জ্ঞান সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। তাই যদি হয়, জ্ঞান-অর্থে যদি সীমাবদ্ধ করা হয়, তবে অনন্তের জ্ঞান সম্বন্ধে কি উহা কম প্রযোজ্য? যিনি সকল জ্ঞানের স্বরূপ, যাঁহাকে ছাড়িয়া তুমি কোন জ্ঞানলাভ করিতে পার না, যাঁহার কোন গুণ নাই, যিনি সমগ্র জগতের এবং আমাদের অন্তঃকরণের সাক্ষিস্বরূপ, তুমি কি তাঁহাকে এইভাবে সীমাবদ্ধ করিতে পারো? তাঁহাকে তুমি কিরূপে জানিবে? কি উপায়ে তাঁহাকে বাঁধিবে?

সব কিছু—এই জগৎপ্রপঞ্চ এইরূপ বাঁধিবার বৃথা চেষ্টা। এই অনন্ত আত্মা যেন নিজের মুখ দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন, নিম্নতম প্রাণী হইতে উচ্চতম দেবতা পর্যন্ত সব যেন তাঁহার মুখ প্রতিবিম্বিত করিবার দর্পণ; আরও কত আধার তিনি গ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু কোনটিই পর্যাপ্ত নয়, অবশেষে মনুষ্যদেহে তিনি বুঝিতে পারেন যে, এ-সবই সসীম—অনন্ত কখন সান্তের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন না।

তারপর শুরু হয় প্রত্যাবর্তন এবং ইহাই ত্যাগ বা বৈরাগ্য। ইন্দ্রিয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হও, ইন্দ্রিয়ের অভিমুখে যাইও না—ইহাই বৈরাগ্যের মূলমন্ত্র। ইহাই সর্বপ্রকার নীতির মূলমন্ত্র, ইহাই সর্বপ্রকার কল্যাণের মূলমন্ত্র, কারণ তোমাদিগকে অবশ্য মনে রাখিতে হইবে তপস্যাতেই জগতের সৃষ্টি—ত্যাগেই জগতের উৎপত্তি। আর যতই তুমি ক্রমশঃ ফিরিয়া আসিবে, ততই তোমার সম্মুখে ধীরে ধীরে বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন দেহ প্রকাশিত হইতে থাকিবে, এক এক করিয়া সেগুলি পরিত্যক্ত হইবে, অবশেষে তুমি স্বরূপতঃ যাহা, তাহাই থাকিবে। ইহাই মোক্ষ।

এই তত্ত্বটি আমাদিগকে বুঝিতে হইবে—'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজনীয়াৎ' —বিজ্ঞাতাকে কি করিয়া জানিবে? জ্ঞাতাকে কখন জানিতে পারা যায় না, কারণ যদি তাঁহাকে জানা যাইত, তাহা হইলে তিনি আর জ্ঞাতা থাকিতেন না। দর্পণে যদি তোমার চক্ষুর প্রতিবিম্ব দেখ, তাহাকে তুমি কখন চক্ষু বলিতে পার না; তাহা অন্য কিছু, তাহা প্রতিবিম্বমাত্র। এখন কথা এই, যদি এই আত্মা—এই অনন্ত সর্বব্যাপী পুরুষ সাক্ষিমাত্র হইলেন, তাহা হইলে আর কি হইল? ইহা তো আমাদের মতো চলিতে ফিরিতে, জীবনধারণ করিতে এবং জগৎকে সম্ভোগ করিতে পারে না; সাক্ষিস্বরূপ যে কিরূপে আনন্দসম্ভোগ করিতে পারে, লোকে সে-কথা বুঝিতে পারে না। 'ওহে হিন্দুগণ, তোমরা সব সাক্ষিস্বরূপ,—এই মতবাদের দ্বারাই তোমরা নিষ্ক্রিয়, অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছ'—এই কথাই লোকে বলিয়া থাকে। তাহাদের কথার উত্তর এই —যিনি সাক্ষিস্বরূপ, তিনিই প্রকৃতপক্ষে আনন্দসম্ভোগ করিতে পারেন। কোন স্থানে যদি একটা কুস্তি হয়, তাহা হইলে ঐ কুস্তির আনন্দভোগ বেশী করে কাহারা?—যাহারা কুস্তি করিতেছে তাহারা, না দর্শকেরা? এই জীবনে যতই তুমি কোন বিষয়ে সাক্ষিস্বরূপ হইতে পারিবে, ততই তুমি অধিক আনন্দ ভোগ করিবে। ইহাই প্রকৃত আনন্দ; আর এই কারণে তখনই তোমার অনন্ত আনন্দ সম্ভব, যখন তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষিস্বরূপ হও। তখনই তুমি মুক্তপুরুষপদবাচ্য। যে সাক্ষিস্বরূপ, সে-ই স্বর্গে যাইবার বাসনা না রাখিয়া, নিন্দাস্তুতিতে সমজ্ঞান হইয়া নিষ্কামভাবে কাজ করিতে পারে। যে সাক্ষিস্বরূপ সে-ই আনন্দ ভোগ করিতে পারে, অন্য কেহ নহে।

অদ্বৈতবাদের নৈতিক দিক আলোচনা করিতে যাইয়া দার্শনিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আর একটি বিষয় আসিয়া থাকে—উহা মায়াবাদ। অদ্বৈতবাদের অন্তর্গত এক একটি বিষয় বুঝিতেই বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যায়, বুঝাইতে আবার আরও বিলম্ব লাগে। অতএব আমাকে ইহার সামান্য কিছু উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হইতে হইবে। এই মায়াবাদ বুঝা চিরকালই একটি কঠিন ব্যাপার। মোটামুটি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, মায়াবাদ প্রকৃতপক্ষে বাদ বা মতবিশেষ নহে, মায়া দেশকালনিমিত্তের নাম—আরও সংক্ষেপে উহাকে 'নামরূপ' বলে। সমুদ্র হইতে সমুদ্রের তরঙ্গের প্রভেদ কেবল নামে ও রূপে, আর তরঙ্গ হইতে এই নামরূপের কোন পৃথক্ সত্তা

নাই, নামরূপ তরঙ্গের সহিতই বর্তমান। তরঙ্গ অন্তর্হিত হইতে পারে, তরঙ্গের অন্তর্গত নামরূপ যদি চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যায়, তথাপি সেই একই পরিমাণ জল থাকিয়া যাইবে। অতএব এই মায়াই তোমার আমার মধ্যে, জীবজন্তু ও মানবের মধ্যে, দেবতা ও মানবের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই মায়াই যেন আত্মাকে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে, আর এই মায়া নাম-রূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি ঐগুলিকে পরিত্যাগ কর—নাম-রূপ দূর করিয়া দাও, তবেই এ-সব পার্থক্য চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইবে, তখন তুমি প্রকৃতপক্ষে যাহা আছ, তাহাই থাকিবে। ইহাই মায়া। মায়া কোন মতবাদ নহে, উহা জগতের ঘটনাবলীর বর্ণনামাত্র।

বাস্তববাদিগণ বলেন, এই জগতের অস্তিত্ব আছে। সেই বেচারারা অজ্ঞ, বালকবৎ; তাহারা যে জগৎ সত্য বলে, তাহা এই অর্থে বলে যে, এই টেবিলটি বা অন্যান্য বস্তুর নিরপেক্ষ সত্তা আছে, উহাদের অস্তিত্ব ব্রহ্মাণ্ডের অপর কোন বস্তুর অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না, আর যদি এই সমগ্র জগৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, তথাপি উহা বা অন্যান্য বস্তু যেমন রহিয়াছে, ঠিক তেমনই থাকিবে। একটু সামান্য জ্ঞানলাভ করিলেই সে বুঝিবে, ইহা কখনই হইতে পারে না। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সব কিছুই পরস্পরের উপর নির্ভর করে, উহারা আপেক্ষিক। আমাদের বস্তুজ্ঞানের তিনটি সোপান আছে: প্রথম—প্রত্যেক বস্তুই স্বতন্ত্র, পরস্পর পৃথক্; দ্বিতীয় সোপান—সকল বস্তুর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ বিদ্যমান; আর শেষ সোপান—একটি মাত্র বস্তু আছে, তাহাকেই আমরা নানারূপে দেখিতেছি।

অজ্ঞ ব্যক্তির ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা এই যে, তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে কোথাও রহিয়াছেন, অর্থাৎ তখন ঈশ্বরধারণা খুব মানবভাবাপন্ন—মানুষ যাহা করে, তিনিও তাহাই করেন; তবে অপেক্ষাকৃত একটু বেশী রকমে করেন। আর আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, এরূপ ঈশ্বরকে অল্প কথায় কিরূপে অযৌক্তিক ও অপর্যাপ্ত বলিয়া প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায়। ঈশ্বর সম্বন্ধে দ্বিতীয় ধারণা এই যে, একটি শক্তি রহিয়াছে, সর্বত্রই তাঁহার প্রকাশ। ইনিই প্রকৃত সগুণ ঈশ্বর, চণ্ডীতে ইঁহার কথা লিখিত আছে। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিও যে, এই ঈশ্বর কেবল কল্যাণকর গুণরাশির আধার নহেন। ঈশ্বর ও শয়তান—দুইটি 'দেবতা' থাকিতে পারে না, এক ঈশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করিতে হইবে এবং তাঁহাকে

ভরসা করিয়া ভালমন্দ উভয়ই বলিতে হইবে এবং ঐ যুক্তিসঙ্গত মত স্বীকার করিলে তাহা হইতে যে স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়, তাহাও গ্রহণ করিতে হইবে।

যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥[১]

—যিনি সর্বভূতে শান্তি ও ভ্রান্তিরূপে অবস্থিত, তাঁহাকে বারংবার নমস্কার করি। যাহা হউক, তাঁহাকে শুধু শান্তিস্বরূপ বলিলে চলিবে না, তাঁহাকে সর্বস্বরূপ বলিলে তাহার ফল যাহাই হউক, তাহা লইতে হইবে।

'হে গার্গি, এ জগতে যাহা কিছু আনন্দ দেখিতে পাও, সবই তাঁহার অংশমাত্র।' তুমি উহাকে যেমন ইচ্ছা কাজে লাগাইতে পারো। আমার সম্মুখবর্তী এই আলোকের সাহায্যে তুমি একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে একশত টাকা দিতে পারো, আর একজন লোক তোমার নাম জাল করিতে পারে, কিন্তু আলোক উভয়ের পক্ষেই সমান। ইহাই ঈশ্বরজ্ঞানের দ্বিতীয় সোপান।

তৃতীয় সোপান এই যে, ঈশ্বর প্রকৃতির বাহিরেও নাই, ভিতরেও নাই, কিন্তু ঈশ্বর, প্রকৃতি, আত্মা, জগৎ—এইগুলি একপর্যায়ভুক্ত শব্দ। প্রকৃতপক্ষে দুইটি বস্তু নাই, কতকগুলি দার্শনিক শব্দই তোমাকে প্রতারিত করিয়াছে। তুমি কল্পনা করিতেছ, তুমি শরীর—আবার আত্মা, তুমি একই সঙ্গে এই শরীর ও আত্মা হইয়া রহিয়াছ। তাহা কিভাবে হইতে পারে? নিজের মনের ভিতর পরীক্ষা করিয়া দেখ। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ যোগী থাকেন, তিনি নিজেকে চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান করিবেন, তাঁহার পক্ষে শরীর-বোধ একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। যদি তুমি সাধারণ লোক হও, তবে তুমি নিজেকে দেহ বিবেচনা করিবে, তখন চৈতন্যের জ্ঞান একেবারে অন্তর্হিত হয়। কিন্তু মানুষের দেহ আছে, আত্মা আছে, আরও অন্যান্য জিনিস আছে—এই-সকল দার্শনিক ধারণা থাকাতে তাহার মনে হয়, এগুলি একই সময়ে রহিয়াছে। এক কালে

১ চণ্ডী, ৫ম অধ্যায়

একটি বস্তুরই ধারণা হয়। যখন তুমি জড়বস্তু দেখিতেছ, তখন ঈশ্বরের কথা বলিও না। তুমি কেবল কার্যই দেখিতেছ, কারণকে তুমি দেখিতে পাইতেছ না। আর যে-মুহূর্তে তুমি কারণকে দেখিবে, সে-মুহূর্তে কার্য অন্তর্হিত হইবে। এ জগৎ কোথায় গেল? কে ইহাকে গ্রাস করিল?

কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং
নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহম্।
নিরবধি গগনাভং নিষ্কলং নির্বিকল্পং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ॥
প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং ভাবনাতীতভাবং
সমরসমসমানং মানসং বন্ধদূরম্।
নিগমবচনসিদ্ধং নিত্যমস্মৎপ্রসিদ্ধং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ॥
অজরমমরমস্তাভাসবস্তুস্বরূপং
স্তিমিতসলিলরাশিপ্রখ্যমাখ্যাবিহীনম্।
শমিতগুণবিকারং শাশ্বতং শান্তমেকং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ॥[১]

—জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধি-অবস্থায় অনির্বচনীয়, কেবল আনন্দস্বরূপ, উপমারহিত, অপার, নিত্যমুক্ত, নিষ্ক্রিয়, অসীম আকাশতুল্য, অংশহীন ও ভেদশূন্য পূর্ণব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করেন। জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধি-অবস্থায় প্রকৃতির বিকারহীন অচিন্ত্যতত্ত্বস্বরূপ, সমভাবাপন্ন অথচ যাঁহার সমান কেহ নাই, যাঁহাতে কোনরূপ পরিমাণের সম্বন্ধ নাই—যিনি অপরিমেয়, যিনি বেদবাক্যের দ্বারা সিদ্ধ এবং সর্বদা আমাদের—ব্রহ্মতত্ত্ব-অভ্যাসশীলগণের নিকট প্রসিদ্ধ—এইরূপ পূর্ণব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করেন। জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধি-অবস্থায় জরামৃত্যুশূন্য, যিনি বস্তুস্বরূপ এবং যাঁহাতে অভাব কিছুই নাই, স্থিরজলরাশি-সদৃশ নামরহিত, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিবিধ গুণবিকাররহিত, ক্ষয়হীন, শান্ত, এক পূর্ণ ব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করেন। —মানবের এমন অবস্থাও আসিয়া থাকে, তখন তাহার পক্ষে জগৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়।

১ বিবেকচূড়ামণি, ৪০৮-৪১০

আমরা দেখিয়াছি, এই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়—অবশ্য অজ্ঞেয়-বাদীর অর্থে উহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় নহে; তাঁহাকে জানিয়াছি, বলিলেই তাঁহাকে ছোট করা হইল, কারণ পূর্ব হইতেই তুমি সেই ব্রহ্ম। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, এই ব্রহ্ম একহিসাবে এই টেবিল নহেন, আবার অন্যহিসাবে ব্রহ্ম ঐ টেবিলও বটে। নামরূপ তুলিয়া লও, তাহা হইলেই যে-সত্যবস্তু থাকিবে, তাহাই তিনি। তিনিই প্রত্যেক বস্তুর ভিতর সত্যস্বরূপ।

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥[১]

—তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমি বৃদ্ধ—দণ্ডহস্তে ভ্রমণ করিতেছ, তুমিই জাত হইয়া নানা রূপ ধারণ করিয়াছ।

তুমি সকল বস্তুতে বর্তমান রহিয়াছ, আমিই তুমি, তুমিই আমি—ইহাই অদ্বৈতবাদের কথা। এ সম্বন্ধে আর কয়েকটি কথা বলিব। এই অদ্বৈতবাদেই সকল বস্তুর মূলতত্ত্বের রহস্য নিহিত। আমরা দেখিয়াছি, এই অদ্বৈতবাদের দ্বারাই কেবল আমরা যুক্তিতর্ক ও বিজ্ঞানের আক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে পারি। এখানেই অবশেষে যুক্তিবিচার একটি দৃঢ় ভিত্তি পাইয়া থাকে, কিন্তু ভারতীয় বৈদান্তিক কখনও তাঁহার সিদ্ধান্তের পূর্ববর্তী সোপানগুলির উপর দোষারোপ করেন না, তিনি নিজ সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়াইয়া পিছনের দিকে তাকান এবং ঐগুলিকে আশীর্বাদ করেন; তিনি জানেন সেগুলি সত্য, কেবল একটু ভুলক্রমে অনুভূত ও ভুলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। একই সত্য—কেবল মায়ার আবরণের মধ্য দিয়া দৃষ্ট; হইতে পারে কিঞ্চিৎ বিকৃত চিত্র, তাহা হইলেও উহা সত্য, সত্য ব্যতীত মিথ্যা কখনই নহে। সেই এক ব্রহ্ম, যাঁহাকে অজ্ঞ ব্যক্তি প্রকৃতির বহির্দেশে অবস্থিত বলিয়া দর্শন করেন, যাঁহাকে অল্পজ্ঞ ব্যক্তি জগতের অন্তর্যামিরূপে দেখেন, যাঁহাকে জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের আত্মারূপে ও সমগ্র বিশ্বরূপে অনুভব করেন; এ-সকল একই বস্তু, একই বস্তু বিভিন্ন-ভাবে দৃষ্ট, মায়ার বিভিন্ন কাচের মধ্য দিয়া দৃষ্ট, বিভিন্ন মনের দ্বারা দৃষ্ট; আর বিভিন্ন মনের দ্বারা দৃষ্ট বলিয়াই এই সব বিভিন্নতা। শুধু তাহাই নহে, উহাদের মধ্যে একটি আর একটিতে যাইবার সোপান। বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে

---

[১] শ্বেতাশ্বতর উপ., ৪।৩

প্রভেদ কি? অন্ধকারে রাস্তায় গিয়া যদি কোন অসাধারণ ঘটনা ঘটিতে দেখ, একজন পথচারীকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা কর; দশ জনের মধ্যে অন্ততঃ নয় জন বলিবে, ভূতে এ ব্যাপার করিতেছে; সে সর্বদাই ভূত দেখিতেছে, কারণ অজ্ঞানের স্বভাব কার্যের বাহিরে কারণের অনুসন্ধান করা। একটা ঢিল পড়িলে সে বলে, ভূত বা দৈত্য উহা ফেলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক বলে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম—মাধ্যাকর্ষণ।

সর্বত্রই বিজ্ঞান ও ধর্মে কি বিরোধ? প্রচলিত ধর্মগুলি বহির্মুখী ব্যাখ্যায় এতদূর জড়িত যে, সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এইরূপ অনন্ত দেবতার কল্পনা করে, আর ভাবে, যাহা কিছু ঘটিতেছে সবই একটা না একটা দেবতা বা ভূত করিতেছে। ইহার মোট কথাটা এই যে, ধর্ম—কোন কিছুর কারণ সেই বস্তুর বাহিরে অন্বেষণ করে, আর বিজ্ঞান তাহার কারণ সেই বস্তুর ভিতরেই অন্বেষণ করে। বিজ্ঞান যত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, ততই উহা প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা ভূত-প্রেতের হাত হইতে নিজের হাতে লইতেছে। যেহেতু ধর্মরাজ্যে অদ্বৈতবাদ এই কাজ করিয়াছে, সেই হেতু অদ্বৈতবাদই অধিকতরভাবে বৈজ্ঞানিক ধর্ম। এই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড বাহিরের কোন ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই, জগতের বহির্দেশে অবস্থিত কোন দৈত্য তাহা সৃষ্টি করে নাই, আপনা-আপনি সৃষ্ট হইতেছে, আপনা-আপনি উহার প্রকাশ হইতেছে, আপনা-আপনি উহার প্রলয় হইতেছে, উহা এক অনন্ত সত্তা ব্রহ্ম, 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'[১]—হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই। এইরূপে তোমরা দেখিতেছ, অদ্বৈতবাদই একমাত্র বৈজ্ঞানিক ধর্ম—অন্য কোন মতবাদ নয়; আর বর্তমান অর্ধশিক্ষিত ভারতে আজকাল প্রত্যহ যে বিজ্ঞানের বুকনি চলিতেছে, প্রত্যহ যে যুক্তির দোহাই শুনিতেছি, তাহাতে আমি আশা করি, তোমরা দলকে দল অদ্বৈতবাদী হইবে, আর বুদ্ধের কথায় বলিতেছি, 'বহুজনহিতায় বহুজন-সুখায়' জগতে উহা প্রচার করিতে সাহসী হইবে। যদি তাহা না পারো, তবে তোমাদিগকে কাপুরুষ মনে করিব।

যদি তোমার এইরূপ দুর্বলতা থাকে, যদি তুমি একেবারে প্রকৃত সত্য স্বীকার করিতে ভয় পাও বলিয়া উহা অবলম্বন করিতে না পারো, তবে

১ ছান্দোগ্য উপ., ৬।৮।৭

অপরকেও সেইরূপ স্বাধীনতা দাও, বেচারা মূর্তিপুজককে একেবারে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিও না, তাহাকে একটা পিশাচ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিও না ; যাহার সহিত তোমার মত সম্পূর্ণ না মিলে, তাহার নিকট তোমার মত প্রচার করিতে যাইও না। প্রথমে এইটি বুঝ যে, তুমি নিজে দুর্বল ; আর যদি সমাজের ভয় পাও, যদি তোমার নিজ প্রাচীন কুসংস্কারের দরুন ভয় পাও, তবে বুঝিয়া দেখ যাহারা অজ্ঞ, তাহারা এই কুসংস্কারে আরও কত ভয় পাইবে, ঐ কুসংস্কার তাহাদিগকে আরও কতদূর বদ্ধ করিবে। ইহাই অদ্বৈতবাদীর কথা। অন্যের উপর সদয় হও। ঈশ্বরেচ্ছায় কালই যদি সমগ্র জগৎ—শুধু মতে নয়, অনুভূতিতেও অদ্বৈতবাদী হয়, তাহা হইলে তো খুব ভালই হয় ; কিন্তু তাহা যদি না হয়, তবে যতটা ভাল করিতে পারা যায়, তাই কর, সকলের হাত ধরিয়া তাহাদের সামর্থ্যানুসারে ধীরে ধীরে লইয়া যাও ; আর জানিও যে, ভারতে সকল প্রকার ধর্মের বিকাশই ধীরে ধীরে ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে হইয়াছে। মন্দ হইতে ভাল হইতেছে, তাহা নহে ; ভাল হইতে আরও ভাল হইতেছে।

অদ্বৈতবাদের নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক। আমাদের যুবকেরা আজকাল অভিযোগ করিয়া থাকে যে, তাহারা কাহারও কাছে শুনিয়াছে—ঈশ্বর জানেন কাহার কাছে—অদ্বৈতবাদের দ্বারা সকলেই দুর্নীতি-পরায়ণ হইয়া উঠিবে, কারণ অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দেয়—আমরা সকলেই এক, সকলেই ঈশ্বর ; অতএব আমাদের আর নীতিপরায়ণ হইবার প্রয়োজন নাই। এ-কথার উত্তরে প্রথমেই বলিতে হয় যে, এ-যুক্তি পশুপ্রকৃতি ব্যক্তির মুখেই শোভা পায়, কশাঘাত ব্যতীত যাহাকে দমন করিবার অন্য উপায় নাই। যদি তুমি পশুপ্রকৃতি হও, তবে শুধু কশাঘাতে শাসনযোগ্য মনুষ্যপদবাচ্য হইয়া থাকা অপেক্ষা তোমার পক্ষে বরং আত্মহত্যা করাই শ্রেয়ঃ। কশাঘাত বন্ধ করিলেই তোমরা সকলে অসুর হইয়া দাঁড়াইবে। তাই যদি হয়, তবে তোমাদের এখনই মারিয়া ফেলা উচিত—তোমাদের ভাল করিবার আর উপায় নাই। চিরকালই তাহা হইলে তোমাদিগকে এই কশা ও দণ্ডের ভয়ে চলিতে হইবে, তোমাদের আর উদ্ধার নাই, তোমাদের আর পলায়নের পন্থা নাই। দ্বিতীয়তঃ অদ্বৈতবাদ—কেবল অদ্বৈতবাদের দ্বারাই নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা হইতে পারে। প্রত্যেক ধর্মই প্রচার করিতেছে যে, সকল নীতিতত্ত্বের সার—অন্যের হিতসাধন। কেন অপরের

হিতসাধন করিব? সকল ধর্মই উপদেশ দিতেছে—নিঃস্বার্থ হও। কেন নিঃস্বার্থ হইব?—কারণ কোন দেবতা ইহা বলিয়া গিয়াছেন। দেবতার কথায় আমার প্রয়োজন কি? শাস্ত্রে ইহা বলিয়া গিয়াছে; শাস্ত্রে বলুক, না আমি উহা মানিতে যাইব কেন? আর ধর, কতকগুলি লোক ঐ শাস্ত্র বা ঈশ্বরের দোহাই শুনিয়া নীতিপরায়ণ হইল—তাহাতেই বা কি! জগতের অধিকাংশ লোকের নীতি—'চাচা আপন বাঁচা'; তাই 'বলিতেছি—আমি যে নীতিপরায়ণ হইব, ইহার যুক্তি দেখাও। অদ্বৈতবাদ ব্যতীত ইহা ব্যাখ্যা করিবার উপায় নাই।

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥[১]

—অর্থাৎ ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া সেই সমদর্শী নিজে নিজেকে হিংসা করে না। সেই জন্য তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন।

অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিয়া অবগত হও যে, অপরকে হিংসা করিতে গিয়া তুমি নিজেকেই হিংসা করিতেছ—কারণ তাহারা সকলেই যে তুমি! তুমি জানো আর নাই জানো, সকল হাত দিয়া তুমি কাজ করিতেছ, সকল পা দিয়া তুমি চলিতেছ, তুমিই রাজারূপে প্রাসাদে সুখসম্ভোগ করিতেছ, আবার তুমিই রাস্তার ভিখারীরূপে দুঃখের জীবন যাপন করিতেছ। অজ্ঞ ব্যক্তিতেও তুমি, বিদ্বানেও তুমি, দুর্বলের মধ্যেও তুমি, সবলের মধ্যেও তুমি। এই তত্ত্ব অবগত হইয়া সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হও। যেহেতু অপরকে হিংসা করিলে নিজেকে হিংসা করা হয়, সেই জন্য কখনও অন্যকে হিংসা করা উচিত নহে। সেইজন্যই যদি আমি না খাইয়া মরিয়া যাই, তাহাও আমি গ্রাহ্য করি না, কারণ আমি যখন শুকাইয়া মরিতেছি, তখন আমার লক্ষ লক্ষ মুখে আমিই আহার করিতেছি। অতএব এই ক্ষুদ্র 'আমি আমার' সম্পর্কীয় বিষয় গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা উচিত নয়, কারণ সমগ্র জগৎই আমার, আমি যুগপৎ জগতের সকল আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি। আমাকে ও জগৎকে কে বিনাশ করিতে পারে? কাজেই দেখিতেছ, অদ্বৈতবাদই নীতিতত্ত্বের একমাত্র ভিত্তি, একমাত্র ব্যাখ্যা। অন্যান্য মতবাদ তোমাদিগকে নীতিশিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু কেন নীতিপরায়ণ

---

১ গীতা, ১৩।২৮

হইব, ইহার কোন হেতু নির্দেশ করিতে পারে না। যাহা হউক, এই পর্যন্ত দেখা গেল—একমাত্র অদ্বৈতবাদই নীতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ।

অদ্বৈতবাদ-সাধনে লাভ কি? উহাতে শক্তি তেজ বীর্য লাভ হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিতেছেন, 'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'[১]—প্রথমে এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইবে। সমগ্র জগতে তোমরা যে মায়াজাল বিস্তার করিয়াছ, তাহা সরাইয়া লইতে হইবে। মানুষকে দুর্বল ভাবিও না, তাহাকে দুর্বল বলিও না। জানিও, সকল পাপ ও সকল অশুভ এক 'দুর্বলতা' শব্দ দ্বারাই নির্দিষ্ট হইতে পারে। সকল অসৎকার্যের মূল—দুর্বলতা। দুর্বলতার জন্যই যাহা করা উচিত নয়, মানুষ তাহাই করিয়া থাকে; দুর্বলতার জন্যই মানুষ তাহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না। তাহারা কি, এ তত্ত্ব তাহারা সকলেই জানুক। দিবারাত্র তাহারা নিজেদের স্বরূপের কথা বলুক। 'আমিই সেই'—এই ওজস্বী ভাবধারা মাতৃস্তন্যের সঙ্গে তাহারা পান করুক। তার পর তাহারা উহা চিন্তা করুক; ঐ চিন্তা—ঐ মনন হইতে এমন সব কাজ হইবে, যাহা পৃথিবী কখনও দেখে নাই।

কিভাবে উহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে? কেহ কেহ বলিয়া থাকে—এই অদ্বৈতবাদ কার্যকর নয়, অর্থাৎ জড়-জগতে এখনও উহার শক্তি প্রকাশিত হয় নাই। এই কথা আংশিক সত্য বটে। বেদের সেই বাণী স্মরণ কর:

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥[২]

—ওঁ, ইহা মহারহস্য। ওঁ—ইহা আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। যিনি এই ওঙ্কারের রহস্য জানেন, তিনি যাহা চান, তাহাই পাইয়া থাকেন।

অতএব প্রথমে এই ওঙ্কারের রহস্য অবগত হও—তুমিই যে সেই ওঙ্কার, তাহা জানো। এই 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের রহস্য অবগত হও; তখনই—কেবল তখনই তোমরা যাহা চাহিবে, তাহা পাইবে। যদি জড়জগতে বড় হইতে চাও, তবে বিশ্বাস কর—তুমি বড়। আমি হয়তো একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ, তুমি হয়তো পর্বততুল্য উচ্চ তরঙ্গ, কিন্তু জানিও আমাদের উভয়েরই পিছনে অনন্ত সমুদ্র

১ বৃহ উপ., ২।৪।৫ ২ কঠ উপ., ১।২।১৬

রহিয়াছে, অনন্ত ঈশ্বর আমাদের সকল শক্তি ও বীর্যের ভাণ্ডারস্বরূপ, আর আমরা উভয়েই সেখান হইতে যত ইচ্ছা শক্তি সংগ্রহ করিতে পারি। অতএব নিজের উপর বিশ্বাস কর। অদ্বৈতবাদের রহস্য এই যে, প্রথমে নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়, তারপর অন্য কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারো। জগতের ইতিহাসে দেখিবে, যে-সকল জাতি নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, শুধু তাহারাই শক্তিশালী ও বীর্যবান্ হইয়াছে। প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে ইহাও দেখিবে, যে-সকল ব্যক্তি নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারাই শক্তিশালী ও বীর্যবান্ হইয়াছে। এই ভারতে একজন ইংরেজ আসিয়াছিলেন—তিনি সামান্য কেরানী ছিলেন; পয়সা-কড়ির অভাবে ও অন্যান্য কারণে তিনি দুইবার নিজের মাথায় গুলি করিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, এবং যখন তিনি উহাতে অকৃতকার্য হইলেন, তাঁহার বিশ্বাস হইল—তিনি কোন বড় কাজ করিবার জন্যই জন্মিয়াছেন; সেই ব্যক্তিই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্লাইভ। যদি তিনি পাদরীদের উপর বিশ্বাস করিয়া সারাজীবন হাঁটু গাড়িয়া বলিতেন, 'হে প্রভু, আমি দুর্বল, আমি হীন', তবে তাঁহার কি গতি হইত? নিশ্চয় উন্মাদাগারেই তাঁহার স্থান হইত। লোকে এই-সকল কুশিক্ষা দিয়া তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। আমি সমগ্র পৃথিবীতে দেখিয়াছি, দীনতা ও দুর্বলতার উপদেশ দ্বারা অতি অশুভ ফল ফলিয়াছে, ইহা মনুষ্যজাতিকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের সন্তানসন্ততিগণকে এইভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়—এবং ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় যে, তাহারা শেষে আধপাগল-গোছের হইয়া দাঁড়ায়?

অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত করিবার উপায়—নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। যদি সাংসারিক ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে এই অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত কর; টাকা তোমার নিকট আসিবে। যদি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইতে ইচ্ছা কর, তবে অদ্বৈতবাদকে সেই দিকে প্রয়োগ কর, তুমি মহামনীষী হইবে। যদি তুমি মুক্তিলাভ করিতে চাও, তবে আধ্যাত্মিক ভূমিতে এই অদ্বৈতবাদ প্রয়োগ করিতে হইবে—তাহা হইলে তুমি মুক্ত হইয়া যাইবে, পরমানন্দস্বরূপ নির্বাণ লাভ করিবে। এইটুকু ভুল হইয়াছিল যে, এতদিন অদ্বৈতবাদ কেবল আধ্যাত্মিক দিকেই প্রযুক্ত হইয়াছিল—অন্য কোন ক্ষেত্রে নয়। এখন কর্মজীবনে উহা প্রয়োগ করিবার সময় আসিয়াছে। এখন আর উহাকে

রহস্য বা গোপনীয় বিদ্যা করিয়া রাখিলে-চলিবে না, এখন আর উহা হিমালয়ের গুহায় বন-জঙ্গলে সাধু-সন্ন্যাসীদের নিকট আবদ্ধ থাকিবে না, লোকের প্রাত্যহিক জীবনে উহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে। রাজার প্রাসাদে, সাধু-সন্ন্যাসীর গুহায়, দরিদ্রের কুটিরে, সর্বত্র—এমন কি রাস্তার ভিখারী দ্বারাও উহা কাজে পরিণত হইতে পারে।

গীতায় কি উক্ত হয় নাই—'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ?' —এই ধর্মের অল্পমাত্রও আমাদিগকে মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করে। অতএব তুমি স্ত্রী হও বা শূদ্রই হও, বা আর যাহা কিছু হও—তোমার কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, এই ধর্ম এতই বড় যে, ইহার অতি অল্পমাত্র অনুষ্ঠান করিলেও মহৎ কল্যাণ হইয়া থাকে। অতএব হে আর্য-সন্তানগণ, অলসভাবে বসিয়া থাকিও না—ওঠ, জাগো, যতদিন না সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতেছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না। এখন অদ্বৈতবাদকে কার্যে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে—উহাকে এখন স্বর্গ হইতে মর্ত্যে লইয়া আসিতে হইবে, ইহাই এখন বিধির বিধান। আমাদের পূর্বপুরুষগণের বাণী আমাদিগকে অবনতির দিকে আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতেছে। অতএব হে আর্যসন্তানগণ, আর সে-দিকে অগ্রসর হইও না। তোমাদের সেই প্রাচীন শাস্ত্রের উপদেশ—উচ্চ স্তর হইতে ক্রমশঃ নিম্নে অবতরণ করিয়া সমগ্র জগৎকে আচ্ছন্ন করুক, সমাজের প্রতি স্তরে প্রবেশ করুক, উহা প্রত্যেক ব্যক্তির সাধারণ সম্পত্তি হউক, আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হউক, আমাদের শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া প্রতি শোণিতবিন্দুর সহিত উহা প্রবাহিত হউক।

তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য হইবে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমাদের অপেক্ষা মার্কিনরা বেদান্তকে অধিক পরিমাণে কর্মজীবনে পরিণত করিয়াছে। আমি নিউ ইয়র্কের সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া দেখিতাম—বিভিন্ন দেশ হইতে লোক আমেরিকায় বাস করিবার জন্য আসিতেছে। দেখিলে বোধ হইত যেন তাহারা মরমে মরিয়া আছে—পদদলিত, আশাহীন। এক পুঁটলি কাপড় কেবল তাহাদের সম্বল—কাপড়গুলিও সব ছিন্নভিন্ন, তাহারা ভয়ে লোকের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে অক্ষম। একটা পুলিশের লোক দেখিলেই ভয় পাইয়া ফুটপাতের অন্যদিকে যাইবার চেষ্টা করে। এখন দেখ, ছয়মাস বাদে সেই লোকগুলিই ভাল জামাকাপড় পরিয়া সোজা হইয়া চলিতেছে—সকলের দিকেই

নির্ভীকদৃষ্টিতে চাহিতেছে। এমন অদ্ভুত পরিবর্তন কিভাবে আসিল? মনে কর, সে-ব্যক্তি আর্মেনিয়া বা অন্য কোন স্থান হইতে আসিতেছে—সেখানে কেহ তাহাকে গ্রাহ্য করিত না, সকলেই পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিত, সেখানে সকলেই তাহাকে বলিত—'তুই জন্মেছিস্ গোলাম, থাকবি গোলাম, একটু যদি নড়তে চড়তে চেষ্টা করিস তো তোকে পিষে ফেলব।' চারিদিকের সবই যেন তাহাকে বলিত, 'গোলাম তুই, গোলাম আছিস—যা আছিস, তাই থাক্। জন্মেছিলি যখন, তখন যে-নৈরাশ্যের অন্ধকারে জন্মেছিলি, সেই নৈরাশ্যের অন্ধকারে সারাজীবন পড়ে থাক্।' সেখানকার হাওয়া যেন তাহাকে গুনগুন করিয়া বলিত, 'তোর কোন আশা নেই—গোলাম হইয়া চিরজীবন নৈরাশ্যের অন্ধকারে পড়িয়া থাক্।' সেখানে বলবান্ ব্যক্তি তাহাকে পিষিয়া তাহার প্রাণ হরণ করিয়া লইতেছিল। আর যখনই সে জাহাজ হইতে নামিয়া নিউ ইয়র্কের রাস্তায় চলিতে লাগিল, সে দেখিল একজন ভালপোশাক-পরা ভদ্রলোক তাহার করমর্দন করিল। সে যে ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত, আর ভদ্রলোকটি যে উত্তমবস্ত্রধারী, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আর একটু অগ্রসর হইয়া সে এক ভোজনাগারে গিয়া দেখিল, ভদ্রলোকেরা টেবিলে বসিয়া আহার করিতেছেন—সেই টেবিলেরই এক প্রান্তে তাহাকে বসিতে বলা হইল। সে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল, দেখিল—এ এক নূতন জীবন; সে দেখিল—এমন জায়গাও আছে, যেখানে আর পাঁচজন মানুষের ভিতরে সেও একজন মানুষ। হয়তো সে ওয়াশিংটনে গিয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের সহিত করমর্দন করিয়া আসিল, সেখানে হয়তো সে দেখিল দূরবর্তী পল্লীগ্রাম হইতে মলিন-বস্ত্রপরিহিত কৃষকেরা আসিয়া সকলেই প্রেসিডেণ্টের করমর্দন করিতেছে। তখন তাহার মায়ার আবরণ খসিয়া গেল। সে যে ব্রহ্ম—মায়াবশে এইরূপ দুর্বল দাসভাবাপন্ন হইয়াছিল! এখন সে আবার জাগিয়া উঠিয়া দেখিল—মনুষ্যপূর্ণ জগতে সেও একজন মানুষ।

আমাদের এই দেশে—বেদান্তের এই জন্মভূমিতে সাধারণ লোককে শত শতাব্দী যাবৎ এইরূপ মায়াচক্রে ফেলিয়া এমন হীনভাবাপন্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে। তাহাদের স্পর্শে অশুচি, তাহাদের সঙ্গে বসিলে অশুচি! তাহাদিগকে বলা হইতেছে, 'নৈরাশ্যের অন্ধকারে তোদের জন্ম—থাক্ চিরকাল এই নৈরাশ্যের অন্ধকারে।' ফল এই হইয়াছে যে, সাধারণ লোক ক্রমশঃ

ডুবিতেছে, গভীর অন্ধকার হইতে গভীরতর অন্ধকারে ডুবিতেছে, মনুষ্যজাতি যতদূর নিকৃষ্ট অবস্থায় পৌঁছিতে পারে, অবশেষে ততদূর পৌঁছিয়াছে। কারণ এমন দেশ আর কোথায় আছে, যেখানে মানুষকে গো-মহিষাদির সঙ্গে একত্র বাস করিতে হয়? আর ইহার জন্য অপর কাহারও ঘাড়ে দোষ চাপাইও না—অজ্ঞ ব্যক্তিরা যে ভুল করিয়া থাকে, সেই ভ্রমে তোমরা পড়িও না। ফলও হাতে হাতে দেখিতেছ, তাহার কারণও এইখানেই বর্তমান। বাস্তবিক দোষ আমাদেরই। সাহস করিয়া দাঁড়াও, নিজেদের ঘাড়েই সব দোষ লও। অন্যের স্কন্ধে দোষারোপ করিতে যাইও না, তোমরা যে-সকল কষ্ট ভোগ করিতেছ, সেগুলির জন্য তোমরাই দায়ী।

অতএব হে লাহোরবাসী যুবকবৃন্দ, তোমরা এইটি বিশেষভাবে অবগত হও যে, তোমাদের স্কন্ধে এই মহাপাপ—বংশপরম্পরাগত এই জাতীয় মহাপাপ রহিয়াছে। ইহা দূর করিতে না পারিলে তোমাদের আর উপায় নাই। তোমরা সহস্র সহস্র সমিতি গঠন করিতে পারো, বিশ হাজার রাজনীতিক সম্মেলন করিতে পারো, পঞ্চাশ হাজার শিক্ষালয় স্থাপন করিতে পারো; এ-সবে কিছুই ফল হইবে না, যতদিন না তোমাদের ভিতর সেই সহানুভূতি, সেই প্রেম আসিতেছে; যতদিন না তোমাদের ভিতর সেই হৃদয় আসিতেছে—যে-হৃদয় সকলের জন্য ভাবে। যতদিন না ভারতে আবার বুদ্ধের হৃদয়বত্তা আসিতেছে, যতদিন না ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাণী কর্মজীবনে পরিণত করা হইতেছে, ততদিন আমাদের আশা নাই। তোমরা ইওরোপীয়দের এবং তাহাদের সভাসমিতির অনুকরণ করিতেছ; কিন্তু তাহাদের হৃদয়বত্তার অনুকরণ করিয়াছ কি? আমি তোমাদিগকে একটি গল্প বলিব—আমি স্বচক্ষে যে ঘটনা দেখিয়াছি, তাহা তোমাদের নিকট বলিব—তাহা হইলেই তোমরা আমার ভাব বুঝিবে। একদল ইউরেশীয়ান কতকগুলি ব্রহ্মদেশবাসীকে লণ্ডনে লইয়া গিয়া, তাহাদের একটি প্রদর্শনী করিয়া খুব পয়সা উপার্জন করিল। টাকাকড়ি নিজেরা লইয়া তাহাদিগকে ইওরোপের এক জায়গায় ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া পড়িল। এই গরীব বেচারারা কোন ইওরোপীয় ভাষার একটি শব্দও জানিত না। যাহা হউক, অষ্ট্রিয়ার ইংরেজ কন্‌সল তাহাদিগকে লণ্ডনে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা লণ্ডনেও কাহাকেও জানিত না, সুতরাং সেখানে গিয়াও নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িল। কিন্তু একজন ইংরেজ ভদ্রমহিলা তাহাদের বিষয় জানিতে পারিয়া

এই বর্মী বৈদেশিকগণকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া নিজের কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র, প্রয়োজনীয় সব দিয়া তাহাদের সেবা করিতে লাগিলেন এবং সংবাদপত্রে খবরটি পাঠাইয়া দিলেন। দেখ, তাহার ফল কী হইল! তার পরদিনই যেন সমগ্র জাতিটি জাগিয়া উঠিল, চারিদিক্ হইতে তাহাদের সাহায্যার্থ টাকা আসিতে লাগিল, শেষে তাহাদিগকে ব্রহ্মদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

তাহাদের রাজনীতিক ও অন্যপ্রকার সভাসমিতি যাহা কিছু আছে, তাহা এইরূপ সহানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা অন্ততঃ তাহাদের স্বজাতিপ্রীতির দৃঢ়ভিত্তি। তাহারা সমগ্র পৃথিবীকে ভাল না বাসিতে পারে, তাহারা আর সকলের শত্রু হইতে পারে, কিন্তু ইহা বলা বাহুল্য যে, তাহারা নিজেদের দেশ ও জাতিকে গভীরভাবে ভালবাসে, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি তাহাদের গভীর অনুরাগ এবং তাহাদের দ্বারে সমাগত বৈদেশিকগণের প্রতিও তাহাদের খুব দয়া। পাশ্চাত্য দেশে সর্বত্র তাহারা কিভাবে অতিথি বলিয়া আমার যত্ন লইয়াছিল, এ-কথা যদি আমি তোমাদের নিকট বার বার না বলি, তাহা হইলে আমি অকৃতজ্ঞতাদোষে দোষী হইব। এখানে সেই হৃদয় কোথায়, যাহাকে ভিত্তি করিয়া এই জাতির উন্নতি প্রতিষ্ঠিত হইবে? আমরা পাঁচজনে মিলিয়া একটি ছোটখাটো যৌথ কারবার খুলিলাম, কিছুদিন চলিতে না চলিতে আমরা পরস্পরকে ঠকাইতে লাগিলাম, শেষে সব ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। তোমরা ইংরেজদের অনুকরণ করিবে বলো, আর তাহাদের মতো শক্তিশালী জাতি গঠন করিতে চাও, কিন্তু তোমাদের ভিত্তি কোথায়? আমাদের বালির ভিত্তি, তাহার উপর নির্মিত গৃহ অতি শীঘ্রই চুরমার হইয়া ভাঙিয়া যায়।

অতএব হে লাহোরবাসী যুবকবৃন্দ, আবার সেই বিশাল অদ্বৈতভাবের পতাকা উড্ডীন কর—কারণ আর কোন ভিত্তির উপর সেই অপূর্ব প্রেম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; যতদিন না তোমরা সেই এক ভগবান্‌কে একভাবে সর্বত্র অবস্থিত দেখিতেছ, ততদিন তোমাদের ভিতর সেই প্রেম জন্মিতে পারে না; সেই প্রেমের পতাকা উড়াইয়া দাও। ওঠ, জাগো, যতদিন না লক্ষ্যে পৌছিতেছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না; ওঠ, আর একবার ওঠ, ত্যাগ ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। অন্যকে যদি সাহায্য করিতে চাও, তবে তোমার নিজের অহংকে বিসর্জন দিতে হইবে। খ্রীষ্টানদের ভাষায় বলি: ঈশ্বর ও

শয়তানের সেবা কখনও এক সঙ্গে করিতে পার না। বৈরাগ্যবান্ হও—তোমাদের পূর্বপুরুষগণ বড় বড় কাজ করিবার জন্য সংসারত্যাগ করিয়াছিলেন। বর্তমানকালে এমন অনেকে রহিয়াছেন, যাঁহারা নিজেদের মুক্তির জন্য সংসার-ত্যাগ করিয়াছেন। তোমরা সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, এমন কি নিজেদের মুক্তি পর্যন্ত দূরে ফেলিয়া দাও; যাও, অন্যের সাহায্য কর। তোমরা সর্বদাই বড় বড় কথা বলিতেছ, কিন্তু তোমাদের সম্মুখে এই কর্মপরিণত বেদান্ত স্থাপন করিলাম। তোমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হও। যদি এই জাতি জীবিত থাকে, তবে তুমি আমি—আমাদের মতো হাজার হাজার লোক যদি অনাহারে মরে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি?

এই জাতি ডুবিতেছে! লক্ষ লক্ষ লোকের অভিশাপ আমাদের মস্তকে রহিয়াছে—যাহাদিগকে আমরা নিত্য-প্রবাহিত অমৃতনদী পার্শ্বে বহিয়া গেলেও তৃষ্ণার সময় পয়ঃপ্রণালীর জল পান করিতে দিয়াছি, সম্মুখে অপর্যাপ্ত আহার্য থাকা সত্ত্বেও যাহাদিগকে আমরা অনশনে মরিতে দিয়াছি, লক্ষ লক্ষ লোক—যাহাদিগকে আমরা অদ্বৈতবাদের কথা বলিয়াছি, কিন্তু প্রাণপণে ঘৃণা করিয়াছি, —যাহাদের বিরুদ্ধে আমরা 'লোকাচারের' মতবাদ আবিষ্কার করিয়াছি, যাহাদিগকে আমরা মুখে বলিয়াছি—সকলেই সমান, সকলেই সেই এক ব্রহ্ম, কিন্তু উহা কার্যে পরিণত করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করি নাই। 'মনে মনে রাখিলেই হইল, ব্যাবহারিক জগতে অদ্বৈতভাব লইয়া আসা যায় না!'—তোমাদের চরিত্রের এই কলঙ্ক মুছিয়া ফেলো। ওঠ, জাগো; এই ক্ষুদ্র জীবন যদি যায়, ক্ষতি কি? সকলেই মরিবে—সাধু অসাধু, ধনী দরিদ্র—সকলেই মরিবে। শরীর কাহারও চিরকাল থাকিবে না। অতএব ওঠ, জাগো এবং সম্পূর্ণ অকপট হও। ভারতে ঘোর কপটতা প্রবেশ করিয়াছে। চাই চরিত্র, চাই এইরূপ দৃঢ়তা ও চরিত্রবল, যাহাতে মানুষ একটা ভাবকে মরণকামড়ে ধরিয়া থাকিতে পারে।

'নীতিনিপুণ ব্যক্তিগণ নিন্দাই করুন বা সুখ্যাতিই করুন, লক্ষ্মী আসুন বা চলিয়া যান, মৃত্যু আজই হউক বা শতাব্দান্তে হউক, তিনিই ধীর, যিনি ন্যায়পথ হইতে এক পাও বিচলিত না হন।'[১] ওঠ, জাগো, সময় চলিয়া যাইতেছে,

---

১ নীতিশতকম্—ভর্তৃহরি

আর আমাদের সমুদয় শক্তি বৃথা বাক্যে ক্ষয় হইতেছে। ওঠ, জাগো—সামান্য সামান্য বিষয় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত-মতান্তর লইয়া বৃথা বিবাদ পরিত্যাগ কর। তোমাদের সম্মুখে খুব বড় কাজ রহিয়াছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্রমশঃ ডুবিতেছে, তাহাদিগকে উদ্ধার কর।

এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষে প্রথম আসে, তখন ভারতে এখনকার অপেক্ষা কত বেশী হিন্দুর বসবাস ছিল, আজ তাহাদের সংখ্যা কত হ্রাস পাইয়াছে। ইহার কোন প্রতিকার না হইলে হিন্দু দিন দিন আরও কমিয়া যাইবে, শেষে আর কেহ হিন্দু থাকিবে না। হিন্দুজাতির লোপের সঙ্গে সঙ্গেই—তাহাদের শতদোষ সত্ত্বেও, পৃথিবীর সম্মুখে তাহাদের শত শত বিকৃত চিত্র উপস্থাপিত হইলেও এখনও তাহারা যে-সকল মহৎ ভাবের প্রতিনিধিরূপে বর্তমান, সেগুলিও লুপ্ত হইবে। আর হিন্দুদের লোপের সঙ্গে সঙ্গে সকল অধ্যাত্মজ্ঞানের চূড়ামণি অপূর্ব অদ্বৈততত্ত্বও বিলুপ্ত হইবে। অতএব ওঠ, জাগো—পৃথিবীর আধ্যাত্মিকতা রক্ষা করিবার জন্য বাহু প্রসারিত কর। আর প্রথমে তোমাদের স্বদেশের কল্যাণের জন্য এই তত্ত্ব কার্যে পরিণত কর। ব্যাবহারিক জগতে অদ্বৈতবাদ একটু কাজে পরিণত করা আমাদের যত প্রয়োজন, আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন ততটা নয়; প্রথমে অন্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তারপর ধর্ম। গরীব লোকেরা অনশনে মরিতেছে, আমরা তাহাদিগকে অতিরিক্ত ধর্মোপদেশ দিতেছি! মত-মতান্তরে তো আর পেট ভরে না! আমাদের একটি দোষ বড়ই প্রবল—প্রথমতঃ আমাদের দুর্বলতা, দ্বিতীয়তঃ ঘৃণা—হৃদয়ের শুষ্কতা। লক্ষ লক্ষ মতবাদের কথা বলিতে পারো, কোটি কোটি সম্প্রদায় গঠন করিতে পারো, কিন্তু যতদিন না তাহাদের দুঃখ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ, বেদের উপদেশ অনুযায়ী যতদিন না জানিতেছ যে, তাহারা তোমার শরীরের অংশ, যতদিন না তোমরা ও তাহারা, দরিদ্র-ধনী, সাধু-অসাধু সকলেই সেই অনন্ত অখণ্ডরূপ—যাঁহাকে তোমরা ব্রহ্ম বলো, তাঁহার অংশ হইয়া যাইতেছে, ততদিন কিছু হইবে না।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের নিকট অদ্বৈতবাদের কয়েকটি প্রধান প্রধান ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এখন উহাকে কাজে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে—শুধু এ-দেশে নয়, সর্বত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের লৌহমুদ্গরাঘাতে দ্বৈতবাদাত্মক ধর্মগুলির কাচনির্মিত ভিত্তিসমূহ সর্বত্র চূর্ণবিচূর্ণ

হইয়া যাইতেছে। শুধু এখানেই যে দ্বৈতবাদীরা টানিয়া শাস্ত্রীয় শ্লোকের অর্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহা নহে,—এতদূর টানা হইতেছে যে, আর চলে না, শ্লোকগুলি তো আর রবার নহে!—শুধু এদেশেই যে উহারা আত্মরক্ষার জন্য অন্ধকারে কোণে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা নহে, ইওরোপ-আমেরিকায় এই চেষ্টা আরও বেশী। আর সেখানেও ভারত হইতে এই তত্ত্বের অন্ততঃ কিছু গিয়া প্রবেশ করা চাই। ইতিপূর্বেই কিছু গিয়াছে—উহার প্রসার দিন দিন আরও বাড়াইতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে রক্ষা করিবার জন্য উহা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ পাশ্চাত্যদেশে সেখানকার প্রাচীন ভাবাদর্শ লোপ পাইতেছে, এক নূতন ব্যবস্থা—কাঞ্চনের পূজা চালু হইতেছে। এই আধুনিক ধর্ম অর্থাৎ পরস্পর প্রতিযোগিতা ও কাঞ্চনপূজা অপেক্ষা যে সেই প্রাচীন অপরিণত ধর্মপ্রণালী ছিল ভাল। কোন জাতি যতই প্রবল হউক, এরূপ ভিত্তির উপর কখনই দাঁড়াইতে পারে না। জগতের ইতিহাস আমাদিগকে বলিতেছে, যাহারাই এইরূপ ভিত্তির উপর তাহাদের সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছে, তাহাদেরই বিনাশ হইয়াছে। যাহাতে ভারতে এই কাঞ্চনপূজার তরঙ্গ প্রবেশ না করে, সেদিকে প্রথমেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অতএব সকলের নিকট এই অদ্বৈতবাদ প্রচার কর, যাহাতে ধর্ম - আধুনিক বিজ্ঞানের প্রবল আঘাতেও অক্ষত থাকিতে পারে। শুধু তাহাই নয়, অপরকেও তোমাদের সাহায্য করিতে হইবে, তোমাদের ভাবরাশি ইওরোপ-আমেরিকাকে উদ্ধার করিবে। কিন্তু সর্বাগ্রে তোমাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, এখানেই প্রকৃত কাজ রহিয়াছে, আর সেই কাজের প্রথমাংশ—দিন দিন গভীর হইতে গভীরতর দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতিমিরে মজ্জমান ভারতের লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের উন্নতি-সাধন। তাহাদের কল্যাণের জন্য, তাহাদের সহায়তার জন্য বাহু প্রসারিত কর এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই বাণী স্মরণ কর :

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

—যাঁহাদের মন সাম্যভাবে অবস্থিত, তাঁহারা ইহজীবনেই সংসার জয় করিয়াছেন। যেহেতু ব্রহ্ম নির্দোষ ও সমভাবাপন্ন, সেই হেতু তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত।

রাজপুতানায়

স্বামীজী লাহোর হইতে দেরাদুন, সাহারানপুর, দিল্লী, রাজপুতানার অন্তর্গত আলোয়ার ও জয়পুর হইয়া খেতড়ি গমন করেন। সর্বত্রই তিনি শিষ্য, ভক্ত ও অনুরাগী বন্ধুদের সহিত আলাপ আলোচনা ও ধর্ম-প্রসঙ্গ করেন এবং ছোট ছোট বক্তৃতা দেন।

খেতড়ি জয়পুরের অধীনে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। খেতড়ির রাজা অগ্রবর্তী হইয়া স্বামীজীর পাদবন্দনা করেন এবং ছয়ঘোড়ার গাড়িতে স্বামীজীকে তুলিয়া খেতড়িতে উপনীত হন। ১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৯৭ খৃঃ স্থানীয় স্কুলগৃহে এক সভায় স্বামীজীকে এক অভিনন্দন প্রদত্ত হয়। সভাপতিত্ব করেন খেতড়িব রাজা। উত্তরে স্বামীজী বলেন ঃ

ভারতের উন্নতিকল্পে আমি সামান্য যাহা করিয়াছি, রাজাজীর সহিত সাক্ষাৎ না হইলে তাহা আমি করিতে পারিতাম না। পাশ্চাত্যদেশের আদর্শ ভোগ এবং প্রাচ্যদেশের—ত্যাগ। খেতড়িনিবাসী যুবকগণ, পাশ্চাত্য আদর্শের চাকচিক্যে বিহ্বল না হইয়া দৃঢ়ভাবে প্রাচ্য আদর্শের অনুসরণ কর। শিক্ষা অর্থে মানবের মধ্যে পূর্ব হইতেই যে-ঈশ্বরত্ব রহিয়াছে, তাহাই প্রকাশ করা। অতএব শিশুদের শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের প্রতি অগাধ-বিশ্বাস-সম্পন্ন হইতে হইবে, বিশ্বাস করিতে হইবে যে, প্রত্যেক শিশুই অনন্ত ঈশ্বরীয় শক্তির আধারস্বরূপ, আর আমাদিগকে তাহার মধ্যে অবস্থিত সেই নিদ্রিত ব্রহ্মকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার সময় আর একটি বিষয় আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে—তাহারাও যাহাতে নিজেরা চিন্তা করিতে শিখে, সেই বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে হইবে। এই মৌলিক চিন্তার অভাবই ভারতের বর্তমান হীনাবস্থার কারণ। যদি এই ভাবে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তাহারা মানুষ হইবে এবং জীবন-সংগ্রামে নিজেদের সমস্যা সমাধান করিতে সমর্থ হইবে।

খেতড়িতে বক্তৃতা—বেদান্ত

২০শে ডিসেম্বর, ১৮৯৭ খৃঃ খেতড়িতে ডাকবাংলোয় স্বামীজী বেদান্ত সম্বন্ধে এই বক্তৃতা দেন। সভাপতি হন খেতড়ির রাজা।

গ্রীক ও আর্য—প্রাচীন দুই জাতি বিভিন্ন অবস্থাচক্রে স্থাপিত হইয়াছিল; প্রথমোক্ত জাতি প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু লোভনীয় তাহার পরিবেশে ও বীর্যপ্রদ আবহাওয়ায় এবং শেষোক্ত জাতি চতুষ্পার্শ্বে সর্ববিধ মহিমময় ভাবের পরিবেষ্টনে ও অধিক শারীরিক পরিশ্রমের অনমুকূল আবহাওয়ায় দুই প্রকার বিভিন্ন ও বিশিষ্ট সভ্যতার সূচনা করিয়াছিলেন; অর্থাৎ গ্রীকগণ বহিঃপ্রকৃতির ও আর্যগণ অন্তঃপ্রকৃতির আলোচনা করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গ্রীকমন বাহিরের অসীম লইয়া আলোচনায় ব্যস্ত হইলেন, আর্যমন ভিতরের অনন্ত অনুসন্ধান করিতে নিযুক্ত হইলেন। জগতের সভ্যতায় উভয়কেই নির্দিষ্ট বিশেষ ভূমিকা অভিনয় করিতে হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একজনকে যে অপরের নিকট ধার করিতে হইবে তাহা নহে, কেবল পরস্পরের সহিত পরিচিত হইতে হইবে—পরস্পরের তুলনা করিতে হইবে। তাহা হইলে উভয়েই লাভবান্ হইবে। আর্যগণের প্রকৃতি বিশ্লেষণপ্রিয়। গণিত ও ব্যাকরণ-বিদ্যায় তাঁহারা অদ্ভুত কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং মনোবিশ্লেষণ-বিদ্যার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। আমরা পিথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো এবং ইজিপ্টের নিওপ্লেটোনিকদের ভিতর ভারতীয় চিন্তার কিছু কিছু প্রভাব দেখিতে পাই।

বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় চিন্তা স্পেন, জার্মানি ও অন্যান্য ইওরোপীয় দেশের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতীয় রাজপুত্র দারাশেকো পারসীতে উপনিষদ্ অনুবাদ করাইয়াছিলেন। শোপেনহাউয়ার নামক জার্মান দার্শনিক উপনিষদের একখানি লাটিন অনুবাদ দেখিয়া উহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। তাঁহার দর্শনে উপনিষদের যথেষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পরই কান্টের দর্শনে উপনিষদের শিক্ষার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইওরোপে সাধারণতঃ তুলনামূলক ভাষাবিদ্যাচর্চার[১] জন্যই পণ্ডিতগণ সংস্কৃত

১ Comparative Philology

আলোচনা করিয়া থাকেন। তবে অধ্যাপক ডয়সনের মতো ব্যক্তিও আছেন, দর্শনচর্চার জন্যই যাঁহাদের দর্শনচর্চায় আগ্রহ আছে, অন্য কারণে নহে। আশা করি, ভবিষ্যতে ইওরোপে সংস্কৃতচর্চায় আরও অধিক যত্ন দেখা যাইবে।

পূর্বকালে 'হিন্দু' শব্দে সিন্ধুনদের অপর তীরের অধিবাসিগণকে বুঝাইত—তখন ঐ শব্দের একটা সার্থকতা ছিল। কিন্তু এখন উহা নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ঐ শব্দের দ্বারা এখন বর্তমান হিন্দু জাতি বা ধর্ম কিছুই বুঝাইতে পারে না, কারণ সিন্ধুনদের তীরে এখন নানাধর্মাবলম্বী নানাজাতীয় লোক বাস করে।

বেদ কোন ব্যক্তিবিশেষের বাক্য নহে। বেদনিবদ্ধ ভাবরাশি ধীরে ধীরে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহার পর সেই গ্রন্থ প্রামাণিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক ধর্মই এইরূপ গ্রন্থে নিবদ্ধ, গ্রন্থসমূহের প্রভাবও অসামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হিন্দুদের এই বেদরাশিরূপ গ্রন্থ রহিয়াছে, তাহাদিগকে এখনও সহস্র সহস্র বৎসর ঐ গ্রন্থের উপর নির্ভর করিতে হইবে। তবে বেদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিবর্তন করিতে হইবে, পর্বতদৃঢ় ভিত্তির উপর এই বেদবিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। বেদরাশি বিপুল সাহিত্য। এই বেদের শতকরা ৯৯ ভাগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিশেষ বিশেষ পরিবারে এক একটি বেদাংশের চর্চা হইত। সেই পরিবারের লোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই বেদাংশও লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও যাহা পাওয়া যায়, তাহাও এক প্রকাণ্ড গ্রন্থাগারে ধরে না। এই বেদরাশি অতি প্রাচীনতম, সরল—অতি সরল ভাষায় লিখিত। ইহার ব্যাকরণও এত অপরিণত যে, অনেকে মনে করেন বেদাংশবিশেষের কোন অর্থই নাই।

বেদের দুইভাগ—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ড বলিতে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ বুঝায়। ব্রাহ্মণে যাগযজ্ঞের কথা আছে। সংহিতা অনুষ্টুপ্ ত্রিষ্টুপ্ জগতী প্রভৃতি ছন্দে রচিত স্তোত্রাবলী—সাধারণতঃ উহাতে বরুণ বা ইন্দ্র বা অন্য কোন দেবতার স্তুতি আছে। তারপর প্রশ্ন উঠিল—এই দেবতারা কে? এই সম্বন্ধে যেমন এক এক মতবাদ উঠিতে লাগিল, অন্যান্য মতবাদ দ্বারা আবার এই-সকল মত খণ্ডিত হইতে লাগিল; এইরূপ অনেকদিন ধরিয়া চলিয়াছিল।

প্রাচীন বাবিলনে আত্মা ছিল এই ধারণা যে, মানুষ মরিলে তাহা হইতে আর একটি দেহ বাহির হয়, উহার স্বাতন্ত্র্য নাই, আর মূল দেহের সহিত উহা

সম্বন্ধ কখনই ছিন্ন করিতে পারে না। মূল শরীরের ন্যায় এই 'দ্বিতীয়' শরীরেরও ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি বৃত্তিতে তাঁহারা বিশ্বাসী ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাসও ছিল যে, মূল দেহটিতে কোনরূপ আঘাত করিলে 'দ্বিতীয়'টিও আহত হইবে। মূল দেহটি নষ্ট হইলে 'দ্বিতীয়'টিও নষ্ট হইবে। এই কারণে মৃতদেহ রক্ষা করিবার প্রথার সৃষ্টি হয়। তাহা হইতেই মমি, সমাধিমন্দির প্রভৃতির উৎপত্তি। ইজিপ্ট ও বাবিলন-বাসীরা এবং য়াহুদীগণ আর বেশী অগ্রসর হইতে পারেন নাই, তাঁহারা আত্মতত্ত্বে পৌছিতে পারেন নাই।

এদিকে ম্যাক্সমূলার বলেন, ঋগ্বেদে পিতৃ-উপাসনার সামান্য চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। মমিগণ একদৃষ্টে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে—সেখানে এই বীভৎস ও ভীষণ দৃশ্য দেখা যায় না। দেবগণ মানবের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন, উপাস্য ও উপাসকের সম্বন্ধ বেশ সহজ ও স্বাভাবিক। উহার মধ্যে কোনরূপ দুঃখের ভাব নাই। উহাতে সরল হাস্যের অভাব নাই। বেদের কথা বলিতে বলিতে আমি যেন দেবতাদের হাস্যধ্বনি স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি। বৈদিক ঋষিগণ হয়তো সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহারা ছিলেন হৃদয়বান্ ও সংস্কৃতিসম্পন্ন, আমরা তাঁহাদের তুলনায় পশু।

অনেক বৈদিক মন্ত্রে আছে—'যেখানে পিতৃগণ বাস করেন, তাঁহাকে সেই স্থানে লইয়া যাও—যেখানে কোন দুঃখ শোক নাই' ইত্যাদি। এইরূপে এদেশে এই ভাবের আবির্ভাব হইল যে, যত শীঘ্র শবদেহ দগ্ধ করিয়া ফেলা যায়, ততই ভাল। তাঁহাদের ক্রমশঃ এই ধারণা হইল যে, স্থূলদেহছাড়া একটি সূক্ষ্মতর দেহ আছে; স্থূলদেহ ত্যাগের পর সূক্ষ্মদেহ এমন এক স্থানে চলিয়া যায়, যেখানে কোন দুঃখ নাই—কেবল আনন্দ। সেমিটিক ধর্মে ভয় ও কষ্টের ভাব প্রচুর; ঐ ধর্মের ধারণা এই যে মানুষ ঈশ্বরদর্শন করিলেই মরিবে। কিন্তু প্রাচীন ঋগ্বেদের ভাব এই যে, মানুষ যদি ঈশ্বরকে চাক্ষুষ দেখিতে পায়, তবেই তাহার যথার্থ জীবন আরম্ভ হইবে।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল—এই দেবগণ কে? ইন্দ্র সময়ে সময়ে মানুষকে সাহায্য করিয়া থাকেন। কখন কখন ইন্দ্র অতিরিক্ত সোমপানে মত্ত বলিয়াও বর্ণিত; স্থানে স্থানে তাঁহার প্রতি সর্বশক্তিমান্ সর্বব্যাপী প্রভৃতি বিশেষণও প্রয়োগ করা হইয়াছে। বরুণদেব সম্বন্ধেও এইরূপ নানাবিধ ধারণা

দেখিতে পাওয়া যায়, এবং দেবচরিত্র-বর্ণনাত্মক মন্ত্রগুলি স্থানে স্থানে অতি অপূর্ব। তারপর আর এক কথা। বেদের ভাষা অতি মহদ্ভাব-দ্যোতক। বিখ্যাত 'নাসদীয় সূক্তে' প্রলয়ের চমৎকার বর্ণনা আছে। যাঁহারা এই-সকল মহান্ ভাব এইরূপ কবিত্বের ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা যদি অসভ্য হন, তবে আমরা কি? সেই ঋষিদের অথবা তাঁহাদের দেবতা ইন্দ্রবরুণাদির সম্বন্ধে আমি কোনরূপ সমালোচনা করিতে অক্ষম। এ যেন ক্রমাগত পট-পরিবর্তন হইতেছে, এবং পশ্চাতে সেই এক বস্তু রহিয়াছেন, যাঁহাকে জ্ঞানিগণ বহুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন —'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। এই দেবগণের বর্ণনা অতি রহস্যময়, অপূর্ব, অতি সুন্দর। উহার দিকে যেন ঘেঁষিবার জো নাই, উহা এত সূক্ষ্ম যে স্পর্শমাত্রেই যেন উহা ভগ্ন হইয়া যাইবে, মরীচিকার মতো অন্তর্হিত হইবে।

একটি বিষয় আমার নিকট খুব স্পষ্ট ও সম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, গ্রীকদের ন্যায় আর্যগণও জগৎসমস্যা সমাধান করিবার জন্য প্রথমে বহিঃপ্রকৃতির দিকে ধাবমান হইয়াছিলেন—সুন্দর রমণীয় বাহ্য জগৎ তাঁহাদিগকেও প্রলোভিত করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভারতের এইটুকু বিশেষত্ব যে, এখানে কোন বস্তু মহাভাবদ্যোতক না হইলে তাহার কোন মূল্যই নাই। মৃত্যুর পর কি হইবে, তাহার যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণ করিবার ইচ্ছা সাধারণতঃ গ্রীকদের মনে উদিত হয় নাই। এখানে কিন্তু এই প্রশ্ন প্রথম হইতেই বার বার জিজ্ঞাসিত হইয়াছে—আমি কি? মৃত্যুর পর আমার কি অবস্থা হইবে? গ্রীকদের মতে মানুষ মরিয়া স্বর্গে যায়। স্বর্গে যাওয়ার অর্থ কি?—সব কিছুর বাহিরে যাওয়া, ভিতরে নয়—কেবল বাহিরে; তাহার লক্ষ্য কেবল বাহিরের দিকে, শুধু তাই নয়, সে নিজেও যে নিজের বাহিরে। আর যখন সে এমন এক স্থানে গমন করিতে পারিবে, যাহা অনেকটা এই জগতেরই মতো, অথচ যেখানে এখানকার দুঃখগুলি নাই, তখনই সে ভাবিল, যাহা কিছু তাহার প্রার্থনীয়, সে সব পাইল, পার্থিবদুঃখবর্জিত সুখ লাভ করিল, অমনি সে তৃপ্ত হইল—তাহার ধর্ম আর ইহার উপর উঠিতে পারিল না। হিন্দুদের মন কিন্তু ইহাতে তৃপ্ত হয় নাই। হিন্দুমনের বিচারে স্বর্গও স্থূল জগতের অন্তর্গত।

হিন্দুরা বলেন, যাহা কিছু সংযোগোৎপন্ন, তাহারই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাঁহারা বহিঃপ্রকৃতিকে প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি জানো আত্মা কি?' উত্তর আসিল —'না।' 'ঈশ্বর আছেন কি?' প্রকৃতি উত্তর দিল—'জানি না।' তাঁহারা তখন

প্রকৃতির নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলেন, বুঝিলেন বহিঃপ্রকৃতি যতই মহান্ হউক, উহা দেশকালে সীমাবদ্ধ। তখন আর একটি বাণী উত্থিত হইল, অন্যবিধ মহান্ ভাবের ধারণা উদিত হইতে লাগিল। সেই বাণী—'নেতি, নেতি'—ইহা নহে; ইহা নহে; তখন বিভিন্ন দেবগণ এক হইয়া গেলেন, চন্দ্র সূর্য তারা, শুধু তাহাই কেন, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক হইয়া গেল—তখন ধর্মের এই নূতন আদর্শের উপর উহার আধ্যাত্মিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। 'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্' ইত্যাদি—সেখানে সূর্যও প্রকাশ পায় না, চন্দ্রতারকাও নহে—এই বিদ্যুৎও সেখানে প্রকাশ পায় না, এই সামান্য অগ্নির আর কথা কি? তিনি প্রকাশ পাইলেই সমুদয় প্রকাশিত হয়, তাঁহার প্রকাশেই এই সমুদয় প্রকাশ পাইয়া থাকে। আর সেই সীমাবদ্ধ, অপরিণত, ব্যক্তিবিশেষ, সকলের পাপপুণ্যের বিচারকারী, ক্ষুদ্র ঈশ্বরের ধারণা রহিল না, আর বাহিরে অন্বেষণ রহিল না, নিজের ভিতরে অন্বেষণ আরম্ভ হইল।—'ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি।' এইরূপে উপনিষদ্‌সমূহ ভারতের বাইবেল হইয়া দাঁড়াইল। এই উপনিষদ্‌ও অসংখ্য, আর ভারতে যত বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত, সবই উপনিষদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—এই-সকল মতের প্রত্যেকটি যেন এক একটি সোপানস্বরূপ—একটি সোপান অতিক্রম করিয়া পরবর্তী সোপানে আরোহণ করিতে হয়, সর্বশেষে অদ্বৈতবাদে স্বাভাবিক পরিণতি, এবং ইহার শেষ কথা 'তত্ত্বমসি'। প্রাচীন ভাষ্যকারগণ শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্ব—সকলেই যদিও উপনিষদ্‌কেই একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতেন, তথাপি সকলেই এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, উপনিষদ্ শুধু একটি মত শিক্ষা দিতেছেন। শঙ্কর এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার মতে উপনিষদ্ কেবল অদ্বৈতপর, উহাতে অন্য কোন উপদেশ নাই; সুতরাং যেখানে স্পষ্ট দ্বৈতভাবাত্মক শ্লোক পাইয়াছেন, সেখানে নিজ মতের পোষকতার জন্য তাহা হইতে টানিয়া বুনিয়া অর্থ করিয়াছেন। রামানুজ এবং মধ্বও খাঁটি অদ্বৈতভাব-প্রতিপাদক অংশ দ্বৈতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, উপনিষদ্ এক তত্ত্ব শিক্ষা দিতেছেন, কিন্তু ঐ তত্ত্ব সোপানারোহণ-ন্যায়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

বর্তমান ভারতে ধর্মের মূলতত্ত্ব অন্তর্হিত হইয়াছে, কেবল কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠান পড়িয়া আছে। এখানকার লোক এখন হিন্দুও নহে, বৈদান্তিকও নহে; তাহারা ছুঁৎমার্গী। রান্নাঘর এখন তাহাদের মন্দির, এবং হাঁড়ি দেবতা

হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ-ভাব দূর হওয়া চাই-ই চাই, আর যত শীঘ্র উহা চলিয়া যায়, ততই মঙ্গল। উপনিষদ্‌সমূহ নিজ মহিমায় উদ্ভাসিত হউক, আর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ যেন না থাকে।

তারপর স্বামীজী উপনিষদে বর্ণিত দুইটি পক্ষীর উদাহরণ দিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ মোহিত হইলেন।

স্বামীজীর শরীর তত সুস্থ না থাকায় এই পর্যন্ত বলিয়াই তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়াতে অর্ধঘণ্টা বিশ্রাম করিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অর্ধঘণ্টা পরে স্বামীজী বলিলেন:

জ্ঞান-অর্থে বহুত্বের মধ্যে একত্বের আবিষ্কার। যখনই কোন বিজ্ঞান সমুদয় বিভিন্নতার অন্তরালে অবস্থিত একত্ব আবিষ্কার করে, তখনই তাহা উচ্চতম সীমায় আরোহণ করে। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ন্যায় জড়বিজ্ঞানেও ইহা সত্য।

খেতড়ি হইতে প্রায় সকল শিষ্য ও সঙ্গীকে বিদায় দিয়া একজনমাত্র শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজী পুনরায় জয়পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজাজীও সঙ্গে গেলেন। রাজাজীর সভাপতিত্বে স্থানীয় এক দেবালয়ে স্বামীজীর এক বক্তৃতা হইল। প্রায় ৫০০ শ্রোতা বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। জয়পুর হইতে বহির্গত হইয়া স্বামীজী যোধপুর, আজমীর, খাণ্ডোয়া প্রভৃতি স্থান হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব

১৮৯৮ খৃঃ ১১ই মার্চ স্বামীজীর শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা (মিস এম. ই নোব্‌ল) কলিকাতার ষ্টার থিয়েটারে 'ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব' সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। স্বামীজী সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমেই উঠিয়া 'সিষ্টার'কে সর্বসাধারণের নিকট পরিচয় করিয়া দিবার জন্য নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেন:

সম্ভ্রান্ত মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আমি যখন এশিয়ার পূর্বভাগে ভ্রমণ করিতেছিলাম, একটি বিষয়ে আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। আমি দেখিলাম, ঐ-সকল স্থানে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তা বিশেষভাবে প্রবেশ করিয়াছে। চীন ও জাপানী মন্দির-সমূহের প্রাচীরে কতকগুলি সুপরিচিত সংস্কৃত মন্ত্র লিখিত দেখিয়া আমি যে

কিরূপ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলাম, তাহা আপনারা অনায়াসে অনুমান করিতে পারেন। সম্ভবতঃ আপনারা অনেকেই জানিয়া সুখী হইবেন যে, ঐগুলি সবই প্রাচীন বাঙলা অক্ষরে লিখিত। আমাদের বঙ্গীয় পূর্বপুরুষগণের ধর্মপ্রচার-কার্যে মহোৎসাহের কীর্তিস্তম্ভস্বরূপ ঐগুলি আজ পর্যন্ত বিদ্যমান।

এশিয়ার অন্তর্গত এই-সকল দেশ ছাড়িয়া দিলেও ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব এত সুদূরপ্রসারী ও স্পষ্ট যে, এমন কি পাশ্চাত্যদেশেও ঐ-সকল স্থানের আচার-ব্যবহারাদির গভীর মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া আমি সেখানেও উহার প্রভাবের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক ভাবসকল ভারতের পূর্বে ও পশ্চিমে—উভয়ত্রই গমন করিয়াছিল। ইহা এখন ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সমগ্র জগৎ ভারতের অধ্যাত্মতত্ত্বের নিকট কতদূর ঋণী এবং ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি মানবজাতির অতীত ও বর্তমান জীবনগঠনে কিরূপ শক্তিশালী উপাদান, তাহা এখন সকলেই অবগত আছেন। এ-সব তো অতীতের ঘটনা।

আমি আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাই। তাহা এই যে, সেই আশ্চর্য এংলো-স্যাক্সন জাতি সামাজিক উন্নতি এবং সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশরূপ অত্যদ্ভুত শক্তির বিকাশ করিয়াছে। শুধু তাহাই কেন, আমি আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে পারি, এংলো-স্যাক্সনের শক্তির প্রভাব ব্যতীত আজ আমরা যেমন ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব আলোচনা করিবার জন্য এই সভায় সমবেত হইয়াছি, তাহা হইতে পারিতাম না। আর পাশ্চাত্যদেশ হইতে প্রাচ্যে—আমাদের স্বদেশে ফিরিয়া দেখিতে পাই, সেই এংলো-স্যাক্সন শক্তি সমুদয় দোষসত্ত্বেও তাহার বিশিষ্ট সুনির্দিষ্ট গুণগুলি লইয়া এখানে কাজ করিতেছে। আমার বিশ্বাস, এতদিনে অবশেষে এই উভয় জাতির সম্মিলনের সুমহৎ ফল সিদ্ধ হইয়াছে। ব্রিটিশ জাতির বিস্তার ও উন্নতির ভাব আমাদিগকে বলপূর্বক উন্নতির পথে ধাবিত করিতেছে এবং ইহাও আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রীকদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত; এবং গ্রীক-সভ্যতার প্রধান ভাব—প্রকাশ বা বিস্তার। ভারতে আমরা মননশীল বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সময়ে সময়ে আমরা এত অধিক মননশীল হই যে, ভাব-প্রকাশের শক্তি কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। ক্রমে এইরূপ দাঁড়াইল যে, পৃথিবীর নিকট আমাদের ভাব ব্যক্ত করিবার শক্তি আর

প্রকাশিত হইল না, এবং তাহার ফল কি হইল? ফল হইল এই যে, আমাদের যাহা কিছু ছিল, সবই গোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ব্যক্তিবিশেষের ভাবগোপনেচ্ছায় উহা আরম্ভ হইল এবং শেষে ভাব গোপন করাটা জাতীয় অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইল। এখন আমাদের ভাবপ্রকাশের শক্তির এত অভাব হইয়াছে যে, আমরা মৃত জাতি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকি। ভাবপ্রকাশ ব্যতীত আমাদের বাঁচিবার সম্ভাবনা কোথায়? পাশ্চাত্য সভ্যতার মেরুদণ্ড—বিস্তার ও অভিব্যক্তি। ভারতে এংলো-স্যাক্সন জাতির কাজগুলির মধ্যে এই যে-কাজের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম, তাহা আমাদের জাতিকে জাগাইয়া আবার নিজের ভাবপ্রকাশে প্রবর্তিত করিবে, এবং এখনই উহা সেই শক্তিশালী এংলো-স্যাক্সন জাতি কর্তৃক আয়োজিত ভাব-বিনিময়ের উপযোগী উপায়গুলির সাহায্যে পৃথিবীর নিকট নিজ গুপ্ত রত্নসমূহ বাহির করিয়া দিতে ভারতকে উৎসাহিত করিতেছে। এংলো-স্যাক্সন জাতি ভারতের ভাবী উন্নতির পথ খুলিয়া দিয়াছে। আমাদের পূর্বপুরুষগণের ভাবসমূহ এখন যেরূপ ধীরে ধীরে বহু স্থানে তাহার প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। যখন আমাদের পূর্বপুরুষগণ প্রথমে সত্য ও মুক্তির মঙ্গলময়ী বার্তা ঘোষণা করেন, তখন তাঁহাদের কত সুযোগ-সুবিধা ছিল। মহান্ বুদ্ধ কিভাবে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব-রূপ অতি উচ্চ মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন? তখনও এই ভারতে—যে-ভারতকে আমরা প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া থাকি—প্রকৃত আনন্দ লাভ করিবার যথেষ্ট সুবিধা ছিল এবং আমরা সহজেই পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আমাদের ভাব প্রচার করিতে পারিতাম। এখন আমরা তাহা অপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইয়া এংলো-স্যাক্সন জাতির মধ্যেও আমাদের ভাব-প্রচারে কৃতকার্য হইয়াছি।

এই প্রকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এখন চলিতেছে এবং আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের দেশ হইতে প্রেরিত বার্তা তাহারা শুনিতেছে, আর শুধু যে শুনিতেছে তাহা নহে, উহার উত্তরও দিতেছে। ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড তাহার কয়েকজন মহামনীষীকে আমাদের কাজে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করিয়াছে। সকলেই আমার বন্ধু মিস মূলারের কথা শুনিয়াছেন এবং বোধ হয় অনেকে তাঁহার সহিত পরিচিতও আছেন—তিনি এখন এখানে এই বক্তৃতা-মঞ্চে উপস্থিত আছেন। এই সম্ভ্রান্তবংশীয়া সুশিক্ষিতা মহিলা ভারতের প্রতি অগাধপ্রীতিবশতঃ তাঁহার

জীবন ভারতের কল্যাণে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং ভারতকে তাঁহার গৃহ ও ভারতবাসীকে পরিবাররূপে পরিগণিত করিয়াছেন। আপনাদের মধ্যে প্রত্যেকেই সেই সুপ্রসিদ্ধ উদারস্বভাবা ইংরেজ মহিলার নামের সহিত পরিচিত আছেন—তিনিও ভারতের কল্যাণ ও পুনরুজ্জীবনের জন্য তাঁহার সমগ্র জীবন নিয়োজিত করিয়াছেন। আমি মিসেস বেস্যাণ্টকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিতেছি। ভদ্রমহোদয়গণ, আজ এই মঞ্চে দুইজন মার্কিন মহিলা রহিয়াছেন—তাঁহারাও তাঁহাদের হৃদয়ে সেই একই উদ্দেশ্য পোষণ করিতেছেন; আর আমি আপনাদিগকে নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি যে, তাঁহারাও আমাদের দরিদ্র দেশের সামান্য কল্যাণের জন্য তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। আমি এই সুযোগে আপনাদের নিকট আমাদের জনৈক শ্রেষ্ঠ স্বদেশবাসীর নাম স্মরণ করাইয়া দিতে চাই—তিনি ইংলণ্ড ও আমেরিকা দেখিয়াছেন, তাঁহার প্রতি আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে, তাঁহাকে আমি বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকি, তিনি আধ্যাত্মিক রাজ্যে অনেকটা অগ্রসর ও মহামনীষী, দৃঢ়ভাবে অথচ নীরবে আমাদের দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করিতেছেন; অন্যত্র বিশেষ কাজ না থাকিলে তিনি আজ এই সভায় নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকিতেন—আমি শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিতেছি। আর এখন ইংলণ্ড আর একটি উপহার-রূপে মিস মার্গারেট নোব্‌ল্‌কে প্রেরণ করিয়াছেন—ইঁহার নিকট হইতে আমরা অনেক কিছু আশা করি। আর বেশী কিছু না বলিয়া আমি মিস নোব্‌ল্‌কে আপনাদের সহিত পরিচিত করিয়া দিলাম—আপনারা এখনই তাঁহার বক্তৃতা শুনিবেন।

সিস্টার নিবেদিতার মনোজ্ঞ বক্তৃতার পর স্বামীজী উঠিয়া আবার বলিতে লাগিলেন :

আমি আর দুই-চারিটি কথা মাত্র বলিতে চাই। আমরা এই মাত্র এই ভাব পাইলাম যে, ভারতবাসী আমরাও কিছু করিতে পারি। আর ভারত-বাসীদের মধ্যে বাঙালী আমরা এই কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারি, কিন্তু আমি তাহা করি না। তোমাদের মধ্যে একটা অদম্য উৎসাহ, অদম্য চেষ্টা জাগ্রত করিয়া দেওয়াই আমার জীবনব্রত। তুমি অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা দ্বৈতবাদী হও, তাহাতে বড় কিছু আসে যায় না। কিন্তু একটি বিষয়, যাহা আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে সর্বদা ভুলিয়া যাই, সে দিকে আমি তোমাদের

মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই—হে মানব, নিজের উপর বিশ্বাসী হও। এই উপায়েই কেবল আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইতে পারি। তুমি অদ্বৈতবাদী হও বা দ্বৈতবাদী হও, তুমি যোগশাস্ত্রে বিশ্বাসী হও বা শঙ্করাচার্যে বিশ্বাসী হও, তুমি ব্যাস বা বিশ্বামিত্র যাঁহারই অনুবর্তী হও না কেন, তাহাতে বড়-কিছু আসে যায় না, কিন্তু বিশেষ প্রণিধানের বিষয় এই যে, পূর্বোক্ত 'আত্মবিশ্বাস' ব্যাপারে ভারতীয় ভাব সমগ্র পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ভাব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এক মুহূর্তের জন্য ভাবিয়া দেখ—অন্যান্য ধর্মে ও অন্যান্য দেশে আত্মার শক্তি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হইয়া থাকে—আত্মাকে তাহারা একরূপ শক্তিহীন দুর্বল নিশ্চেষ্ট জড়বৎ বিবেচনা করিয়া থাকে ; আমরা কিন্তু ভারতে আত্মাকে অনন্ত বলিয়া মনে করি, আর আমাদের ধারণা—উহা চিরকাল পূর্ণ থাকিবে। আমাদিগকে সর্বদা উপনিষদের শিক্ষা মনে রাখিতে হইবে।

তোমাদের জীবনের মহান্ ব্রত স্মরণ কর। ভারতবাসী আমরা, বিশেষতঃ বাঙালীরা বহু পরিমাণে বৈদেশিক ভাব দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি—উহা আমাদের জাতীয় ধর্মের অস্থিমজ্জা পর্যন্ত চর্বণ করিয়া ফেলিতেছে। আমরা আজকাল এত পিছনে পড়িয়া গিয়াছি কেন? আমাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন কেন সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য ভাব ও উপাদানে গঠিত হইয়া পড়িয়াছে? যদি আমরা জাতীয় গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে চাই, তবে পাশ্চাত্য অনুকরণ দূরে ফেলিয়া দিতে হইবে ; যদি আমরা উঠিতে চাই, তবে ইহাও আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পাশ্চাত্য দেশ হইতে আমাদের অনেক শিখিবার আছে। পাশ্চাত্যদেশ হইতে আমাদিগকে তাহাদের শিল্পবিজ্ঞান—বহিঃপ্রকৃতি-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানসমূহ শিখিতে হইবে, আবার পাশ্চাত্যদিগকে আমাদের নিকট আসিয়া ধর্ম ও অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষা ও আয়ত্ত করিতে হইবে। আমাদিগকে—হিন্দুগণকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আমরাই জগতের আচার্য। আমরা এখানে রাজনীতিক অধিকার ও এইরূপ অন্যান্য অনেক বিষয়ের জন্য চীৎকার করিয়া আসিতেছি। বেশ কথা ; কিন্তু অধিকার, সুবিধা, এ-সকল কেবল বন্ধুত্বের ফলেই লাভ করা যায়, আর বন্ধুত্বও কেবল দুইজন সমান সমান ব্যক্তির ভিতর আশা করা যাইতে পারে। এক পক্ষ যদি চিরকালই ভিক্ষা করিতে থাকে, তবে আর তাহাদের মধ্যে পরস্পর কি বন্ধুত্ব হইতে পারে? ও-সব কথা মুখে বলা সহজ, কিন্তু আমি বলিতেছি যে, পরস্পর সাহায্য

ব্যতীত আমরা কখন শক্তিশালী হইতে পারিব না। এই জন্য আমি তোমাদিগকে ভিক্ষুকভাবে নয়, ধর্মাচার্যরূপে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছি। কার্যক্ষেত্রে আদান-প্রদানের নিয়ম যথাসাধ্য প্রয়োগ করিতে হইবে। যদি আমাদিগকে পাশ্চাত্যের নিকট ইহজীবনে সুখী হইবার উপায় ও প্রণালী শিখিতে হয়, তবে কেন তাহার বিনিময়ে আমরা তাহাদিগকে অনন্তকাল সুখী হইবার উপায় ও প্রণালী না শিখাইব?

সর্বোপরি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য কাজ করিতে থাকো। তোমরা যে নিজদিগকে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া খাঁটি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করিয়া থাকো, উহা ছাড়িয়া দাও। মৃত্যু সকলের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, আর এই অতি বিস্ময়কর ঐতিহাসিক সত্যটি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিও যে, পৃথিবীর সকল জাতিকে ভারতীয় সাহিত্যে নিবদ্ধ সনাতন সত্যসমূহ শিক্ষা করিবার জন্য ভারতের পদতলে ধৈর্যের সহিত বসিতে হইয়াছে। ভারতের বিনাশ নাই, চীনের নাই, জাপানেরও নাই; অতএব আমাদিগকে আমাদের ধর্মরূপ মেরুদণ্ডের বিষয় সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, এবং তাহা করিতে হইলে আমাদের এমন একজন পথপ্রদর্শক চাই, যিনি আমাদিগকে সেই পথ দেখাইয়া দিবেন—যে-পথের বিষয় এইমাত্র তোমাদিগকে বলিতেছিলাম। যদি তোমাদের মধ্যে এমন কেহ থাকে, যে ইহা বিশ্বাস করে না, যদি আমাদের মধ্যে এমন কোন হিন্দুবালক থাকে, যে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নয় যে, তাহার ধর্ম পুরাপুরি আধ্যাত্মিক, আমি তাহাকে 'হিন্দু' বলিব না। আমার মনে পড়িতেছে, কাশ্মীরের কোন পল্লীগ্রামে জনৈক বৃদ্ধা মুসলমান মহিলার সহিত কথাপ্রসঙ্গে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনি কোন্ ধর্মাবলম্বী? তিনি তাঁহার নিজ ভাষায় সতেজে উত্তর দিলেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ; তাঁহার দয়ায় আমি মুসলমানী।' তারপর একজন হিন্দুকেও সেই প্রশ্ন করাতে সে সাদাসিধা ভাষায় বলিয়াছিল—'আমি হিন্দু।'

কঠোপনিষদের সেই মহাবাক্যটি মনে পড়িতেছে—'শ্রদ্ধা' বা অপূর্ব বিশ্বাস। নচিকেতার জীবনে শ্রদ্ধার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই 'শ্রদ্ধা' বা যথার্থ বিশ্বাস প্রচার করাই আমার জীবনব্রত। আমি তোমাদিগকে আবার বলিতেছি যে, এই বিশ্বাস সমগ্র মানবজাতির জীবনের এবং সকল *ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ।* প্রথমতঃ নিজের প্রতি বিশ্বাস-সম্পন্ন হও। জানিও,

একজন ক্ষুদ্র বুদ্বুদমাত্র বিবেচিত হইতে পারে এবং অপরে পর্বততুল্য বৃহৎ তরঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু উভয়েরই পশ্চাতে অনন্ত সমুদ্র রহিয়াছে। অতএব সকলেরই আশা আছে, সকলেরই জন্য মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত, সকলেই শীঘ্র বা বিলম্বে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। ইহাই আমাদের প্রথম কর্তব্য। অনন্ত আশা হইতে অনন্ত আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার উৎপত্তি হয়। যদি সেই বিশ্বাস আমাদের ভিতরে আবির্ভূত হয়, তবে উহা আমাদের জাতীয় জীবনে ব্যাস ও অর্জুনের যুগ লইয়া আসিবে, যে যুগে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকর উচ্চ মতবাদসমূহ প্রচারিত হইয়াছিল। আজকাল আমরা অন্তর্দৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক চিন্তায় অনেক পিছনে পড়িয়াছি, কিন্তু এখনও ভারতে যথেষ্ট আধ্যাত্মিকতা আছে, এত অধিক আছে যে, আধ্যাত্মিক মহত্ত্বই ভারতকে জগতের বর্তমান জাতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি করিয়াছে। যদি জাতীয় ঐতিহ্য ও আশার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তবে সেই গৌরবময় দিনগুলি আমাদের আবার ফিরিয়া আসিবে, আর উহা তোমাদের উপরেই নির্ভর করিতেছে। বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমরা ধনী ও বড় লোকের মুখ চাহিয়া থাকিও না; দরিদ্রেরাই পৃথিবীতে চিরকাল মহৎ ও বিরাট কার্যসমূহ সাধন করিয়াছে।

হে দরিদ্র বঙ্গবাসিগণ, ওঠ, তোমরা সব করিতে পারো, আর তোমাদিগকে সব করিতেই হইবে। যদিও তোমরা দরিদ্র, তথাপি অনেকে তোমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে। দৃঢ়চিত্ত হও; সর্বোপরি পবিত্র ও সম্পূর্ণ অকপট হও; বিশ্বাস কর যে, তোমাদের ভবিষ্যৎ অতি গৌরবময়। বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমাদের দ্বারাই ভারতের উদ্ধার সাধিত হইবে। তোমরা বিশ্বাস কর বা না কর, উহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও। মনে করিও না—আজ বা কালই উহা হইয়া যাইবে। আমি যেমন আমার দেহ ও আমার আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, সেইরূপ দৃঢ়ভাবে ইহাও বিশ্বাস করিয়া থাকি। সেই জন্য হে বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমাদের প্রতি আমার হৃদয় আকৃষ্ট। তোমাদের টাকা কড়ি নাই; তোমাদেরই উপর ইহা নির্ভর করিতেছে; যেহেতু তোমরা দরিদ্র, সেইজন্যই তোমরা কাজ করিবে। যেহেতু তোমাদের কিছুই নাই, সেহেতু তোমরা অকপট হইবে। অকপট বলিয়াই তোমরা সর্বত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইবে।' এ-কথাই আমি তোমাদিগকে এইমাত্র বলিতেছিলাম। আবার 'তোমাদিগের নিকট' উল্লেখ করিতেছি—ইহাই তোমাদের জীবনব্রত, ইহাই আমার জীবনব্রত।

তোমরা যে-দার্শনিকমতই অবলম্বন কর না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমি শুধু এখানে প্রমাণ করিতে চাই যে, সমগ্র ভারতে 'মানবজাতির পূর্ণতায় অনন্ত বিশ্বাস-রূপ প্রেমসূত্র' ওতপ্রোতভাবে বর্তমান, আর আমি স্বয়ং ইহা বিশ্বাস করিয়া থাকি ; ঐ বিশ্বাস সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হউক।

সন্ন্যাসীর আদর্শ ও তৎপ্রাপ্তির সাধন

১৮৯৯ খৃঃ ২০শে জুন তারিখে স্বামীজী দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাত্রা করেন। পূর্বদিন ১৯শে জুন সন্ধ্যায় বেলুড় মঠে তরুণ সন্ন্যাসী ও শিষ্যগণের একটি সভায় স্বামীজী ইংরেজীতে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দেন। মঠের ডায়েরীতে বক্তৃতার সারাংশ রক্ষিত হয়। নিম্নে তাঁহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল।

ভ্রাতৃগণ ও সন্তানগণ,

এখন দীর্ঘ বক্তৃতা দিবার অথবা বক্তৃতাশক্তি প্রকাশ করিবার সময় নয়। আমি তোমাদিগকে কয়েকটি বিষয় বলিতে ইচ্ছা করি। আশা—তোমরা এইগুলি কাজে পরিণত করিবে। প্রথমতঃ আমাদের আদর্শ কি, তাহা বুঝিতে হইবে ; দ্বিতীয়তঃ উহা কাজে পরিণত করিবার উপায়গুলি কি, তাহাও বুঝিতে হইবে। তোমাদের মধ্যে যাহারা সন্ন্যাসী, তাহাদিগকে পরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিতেই হইবে, কারণ সন্ন্যাসী বলিতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। ত্যাগ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিবার সময় এখন নাই, আমি সংক্ষেপে উহার লক্ষণ নির্দেশ করিতে চাই : মৃত্যুকে ভালবাসা। সাংসারিক ব্যক্তি জীবন ভালবাসে, সন্ন্যাসীকে মৃত্যু ভালবাসিতে হইবে। তবে কি আমাদিগকে আত্মহত্যা করিতে হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। কারণ আত্মহত্যাকারিগণ প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুকে ভালবাসে না। দেখাও যায়—আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিয়া যদি কেহ তাহাতে অকৃতকার্য হয়, সে পুনরায় ঐ চেষ্টা প্রায় করে না। তবে মৃত্যুকে ভালবাসার অর্থ কি? তাৎপর্য এই : আমাদিগকে মরিতেই হইবে, ইহা অপেক্ষা ধ্রুব সত্য কিছুই নাই ; তবে আমরা কোন মহৎ সৎ উদ্দেশ্যের জন্য দেহপাত করি না কেন? আমাদের সকল কাজ—আহার, বিহার, অধ্যয়ন প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা করি—সব যেন আমাদিগকে

আত্মত্যাগের অভিমুখী করিয়া দেয়। তোমরা আহারের দ্বারা শরীর পুষ্ট করিতেছ, কিন্তু শরীর পুষ্ট করিয়া কি হইবে, যদি উহাকে আমরা অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পারি? তোমরা অধ্যয়নাদি দ্বারা মনের পুষ্টি বিধান করিতেছ—ইহাতেই বা কি হইবে, যদি অপরের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে না পারো? কারণ সমগ্র জগৎ এক অখণ্ড-সত্তাস্বরূপ—তুমি তো ইহার নগণ্য ক্ষুদ্র অংশমাত্র; সুতরাং এই ক্ষুদ্র আমিত্বটাকে না বাড়াইয়া তোমার কোটি কোটি ভাইয়েব সেবা করাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক কাজ,—না করাই অস্বাভাবিক। উপনিষদের সেই মহতী বাণী কি মনে নাই?—

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥[১]

তোমাদিগকে ধীরে ধীরে মরিতে হইবে। মৃত্যুতেই স্বর্গ—মৃত্যুতেই সকল কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত, আর ইহার বিপরীত বস্তুতে সমুদয় অকল্যাণ ও 'আসুরিক ভাব নিহিত।

তারপর এই আদর্শটিকে কার্যে পরিণত করিবার উপায়গুলি কি, তাহা বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ এইটি বুঝিতে হইবে, অসম্ভব আদর্শ ধরিয়া থাকিলে চলিবে না। অতিমাত্রায় উচ্চ আদর্শ জাতিকে দুর্বল ও হীন করিয়া ফেলে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম-সংস্কারের পর এইটি ঘটিয়াছে। অপর দিকে আবার অতিমাত্রায় 'কাজের লোক' হওয়াও ভুল। যদি এতটুকুও কল্পনাশক্তি তোমার না থাকে, যদি তোমাকে নিয়মিত করিবার একটা আদর্শ না থাকে, তবে তুমি তো একটা পশুমাত্র। অতএব আমাদিগকে আদর্শও খাটো করিলে চলিবে না, আবার যেন আমরা কর্মকেও অবহেলা না করি। এই দুইটি 'অত্যন্ত'কে ছাড়িতে হইবে। আমাদের দেশের প্রাচীন ভাব এই—কোন গুহায় বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে মরিয়া যাওয়া। কিন্তু এখন এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে যে, আমি অপরের পূর্বে তাড়াতাড়ি মুক্তিলাভ করিব—এই ভাবটিও ভুল। মানুষ শীঘ্র বা বিলম্বে বুঝিতে পারে যে, যদি সে তাহার নিজ ভ্রাতার মুক্তির চেষ্টা না করে, তবে সে কখনই মুক্ত হইতে পারে না। তোমাদের জীবনে যাহাতে প্রবল আদর্শবাদের সহিত প্রবল কার্যকারিতা সংযুক্ত থাকে,

১ শ্বেতাশ্ব. উপ, ৩।১৬

তাহা করিতে হইবে। তোমাদিগকে গভীর ধ্যান-ধারণার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, আবার পরমুহূর্তেই এই মঠের জমিতে চাষ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তোমাদিগকে শাস্ত্রীয় কঠিন সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, আবার পরমুহূর্তেই এই জমিতে যে ফসল হইবে, তাহা বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তোমাদিগকে ছোটখাটো গৃহকর্ম, এমন কি পায়খানা পর্যন্ত সাফ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, শুধু এখানে নয়, অন্যত্রও।

তারপর তোমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, এই মঠের উদ্দেশ্য—মানুষ গঠন করা। অমুক ঋষি এই কথা বলিয়াছেন—শুধু এইটি শিখিলেই চলিবে না। সেই ঋষিগণ এখন আর নাই—তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের মতামতও চলিয়া গিয়াছে। তোমাদিগকে ঋষি হইতে হইবে। তোমরাও তো মানুষ; মহাপুরুষ, এমন কি অবতার পর্যন্ত যেমন মানুষ, তোমরাও তো সেই মানুষ। তোমাদিগকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে হইবে। কেবল শাস্ত্রপাঠে কি হয়? এমন কি ধ্যানধারণাতেই বা কতদূর হইবে? মন্ত্রতন্ত্রেই বা কি করিতে পারে? তোমাদিগকে এই নূতন প্রণালী—মানুষ গড়িবার নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। মানুষ তাহাকেই বলা যায়—যে এত বলবান্ যে, তাহাকে শক্তির অবতার বলা যাইতে পারে, আবার যাহার হৃদয়ে নারীসুলভ কোমলতা আছে, কিন্তু তাহা দুর্বলতা নয়। তোমাদের চারিদিকে যে কোটি কোটি প্রাণী রহিয়াছে, তাহাদের জন্য যেন তোমাদের হৃদয় কাঁদে, অথচ তোমাদিগকে দৃঢ়চিত্ত হইতে হইবে। আবার এইটি বুঝিতে হইবে—স্বাধীনচিন্তা যেমন আবশ্যক, তেমনি আজ্ঞাবহতাও অবশ্য চাই। আপাততঃ এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী মনে হইতে পারে, কিন্তু তোমাদিগকে এই দুইটি আপাতবিরুদ্ধ গুণের অধিকারী হইতে হইবে। যদি অধ্যক্ষগণ নদীতে ঝাঁপ দিয়া কুমির ধরিতে বলেন, তবে প্রথমে তোমাদিগকে তাঁহাদের কথামত কাজ করিতে হইবে, তারপর তাঁহাদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারো। যদি সেই আদেশ অন্যায়ও হয়, তথাপি প্রথমে তাঁহাদের কথানুসারে কাজ কর, তারপর প্রতিবাদ করিও। সম্প্রদায়সমূহের—বিশেষতঃ বাংলা দেশের সম্প্রদায়গুলির এই এক বিশেষ দোষ যে, যদি তাহাদের মধ্যে কাহারও একটু ভিন্ন মত হয়, অমনি সে একটি নূতন সম্প্রদায় করিয়া বসে, তাহার আর অপেক্ষা করিবার সহিষ্ণুতা থাকে না।

অতএব তোমাদিগকে নিজ সম্প্রদায়ের উপর গভীর শ্রদ্ধা রাখিতে হইবে। এখানে অবাধ্যগণের স্থান নাই। যদি কেহ অবাধ্য হয়, তাহাকে মমতাশূন্য হইয়া দূর করিয়া দাও—বিশ্বাসঘাতক কেহ যেন না থাকে। বায়ুর মতো মুক্ত ও অবাধগতি হও, অথচ লতা ও কুকুরের মতো নম্র এবং আজ্ঞাবহ হও।

আমি কি শিখিয়াছি?

স্বামীজী দ্বিতীয়বার প্রায় দেড় বৎসর পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচার করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় তীর্থদর্শনে বাহির হইয়া পূর্ববঙ্গে লাঙ্গলবন্ধ ও আসামে কামাখ্যা দর্শন করেন; পরে শিলং গৌহাটি হইয়া ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯০১ খৃঃ ১৯শে মার্চ ঢাকা জগন্নাথ কলেজ-গৃহে প্রায় দুই সহস্র শ্রোতার সম্মুখে ইংরেজীতে এই বক্তৃতা দেন:

আমি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছি—কিন্তু আমি কখনও নিজের জন্মভূমি বাঙলাদেশ বিশেষভাবে দর্শন করি নাই। জানিতাম না, এদেশের জলে স্থলে সর্বত্র এত সৌন্দর্য; কিন্তু নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া আমার এই লাভ হইয়াছে যে, আমি বাঙলার সৌন্দর্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। এইভাবেই আমি প্রথমে ধর্মের জন্য নানা সম্প্রদায়ে—বৈদেশিকভাববহুল নানা সম্প্রদায়ে ঘুরিতেছিলাম, অন্যের দ্বারে ভিক্ষা করিতেছিলাম, জানিতাম না যে, আমার দেশের ধর্মে, আমার জাতীয় ধর্মে এত সৌন্দর্য আছে।

আজকাল একদল লোক আছেন, তাঁহারা ধর্মের ভিতর বৈদেশিক ভাব চালাইবার বিশেষ পক্ষপাতী—তাঁহারা 'পৌত্তলিকতা' বলিয়া একটি শব্দ রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, হিন্দুধর্ম সত্য নয়, কারণ উহা পৌত্তলিক। পৌত্তলিকতা কি, উহা ভাল কি মন্দ—কেহ অনুসন্ধান করেন না, কেবল ঐ শব্দেরই প্রভাবে তাঁহারা হিন্দুধর্মকে ভুল বলিতে সাহস করেন। আর একদল আছেন, তাঁহারা হাঁচি-টিকটিকির পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির করেন। তাঁহারা কোন দিন ভগবানকেই তড়িতের পরিণামবিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন। যাহা হউক, জগন্মাতা ইঁহাদিগকেও আশীর্বাদ করুন। তিনিই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির দ্বারা নিজ কার্য সাধন করিয়া লইতেছেন। ইহা ছাড়া আর একটি

দল আছেন—প্রাচীন সম্প্রদায়—তাঁহারা বলেন, অত শত বুঝি না, বুঝিতেও চাহি না, আমরা চাই ঈশ্বরকে, চাই আত্মাকে; চাই জগৎকে ছাড়িয়া, সুখ-দুঃখকে ছাড়িয়া উহার পারে যাইতে। তাঁহারা বলেন, বিশ্বাসের সহিত গঙ্গাস্নান করিলে মুক্তি হয়—তাঁহারা বলেন, শিব রাম বিষ্ণু প্রভৃতি যাঁহার প্রতিই হউক না কেন, ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া উপাসনা করিলে মুক্তি হইয়া থাকে; আমি সেই বলিষ্ঠ প্রাচীনসম্প্রদায়ভুক্ত।

আজকালকার এক সম্প্রদায় বলেন, ঈশ্বর ও সংসার এক সঙ্গে অনুসরণ কর। ইঁহাদের মন-মুখ এক নহে। প্রকৃত মহাত্মাগণের উপদেশ এই:

জঁহা কাম তঁহা রাম নহিঁ, জঁহা রাম তঁহা নহিঁ কাম।
কবহুঁ ন মিলত বিলোকিয়ে রবি রজনী এক ঠাম॥

—যেখানে ভগবান্ সেখানে কখনও সংসার-বাসনা থাকিতে পারে না। অন্ধকার ও আলোক কখনও এক সঙ্গে থাকিতে পারে না। এই জন্য ইঁহারা বলেন, যদি ভগবান্ পাইতে চাও, কামকাঞ্চন ত্যাগ করিতে হইবে। এই সংসারটা তো অনিত্য, শূন্য—কিছুই নয়। ইহাকে না ছাড়িলে কিছুতেই তাঁহাকে পাইবে না। যদি তাহা না পারো, তবে স্বীকার কর যে তুমি দুর্বল, কিন্তু কোন মতেই আদর্শকে ছোট করিও না। গলিত শবকে সোনার পাত মুড়িয়া ঢাকিও না। এইজন্য ইঁহাদের মতে এই ধর্মলাভ করিতে হইলে, ঈশ্বরলাভ করিতে হইলে প্রথমে 'ভাবের ঘরে চুরি' ছাড়িতে হইবে।

আমি কি শিখিয়াছি? এই প্রাচীন সম্প্রদায়ের নিকট আমি কি শিখিয়াছি? শিখিয়াছি: দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকম্। মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ।[১]—প্রথমে চাই মনুষ্যত্ব—মানুষজন্ম, ইহাতেই মুক্তিলাভের বিশেষ সুবিধা। তারপর চাই মুমুক্ষুতা; সম্প্রদায় ও ব্যক্তি-ভেদে আমাদের সাধনপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন, বর্ণাশ্রম অনুযায়ী কর্তব্য ও অধিকার ভিন্ন ভিন্ন, তথাপি বলা যাইতে পারে যে, মুমুক্ষুতা ব্যতীত ঈশ্বরের উপলব্ধি অসম্ভব। মুমুক্ষুত্ব কি? মোক্ষের জন্য—এই সুখদুঃখ হইতে বাহির হইবার জন্য—প্রবল আগ্রহ, এই সংসারের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা। যখন ভগবানের জন্য এই তীব্র ব্যাকুলতা হইবে, তখনই জানিবে তুমি ঈশ্বরলাভের অধিকারী হইয়াছ।

---

১ বিবেকচূড়ামণি, ৩

তারপর চাই মহাপুরুষসংশ্রয়—গুরুলাভ; গুরুপরম্পরাক্রমে যে শক্তি আসিয়াছে, তাহারই সহিত নিজের সংযোগ-স্থাপন। তদ্ব্যতীত মুমুক্ষুতা থাকিলেও কিছু হইবে না, অর্থাৎ তোমার গুরুকরণ আবশ্যক। কাহাকে গুরু করিব?—শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ।[১] তিনি শাস্ত্রের সূক্ষ্ম রহস্য জানেন—

পোথি পঢ়ি তোতা ভয়ো পণ্ডিত ভয়ো ন কোয়।
ঢাই অক্ষর প্রেমসে পঢ়ে সো পণ্ডিত হোয়॥

শুধু বই-পড়া পণ্ডিত হইলে চলিবে না। আজকাল যে-সে গুরু হইতে চায়। ভিক্ষুকও লক্ষ মুদ্রা দান করিতে চায়। 'অবৃজিন'—যিনি নিষ্পাপ; 'অকামহত'—কেবল জীবের হিত ব্যতীত যাঁহার আর কোন অভিসন্ধি নাই, যিনি অহেতুক-দয়াসিন্ধু, যিনি কোন লাভের উদ্দেশ্যে অথবা নাম-যশের জন্য উপদেশ দেন না, আর যিনি ব্রহ্মকে বিশেষ করিয়া জানেন, যিনি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যিনি তাঁহাকে 'করতলামলকবৎ' দর্শন করিয়াছেন; তিনিই গুরু—তাঁহারই সহিত আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত হইলে তবে ঈশ্বরলাভ, ঈশ্বর-দর্শন সহজ হইবে। তারপর চাই অভ্যাস। ব্যাকুলই হও, আর গুরুই লাভ কর, অভ্যাস না করিলে, সাধন না করিলে কখন উপলব্ধি হইতে পারে না। এই কয়টি যখন দৃঢ় হইবে, তখনই ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হইবেন। তাই বলি হে হিন্দুগণ, হে আর্যসন্তানগণ, তোমরা এই আদর্শ কখনও বিস্মৃত হইও না যে, হিন্দুর লক্ষ্য এই সংসারের বাহিরে যাওয়া—শুধু এই জগৎকে ত্যাগ করিতে হইবে তাহা নয়, স্বর্গকেও ত্যাগ করিতে হইবে; মন্দকে ত্যাগ করিতে হইবে শুধু তাহা নয়, ভালকেও ত্যাগ করিতে হইবে—এই সকলের পারে যাইতে হইবে।

[১] বিবেকচূড়ামণি, ৩৩

আমাদের জন্মপ্রাপ্ত ধর্ম

১৯০১ খৃঃ ৩১শে মার্চ ঢাকায় পগোজ স্কুলের খোলা ময়দানে প্রায় তিন সহস্র শ্রোতার সম্মুখে স্বামীজী ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন, নিম্নে তাহার বাংলায় গৃহীত বিবরণী প্রদত্ত হইল :

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক ভাবের অতিশয় উন্নতি হইয়াছিল। আমাদিগকে আজ সেই প্রাচীন কাহিনী স্মরণ করিতে হইবে। প্রাচীনকালের গৌরবের চিন্তায় বিপদাশঙ্কা এই যে, আমরা আর নূতন কিছু করিতে চাহি না—কেবল সেই প্রাচীন গৌরব স্মরণে ও কীর্তনে কালাতিপাত করি। প্রাচীনকালে অনেক ঋষি—মহর্ষি ছিলেন, তাঁহারা সত্য সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীনকাল স্মরণ করিয়া প্রকৃত উপকার লাভ করিতে হইলে আমাদিগকেও তাঁহাদের মতো ঋষি হইতে হইবে; শুধু তাই নয়—আমার বিশ্বাস, আমরা আরও মহান্ ঋষি হইব। অতীতকালে আমাদের খুব উন্নতি হইয়াছিল, আমি তাহা স্মরণ করিয়া গৌরব বোধ করি। বর্তমান-কালের অবনত অবস্থা দেখিয়া আমি দুঃখিত নই; ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহা ভাবিয়া আমি আশান্বিত; কারণ আমি জানি, বীজের বীজত্ব নষ্ট হইয়া তবে বৃক্ষ হয়। সেইরূপ বর্তমান অবস্থার অবনত ভাবের ভিতর ভবিষ্যৎ মহত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

আমাদের জন্মপ্রাপ্ত ধর্মের ভিতর সাধারণ ভাব কি কি? আপাততঃ নানা বিরোধ দেখিতে পাই। মত সম্বন্ধে কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী, কেহ বা দ্বৈতবাদী। কেহ অবতার মানেন—মূর্তিপূজা মানেন, কেহ বা নিরাকারবাদী। আবার আচার সম্বন্ধে তো নানা বিভিন্নতা দেখিতে পাই। জাঠেরা মুসলমান বা খ্রীষ্টান পর্যন্ত বিবাহ করিলেও জাতিচ্যুত হয় না। তাহারা অবাধে সকল দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে। পঞ্জাবে অনেক গ্রামে যে-হিন্দু শূকর ভক্ষণ না করে, সে মুসলমান বলিয়া বিবেচিত হয়। নেপালে ব্রাহ্মণ চারিবর্ণেই বিবাহ করিতে পারেন, আবার বাংলা দেশে ব্রাহ্মণের অবান্তর বিভাগের ভিতরেও বিবাহ হইবার জো নাই। এইরূপ নানা বিভিন্নতা দেখিতে পাই। কিন্তু সকল হিন্দুর মধ্যে এই একটি বিষয়ের ঐক্য দেখিতে পাই যে, কোন হিন্দু গোমাংস ভক্ষণ করে না।

এইরূপ আমাদের ধর্মের ভিতরও এক মহান্ সামঞ্জস্য আছে। প্রথমতঃ শাস্ত্রের কথা লইয়া একটু আলোচনা করা যাক। যে-সকল ধর্মের নিজস্ব এক বা বহু শাস্ত্র ছিল, সেই-সকল ধর্ম দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল এবং নানাবিধ অত্যাচার সত্ত্বেও এতদিন টিকিয়া রহিয়াছে। গ্রীকধর্মের নানাবিধ সৌন্দর্য থাকিলেও শাস্ত্রের অভাবে উহা লোপ পাইয়া গেল, কিন্তু য়াহুদীধর্ম ওল্ড টেস্টামেন্টের বলে এখনও অক্ষুণ্ণপ্রতাপ। হিন্দুধর্মও সেইরূপ। উহার শাস্ত্র 'বেদ' জগতের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ। উহার দুইটি ভাগ—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। ভারতের সৌভাগ্যেই হউক অথবা দুর্ভাগ্যেই হউক, কর্মকাণ্ড এখন লোপ পাইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে কতকগুলি ব্রাহ্মণ মধ্যে মধ্যে ছাগবধ করিয়া যজ্ঞ করিয়া থাকেন, আর বিবাহ-শ্রাদ্ধাদির মন্ত্রে মধ্যে মধ্যে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। এখন আর উহাকে পূর্বের মতো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় নাই। কুমারিলভট্ট একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য হন। তারপর বেদের জ্ঞানকাণ্ড—যাহার নাম উপনিষদ্ বা বেদান্ত, উহাকেই 'শ্রুতিশির' বলা হয়। আর্যগণ যেখানে শ্রুতি উদ্ধৃত করিতেছেন, সেখানেই দেখা যায় যে, তাঁহারা এই উপনিষদ্ উদ্ধৃত করিতেছেন। এই বেদান্তের ধর্মই এখন ভারতের ধর্ম। যদি কোন সম্প্রদায় জনগণের মধ্যে নিজ মত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত দেখিতে ইচ্ছা করে, তবে সেই সম্প্রদায়কে বেদান্তের দোহাই দিতে হয়। কি দ্বৈতবাদী, কি অদ্বৈতবাদী, সকলকেই তাই করিতে হয়। বৈষ্ণবগণ নিজেদের মত প্রমাণ করিতে 'গোপালতাপিনী উপনিষদ্' উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। নিজের মনোমত বচনাবলী না পাইলে কেহ কেহ নূতন উপনিষদ্ রচনা পর্যন্ত করিয়া লন। এখন বেদ সম্বন্ধে হিন্দুগণের মত এই যে, উহা কোন পুস্তকবিশেষ বা কাহারও রচনা নহে। উহা ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানরাশি—কখন ব্যক্ত হয়, কখন বা অব্যক্ত থাকে। সায়নাচার্য একস্থলে বলিয়াছেন, 'যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ নির্মমে'—যিনি বেদজ্ঞানের প্রভাবে সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করেন। বেদের রচয়িতা—কেহ কখন দেখে নাই; সুতরাং উহা কল্পনা করাও অসম্ভব। ঋষিগণ কেবল ঐ-সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঋষি অর্থাৎ দ্রষ্টা—মন্ত্রদ্রষ্টা, অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান বেদ তাঁহারা সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন মাত্র।

এই ঋষিগণ কে? বাৎস্যায়ন বলেন, যিনি যথাবিহিত ধর্ম প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি ম্লেচ্ছ হইলেও ঋষি হইতে পারেন। তাই প্রাচীনকালে

বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ, ধীবরতনয় ব্যাস, দাসীপুত্র নারদ প্রভৃতি সকলেই ঋষিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত উপায়ে এই ধর্মের সাক্ষাৎকার হইলে আর কোন ভেদ থাকে না। পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ যদি ঋষি হইয়া থাকেন, তবে হে আধুনিক কালের কুলীন ব্রাহ্মণগণ, তোমরা আরও কত মহান্ ঋষি হইতে পারো! সেই ঋষিত্বলাভের চেষ্টা কর, জগৎ তোমাদের নিকট স্বতই নত হইবে। এই বেদই আমাদের একমাত্র প্রমাণ, আর ইহাতে সকলেরই অধিকার। 'যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্যায় চ স্বায় চারণায় ॥'[১] —এই বেদ হইতে এমন কোন প্রমাণ দেখাইতে পারো যে, ইহাতে সকলের অধিকার নাই? পুরাণ বলিতেছে, বেদের অমুক শাখায় অমুক জাতির অধিকার, অমুক অংশ সত্যযুগের, অমুক অংশ কলিযুগের জন্য। কিন্তু বেদ তো এ-কথা বলিতেছেন না। ভৃত্য কি কখন প্রভুকে আজ্ঞা করিতে পারে? স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র—এই সবগুলিরই ততটুকু গ্রাহ্য, যতটুকু বেদের সহিত মিলে; না মিলিলে অগ্রাহ্য। কিন্তু এখন আমরা পুরাণকে বেদের অপেক্ষা উচ্চতর আসন দিয়াছি। বেদের চর্চা তো বাঙলাদেশ হইতে লোপই পাইয়াছে। আমি শীঘ্র সেইদিন দেখিতে চাই, যে-দিন প্রত্যেক বাটীতে শালগ্রামশিলার সহিত বেদও পূজিত হইবে, আবালবৃদ্ধবনিতা বেদের পূজা করিবে।

বেদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে আমার কোন আস্থা নাই। তাঁহারা বেদের কাল—আজ এই নির্ণয় করিতেছেন, আগামী কাল উহা বদলাইয়া সহস্র বৎসর পিছাইয়া দিতেছেন। যাহা হউক, পূর্বে যেমন বলিয়াছি, পুরাণের যতটুকু বেদের সহিত মিলে, ততটুকুই গ্রাহ্য। পুরাণে অনেক কথা দেখিতে পাই, যেগুলি বেদের সহিত মিলে না। যথা, পুরাণে লিখিত আছে—কেহ দশ সহস্র, কেহ বা বিশ সহস্র বৎসর জীবিত রহিয়াছেন, কিন্তু বেদে দেখিতে পাই, 'শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ'—এখানে বেদের কথাই গ্রাহ্য। তাহা হইলেও পুরাণে যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্মের অনেক সুন্দর সুন্দর কথা আছে, সেগুলি অবশ্য লইতে হইবে।

তারপর তন্ত্র। তন্ত্র-শব্দের প্রকৃত অর্থ 'শাস্ত্র', যেমন 'কাপিল তন্ত্র'। কিন্তু এখানে তন্ত্র-শব্দ আমি উহার বর্তমান প্রচলিত সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিতেছি।

---

১ শুক্লযজুর্বেদ, মাধ্যন্দিন শাখা, ২৬ অধ্যায়, ২ মন্ত্র

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজগণের শাসনে বৈদিক যাগযজ্ঞসকল লোপ পাইলে কেহ আর রাজভয়ে হিংসা করিতে পারিল না। কিন্তু অবশেষে বৌদ্ধদের ভিতরেই সেই যাগযজ্ঞের ভাল ভাল অংশগুলি গোপনে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, তাহা হইতেই তন্ত্রের উৎপত্তি। তন্ত্রে বামাচার প্রভৃতি কতকগুলি ঘৃণ্য ব্যাপার বাদ দিলে—লোকে যতটা ভাবে, উহা ততটা খারাপ নহে। বাস্তবিক বেদের ব্রাহ্মণভাগই একটু পরিবর্তিত হইয়া তন্ত্রের মধ্যে বর্তমান। আজকালকার সমুদয় উপাসনা পূজাপদ্ধতি কর্মকাণ্ড তন্ত্রমতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

এখন ধর্মমত সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। ধর্মমতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধসত্ত্বেও কতকগুলি ঐক্য আছে। প্রথমতঃ তিনটি বিষয়—তিনটি সত্তা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন: ঈশ্বর, আত্মা ও জগৎ। ঈশ্বর অর্থাৎ যিনি জগৎকে চিরকাল সৃজন, পালন ও লয় করিতেছেন; সাংখ্যগণ ব্যতীত আর সকলেই ইহা স্বীকার করেন। আত্মা—অসংখ্য জীবাত্মা কর্মফলে বারবার শরীর পরিগ্রহ করিয়া জন্মমৃত্যুচক্রে ভ্রাম্যমাণ; ইহাকে 'সংসারবাদ' বলে—চলতি কথায় 'পুনর্জন্মবাদ'। আর রহিয়াছে এই অনাদি অনন্ত জগৎ। এই তিনকে কেহ একেরই বিভিন্ন অবস্থা, কেহ বা সম্পূর্ণ পৃথক্ তিনটি সত্তা বলিয়া মানিলেও সকলেই এই তিনটিতে বিশ্বাস করেন।

এখানে একটু বক্তব্য এই যে, আত্মাকে হিন্দুরা চিরকাল মন হইতে পৃথক্ বলিয়া জানিতেন। পাশ্চাত্যেরা কিন্তু মনের উপর আর উঠিতে পারেন নাই, পাশ্চাত্যগণ জগৎকে আনন্দপূর্ণ এবং সম্ভোগ করিবার জিনিস বলিয়া জানেন; আর প্রাচ্যগণের জন্ম হইতে ধারণা—সংসার দুঃখপূর্ণ, উহা কিছুই নয়। এইজন্য পাশ্চাত্যেরা যেমন সঙ্ঘবদ্ধ কর্মে বিশেষ পটু, প্রাচ্যেরা তেমনি অন্তর্জগতের অন্বেষণে অতিশয় সাহসী।

যাহা হউক—এখন হিন্দুধর্মের আর দু-একটি কথা লইয়া আলোচনা করা যাক। হিন্দুদের মধ্যে অবতারবাদ প্রচলিত। বেদে আমরা কেবল মৎস্য-অবতারের কথা দেখিতে পাই। যাহা হউক, এই অবতারবাদের প্রকৃত তাৎপর্য মনুষ্যপূজা—মনুষ্যের ভিতর ঈশ্বর-দর্শনই প্রকৃত ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার। হিন্দুগণ প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির ঈশ্বরে যান না—মনুষ্য হইতে মনুষ্যের ঈশ্বরে গমন করিয়া থাকেন। তারপর মূর্তিপূজা—শাস্ত্রোক্ত পঞ্চ উপাস্যদেবতা ব্যতীত সকল দেবতাই এক একটি পদের নাম, কিন্তু এই পঞ্চদেবতা সেই এক ভগবানের

নামমাত্র। এই মূর্তিপূজা আমাদের সকল শাস্ত্রেই অধমাধম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া উহা অন্যায় কার্য নহে। এই মূর্তিপূজার ভিতরে নানাবিধ কুৎসিত ভাব প্রবেশ করিয়া থাকিলেও আমি উহা নিন্দা করি না। সেই মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদধূলি যদি আমি না পাইতাম, তবে কোথায় থাকিতাম! যে-সকল সংস্কারক মূর্তিপূজার নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমি বলি—ভাই; তুমি যদি নিরাকার-উপাসনার যোগ্য হইয়া থাকো, তাহা কর; কিন্তু অপরকে গালি দাও কেন?

সংস্কার কেবল পুরাতন বাটীর জীর্ণসংস্কারমাত্র। সেটুকু হইয়া গেলে সংস্কারের আর প্রয়োজন কি? কিন্তু সংস্কারকদল এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করিতে চান। তাঁহারা মহৎ কার্য করিয়াছেন। তাঁহাদের উপর ভগবানের আশীর্বাদ বর্ষিত হউক। কিন্তু তোমরা নিজদিগকে পৃথক্ করিতে চাও কেন? হিন্দু নাম লইতে লজ্জিত হও কেন? আমাদের জাতীয় অর্ণবযানে আমরা সকলে আরোহণ করিয়াছি—হয়তো উহাতে একটু ছিদ্র হইয়াছে। এস, সকলে মিলিয়া উহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করি, না পারি একসঙ্গে ডুবিয়া মরি।

আর ব্রাহ্মণগণকেও বলি: তোমরা আর বৃথা অভিমান রাখিও না, শাস্ত্রমতে তোমাদের ব্রাহ্মণত্ব আর নাই; কারণ তোমরা এতকাল ম্লেচ্ছরাজ্যে বাস করিতেছ। যদি তোমরা নিজেদের কথায় নিজেরা বিশ্বাস কর, তবে সেই প্রাচীন কুমারিলভট্ট যেমন বৌদ্ধগণকে সংহার করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে বৌদ্ধের শিষ্য হইয়া শেষে তাহাদিগকে হত্যা করার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ তুষানলে প্রবেশ করেন, সেইরূপ তোমরা সকলে মিলিয়া তুষানলে প্রবেশ কর; যদি তাহা না পারো, নিজেদের দুর্বলতা স্বীকার করিয়া সর্বসাধারণকে তাহাদের প্রকৃত অধিকার দাও।

ভারত-প্রসঙ্গে

জগতের কাছে ভারতের বাণী

'India's Message to the World' নামে একটি বই লেখার উদ্দেশ্যে স্বামীজী ৪২টি চিন্তাসূত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বইটির ভূমিকাসহ সামান্য কয়েকটি চিন্তাসূত্রই বিস্তারিতভাবে লেখা হইয়াছিল। দেহাবসানের পর এই অসমাপ্ত ইংরেজী রচনাটি তাঁহার কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। এখানে খসড়া-রচনাটির অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

সূচী

১. পাশ্চাত্যবাসীদের উদ্দেশে আমার বাণী বীরত্বপূর্ণ। দেশবাসীর উদ্দেশে আমার বাণী বলিষ্ঠতর।

২. ঐশ্বর্যময় পাশ্চাত্যে চার বৎসর বাস করার ফলে ভারতবর্ষকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। অন্ধকার দিকগুলি গাঢ়তর এবং আলোকিত দিকগুলি উজ্জ্বলতর হইয়াছে।

৩. পর্যবেক্ষণের ফল—ভারতবাসীর অধঃপতন হইয়াছে, এ-কথা সত্য নহে।

৪. প্রত্যেক দেশের যে সমস্যা, এখানেও সেই সমস্যা—বিভিন্ন জাতির একীকরণ; কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় এই সমস্যা অন্যত্র এত বিশালরূপে দেখা দেয় নাই।

৫. ভাষাগত ঐক্য, শাসন-ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি ধর্ম—একীকরণের শক্তিরূপে কাজ করিয়াছে।

৬. অন্যান্য দেশে ইহা দৈহিক বলের দ্বারা সাধিত হইয়াছে, অর্থাৎ কোন গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতিকে অপরাপর সংস্কৃতির উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে ক্ষণস্থায়ী বিপুলপ্রাণশক্তিসম্পন্ন জাতীয় জীবন দেখা দিয়াছে, তারপর উহার ধ্বংস হইয়াছে।

৭. অপর পক্ষে ভারতবর্ষের সমস্যা যত বিরাট, উহা সমাধানের চেষ্টাও তত শান্ত উপায়ে দেখা দিয়াছে। প্রাচীনতম কাল হইতে ভিন্ন আচার-পদ্ধতি, বিশেষভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ধর্মসম্প্রদায়কে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

৮. যে-দেশে ঐক্যস্থাপনের জন্য বলপ্রয়োগই যথেষ্ট হইয়াছে, সে-দেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিচিত্র উন্নতির পন্থাগুলিকে অঙ্কুরেই নষ্ট করিয়া প্রধান গোষ্ঠীটিই

উন্নত হইয়াছে। একটি বিশেষ শ্রেণী জনসাধারণের অধিকাংশকে স্বীয় মঙ্গল-সাধনের জন্য ব্যবহার করিয়াছে; ফলে উন্নতির বেশীর ভাগ সম্ভাবনাই বিনষ্ট হইয়াছে। ইহার ফলে, যখন সেই প্রাধান্যপ্রয়াসী গোষ্ঠীটির প্রাণশক্তি বিনষ্ট হইয়াছে, তখন গ্রীস রোম বা নর্মানদের ন্যায় আপাত-অভেদ্য জাতিসৌধগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

৯. একটি সাধারণ ভাষার বিশেষ অভাব অনুভূত হইতে পারে; কিন্তু পূর্বোক্ত সমালোচনা অনুসারে এ-কথাও বলা যায়, ইহার দ্বারা প্রচলিত ভাষাগুলির প্রাণশক্তি বিনষ্ট হইবে।

১০. এমন একটি মহান্ পবিত্র ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে, অন্য সমুদয় ভাষা যাহার সন্ততিস্বরূপ। সংস্কৃতই সেই ভাষা। ইহাই (ভাষা-সমস্যার) একমাত্র সমাধান।

১১. দ্রাবিড় ভাষাসকল সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে বাস্তব ক্ষেত্রে উহারা প্রায় সংস্কৃতই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দিনের পর দিন নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই এই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

১২. একটি জাতীয় পটভূমি পাওয়া গেল—আর্যজাতি।

১৩. মধ্য-এশিয়া হইতে বাল্টিক উপসাগর অবধি এলাকায় কোন পৃথক্ ও বিশিষ্ট আর্যজাতি ছিল কিনা, তাহা অনুমানের বিষয়।

১৪. তথাকথিত জাতি-রূপ (type)। বিভিন্ন জাতি সর্বদাই মিশ্রিত ছিল।

১৫. সোনালী চুল ও কালো চুল।

১৬. তথাকথিত ঐতিহাসিক কল্পনা হইতে সহজবুদ্ধির বাস্তব জগতে অবতরণ। প্রাচীন নথিপত্র অনুসারে আর্যদের বাসভূমি ছিল তুর্কীস্থান, পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম তিব্বতের মধ্যবর্তী দেশে।

১৭. ইহার ফলে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর বিভিন্ন স্তরের সংস্কৃতির মিশ্রণ দেখা দেয়।

১৮. 'সংস্কৃত' যেমন ভাষা-সমস্যার সমাধান, 'আর্য' তেমনি জাতিগত সমস্যার সমাধান। বিভিন্ন পর্যায়ের প্রগতি ও সংস্কৃতির এবং সর্বপ্রকার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যার সমাধান 'ব্রাহ্মণত্ব'।

১৯. ভারতবর্ষের মহান্ আদর্শ—'ব্রাহ্মণত্ব'।

২০. স্বার্থহীন, সম্পদ্‌হীন, একমাত্র নৈতিক নিয়ম ভিন্ন অন্য সর্বপ্রকার শাসন ও অনুশাসনের উর্ধ্বে।

২১. জন্মগত ব্রাহ্মণত্ব—অতীতে ও বর্তমানে বহু জাতি ব্রাহ্মণত্বের দাবি করিয়াছে, এবং অধিকার লাভ করিয়াছে।

২২. যাঁহারা মহৎ কর্মের অধিকারী, তাঁহারা কোন দাবি করেন না, একমাত্র অলস অকর্মণ্য মূর্খেরাই দাবি করে।

২৩. ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্র আদর্শের অবনতি। পুরাণে আছে, কলিযুগে কেবল অব্রাহ্মণেরাই থাকিবে। সে-কথা সত্য, দিনে দিনে আরও সত্য হইয়া উঠিতেছে। কিছু পরিমাণ ব্রাহ্মণ এখনও আছেন—একমাত্র ভারতবর্ষেই আছেন।

২৪. ব্রাহ্মণত্ব লাভের পূর্বে আমাদিগকে ক্ষাত্র আদর্শের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। কেহ হয়তো পূর্বে এই আদর্শে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু বর্তমানে উহার পরিচয় দিতে হইবে।

২৫. কিন্তু সমগ্র পরিকল্পনাটি ধর্মকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া ওঠা প্রয়োজন।

২৬. একই জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীরা একটি বংশগত নামে এক ধরনের দেবতার উপাসনা করে—যেমন ব্যাবিলোনীয়দের 'বাল'-দেবতা উপাসনা এবং হিব্রুদের 'মোলোক'-দেবতা উপাসনা।

২৭. ব্যাবিলোনীয়দের সব 'বাল'-দেবতাকে 'বাল-মেরো ডাচে' পরিণত করা এবং য়াহুদীদের সব 'মোলোক'কে 'মোলোক যিয়োবাহ' বা 'ইয়াহু'তে পরিণত করার চেষ্টা।

২৮. ব্যাবিলোনীয়েরা পারসীকদের দ্বারা ধ্বংস হয়। হিব্রুগণ ব্যাবিলোনীয়দের পৌরাণিক কাহিনী গ্রহণ করিয়া নিজেদের প্রয়োজনমত গড়িয়া লয় এবং একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম গড়িতে সমর্থ হয়।

২৯. স্বৈর রাজতন্ত্রের মতো একেশ্বরবাদ আদেশানুযায়ী দ্রুত কার্য সমাধা করে, কিন্তু ইহার আর কোন বিকাশ সম্ভব হয় না। একেশ্বরবাদের সর্বাপেক্ষা ত্রুটি—ইহার নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন। যে-সকল জাতি এই মতবাদের প্রভাবাধীন হয়, তাহারা অল্পকালের জন্য সহসা উন্নতি লাভ করিয়া অতি শীঘ্র ধ্বংস হইয়া যায়।

৩০. ভারতবর্ষে সেই সমস্যা দেখা দিয়াছিল, সমাধান মিলিল—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' সর্বপ্রকার সাফল্যের পশ্চাতে ইহাই মূলমন্ত্রস্বরূপ, সমগ্র সৌধের ইহাই কেন্দ্র-শিলা।

৩১. ফলস্বরূপ—বৈদান্তিকের সেই আশ্চর্য উদার সহনশীলতা।

৩২. সুতরাং বিরাট সমস্যা হইল বিভিন্ন উপাদানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট না করিয়া উহাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি-সাধন।

৩৩. স্বর্গ বা মর্ত্যের কোন ব্যক্তির উপর নির্ভর করিয়া গঠিত কোন প্রকার ধর্মের পক্ষে ঐরূপ করা অসম্ভব।

৩৪. এইখানেই অদ্বৈতবাদের মহিমা। অদ্বৈতবাদ কোন 'ব্যক্তি'র নয়—'আদর্শে'র প্রচারক; অথচ পার্থিব ও অপার্থিব শক্তির পূর্ণ প্রকাশের সুযোগ করিয়া দেয়।

৩৫. চিরকাল এইরূপ চলিয়া আসিতেছে—এই অর্থে আমরা সর্বদা অগ্রসর হইতেছি।—মুসলমান আমলের মহাপুরুষবৃন্দ।

৩৬. প্রাচীনকালে এই আদর্শ পূর্ণসচেতন ও শক্তিশালী ছিল, আধুনিক-কালে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল; এই অর্থে আমাদের অধঃপতন হইয়াছে।

৩৭. ভবিষ্যতে এইরূপ ঘটিবে: যদি কিছুকালের জন্য একটি গোষ্ঠী অপর একটি গোষ্ঠীর পুঞ্জীভূত শ্রমের দ্বারা আশ্চর্য ফল লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে বহুকাল ধরিয়া যে-সকল জাতি রক্ত ও আদর্শের মধ্য দিয়া মিলিত হইতেছে, তাহাদের সমবায়ে যে ভবিষ্যৎ মহাশক্তি গড়িয়া উঠিবে—তাহা আমি মানস নেত্রে দেখিতে পাইতেছি।

ভারতের ভবিষ্যৎ—পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে তরুণতম ও সর্বাপেক্ষা মহিমান্বিত একটি জাতি, যাহা প্রাচীনতমও বটে।

৩৮. আমাদের কোন্ পন্থায় কাজ করিতে হইবে? স্মৃতি-অনুসারে নির্ধারিত কয়েকটি সামাজিক বিধিনিষেধের গণ্ডি। কিন্তু উহাদের একটিও শ্রুতি হইতে আসে নাই। সময়ের সঙ্গে স্মৃতির পরিবর্তন হইবে—ইহাই নিয়মরূপে স্বীকৃত।

৩৯. বেদান্তের আদর্শ কেবল ভারতবর্ষে নয়, বাহিরেও প্রচার করিতে হইবে। লেখার মধ্য দিয়া নয়, ব্যক্তির মধ্য দিয়া প্রত্যেক জাতির মানসগঠনে আমাদের চিন্তাধারা সঞ্চার করিতে হইবে।

৪০. কলিকালে দানই একমাত্র কর্ম। কর্মের দ্বারা শুদ্ধ না হইলে কেহ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না।

৪১. পরা ও অপরা—দুই ধরনের বিদ্যাই দান করিতে হইবে।

৪২. জাতির আহ্বান—ত্যাগ এবং ত্যাগীর দল।

ভূমিকা

প্রতীচ্যের জনগণের উদ্দেশে আমার বাণী তেজোদীপ্ত। হে প্রিয় স্বদেশবাসিগণ! তোমাদের প্রতি আমার বাণী বলিষ্ঠতর। প্রাচীন ভারতবর্ষের বাণী আমার সাধ্যানুযায়ী আমি প্রতীচ্য জাতিসমূহের নিকট প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। উহা ভাল হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই বুঝা যাইবে। কিন্তু সেই ভবিষ্যতের বলদৃপ্ত কণ্ঠের মৃদু অথচ নিশ্চিত বাণী স্পন্দিত হইতেছে, দিনে দিনে সেই ধ্বনি স্পষ্টতর হইতেছে—উহা বর্তমান ভারতের নিকট ভবিষ্যৎ ভারতের বাণী।

নানা জাতির মধ্যে অনেক আশ্চর্য প্রথা ও বিধি, অনেক অদ্ভুত শক্তি ও ক্ষমতার বিকাশ লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য এই যে, আচার-ব্যবহারের—সংস্কৃতি ও শক্তির আপাত-বৈচিত্র্যের অন্তরালে একই মনুষ্যহৃদয় একই ধরনের আনন্দ-বেদনা, সবলতা ও দুর্বলতা লইয়া স্পন্দিত হইতেছে।

ভাল মন্দ সর্বত্রই আছে। উহাদের সামঞ্জস্যও আশ্চর্যভাবে বিদ্যমান। কিন্তু সকলের ঊর্ধ্বে সর্বত্র সেই গৌরবদীপ্ত মানবাত্মা—তাহার নিজস্ব ভাষায় কথা বলিতে জানিলে সে কখনও কাহাকেও ভুল বুঝে না। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই এমন নরনারী আছেন, যাঁহাদের জীবন মানবজাতির পক্ষে আশীর্বাদ-স্বরূপ। তাঁহারা সম্রাট অশোকের সেই বাণীর প্রমাণস্বরূপ—'প্রত্যেক দেশেই ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা বাস করেন।'

যে পবিত্র ভালবাসার সহিত প্রতীচ্যের অধিবাসিগণ আমাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিঃস্বার্থ হৃদয়েই সম্ভব, সে-দেশের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এই মাতৃভূমির প্রতিই আমার সারা জীবনের আনুগত্য; এবং আমাকে যদি সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে সেই সহস্র জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমার স্বদেশবাসীর, হে আমার বন্ধুবর্গ—তোমাদেরই সেবায় ব্যয়িত হইবে।

আমার দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক যাহা কিছু সম্বল—সে-সবই তো আমি এই দেশের কাছে পাইয়াছি, এবং যদি আমি কোন ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিয়া

থাকি, সে গৌরব আমার নয়, তোমাদের। আবার দুর্বলতা ও ব্যর্থতা—সবই আমার ব্যক্তিগত, সে-সবই এ দেশবাসীকে যে মহতী ভাবধারা আজন্ম ধারণ করিয়া রাখে, তাহা দ্বারা সমৃদ্ধ হইবার শক্তির অভাববশতঃ।

আর কী দেশ! বিদেশী অথবা স্বদেশী, যে-কেহ এই পবিত্রভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইবে—যদি তাঁহার মন পশুস্তরে অধঃপতিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইতিহাসের বিস্মৃত অতীত হইতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম যে-সন্তানেরা পশুসত্তাকে দিব্যসত্তায় উন্নীত করিবার সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন্ত চিন্তারাশি দ্বারা নিজেদের পরিবৃত অনুভব করিবেন। সমগ্র বায়ুমণ্ডল আধ্যাত্মিকতায় স্পন্দিত হইতেছে।

দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও আধ্যাত্মিকতা—যা কিছু মানুষের অন্তর্নিহিত পশুসত্তা রক্ষা করিবার নিরন্তর প্রচেষ্টায় বিরতি আনিয়া দেয়, যে-সকল শিক্ষা মানুষকে পশুত্বের আবরণ অপসৃত করিয়া জন্মমৃত্যুহীন চিরপবিত্র অমর আত্মা-রূপে প্রকাশিত হইতে সাহায্য করে—এই দেশ সেই-সব কিছুরই পুণ্যভূমি। এই দেশ—যেখানে আনন্দের পাত্রটি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, বেদনায় পাত্রটি পূর্ণতর হইলে অবশেষে এইখানেই মানুষ সর্বপ্রথম উপলব্ধি করিল—এ সবই অসার; এখানেই যৌবনের প্রথম সূচনায়, বিলাসের ক্রোড়ে, গৌরবের সমুচ্চ শিখরে, ক্ষমতার অজস্র প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ মায়ার শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছে।

এইখানে এই মানবতা-সমুদ্রে সুখদুঃখ, সবলতা ও দুর্বলতা, ধন-দারিদ্র্য, আনন্দ-বেদনা, হাসি-অশ্রু, জন্ম-মৃত্যুর তীব্র স্রোত-সংঘাতে, অনন্ত শান্তি ও স্তব্ধতার বিগলিত ছন্দের আবর্তনে উত্থিত হয় বৈরাগ্যের সিংহাসন! এই দেশেই জন্মমৃত্যুর মহাসমস্যাসকল—জীবন-তৃষ্ণা, এ-জীবনের জন্য ব্যর্থ উন্মাদ প্রচেষ্টার ফলে সঞ্চিত দুঃখরাশি—সর্বপ্রথম আয়ত্তে আনিয়া সমাধান করা হয়, এমন সমাধান অতীতে কখনও হয় নাই বা ভবিষ্যতে কখনও হইবে না; এইখানেই সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় যে, এই জীবনটাই অনিত্য—যাহা পরমসত্য, তাহারই ছায়ামাত্র। এই একটি দেশ, যেখানে ধর্ম বাস্তব সত্য, এইখানেই নরনারী সাহসের সঙ্গে অধ্যাত্ম-লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য ঝাঁপ দেয়, ঠিক যেমন অন্যান্য দেশে দরিদ্র ভ্রাতাদের বঞ্চিত করিয়া নরনারী জীবনের সুখসামগ্রীর জন্য উন্মাদের মতো ঝাঁপ দেয়। এইখানেই মানব-হৃদয়—পশুপক্ষী, তরুলতা, মহত্তম দেবগণ হইতে ধূলিকণা অবধি, উচ্চতম হইতে নিম্নতম সত্তা পর্যন্ত

সবকিছুকে ধারণ করিয়া আরও বিশাল—অনন্তপ্রসারিত হইয়া উঠিয়াছে। এইখানেই মানবাত্মা সমগ্র বিশ্বকে এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে অনুধাবন করিয়াছে, তাহার প্রতিটি স্পন্দন আপন নাড়ীর স্পন্দন বলিয়া মনে করিয়াছে।

আমরা সকলেই ভারতের অধঃপতন সম্বন্ধে শুনিয়া থাকি। এককালে আমিও ইহা বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু আজ অভিজ্ঞতার দৃঢ়ভূমিতে দাঁড়াইয়া, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি লইয়া, সর্বোপরি দেশের সংস্পর্শে আসিয়া উহাদের অতিরঞ্জিত চিত্রসমূহের বাস্তব রূপ দেখিয়া সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি, আমার ভুল হইয়াছিল। হে পবিত্র আর্যভূমি, তোমার তো কখনও অবনতি হয় নাই। কত রাজদণ্ড চূর্ণ হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কত শক্তির দণ্ড এক হাত হইতে অন্য হাতে গিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে রাজা ও রাজসভা অতি অল্প লোককেই প্রভাবিত করিয়াছে। উচ্চতম হইতে নিম্নতম শ্রেণী অবধি বিশাল জনসমষ্টি আপন অনিবার্য গতিপথে ছুটিয়া চলিয়াছে; জাতীয় জীবনস্রোত কখন মৃদু অর্ধচেতনভাবে, কখন প্রবল জাগ্রতভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। শত শতাব্দীর সমুজ্জ্বল শোভাযাত্রার সম্মুখে আমি স্তম্ভিত বিস্ময়ে দণ্ডায়মান, সে শোভাযাত্রার কোন কোন অংশে আলোকরেখা স্তিমিতপ্রায়, পরক্ষণে দ্বিগুণতেজে ভাস্বর, আর উহার মাঝখানে আমার দেশমাতৃকা রানীর মতো পদবিক্ষেপে পশুমানবকে দেবমানবে রূপান্তরিত করিবার জন্য মহিমময় ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন; স্বর্গ বা মর্ত্যের কোন শক্তির সাধ্য নাই—এ জয়যাত্রার গতিরোধ করে।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ, সত্যই মহিমময় ভবিষ্যৎ, প্রাচীন উপনিষদের যুগ হইতে আমরা পৃথিবীর সমক্ষে এই স্পর্ধাপূর্বক প্রচার করিয়াছি: 'ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ'—সন্তান বা ধনের দ্বারা নয়, ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হইতে পারে। জাতির পর জাতি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইয়াছে এবং বাসনার জগতে থাকিয়া জগৎ-রহস্য সমাধানের আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা সকলেই ব্যর্থ হইয়াছে, প্রাচীন জাতিসমূহ ক্ষমতা ও অর্থগৃধ্নুতার ফলে জাত অসাধুতা ও দুর্দশার চাপে বিলুপ্ত হইয়াছে, —নূতন জাতিসমূহ পতনোন্মুখ। শান্তি অথবা যুদ্ধ, সহনশীলতা অথবা অসহিষ্ণুতা, সততা অথবা খলতা, বুদ্ধিবল অথবা বাহুবল, আধ্যাত্মিকতা অথবা ঐহিকতা—এগুলির মধ্যে কোন্‌টির জয় হইবে, সে প্রশ্নের মীমাংসা এখনও বাকি

বহুযুগ পূর্বে আমরা এ সমস্যার সমাধান করিয়াছি, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়া সেই সমাধান অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছি, শেষ অবধি ইহাই ধরিয়া রাখিতে চাই। আমাদের সমাধান—ত্যাগ, অপার্থিবতা।

সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর—ইহাই ভারতীয় জীবন-সাধনার মূলমন্ত্র, ভারতের চিরন্তন সঙ্গীতের মূল সুর, ভারতীয় সত্তার মেরুদণ্ডস্বরূপ, ভারতীয়তার ভিত্তি, ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান প্রেরণা ও বাণী। তাতার, তুর্কী, মোগল, ইংরেজ—কাহারও শাসনকালেই ভারতের জীবনসাধনা এই আদর্শ হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই।

ভারতের ইতিহাসে কেহ এমন একটি যুগ দেখাইয়া দিন দেখি, যে-যুগে সমগ্র জগৎকে আধ্যাত্মিকতা দ্বারা পরিচালিত করিতে পারেন, এমন মহাপুরুষের অভাব ছিল। কিন্তু ভারতের কার্যপ্রণালী আধ্যাত্মিক—সে-কাজ রণবাদ্য বা সৈন্যবাহিনীর অভিযানের দ্বারা হইতে পারে না। ভারতের প্রভাব চিরকাল পৃথিবীতে নিঃশব্দ শিশিরপাতের ন্যায় সকলের অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, অথচ পৃথিবীর সুন্দরতম কুসুমগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। নিজস্ব শান্ত প্রকৃতির দরুন এ প্রভাব বিদেশে ছড়াইয়া পড়িবার উপযুক্ত সময় ও সুযোগের প্রয়োজন হইয়াছে, যদিও স্বদেশের গণ্ডিতে ইহা সর্বদাই সক্রিয় ছিল। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, ইহার ফলে যখনই তাতার, পারসীক, গ্রীক বা আরব জাতি এদেশের সঙ্গে বহির্জগতের সংযোগসাধন করিয়াছে, তখনই এদেশ হইতে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব বন্যাস্রোতের মতো সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে। সেই এক ধরনেরই ঘটনা আবার আমাদের সম্মুখে দেখা দিয়াছে। ইংরেজের জলপথ ও স্থলপথ এবং ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসিবৃন্দের অসাধারণ বিকাশের ফলে পুনরায় সমগ্র জগতের সঙ্গে ভারতের সংযোগ সাধিত হইয়াছে, এবং সেই একই ব্যাপারের সূচনা দেখা দিয়াছে। আমার কথা লক্ষ্য করুন, এ কেবল সামান্য সূচনা মাত্র, বৃহত্তর ঘটনাপ্রবাহ আসিতেছে। বর্তমানে ভারতের বাহিরে যে-কাজ হইতেছে, তাহার ফলাফল কি, তাহা আমি সঠিক বলিতে পারি না; কিন্তু নিশ্চিত জানি, লক্ষ লক্ষ লোক—আমি ইচ্ছা করিয়াই বলিতেছি, লক্ষ লক্ষ লোক প্রত্যেক সভ্য দেশে সেই বাণীর জন্য অপেক্ষমাণ, যে-বাণী—আধুনিক যুগে অর্থোপাসনা যে ঘৃণ্য বস্তুবাদের নরকাভিমুখে তাহাদিগকে তাড়াইয়া লই চলিয়াছে, তাহার কবল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। বিভিন্ন সামা

আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ইতোমধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বেদান্তের উচ্চতম ভাবধারাই তাঁহাদের সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষার অধ্যাত্ম-রূপান্তর সাধন করিতে পারিবে। গ্রন্থের শেষ ভাগে আমাকে এ বিষয়ে আবার আলোচনা করিতে হইবে। এখন আমি অন্য একটি প্রধান বিষয়ের আলোচনা করিতে যাইতেছি—দেশের অভ্যন্তরে কার্যক্রম।

এই সমস্যার দুইটি দিক—কেবলমাত্র অধ্যাত্ম-রূপান্তর সাধন নয়, যে বিভিন্ন উপাদানে এ জাতি গঠিত, তাহাদের সমীকরণ। বিভিন্ন গোষ্ঠীকে এক আত্মীয়তাসূত্রে বিধৃত করা প্রত্যেক জাতির সাধারণ কর্তব্য।

[রচনাটি অসমাপ্ত]

আর্য ও তামিল

['প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় লিখিত ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ]

সত্যই, এ এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। হয়তো সম্প্রতি আবিষ্কৃত সুমাত্রার অর্ধবানরের কঙ্কালটিও এখানে পাওয়া যাইবে। ডোলমেনদেরও অভাব নাই। চকমকি-পাথরের অস্ত্রশস্ত্রও যে-কোন স্থানে মাটি খুঁড়িলেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। হ্রদ-অধিবাসিগণ, অন্ততঃ নদীতীরবাসিগণ—নিশ্চয়ই কোন কালে সংখ্যায় প্রচুর ছিলেন। গুহাবাসী এবং পত্রসজ্জা-পরিহিতগণ এখনও বর্তমান। বনবাসী আদিম মৃগয়াজীবীদের এখনও এদেশের নানা অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। তাছাড়া নেগ্রিটো-কোলারীয়, দ্রাবিড় এবং আর্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুগের নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যও উপস্থিত। ইহাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাতার, মঙ্গোলবংশসম্ভূত ও ভাষাতাত্ত্বিকগণের তথাকথিত আর্যদের নানা প্রশাখা-উপশাখা আসিয়া মিলিত হয়। পারসীক, গ্রীক, ইয়ুংচি, হুন, চীন, সীথিয়ান,—এমন অসংখ্য জাতি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে; ইহুদী, পারসীক, আরব, মঙ্গোলীয় হইতে আরম্ভ করিয়া স্কাণ্ডিনেভীয় জলদস্যু ও জার্মান বনচারী দস্যুদল অবধি—যাহারা এখনও একাত্ম হইয়া যায় নাই—এই-সব বিভিন্ন জাতির তরঙ্গায়িত বিপুল মানবসমুদ্র—যুধ্যমান, স্পন্দমান, চেতনায়মান, নিরন্তর পরিবর্তনশীল—ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া

ক্ষুদ্রতর জাতিগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া আবার শান্ত হইতেছে—ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাস।

প্রকৃতির এই উন্মাদনাস্রোতের মধ্যে অন্যতম একটি প্রতিযোগী জাতি একটি পন্থা উদ্ভাবন করিয়া আপন উন্নততর সংস্কৃতির সাহায্যে ভারতের অধিকাংশ জনগণকে আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হইল। এই উন্নত জাতি নিজেদের 'আর্য' বলিত এবং তাহাদের পন্থা ছিল বর্ণাশ্রমাচার—তথাকথিত জাতিভেদ-প্রথা।

আর্যজাতির জনসাধারণ অবশ্য জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেকগুলি সুবিধা নিজেদের হাতে রাখিয়া দিয়াছিল। তবু জাতিভেদপ্রথা চিরদিনই খুব নমনীয় ছিল; মাঝে মাঝে নিম্নস্তরের জাতিগুলির সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য ইহা একটু অতিরিক্ত নত হইয়া পড়িত।

ধনসম্পদ বা তরবারি দ্বারা নয়—আধ্যাত্মিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও শোধিত বুদ্ধি দ্বারাই এই আর্যজাতি অন্ততঃ তত্ত্বগতভাবে সমগ্র ভারতবর্ষকে চালিত করিয়াছিল। ভারতের প্রধান জাতি আর্যদের শ্রেষ্ঠ বর্ণ—ব্রাহ্মণ।

অন্যান্য দেশের সামাজিক পদ্ধতি হইতে আপাততঃ পৃথক্ মনে হইলেও, গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে আর্যদের জাতিবিভাগপ্রথা দুইটি ক্ষেত্র ছাড়া খুব পৃথক্ বলিয়া মনে হইবে না।

প্রথমতঃ অন্য সব দেশে শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়েরা। রাইন-নদীর তীরবর্তী কোন অভিজাতবংশীয় দস্যুকে নিজের পূর্বপুরুষরূপে আবিষ্কার করিতে পারিলে রোমের পোপ খুবই খুশী হইবেন। ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করেন প্রশান্তচিত্ত পুরুষগণ—শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, সাধক ও মহাপুরুষেরা।

ভারতের শ্রেষ্ঠ নরপতি অতীতের কোন অরণ্যচারী সংসারবিরাগী, সর্বস্বত্যাগী, ভিক্ষান্নজীবী, ইহকাল ও পরকালের তত্ত্বালোচনায় জীবন-অতিবাহনকারী ঋষিকে পূর্বপুরুষ বলিতে পারিলে আনন্দিত হইবেন।

দ্বিতীয়তঃ মাত্রাগত পার্থক্য। অন্য সব দেশে জাতিনির্ধারণের একক মাত্রা হিসাবে একজন নর বা নারীই যথেষ্ট। ধন, ক্ষমতা, বুদ্ধি বা সৌন্দর্যের দ্বারা যে-কেহ নিজ জন্মগত জাতির ঊর্ধ্বে যে-কোন স্তরে আরোহণ করিতে পারে।

ভারতবর্ষে সমগ্র গোষ্ঠীটিই জাতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে একক-রূপে গৃহীত। এখানেও নিম্নজাতি হইতে উচ্চতর বা উচ্চতম জাতিতে উন্নীত হইতে পারা

যায়; তবে এই পরার্থবাদের জন্মভূমিতে নিজ জাতির সকলকে লইয়া একত্র উন্নত হইতে হইবে।

ভারতবর্ষে ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য, ক্ষমতা বা অন্য কোন গুণের দ্বারা নিজ গোষ্ঠীর লোকদের পশ্চাতে ফেলিয়া উন্নতজাতির লোকদের সঙ্গে স্বাজাত্যের দাবি করিতে পার না। যাহারা তোমার উন্নতিতে সহায়তা করিয়াছে, তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া ঘৃণা করিতে পার না। যদি কেহ উচ্চতর জাতিতে উন্নীত হইতে চায়, তবে তাহার স্বজাতিকেও উন্নত করিতে হইবে—তাহা হইলে আর কোন কিছু বাধা দিতে পারিবে না।

ইহাই ভারতীয় স্বাঙ্গীকরণপদ্ধতি—সুদূর অতীত হইতে এই প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। অন্য যে-কোন দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষের পক্ষে এ-কথা আরও বেশী করিয়া খাটে যে, আর্য ও দ্রাবিড়—এই বিভাগ কেবল ভাষাতাত্ত্বিক বিভাগমাত্র, করোটিতত্ত্বগত (craniological) বিভাগ নহে, সে-ধরনের বিভাগের পক্ষে কোন দৃঢ় যুক্তিই নাই।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় নামগুলির ক্ষেত্রেও এইরূপ। উহারা কেবল একটি গোষ্ঠীর মর্যাদাসূচক, এই গোষ্ঠীও সর্বদা পরিবর্তনশীল, এমন কি পরিবর্তনের শেষ ধাপে উপনীত হইয়া যখন বিবাহনিষেধ (non-marriage) প্রভৃতির মধ্যেই অন্য সব প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ হইয়া আসিতেছে, তখনও নিম্নতর জাতি বা বিদেশ হইতে আগত লোকদিগকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিয়া এই গোষ্ঠীগুলি প্রসারিত হইতেছে।

যে-বর্ণের হস্তে তরবারি রহিয়াছে, সেই বর্ণই ক্ষত্রিয় হইয়া দাঁড়ায়; যাহারা বিদ্যাচর্চা লইয়া থাকে, তাহারাই ব্রাহ্মণ; ধনসম্পদ যাহাদের হাতে তাহারাই বৈশ্য।

যে-গোষ্ঠী আপন অভীষ্ট পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে, স্বাভাবিকভাবেই সে-গোষ্ঠী নবাগতদিগের নিকট হইতে নানা উপ-বিভাগের দ্বারা নিজেদের পৃথক্ করিয়া রাখে। কিন্তু শেষ অবধি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়। আমাদের চোখের উপর ভারতের সর্বত্র এইরূপ ঘটিতেছে।

স্বাভাবিকভাবেই যে-গোষ্ঠীটি নিজেদের উন্নীত করিয়াছে, তাহারা নিজেদের জন্য সব সুবিধা সংরক্ষিত করিয়া রাখিতে চায়। সুতরাং উচ্চবর্ণেরা—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা—যখনই সম্ভব হইয়াছে, রাজার সাহায্যে এবং প্রয়োজন হইলে অস্ত্রের

দ্বারাও নিম্নবর্ণের লোকেদের উচ্চাশা দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই, তাহারা কি সফল হইয়াছিল? নিজেদের পুরাণ ও উপপুরাণগুলি যত্ন সহকারে লক্ষ্য কর—বিশেষতঃ বৃহৎ পুরাণগুলির স্থানীয় সংস্করণগুলির প্রতি লক্ষ্য কর; দৃষ্টির সম্মুখে ও চারিদিকে যাহা ঘটিতেছে ভাল করিয়া লক্ষ্য কর—উত্তর পাইবে।

আমাদের বিভিন্ন বর্ণবিভাগ এবং নানা উপ-বিভাগের মধ্যে বর্তমান বিবাহ-প্রথাকে সীমাবদ্ধ রাখা (যদিচ এ রীতি সর্বত্র পালিত হয় না) সত্ত্বেও আমরা পুরাপুরি মিশ্রিত জাতি।

ভাষাতাত্ত্বিকদের 'আর্য' ও 'তামিল' এই শব্দ দুইটির নিহিত তাৎপর্য যাহাই হউক না কেন, এমন কি যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে, ভারতীয়দের এই দুই বিশিষ্ট শাখা ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্ত-পার হইতে আসিয়াছিল, তবু অতি প্রাচীনকাল হইতে এই বিভাগ ভাষাতত্ত্বগত—রক্তগত নহে। বেদে দস্যুদের কুৎসিত আকৃতিসম্বন্ধে যে-সকল বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাদের কোনটিই মহান্ তামিলভাষীদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। বস্তুতঃ আর্য ও তামিলদের মধ্যে কাহাদের দৈহিক সৌন্দর্য বেশী—এ সম্বন্ধে যদি কোন প্রতিযোগিতা হয়, তবে উহার ফলাফল সম্বন্ধে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সাহসী হইবে না।

বর্ণ-বিশেষের উৎপত্তি-সম্বন্ধে দাম্ভিকতাপূর্ণ মতবাদ অসার কল্পনামাত্র। দুঃখের সহিত বলিতে হয়, এই মতবাদ দাক্ষিণাত্যের মতো অন্য কোথাও এতটা সাফল্যলাভ করে নাই।

ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণের উৎপত্তির ইতিহাস লইয়া আমরা যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করি নাই, সেইরূপ ইচ্ছা করিয়াই আমরা দাক্ষিণাত্যের এই সামাজিক অত্যাচারের কথা বেশী আলোচনা করিব না। মাদ্রাজ-প্রদেশে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যে যে উত্তেজনা বিদ্যমান, তাহার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রমধর্ম মানবজাতিকে প্রদত্ত ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সম্পদসমূহের অন্যতম। আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, 'অনিবার্য ত্রুটিবিচ্যুতি, বৈদেশিক অত্যাচার, সর্বোপরি ব্রাহ্মণ-নামের অযোগ্য কিছুসংখ্যক ব্রাহ্মণের পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা ও দম্ভের দ্বারা বর্ণাশ্রমধর্মের স্বাভাবিক' সুফল-লাভ

ব্যাহত হইলেও এই বর্ণাশ্রমধর্ম ভারতে আশ্চর্য কীর্তি স্থাপন করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ভারতবাসীকে পরম লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত করিবে।

ভারতের আদর্শ পবিত্রতাস্বরূপ ভগবৎকল্প ব্রাহ্মণদের একটি জগৎসৃষ্টি—মহাভারতের মতে পূর্বে এইরূপ ছিল, ভবিষ্যতেও এইরূপ হইবে। দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণের প্রতি আমরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি, তাঁহারা যেন ভারতবর্ষের এই আদর্শকে ভুলিয়া না যান, মনে রাখেন।

যিনি নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া দাবি করেন, তিনি নিজের সেই পবিত্রতার দ্বারা এবং অপরকেও অনুরূপ পবিত্র করিয়া নিজের দাবি প্রমাণ করুন। ইহার বদলে বেশীর ভাগ ব্রাহ্মণই ভ্রান্ত জন্মগর্ব লালন করিতেই ব্যস্ত; স্বদেশী অথবা বিদেশী যে-কোন পণ্ডিত এই মিথ্যাগর্ব ও জন্মগত আলস্যকে বিরক্তিকর কুতর্কের দ্বারা লালন করেন, তিনিই ইহাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় হইয়া দাঁড়ান।

ব্রাহ্মণগণ, সাবধান, ইহাই মৃত্যুর চিহ্ন। তোমাদের চারিপাশের অব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করিয়া তোমাদের মনুষ্যত্ব—ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ কর, তবে প্রভুর ভাবে নয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন দূষিত গলিত অহঙ্কারের দ্বারা নয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উদ্ভট সংমিশ্রণের দ্বারাও নয়—শুধু সেবাভাবের দ্বারা। যে ভালভাবে সেবা করিতে জানে, সেই ভালভাবে শাসন করিতে পারে।

অব্রাহ্মণেরাও বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে ঘৃণাসৃষ্টিতে সাহায্য করিতেছেন—মূল সমস্যা-সমাধানের পক্ষে এ ধরনের কাজ নিতান্ত বিঘ্নস্বরূপ। অহিন্দুরাও এই পারস্পরিক ঘৃণার বিস্তারে সহায়তা করিতেছেন মাত্র।

বিভিন্ন বর্ণের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হইবে না; যদি এই বিরোধের আগুন একবার প্রবলভাবে জ্বলিয়া উঠে, তাহা হইলে সর্বপ্রকার কল্যাণমূলক প্রগতিই কয়েক শতাব্দীর জন্য পিছাইয়া যাইবে। ইহা বৌদ্ধদের রাজনীতিক বিভ্রান্তির পুনরাবর্তন হইয়া দাঁড়াইবে।

এই ঘৃণা-ও অজ্ঞতাপ্রসূত কোলাহলের মধ্যে পণ্ডিত শবরীরয়ান* একটিমাত্র যুক্তি ও বুদ্ধির পন্থা অনুসরণ করিতেছেন। মূর্খোচিত নিরর্থক কোলাহলে মহামূল্য প্রাণশক্তি নষ্ট না করিয়া তিনি 'সিদ্ধান্তদীপিকা'য় 'আর্য-তামিলগণের সংমিশ্রণ'-নামক প্রবন্ধে অতিসাহসিক পাশ্চাত্য ভাষাবিদ্‌গণের সৃষ্ট মতবাদের

* Pandit D. Savariroyan.

কুয়াশাই শুধু ভেদ করেন নাই, অধিকন্তু দাক্ষিণাত্যের জাতিসমস্যা-সমাধানে সহায়তা করিয়াছেন।

ভিক্ষার দ্বারা কেহ কখনও কিছু পায় নাই। আমরা যাহা পাইবার যোগ্য, তাহাই লাভ করিয়া থাকি। যোগ্যতার প্রথম ধাপ পাওয়ার ইচ্ছা; আমরা নিজেদের যাহা পাওয়াব যোগ্য বলিয়া মনে করি, তাহাই লাভ করিয়া থাকি।

বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যবাসীদের জন্য তথাকথিত 'আর্য'-মতবাদের জাল এবং ইহার আনুষঙ্গিক দোষগুলি শান্ত অথচ দৃঢ় সমালোচনার দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লওয়া প্রয়োজন। সেইসঙ্গে প্রয়োজন আর্যজাতির পূর্ববর্তী মহান্ তামিল-সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ও যথার্থ গৌরববোধ।

নানা পাশ্চাত্য মতবাদ সত্ত্বেও আমাদের শাস্ত্রসমূহে 'আর্য' শব্দটি যে-অর্থে দেখিতে পাই—যাহা দ্বারা এই বিপুল জনসঙ্ঘকে 'হিন্দু' নামে অভিহিত করা হয়—সেই অর্থটিই আমরা গ্রহণ করিতেছি। এ-কথা সব হিন্দুর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য যে, এই আর্যজাতি সংস্কৃত ও তামিল এই দুই ভাষাভাষীর সংমিশ্রণে গঠিত। কয়েকটি স্মৃতিতে যে শূদ্রদিগকে এই অভিধা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, ঐ শূদ্রেরা এখনও নবাগত শিক্ষার্থী মাত্র, ভবিষ্যতে উহারাও আর্যজাতিতে পরিণত হইবে।

যদিও আমরা জানি যে, পণ্ডিত শবরীরয়ান কিছুটা অনিশ্চয়তার পথে বিচরণ করিতেছেন, যদিও বৈদিক নাম ও জাতিসমূহ সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষিপ্র মন্তব্য-সমূহের সঙ্গে আমরা একমত নহি, তবুও আমরা এ-কথা জানিয়া আনন্দিত যে, তিনি ভারতীয় সভ্যতার মহান্ উৎস সংস্কৃতির (সংস্কৃতভাষী জাতিকে যদি সভ্যতার জনক বলা যায়) পূর্ণ পরিচয়লাভের পথে অগ্রসর হইয়াছেন।

তিনি যে প্রাচীন তামিলগণের সঙ্গে আক্কাদো-সুমেরীয়গণের জাতিগত ঐক্য-সম্বন্ধীয় মতবাদের উপর জোর দিয়াছেন, ইহাতেও আমরা আনন্দিত। ইহার ফলে অন্য সমুদয় সভ্যতার পূর্বে যে-সভ্যতাটি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল—যাহার সহিত তুলনায় আর্য ও সেমিটিক সভ্যতাদ্বয় শিশুমাত্র—সেই সভ্যতার সহিত আমাদের রক্তসম্বন্ধের কথা ভাবিয়া আমরা গৌরববোধ করিতেছি।

আমরা মনে করি, মিশরবাসীদের পন্টই মালাবার দেশ নয়, বরং সমগ্র মিশরীয়গণ মালাবার-তীর হইতে সমুদ্র পার হইয়া নীলনদের তীর ধরিয়া উত্তর

হইতে দক্ষিণের দিকে বদ্বীপ-অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিল। এই পন্ট্‌কে তাহারা পবিত্রভূমিরূপে সাগ্রহে স্মরণ করিত।

এই প্রচেষ্টাটি ঠিক পথে চলিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রসমূহের মধ্যে তামিল ভাষা ও উপাদান যতই আবিষ্কৃত হইবে, ততই আরও বিশদ ও নিখুঁত আলোচনা দেখা দিবে। তামিল-ভাষার বৈশিষ্ট্য যাঁহারা মাতৃভাষার ন্যায় আয়ত্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা এ-কাজে যোগ্যতর আর কাহাকে পাওয়া যাইবে?

আমরা বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী—আমরা বেদের সংস্কৃতভাষী পূর্বপুরুষদের জন্য গর্ব অনুভব করি; এ পর্যন্ত পরিচিত সর্বপ্রাচীন সভ্যজাতি তামিলভাষীদের জন্য আমরা গর্বিত; এই দুই সভ্যতার পূর্ববর্তী অরণ্যচারী মৃগয়াজীবী কোল পূর্ব-পুরুষগণের জন্য আমরা গর্বিত; মানবজাতির যে আদিপুরুষেরা প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ফিরিতেন, তাঁহাদের জন্য আমরা গর্বিত; আর যদি বিবর্তনবাদ সত্য হয়, তবে আমাদের সেই জন্তুরূপী পূর্বপুরুষদের জন্যও আমরা গর্বিত—কারণ তাহারা মানবজাতিরও পূর্ববর্তী। জড় অথবা চেতন এই সমগ্র বিশ্ব-জগতের উত্তরপুরুষ বলিয়া আমরা গর্বিত। আমরা যে জন্মগ্রহণ করি, কাজ করি, যন্ত্রণা পাই, এজন্য আমরা গর্ব বোধ করি—আবার কর্মাবসানে আমরা মৃত্যুর মধ্য দিয়া মায়াতীত জগতে প্রবেশ করি, এজন্য আরও বেশী গর্ব অনুভব করি।

ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ

[Historical Evolution of India—প্রবন্ধের অনুবাদ]

ওঁ তৎ সৎ।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

নাসতো সদ্ জায়েত।

অনস্তিত্ব হইতে কোন অস্তিত্বের উদ্ভব সম্ভব নহে। যাহা 'অসৎ', তাহা কোন সদ্বস্তুর হেতুও হইতে পারে না। শূন্যতা হইতে কোন বস্তু জাত হয় না।

কার্য-কারণ-নিয়ম আর্যজাতিরই মতো সুপ্রাচীন। এই নিয়ম সর্বশক্তিমান্, কোন দেশ বা কালের সীমায় ইহা আবদ্ধ নয়। প্রাচীন ঋষি-কবিগণ ইহার মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, দার্শনিকগণ ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন এবং ইহাকেই ভিত্তিপ্রস্তর-রূপে স্বীকার করিয়া আজ পর্যন্ত হিন্দুজাতি তাহার জীবনদর্শন রচনা করিয়া চলিয়াছে।···

যুগ-প্রারম্ভে জাতির মনে ছিল কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা। অল্পকাল মধ্যে সেই জিজ্ঞাসাই বলিষ্ঠ বিশ্লেষণে পরিণতি লাভ করে এবং যদিও আদিযুগের প্রথম-প্রয়াসের মধ্যে কাঁচা-হাতের অপরিণত স্বাক্ষর ছিল—যেমন থাকে সুদক্ষ স্থপতির প্রাথমিক সৃষ্টির মধ্যে, তথাপি নির্ভীক উদ্যম ও নিখুঁত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর মধ্য দিয়া সে এক বিস্ময়কর ফল প্রসব করিয়াছিল।

এই জিজ্ঞাসার সাহস আর্য-ঋষিদিগকে নিয়োজিত করিয়াছিল যজ্ঞবেদীর প্রতিটি ইষ্টকখণ্ডের স্বরূপ-অনুসন্ধানে, উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল শাস্ত্রের প্রতিটি শব্দের মাত্রানির্ণয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে কিংবা ঐগুলির পুনর্বিন্যাসে। ইহারই প্রেরণায় পূজা-উৎসবাদির তাৎপর্য সম্পর্কে কখন তাঁহারা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কখন ঐগুলির ব্যাখ্যায় বা বিশ্লেষণে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কখন বা সেগুলি একেবারে বর্জন করিয়াছিলেন।

এই অনুসন্ধিৎসার ফলে প্রচলিত দেবতাবর্গকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজা হইয়াছিল এবং সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্ বিশ্বস্রষ্টারূপে যিনি কীর্তিত, যিনি পিতৃপুরুষের স্বর্গীয় পিতা—তাঁহার জন্য হয় একটি দ্বিতীয় পর্যায়ের স্থান

নির্দিষ্ট হইয়াছিল, অথবা এককালে অপ্রয়োজনীয় বোধে তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, তাঁহাকে বাদ দিয়াই এক সার্বভৌম ধর্ম প্রবর্তিত হইয়াছিল, সকল ধর্ম অপেক্ষা সেই ধর্মের অনুগামি-সংখ্যা আজও সর্বাধিক।

ইহারই অনুপ্রেরণায় যজ্ঞবেদীর ইষ্টক-স্থাপন-ব্যবস্থা হইতে জ্যামিতি-বিজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছিল। আবার পুজা-উপাসনার যথাযথ কাল-নির্ণয়ের চেষ্টা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান, যাহা সকলকে বিস্মিত করিয়াছিল।

ঐ অনুসন্ধিৎসা হইতেই অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহাদের দান প্রাচীন অথবা আধুনিক যে-কোন জাতির দান অপেক্ষা অধিকতর হইয়াছিল এবং রসায়নশাস্ত্রে ধাতু-ঘটিত ঔষধ প্রস্তুত করিবার অভিজ্ঞতায়, সঙ্গীতের স্বরগ্রাম-নির্ধারণে, বেহালা-জাতীয় তারযন্ত্রের উদ্ভাবনে তাহাদের যে প্রতিভা, তাহাই আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। এই ভাব হইতেই বিচিত্র গল্প ও উপাখ্যানের সাহায্যে অপরিণত শিশুমন গড়িয়া তুলিবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং আজও পৃথিবীর সর্বদেশে শৈশবের শিক্ষায়তনে শিশুগণ ঐ-সকল গল্পই শিখিয়া থাকে, আর ঐগুলির মধ্য দিয়াই জীবনের পটে সুস্পষ্ট ছাপ গ্রহণ করে।

এই তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তির সম্মুখে এবং পশ্চাতে যেন একটি কোমল ও মসৃণ আচ্ছাদন ছিল এবং তাহারই মধ্যে সুরক্ষিত ছিল এই জাতির অপর একটি মানসিক বৈশিষ্ট্য—যাহাকে 'কবির অন্তর্দৃষ্টি' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই জাতির ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতি সব কিছুই যেন কবি-কল্পনার পুষ্পবেদীতে স্থাপিত ছিল এবং সেগুলিকে অন্য যে-কোন ভাষা অপেক্ষা সুন্দরতররূপে প্রকাশ করিয়াছিল এক বিচিত্র ভাষা—যাহার নাম 'সংস্কৃত' বা 'পূর্ণাঙ্গ' ভাষা। এমন কি গণিতের কঠিন সংখ্যাতত্ত্বসমূহ প্রকাশ করিতেও ছন্দোবদ্ধ শ্লোক ব্যবহৃত হইয়াছিল।

সেই বিশ্লেষণী শক্তি এবং নির্ভীক কবি-কল্পনা, যাহা ঐ শক্তিকে প্রেরণা দিত—এই দুইটি আভ্যন্তরীণ কারণই হিন্দুর জাতীয় চরিত্রের প্রধান সুর ; ঐ দুইটি সমন্বিত শক্তির বলেই আর্যজাতি চিরদিন ইন্দ্রিয়-স্তর হইতে অতীন্দ্রিয় স্তরের দিকে গতিশীল, এবং ইহাই এই জাতির দার্শনিক চিন্তাধারার গোপন রহস্য; ইহা দক্ষকারিগর-নির্মিত ইস্পাত-ফলকের মতো, যাহা

লৌহদণ্ডকে ছেদন করিতে পারে, আবার বৃত্তাকারে রূপায়িত হইবার মতো নমনীয়ও বটে।

স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্রে তাহারা ছন্দ-গাথা উৎকীর্ণ করিয়াছিল। মণিমাণিক্যের ঐকতানে, মর্মর-প্রস্তরের বহু বিচিত্র স্থাপত্যে, বর্ণ-সুষমার সঙ্গীতে এবং সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্পের সৃষ্টিতে—যে-সৃষ্টি এই জগতের বাহিরে অন্য এক রূপকথার জগতের বলিয়া মনে হইত, সব কিছুর পশ্চাতে এই জাতির চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সহস্রবর্ষ-ব্যাপী সাধনা নিহিত ছিল।

কলা, বিজ্ঞান, এমন কি প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতা পর্যন্ত—সব কিছু এমন ছন্দোময় ভাবদ্বারা মণ্ডিত ছিল যে, চরমে ইন্দ্রিয়ানুভূতি অতীন্দ্রিয় স্তরে উত্তীর্ণ হইত, স্থূল বাস্তবতা সূক্ষ্ম অবাস্তবতার রঙিন আভায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিত।

এ-জাতির দূর-অতীত ইতিহাসের যতটুকু আভাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে বোঝা যায়, সেই আদিযুগেই—ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োগ করিবার যন্ত্র-হিসাবে এই বৈশিষ্ট্য তাহাদের আয়ত্তে ছিল। বেদ-গ্রন্থে এই জাতির জীবনাখ্যায়িকা চিত্রিত হইবার পূর্বে চলার পথে বহু প্রকারের ধর্ম ও সমাজ পশ্চাতের পথরেখায় নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হইয়াছিল।

সেখানে দেখা যায়—এক সুসংবদ্ধ দেবতামণ্ডলী, উৎসবাদির বিস্তারিত ব্যবস্থা, ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির তাগিদে গঠিত বংশানুক্রমিক একটি সমাজ। সেখানে ইতিমধ্যেই অনেক প্রয়োজনীয় ও বিলাসের সামগ্রী বর্তমান।

আধুনিক পণ্ডিতগণের প্রায় সকলেই এ-বিষয়ে একমত যে, ভারতীয় জলবায়ু এবং ভারতে প্রচলিত রীতিনীতি তখনও এই জাতির উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

আরও কয়েক শতাব্দী অতিক্রান্ত হইল। তখন দেখা গেল এক মানব-গোষ্ঠী, তাহাদের উত্তরে তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়, দক্ষিণে দক্ষিণাপথের উষ্ণতা—মধ্যে দিগন্তবিস্তীর্ণ সমতল, সীমাহীন অরণ্য-অঞ্চল, আর তাহাদেরই মধ্য দিয়া দুর্বার-গতি নদীসমূহ প্রচণ্ড স্রোতে প্রবাহিত। তাতার, দ্রাবিড়, আদিবাসী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির ক্ষণিক আভাস পাওয়া যায়; শেষে দেখা যায় ইহাদেরই শোণিতধারা, ভাষা ধর্ম ও আচার-পদ্ধতির নির্ধারিত অংশ-সংযোগে—ধীরে ধীরে আর্যদেরই অনুরূপ আর এক মহান্ জাতির উদ্ভব হইয়াছে, যাহারা আরও শক্তিশালী,—উদার অঙ্গীভূত-করণের ফলে অধিকতর সংবদ্ধ।

আরও দেখা যায়, এই কেন্দ্রীয় গোষ্ঠী গ্রহণ-শক্তির প্রভাবে সমগ্র দেশের জনসাধারণের উপর স্বকীয় চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের ছাপ অঙ্কিত করিয়াও বিশেষ গর্বের সঙ্গে নিজেদের 'আর্য'-পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে এবং অপরাপর জাতিকে নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতির সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে সম্মত হইয়াও আর্যজাতির অন্তরঙ্গ-গোষ্ঠীর মধ্যে কাহাকেও গ্রহণ করিতে অসম্মত।

ভারতীয় আবহাওয়া এই জাতির প্রতিভাকে উন্নততর লক্ষ্যে চালিত করিয়াছিল। এ দেশের প্রকৃতি ছিল কল্যাণময়ী, পরিবেশ ছিল আশু ফলপ্রসূ। সুতরাং জাতির সমষ্টি-মন সহজেই উন্নত চিন্তাক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া জীবনের বৃহত্তর সমস্যাসমূহের মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিল এবং সেইগুলিকে জয় করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। ফলে দার্শনিক এবং পুরোহিত ভারতীয় সমাজে সর্বোচ্চ আসন লাভ করিয়াছিলেন, অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয় নয়।

পুরোহিতগণ আবার ইতিহাসের সেই আদিম যুগেই পূজা-অর্চনার বিস্তারিত বিধিনিয়ম-প্রণয়নে নিজেদের শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল। পরে কালক্রমে, যখন সে-সকল প্রাণহীন অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্মের বোঝা জাতির পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তখনই দার্শনিক চিন্তা দেখা দিল, এবং ক্ষত্রিয়েরাই প্রথম মারাত্মক আচার-অনুষ্ঠানের বেড়াজাল ছিন্ন করিয়াছিল।

সে এক দ্বন্দ্বের কাল।...

একদিকে পুরোহিতকুলের অধিকাংশ আর্থিক প্রয়োজনের তাগিদে বাধ্য হইয়াই শুধু সেই-সকল ক্রিয়াকর্মকেই সমর্থন করিত, যেগুলির জন্য সমাজ-ব্যবস্থায় তাহারা অপরিহার্য এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা তাহাদের প্রাপ্য। আবার অন্যদিকে যে রাজন্যবর্গের শক্তি ও শৌর্যই জাতিকে রক্ষা করিত—পরিচালিত করিত এবং যাঁহাদের নেতৃত্ব তখন উচ্চ মননক্ষেত্রেও প্রসারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাঁহারা শুধু ক্রিয়ানুষ্ঠানদক্ষ পুরোহিতবর্গকে সমাজের সর্বোচ্চ স্থান ছাড়িয়া দিতে আর সম্মত ছিলেন না। আরও একদল ছিল, পুরোহিতকুল ও রাজকুল—উভয় হইতে যাহারা উদ্ভূত, তাহারা পুরোহিত এবং দার্শনিক দুই শ্রেণীকেই বিদ্রূপ করিত, অধ্যাত্মবাদকে ধাপ্পাবাজি ও বুজরুকি বলিয়া অভিহিত করিত এবং জাগতিক সম্ভোগকেই জীবনের সর্বোত্তম কাম্যবস্তু বলিয়া ঘোষণা করিত। ইহারাই জড়বাদী।

সাধারণ মানুষ তখন ধর্মের প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানে ক্লান্ত এবং দার্শনিক ব্যাখ্যার জটিলতায় বিভ্রান্ত; কাজেই তাহারা দলে দলে এই জড়বাদীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল। শ্রেণীগত সমস্যার সূচনা তখন হইতেই, এবং ভারত-ভূখণ্ডে আনুষ্ঠানিক ধর্ম, দার্শনিকতা ও জড়বাদের মধ্যে যে ত্রিমুখী বিরোধ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা আজ পর্যন্ত অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে।

এ বিরোধের প্রথম সমাধান-প্রচেষ্টা শুরু হয় ভাব-সমীকরণের সূত্র অনুসরণ করিয়া, যাহা স্মরণাতীত কাল হইতে জনসাধারণকে একই সত্য বিভিন্নভাবে দেখিতে শিখাইয়াছিল।

এই চিন্তাধারার মহান্ নেতা ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। তাঁহারই উপদেশ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। জৈন, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য বহু সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের ও বিপর্যয়ের পর অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ অবতাররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং যথার্থ জীবনদর্শন-রূপে গীতা স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল।

বর্ণাধিকারে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবার জন্য রাজন্যবর্গের যে দাবি এবং পুরোহিতকুলের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভ-জনিত যে উত্তেজনা, তাহা সাময়িকভাবে প্রশমিত হইলেও তাহার মূলীভূত হেতু যে সামাজিক বৈষম্য, তাহা তখনও দূর হইল না, রহিয়াই গেল। শ্রীকৃষ্ণ জাতি-নির্বিশেষে সকলের সম্মুখে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে অনুরূপ সমস্যা তিনি স্পর্শ করেন নাই। সকলের সামাজিক সাম্যের জন্য বৌদ্ধ বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিপুল সংগ্রাম সত্ত্বেও সেই অমীমাংসিত সমস্যা আমাদের কাল পর্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছে।

তাই দেখা যায়, বর্তমান কালের ভারতবর্ষে মানুষের আধ্যাত্মিক সমতা স্বীকৃত হইলেও সামাজিক বৈষম্য দৃঢ়ভাবে রক্ষিত হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই, সেই সামাজিক বৈষম্যের বিরোধ খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে নূতন শক্তি লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে শাক্যমুনি বুদ্ধদেবের নেতৃত্ব প্রাচীন আচার-ব্যবস্থাদি একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই সময় বিশেষ-অধিকারভোগী পুরোহিতবর্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়ায় বৌদ্ধগণ প্রাচীন বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, বৈদিক দেবতাদিগকে বৌদ্ধাচার্যগণের ভৃত্যশ্রেণীতে অবনমিত করিয়াছিল; সেই সঙ্গে এই কথা ঘোষণা করিয়াছিল যে, 'স্রষ্টা'

বা 'সর্বনিয়ন্তা' বলিয়া কিছু নাই, উহা পুরোহিতগণের আবিষ্কার অথবা কুসংস্কার মাত্র।

পূজানুষ্ঠানে পশুবলি নিবারণ করিয়া, বংশগত জাতিভেদ ও পুরোহিতকুলের আধিপত্য লুপ্ত করিয়া এবং আত্মার নিত্যত্বে অবিশ্বাস করিয়া বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য ছিল বৈদিক ধর্মের সংস্কার করা। বৌদ্ধধর্ম কখনও হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করিতে চাহে নাই, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত করিতে চাহে নাই। বৌদ্ধগণ একদল ত্যাগী সাধুকে একটি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ে সুগঠিত করিয়াছিল, কতিপয় ব্রহ্মবাদিনী নারীকে সন্ন্যাসিনীরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিল, আর যজ্ঞবেদীর স্থানে সিদ্ধ মহাপুরুষদের প্রতিমূর্তি স্থাপন করিয়াছিল। এই ভাবেই প্রাণশক্তিসম্পন্ন একটি পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছিল।...

খুব সম্ভব এই সংস্কারকগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতের জনসাধারণের আনুগত্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং যদিও প্রাচীন শক্তিসমূহ কখনই সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে নাই, তথাপি বৌদ্ধপ্রাধান্যের কালে তাহাদের মধ্যে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্বযুগেই মননশীলতা ও আধ্যাত্মিকতা জাতির প্রাণ-কেন্দ্র ছিল, রাজনীতি নয়। বস্তুতঃ আধুনিক কালের মতো প্রাচীনকালেও রাজনীতিক ও সামাজিক ক্ষমতা—আধ্যাত্মিক সাধনা ও বিদ্যাবুদ্ধি-চর্চার নিম্নে স্থান পাইত। মুনি-ঋষি এবং আচার্যগণ যে-সকল শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করিতেন, সেগুলিকে অবলম্বন করিয়াই জাতীয় জীবন উচ্ছ্বসিত হইত।

সেইজন্য দেখা যায়, পাঞ্চাল বারাণসী ও মিথিলাবাসীদের সমিতিগুলি অধ্যাত্ম-সাধনা ও দার্শনিক উৎকর্ষের মহান্ কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কালক্রমে আবার এগুলিই আর্যসমাজের বিভিন্ন দল-উপদলের পক্ষে রাজনীতিক উচ্চাভিলাষ-পূরণের কর্মকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।

আধিপত্য লাভের জন্য কুরুপাঞ্চাল যে-যুদ্ধে পরস্পরকে ধ্বংস করিয়াছিল, সে-যুদ্ধের ইতিহাস প্রাচীন মহাকাব্য 'মহাভারতে'র মাধ্যমে আমরা পাইয়াছি। পূর্বাঞ্চলে মগধ ও মিথিলাকে ঘিরিয়াই আধ্যাত্মিক প্রাধান্য আবর্তিত হইয়াছিল এবং কুরুপাঞ্চাল-যুদ্ধের অবসানে মগধের রাজশক্তি কতকটা প্রাধান্য লাভ করে।

এই পূর্বাঞ্চলই বৌদ্ধদিগের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল এবং সেখানেই তাহাদের সংস্কারমূলক কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হয়। আবার যখন মৌর্য

নরপতিগণ সম্ভবতঃ নিজেদের ক্ষতিকর কুলকলঙ্কচিহ্ন স্খালন করিবার জন্য বাধ্য হইয়া ঐ নূতন আন্দোলনকে—শুধু সমর্থন নয়—পরিচালিতও করিয়াছিলেন, তখন নূতন পুরোহিত-শক্তি পাটলিপুত্রের রাজশক্তির সহিত হাত মিলাইয়াছিল।

একদিকে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা এবং নূতন প্রাণশক্তি যেমন মৌর্য রাজন্য-বর্গকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ সম্রাটরূপে গৌরবান্বিত করিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি মৌর্যরাজশক্তির সাহায্যেই বৌদ্ধধর্ম সমগ্র বিশ্বে প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত তাহার চিহ্ন আমরা দেখিতে পাইতেছি।…'

এ কথা অবশ্য সত্য যে, প্রাচীন বৈদিক ধর্মের বর্জনশীলতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ বাহিরের কোন সাহায্য-গ্রহণে তাহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিল। ইহারই ফলে বৈদিক ধর্ম যেমন শুচিতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তেমনি অনেক হীন প্রভাব হইতেও নিজেকে মুক্ত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু প্রচারের অতি উৎসাহে বৌদ্ধধর্মের পক্ষে সেটি সম্ভব হয় নাই।

অত্যধিক গ্রহণ-প্রবণতার জন্য বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রায় সবটুকুই হারাইয়া ফেলে, এবং জনপ্রিয়তার চরম আগ্রহে কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই মূল বৈদিক ধর্মের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা আর তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বৈদিক সম্প্রদায় ইতিমধ্যে পশুবলি প্রভৃতি বহু অবাঞ্ছিত আচার-অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়াছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী বৌদ্ধ ধর্মের উদাহরণ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া, বিশেষ বিবেচনার সহিত মূর্তি-উপাসনা, মন্দিরে শোভাযাত্রা প্রভৃতি জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবাদির প্রভূত পরিবর্তন সাধন করিয়া যথাসময়ে পতনোন্মুখ ভারতীয় বৌদ্ধধর্মকে এককালে নিজ আবেষ্টনীর মধ্যে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

সীথিয়ানদের ভারতাক্রমণ এবং পাটলিপুত্র-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সব যেন হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া গেল। এই আক্রমণকারীর দল নিজেদের বাসভূমি মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধ প্রচারকদের আক্রমণে ইতিপূর্বে ক্রোধদীপ্ত হইয়াছিল। এখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের সূর্যোপাসনার সহিত নিজেদের সৌরধর্মের প্রভূত সাদৃশ্য তাহারা লক্ষ্য করিল এবং যখন ব্রাহ্মণগণ তাহাদের বহু আচার-পদ্ধতি নিজেদের ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হইল, তখন সহজেই তাহারা ব্রাহ্মণদের পক্ষ অবলম্বন করিল।

তারপরই এক অন্ধকারময় যুগের কৃষ্ণ যবনিকা—যাহার দীর্ঘ ছায়া ক্ষণে ক্ষণে ইতস্ততঃ প্রসারিত। কখন যুদ্ধের কোলাহল ও আর্তনাদ, কখন ব্যাপক নরহত্যার জনশ্রুতি—সে-কালের এই ছিল পরিস্থিতি, আর তাহার অবসানে এক নূতন অবস্থায় নূতন দৃশ্যের সূচনা হইয়াছিল।

তখন আর মগধ-সাম্রাজ্য নাই। প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারতবর্ষ পরস্পর-বিবদমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ-কর্তৃক শাসিত হইতেছে। পূর্বাঞ্চলে ও হিমালয়ের সন্নিহিত কোন কোন প্রদেশে এবং সুদূর দক্ষিণে ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম তখন লুপ্তপ্রায়। আর সেই পরিস্থিতির মধ্যেই বংশানুক্রমিক পুরোহিত-শক্তির সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রামের পর জাতি জাগিতেছে; জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, জাতির জীবন একদিকে বংশগত ব্রাহ্মণের, অন্যদিকে নবযুগের বর্জনশীল সন্ন্যাসীর—এই দ্বিবিধ পৌরোহিত্যের কবলে; এই সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় বৌদ্ধ-সংগঠনী-শক্তির অধিকারী হইলেও বৌদ্ধদের মতো জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল না।

ইহার পর প্রাচীনের ধ্বংসস্তূপ হইতেই নবজাগ্রত ভারতবর্ষের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। নির্ভীক রাজপুত-জাতির বীর্যে ও শোণিতের বিনিময়ে সে ভারত-বর্ষের জন্ম, মিথিলার সেই ঐতিহাসিক জ্ঞান-কেন্দ্রের নির্মম ক্ষুরধারবুদ্ধি জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক সেই নবভারতের স্বরূপ ব্যাখ্যাত; আচার্য শঙ্কর এবং তাঁহার সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়-প্রবর্তিত এক নূতন দার্শনিক ভাবের দ্বারা সেই ভারত পরিচালিত এবং মালবের সভাকবি ও সভাশিল্পিবৃন্দের সাহিত্য ও শিল্পদ্বারা সে-ভারত সৌন্দর্য-মণ্ডিত।

নবজাগ্রত ভারতেব সম্মুখে দায়িত্ব ছিল গুরুতর, সমস্যা ছিল বিরাট, যে-সমস্যা পূর্বপুরুষদের সম্মুখেও কখন উপস্থিত হয় নাই।

তুলনীয় অবস্থাটি ছিল এই: প্রথম যুগের একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও সংহত জাতি; একই রক্ত-স্রোত যাহাদের মধ্যে প্রবাহিত, যাহাদের ভাষা এবং সামাজিক আকাঙ্ক্ষা-অভিলাষ এবং দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকার-বেষ্টনীর অন্তরালে নিজেদের ঐক্য-সংরক্ষণে যাহারা নিয়ত যত্নশীল,—সেই জাতিই বৌদ্ধপ্রাধান্যের কালে বহু সংযোজন ও বিস্তারের ফলে এক বিপুল আয়তন লাভ করিয়াছিল। আবার বর্ণ, ভাষা, ধর্মসংস্কার, সামাজিক উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি বিপরীত প্রভাবে সেই জাতিই বহু বিবদমান গোষ্ঠীতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এখন সেইগুলিকে একটি

বিরাট সঙ্ঘবদ্ধ জাতিতে গড়িয়া তোলাই এক প্রকৃত সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বৌদ্ধগণও অবশ্য এই সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাহার আয়তন ও গুরুত্ব এত বিস্তৃত ছিল না।

তখন পর্যন্ত প্রশ্ন ছিল—আর্যজাতিভুক্ত হইবার জন্য যে-সকল মানবগোষ্ঠী আগ্রহান্বিত, তাহাদিগকে স্বকীয় সংস্কৃতিতে অনুপ্রাণিত করিয়া বহুবিচিত্র উপাদান-সমন্বিত এক বিরাট আর্যদেহ গড়িয়া তোলা।...বিশেষ সুবিধাদানের এবং আপসের মনোভাব সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্ম প্রভূত সাফল্য অর্জন করিয়াছিল, এবং ভারতবর্ষের জাতীয় ধর্মরূপে বিরাজিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে তাহাদের ইতরজাতি-সুলভ ইন্দ্রিয়াসক্তি-বহুল উপাসনার প্রলোভন আর্যগোষ্ঠীর অস্তিত্বের পক্ষেই মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সে সংযোগ দীর্ঘতর কালের জন্য স্থায়ী হইলে আর্যসভ্যতা নিঃসন্দেহে বিনষ্ট হইত। ইহার পর স্বভাবতই আত্মরক্ষার একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, এবং নিজবাসভূমিতে স্বতন্ত্র ধর্মসম্প্রদায়-রূপে বৌদ্ধধর্ম আর টিকিয়া থাকিতে পারে নাই।

সেই প্রতিক্রিয়া-আন্দোলন উত্তরে কুমারিল্ল এবং দক্ষিণে আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া বহু মত, বহু সম্প্রদায়, বহু পূজা-পদ্ধতি পুঞ্জীভূত হইয়া হিন্দুধর্মে তাহার শেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। বিগত সহস্র বৎসর কিংবা তদপেক্ষা অধিক কাল ধরিয়া এই অঙ্গীভূত করাই ছিল তাহার প্রধান কাজ। মাঝে মাঝে দেখা দিত সাময়িক সংস্কার-আন্দোলন।

এই প্রতিক্রিয়া প্রথমতঃ বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানগুলির পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিল। পরে তাহাতে ব্যর্থ হইয়া বেদের দার্শনিক ভাগ বা উপনিষদ-সমূহকেই ভিত্তিরূপে স্থাপন করিয়াছিল।

এই আন্দোলন ব্যাসদেবের মীমাংসা-দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ গীতাকে পুরোভাগে স্থাপন করে এবং পরবর্তী কালের যাবতীয় আন্দোলন ঐ পন্থা অবলম্বন করিয়াই অগ্রসর হইয়াছিল। শঙ্করাচার্যের আন্দোলন অতি উচ্চ জ্ঞানমার্গেই চালিত হইয়াছিল। কিন্তু জাতিভেদে অতিনিষ্ঠা, সহজ ভাবাবেগ সম্পর্কে ঔদাসীন্য এবং শুধু সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে প্রচার—এই ত্রিবিধ কারণে জনসাধারণের মধ্যে সে আন্দোলন বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। অন্যদিকে রামানুজ একটি অত্যন্ত কার্যকর ও বাস্তব 'মতবাদের ভিত্তিতে এবং ভাব-ভক্তির বিরাট আবেদন লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। ধর্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে জন্মগত জাতিবিভাগ

তিনি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিলেন, সর্বসাধারণের কথ্যভাষাই ছিল তাঁহার প্রচারের ভাষা। ফলে জনসাধারণকে বৈদিক ধর্মের আবেষ্টনীতে ফিরাইয়া আনিতে রামানুজ সম্পূর্ণভাবে সফল হইয়াছিলেন।

উত্তরাঞ্চলে সে প্রতিক্রিয়ার পরেই মালব সাম্রাজ্যের সাময়িক গৌরবদীপ্তি দেখা দিয়াছিল। কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহার অবসান ঘটিলে উত্তর-ভারত যেন দীর্ঘকালের জন্য গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল। আর সে-নিদ্রা রূঢ়ভাবে ভাঙিয়াছিল আফগানিস্তানের গিরিবর্ত্ম দিয়া সবেগে সম্মুখে ধাবমান মুসলমান অশ্বারোহি-দলের বজ্রনিনাদে।

যাহা হউক, দক্ষিণাঞ্চলে শঙ্কর ও রামানুজের অভ্যুদয়ের পরই এ-দেশের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে একতাবদ্ধ জাতি ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। কাজেই দক্ষিণভারতই তখন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির আশ্রয়ভূমি হইয়া উঠিয়াছিল; আর, এক সমুদ্রতীর হইতে অন্য সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র উত্তর-ভারত—মধ্য-এশিয়ার বিজেতাদের পাদমূলে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

দক্ষিণভারতকে পদানত করিবার জন্য মুসলমানগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে-অঞ্চলের কোথাও একটি শক্ত ঘাঁটিও স্থাপন করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী মোগল সাম্রাজ্যের দক্ষিণবিজয় যখন প্রায় সমাপ্তির মুখে, ঠিক তখনই সেই ভূখণ্ডের পার্বত্যপ্রদেশ হইতে, মালভূমির নানাপ্রান্ত হইতে কৃষকগণ অশ্বারোহী যোদ্ধৃবেশে দলে দলে কাতারে কাতারে রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। রামদাস-প্রচারিত, তুকারাম-সমুদ্গীত ধর্মের জন্য তাহারা প্রাণ বিসর্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প; এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য নামমাত্রে পর্যবসিত হইল।

মুসলমানযুগে উত্তরভারতে বিজয়ী জাতির ধর্মে দীক্ষা-গ্রহণ হইতে জনসাধারণকে নিবৃত্ত রাখাই ছিল সকল আন্দোলনের মুখ্য প্রয়াস; তাহারই ফলে সে-সময়ে ধর্মজগতে এবং সমাজ-ব্যবস্থায় সমানাধিকারের ভাব দেখা দিয়াছিল।

রামানন্দ, কবীর, দাদূ, শ্রীচৈতন্য বা নানক এবং তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুসন্তগণ দার্শনিক বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও মানুষের সম-অধিকার-প্রচারে সকলে একমত ছিলেন। সাধারণের মধ্যে ইসলামের অতি দ্রুত অনুপ্রবেশ রোধ করিতেই ইঁহাদের অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে; কাজেই

নূতন আকাঙ্ক্ষা বা আদর্শের উদ্ভাবন তখন তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বস্তুতঃ যদিও জনসাধারণকে নিজ ধর্মের আবেষ্টনীতে ধরিয়া রাখিবার জন্য তাঁহাদের প্রয়াস অনেকটা ফলপ্রসূ হইয়াছিল, এবং মুসলমানদিগের উগ্র সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামিও কতকটা প্রশমিত করিতে তাঁহারা সক্ষম হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা ছিলেন নিছক আত্মসমর্থনকারী ; কোনপ্রকারে শুধু বাঁচিয়া থাকার অধিকার লাভ করিবার জন্যই তাঁহারা প্রাণপণ সংগ্রাম করিতেছিলেন।

এইকালে উত্তরভারতে একজন শক্তিমান্ দিব্য পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। সৃজনী-প্রতিভাসম্পন্ন শেষ শিখগুরু—গুরু গোবিন্দসিংহের আধ্যাত্মিক কার্যাবলীর ফলেই শিখসম্প্রদায়ের সর্বজনবিদিত রাজনীতিক সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভারতের ইতিহাসে বরাবর দেখা গিয়াছে, যে-কোন আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের পরে, তাহারই অনুবর্তিভাবে একটি রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যবোধ জাগ্রত হইয়া থাকে এবং ঐ বোধই আবার যথানিয়মে নিজ জনয়িত্রী যে বিশেষ আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা, তাহাকে শক্তিশালী করিয়া থাকে। কিন্তু মহারাষ্ট্র বা শিখ সাম্রাজ্যের উত্থানের প্রাক্কালে যে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা ছিল সম্পূর্ণরূপে প্রতিক্রিয়াশীল। মালব কিংবা বিদ্যানগরের কথা দূরে থাকুক, মোগল-দরবারেও তদানীন্তন কালে যে-প্রতিভা ও বুদ্ধিদীপ্তির গৌরব ছিল, পুনার রাজ-দরবার কিংবা লাহোরের রাজসভায় বৃথাই আমরা সে দীপ্তির অনুসন্ধান করিয়া থাকি। মানসিক উৎকর্ষের দিক হইতে এই যুগই ভারত-ইতিহাসের গাঢ়তম তমিস্রার যুগ এবং ঐ দুই ক্ষণপ্রভ সাম্রাজ্য—ধর্মান্ধ গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিনিধিস্বরূপ ছিল, সর্ববিধ সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের তাহারা একান্ত বিরোধী ; উভয়েই মুসলমান রাজত্ব-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের সকল প্রেরণা ও কর্মপ্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল।...

তারপর আবার এক বিশৃঙ্খলার যুগ উপস্থিত হইল। শত্রু ও মিত্র, মোগলশক্তি ও তাহার ধ্বংসকারীরা এবং তৎকাল পর্যন্ত শান্তিপ্রিয় ফরাসী, ইংরেজ-প্রমুখ বিদেশী বণিক্‌দল এক ব্যাপক হানাহানিতে লিপ্ত হইয়াছিল। প্রায় অর্ধ-শতাব্দীরও অধিক কাল যুদ্ধ লুণ্ঠন ও ধ্বংস ছাড়া দেশে আর কিছুই ছিল না। পরে সে তাণ্ডবের ধূমধূলি যখন অপসারিত হইল, তখন দেখা গেল সকলের উপর জয়লাভ করিয়া সদম্ভ পদবিক্ষেপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—ইংরেজ-শক্তি। সেই শক্তির শাসনাধীনেই অর্ধশতাব্দীকাল ধরিয়া দেশে শান্তি ও

আইন-শৃঙ্খলা অব্যাহত। অবশ্য সে-শৃঙ্খলা যথার্থ উন্নতির দ্যোতক কিনা—কালের নিকষেই তাহা পরীক্ষিত হইবে।

দিল্লীর বাদশাহী আমলে উত্তর-ভারতীয় সম্প্রদায়গুলি যে-ধরনের ধর্ম-আন্দোলন করিত; ইংরেজ আমলেও ভারতের জনসাধারণের মধ্যে সে-ধরনের কিছু কিছু আন্দোলন দেখা গিয়াছে। কিন্তু সে-সব ছিল যেন মৃত বা মৃতকল্পের কণ্ঠধ্বনির মতো ভয়ার্ত এক জাতির শুধু বাঁচিয়া থাকার অধিকারের জন্য ক্ষীণ আবেদন। বিজেতাদের রুচি ও অভিপ্রায় অনুসারে নিজেদের ধর্মগত ও সমাজগত যে-কোন পরিবর্তন সাধন করিতে তাহারা একান্ত উদ্‌গ্রীব, বিনিময়ে শুধু বাঁচিয়া থাকার অধিকারটুকুই ছিল প্রার্থনা। আর ইংরেজ-শাসনে বিজেতাদিগের সহিত তাহাদের ধর্ম অপেক্ষা সামাজিক পার্থক্যই ছিল স্পষ্টতর।

মনে হয়, এ-শতকের হিন্দু-সম্প্রদায়গুলিব একটি মাত্র আদর্শ ছিল—তাহাদের ইংরেজ প্রভুর সমর্থন-লাভ। কাজেই ইহাদের অস্তিত্ব যে ব্যাঙের ছাতার মতো ক্ষণিক হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

ভারতের বৃহৎ জনসমাজ অতি নিষ্ঠার সহিত এই সম্প্রদায়গুলিকে দূরে পরিহার করিয়া চলিত। জনসাধারণের কাছে ইহাদের স্বীকৃতি ছিল মৃত্যুর পরে, অর্থাৎ এগুলি লোপ পাইলেই যেন তাহারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

সম্ভবতঃ আরও কিছুকাল এইরূপই চলিবে, অন্যরূপ হইতে পারে না।

'সামাজিক সম্মেলন অভিভাষণ'

জাস্টিস রাণাডে-কর্তৃক প্রদত্ত Social Conference Address-এর সমালোচনা; 'Prabuddha Bharata' ইংরেজী মাসিক পত্রিকার ১৯০০ খৃঃ ডিসেম্বর সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধরূপে লিখিত।

আমরা একবার এক ঘোর ঈশ্বরনিন্দুক ইংরেজের মুখে শুনেছিলাম, 'সাহেবদের সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর, নেটিভদের সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর—কিন্তু দো-আঁশলা জাতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর নন, অন্য কেউ।'

আজ হঠাৎ একটা জিনিস পড়ে আমাদের ঐ ভাবের একটা কথা মনে পড়ছে। কথাটা কি খুলে বলি।

ভারতীয় সামাজিক সম্মেলনের সংস্কারোৎসাহের জীবন্ত বাণীস্বরূপ মিঃ জাস্টিস রানাডের প্রারম্ভিক অভিভাষণ কিছু দিন হ'ল আমাদের কাছে এসে সমালোচনার জন্য পড়ে রয়েছে। পাঠ ক'রে দেখা গেল, ওতে প্রাচীনকালের অসবর্ণ বিবাহের দৃষ্টান্তের একটা লম্বা তালিকা রয়েছে, প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের উদার ভাবের বিষয়ে অনেক আলোচনা রয়েছে। ছাত্রমণ্ডলীকে সম্বোধন করেও সুন্দর খাঁটি উপদেশ সব দেওয়া হয়েছে,—আর এগুলি এত ভাবের সহিত এবং এমন মোলায়েম ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে যে, পড়লেই বক্তাকে—বাস্তবিকই প্রশংসা করতে ইচ্ছা হয়।

কিন্তু বক্তৃতাটির শেষ ভাগটায় একটা প্রসঙ্গ রয়েছে, তাতে পঞ্জাব প্রদেশে প্রবল নূতন সম্প্রদায়টির জন্য একদল আচার্য গঠন করবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে; দেখা গেল—বক্তা যদিও স্পষ্টতঃ ঐ সম্প্রদায়টির নাম করেননি, কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি, তিনি আর্যসমাজকে লক্ষ্য করেই কথাটা বলেছেন—যে-সমাজটি, স্মরণ রাখবেন, জনৈক সন্ন্যাসীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ঐ অংশটা পাঠ ক'রে আমাদের একটু বিস্ময় বোধ হ'ল। আমাদের মনে স্বভাবতই একটা প্রশ্ন উঠল যে, ঈশ্বর তো দেখছি ব্রাহ্মণদেরও সৃষ্টি করেছেন, ক্ষত্রিয়দেরও সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু সন্ন্যাসীদের সৃষ্টি করলে কে?

আমাদের পরিজ্ঞাত সকল ধর্ম-সম্প্রদায়েই সন্ন্যাসী ছিল ও আছে—হিন্দু সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী; এমন কি যে-ইস্‌লামধর্মে সন্ন্যাসকে

অস্বীকার করবার একটা উৎকট ভাব আছে, তা থেকে একটু নরম স্বরে নেমে ইসলামপন্থীদেরও দলকে দল ভিক্ষু সন্ন্যাসীকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

সন্ন্যাসী আবার হরেক রকমের—কেউ পুরা মাথা-কামানো, কেউ খানিকটা কামানো, দীর্ঘকেশ, হ্রস্বকেশ, জটাজূটধারী এবং অন্যান্য নানাবিধ ঢঙের কেশবিশিষ্ট সন্ন্যাসী আছেন।

আবার এঁদের পোশাকের তারতম্যও অনেক—কেউ দিগম্বর, কেউ চীরাম্বর, কেউ কাষায়ধারী, কেউ পীতাম্বর—আবার কৃষ্ণাম্বর খ্রীষ্টান ও নীলাম্বর মুসলমান রয়েছেন। আবার ঐ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল নানারূপে দেহকে কষ্ট দিয়ে তপস্যার পক্ষপাতী, অপর একদল বলেন—'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্', 'ধর্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।' প্রাচীনকালে প্রত্যেক দেশেই সন্ন্যাসীর ভিতর একদল যোদ্ধা ছিল—নাগা-সন্ন্যাসীর দল চিরকালই ছিল। পুরুষজাতির ন্যায় নারীজাতির ভিতরও একই ত্যাগের ভাব এবং সদৃশ শক্তিপ্রকাশ ঠিক যেন সমান্তরাল রেখায় চলে আসছে। সন্ন্যাসীর ন্যায় সন্ন্যাসিনী-সম্প্রদায়ও বরাবর ছিল, এখনও আছে। মিঃ রানাডে শুধু যে ভারতীয় সামাজিক সম্মেলনের সভাপতিপদ অলঙ্কৃত করেছেন তা নয়, তিনি নারীজাতির মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করতে সদা-বদ্ধপরিকর একজন মহাশয় ব্যক্তিও দেখছি। শ্রুতি ও স্মৃতিতে যে সন্ন্যাসিনীবৃন্দের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, তাতে তাঁর সম্পূর্ণ সম্মতি আছে ব'লে বোধ হচ্ছে। প্রাচীনকালের অবিবাহিতা ব্রহ্মবাদিনীরা, যাঁরা বড় বড় দার্শনিকগণকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান ক'রে এক রাজসভা থেকে আর এক রাজসভায় ঘুরে বেড়াতেন, তাঁরা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের মুখ্য উদ্দেশ্য যে বংশবৃদ্ধি তাতে বাধা দিয়েছেন ব'লে তাঁর আশঙ্কা নেই,—এই রকমই মনে হয়; আর মিঃ রানাডের মতে—পুরুষরা সন্ন্যাসী হয়ে যেমন মানবীয় অভিজ্ঞতার পূর্ণতা ও বৈচিত্র্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, নারীরাও সেই একই প্রকার কার্যপ্রণালীর অনুসরণ ক'রে ঐরূপ বঞ্চিত হয়েছেন, তা বোধ হয় না।

সুতরাং আমরা প্রাচীন সন্ন্যাসিনীকুল ও তাঁহাদের আধুনিক আধ্যাত্মিক বংশধরগণকে মিঃ রানাডের সমালোচনা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব'লে ছেড়ে দিলাম।

তা হ'লে চূড়ান্ত দোষী পুরুষকেই শুধু মিঃ রানাডের সমালোচনার সব চোটটা সহ্য করতে হচ্ছে। এখন দেখা যাক, এই চোটটা খেয়েও সে সামলে উঠতে পারে কিনা।

আধুনিক পাশ্চাত্য বড় বড় পণ্ডিতদের এই বিষয়ে যেন একমত বলে বোধ হয় যে, এই যে জগদ্ব্যাপী সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণের প্রথা, তার প্রথম উৎপত্তি আমাদের এই অদ্ভুত দেশটাতে—যে দেশটাতেই এত 'সমাজসংস্কারে'র দরকার ব'লে বোধ হচ্ছে।

সন্ন্যাসী গুরু ও গৃহস্থ গুরু, কুমার ব্রহ্মচারী ও বিবাহিত ধর্মাচার্য—উভয় প্রকার আচার্যই বেদ যত প্রাচীন, তত প্রাচীন। 'সকল বিষয়ে চৌকস্',—সব বিষয়ের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন সোমপায়ী বিবাহিত গৃহস্থ ঋষিদেরই প্রথম অভ্যুদয় হয়েছিল, অথবা মানবোচিত অভিজ্ঞতাহীন সন্ন্যাসী ঋষিই সৃষ্টির প্রথমে হয়েছিলেন—এখন অবশ্য এ সমস্যার একটা মীমাংসা করা কঠিন। সম্ভবতঃ মিঃ রানাডে তথাকথিত পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের উড়ো কথার উপর নির্ভর না ক'রে স্বাধীনভাবে আমাদের জন্য এই সমস্যার মীমাংসা ক'রে দেবেন। যতদিন না এ মীমাংসা হচ্ছে, ততদিন প্রাচীনকালের 'বীজ ও বৃক্ষের' সমস্যার মতো এটা একটা সমস্যাই থেকে যাবে।

কিন্তু উৎপত্তির ক্রম যাই হোক, শ্রুতি ও স্মৃতিতে উক্ত সন্ন্যাসী আচার্যগণ গৃহস্থ আচার্যগণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হয়েছিলেন, সেই ভিত্তি হচ্ছে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য।

যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান যদি বৈদিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হয়, ত'বে ব্রহ্মচর্য যে জ্ঞানকাণ্ডের ভিত্তি, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জীবহত্যাকারী যাজ্ঞিকগণ উপনিষদ্বক্তা হ'তে পারলেন না কেন?—জিজ্ঞাসা করি, কেন?

একদিকে বিবাহিত গৃহস্থ ঋষি—কতকগুলি অর্থহীন কিম্ভূত-কিমাকার—শুধু তাই নয়, ভয়ানক অনুষ্ঠান নিয়ে রয়েছেন—খুব কম ক'রে বললেও বলতে হয়, তাঁদের নীতিজ্ঞানটাও একটু ঘোলাটে ধরনের! আবার অন্যদিকে অবিবাহিত ব্রহ্মচর্যপরায়ণ সন্ন্যাসী ঋষিগণ, যাঁরা মানবোচিত অভিজ্ঞতার অভাব সত্ত্বেও এমন উচ্চ ধর্মনীতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রস্রবণ খুলে দিয়ে গেছেন, যার অমৃতবারি সন্ন্যাসের বিশেষ পক্ষপাতী. জৈন ও বৌদ্ধেরা এবং পরে পরে শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, চৈতন্য পর্যন্ত প্রাণভরে পান ক'রে তাঁদের অদ্ভুত আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সংস্কারসমূহ চালাবার শক্তিলাভ করেছিলেন, এবং যা পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে তিন চার হাত ঘুরে এসে আমাদের

সমাজ-সংস্কারকগণকে সন্ন্যাসীদের সমালোচনা করবার শক্তি পর্যন্ত দান করছে।

বর্তমান কালে আমাদের সমাজসংস্কারকগণের বেতন ও সুবিধাগুলির তুলনায় ভিক্ষুসন্ন্যাসীরা সমাজ থেকে কি সাহায্য, কি প্রতিদান পেয়ে থাকেন? আর সন্ন্যাসীর নীরব নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কার্যের তুলনায় সমাজসংস্কারকগণ কি কাজই বা ক'রে থাকেন?

কিন্তু সন্ন্যাসীরা তো আর আধুনিকদের মতো নিজের বিজ্ঞাপন নিজে প্রচার করবার, নিজের ঢাক নিজে বাজাবার উপায়টা শেখেননি।

এ জগৎটা যেন কিছুই নয়, একটা স্বপ্নমাত্র—এ ভাবটা হিন্দু মাতৃস্তন্য পানের সঙ্গে সঙ্গেই আয়ত্ত করে। এ বিষয়ে সে পাশ্চাত্যদের সঙ্গে একমত—কিন্তু পাশ্চাত্যগণ এর পরে আর কিছু দেখে না, তাই সে চার্বাকের মতো সিদ্ধান্ত ক'রে বসে, 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ।' 'এই পৃথিবীটা একটা দুঃখপূর্ণ গহ্বর মাত্র, এখানে যতটুকু সুখ পাওয়া যায় ভোগ ক'রে নেওয়া যাক।' হিন্দুদের দৃষ্টিতে কিন্তু ঈশ্বর ও আত্মাই একমাত্র সত্য পদার্থ—এই জগৎ যতদূর সত্য, তার চেয়েও অনন্তগুণে সত্য; সুতরাং ঈশ্বর ও আত্মার জন্য জগৎটাকে ত্যাগ করতে হিন্দু প্রস্তুত।

যতদিন সমগ্র হিন্দুজাতির মনের ভাব এইরূপ চলবে, আর আমরা ভগবৎ-সমীপে প্রার্থনা করি, চিরকালের জন্য এই ভাব চলুক—ততদিন আমাদের পাশ্চাত্যভাবাপন্ন স্বদেশবাসিগণ ভারতীয় নরনারীর 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' সর্বত্যাগ করবার প্রবৃত্তিকে বাধা দেবার কি আশা করতে পারেন?

আর সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে সেই মান্ধাতার আমলের পচা মড়ার মতো আপত্তিটা ইওরোপে প্রোটেস্ট্যাণ্ট সম্প্রদায় কর্তৃক প্রথম ব্যবহৃত, পরে বাঙালী সংস্কারকগণ তাঁদের কাছ থেকে ঐটি ধার ক'রে নিয়েছেন, আর এখন আবার আমাদের বোম্বাইবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ সেটি আঁকড়ে ধরেছেন—অবিবাহিত থাকার দরুন সন্ন্যাসীরা জীবনের 'পূর্ণ উপভোগ ও নানা রকমের অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত'। আশা করি, এইবার ঐ মড়াটা চিরদিনের জন্য আরব-সাগরে ডুবে যাবে—বিশেষতঃ এই প্লেগের দিনে আর হয়তো ঐ স্থানের উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণদের তাঁদের পূর্ব-পুরুষদের পরম সৌরভময় শবদেহের প্রতি প্রবল ভক্তি থাকতে পারে,

—তাঁদের পূর্বপুরুষের বিবরণ নির্ণয় করতে যদি পৌরাণিক কাহিনীর কিছু মূল্য আছে স্বীকার করা যায়—তা সত্ত্বেও।

প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা মনে পড়ছে বলি—ইওরোপে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরাই বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েকে মানুষ করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন; তাঁদের পিতামাতা বিবাহিত হলেও তাঁরা 'জীবনের নানাবিধ অভিজ্ঞতার' রসাস্বাদ করতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিলেন।

তারপর অবশ্য সন্ন্যাসাশ্রমের বিরুদ্ধবাদীদের মুখে এ-কথা তো লেগেই আছে যে, ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেক বৃত্তি দিয়েছেন—কোন না কোন ব্যবহারের জন্য; সুতরাং সন্ন্যাসী যখন বংশবৃদ্ধি করছেন না, তিনি অন্যায় কাজ করছেন—তিনি পাপী। বেশ, তা হ'লে তো কাম ক্রোধ চুরি ডাকাতি প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সকল বৃত্তিই ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন—আর তাদের মধ্যে প্রত্যেকটিই সংস্কৃত বা অসংস্কৃত সামাজিক জীবন-রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক। এগুলির বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীদের কি বক্তব্য? জীবনে সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা চাই, এই মত অবলম্বন ক'রে কি ঐগুলিও পুরা দমে চালাতে হবে নাকি? অবশ্য সমাজ-সংস্কারক দলের সঙ্গে যখন সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা এবং তাঁরা যখন তাঁর কি কি ইচ্ছা, তাও ভাল রকম অবগত আছেন, তখন তাঁদের এই প্রশ্নের 'হাঁ'-জবাবই দিতে হবে। আমাদের কি উগ্রস্বভাব বিশ্বামিত্র অত্রি প্রভৃতি ঋষিদের, বিশেষতঃ নারীর সাহচর্যে 'পুরামাত্রায় নানাবিধ অভিজ্ঞতা অর্জনকারী' বশিষ্ঠবংশের অনুসরণ করতে হবে?—কারণ, অধিকাংশ গৃহস্থ ঋষিই বৈদিক সূক্ত পাঠ ও সোমপানের জন্য যেরূপ প্রসিদ্ধ, যখন যেখানে পেরেছেন, তখন সেখানেই পুত্রোৎপাদনের বিষয়ে উদারতার জন্যও তদ্রূপ প্রসিদ্ধ;—এঁদের অথবা যে-সকল অবিবাহিত সন্ন্যাসী ঋষি ব্রহ্মচর্যকেই ধর্মের মূলমন্ত্র ব'লে প্রচার ক'রে গেছেন, আমরা তাঁদের অনুসরণ ক'রব?

তারপর অবশ্য ভ্রষ্টের দল তো রয়েছেই, তাদের মাথায় তো গালাগালের বোঝা পড়াই উচিত—যে-সকল সন্ন্যাসী তাঁদের আদর্শ ঠিক ধরে রাখতে পারেননি সেই দুর্বল অসৎপ্রকৃতি সন্ন্যাসীর দল।

কিন্তু আদর্শটি যদি খাঁটি ও সরল হয়, তবে আমাদের একজন ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীও যে-কোন গৃহস্থ অপেক্ষা শতগুণে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ, কারণ চলতি কথাতেই আছে—'ভালবেসে না পাওয়া বরং ভাল।'

যে কখন উন্নত জীবনলাভের চেষ্টাই করেনি, সেই কাপুরুষের সঙ্গে তুলনায় ভ্রষ্টসন্ন্যাসী তো বীর।

আমাদের সমাজ-সংস্কারকদলের ভিতরের ব্যাপারের খবর যদি ভাল ক'রে নেওয়া যায়, তবে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের ভিতর ভ্রষ্টের সংখ্যা শতকরা কত, তা দেবতাদের ভাল ক'রে গুনতে হয়; আব আমাদের সমুদয় কাজকর্মের এ-রকম সম্পূর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর যে-দেবতা রাখছেন, তিনি তো আমাদের নিজেদের হৃদয়-মধ্যেই।

কিন্তু এদিকে দেখ, এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে, কারও কিছু সাহায্য চাইছে না, জীবনে যত ঝড-ঝাপটা আসছে সব বুক পেতে নিচ্ছে—কাজ করছে, কোন পুরস্কারের আশা নেই, এমন কি কর্তব্য ব'লে লম্বা নামে সাধারণে পরিচিত, সেই পচা বিটকেল ভাবটাও নেই। সারা জীবন কাজ চলছে—আনন্দের সঙ্গে স্বাধীনভাবে কাজ চলছে—কারণ ক্রীতদাসের মতো জুতোর ঠোক্কর মেরে তাকে কাজ করাতে হচ্ছে না, অথবা মিছে মানবীয় প্রেম বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষাও সে কার্যের মূলে নেই।

এ কেবল সন্ন্যাসীই পারে। ধর্মের কথা কি বলো? তা থাকা উচিত, না একেবারে অন্তর্হিত হবে? ধর্ম যদি থাকে, তবে ধর্মসাধনে বিশেষ অভিজ্ঞ একদল লোকের আবশ্যক—ধর্মযুদ্ধের জন্য যোদ্ধার প্রয়োজন। সন্ন্যাসীই ধর্মে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি, কারণ তিনি ধর্মকেই তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য করেছেন। তিনিই ঈশ্বরের সৈন্যস্বরূপ। যতদিন একদল একনিষ্ঠ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় থাকে, ততদিন কোন্ ধর্মের বিনাশাশঙ্কা?

প্রোটেস্ট্যাণ্ট ইংলণ্ড ও আমেরিকা ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের প্রবল প্লাবনে কম্পিত হচ্ছে কেন?

বেঁচে থাকুন রানাডে ও সমাজসংস্কারকদল! কিন্তু হে ভারত, হে পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত ভারত, বৎস, ভুলো না, এই সমাজে এমন সব সমস্যা রয়েছে, এখনও তুমি বা তোমার পাশ্চাত্য গুরু যার মানেই বুঝতে পারছ না, মীমাংসা করা তো দূরের কথা।

ভারতের রীতিনীতি

১৮৯৪ খৃ: ১৫ই ফেব্রুআরি বৃহস্পতিবার ডেট্রয়েটে প্রদত্ত একটি বক্তৃতার বিবরণী—'ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেসের' সম্পাদকীয় মন্তব্য সহ।

গত রাত্রে ইউনিটেরিয়ান চার্চে হল-ভরতি শ্রোতৃবৃন্দ খ্যাতনামা সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ শ্রবণ করে; তিনি তাঁর দেশের রীতিনীতি ও প্রথা সম্পর্কে বলেন। তাঁর বাগ্মিতা ও মধুর ব্যবহারে শ্রোতারা আনন্দিত হয়; প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গভীর মনোযোগের সঙ্গে তারা তাঁর বক্তৃতা শোনে, মাঝে মাঝে উচ্চ করতালি-ধ্বনি তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করে। চিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত সুবিখ্যাত বক্তৃতার চেয়েও তাঁর এই বক্তৃতাটির বিষয়বস্তু ছিল অধিকতর জনপ্রিয়। ভাষণটি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল, বিশেষতঃ সেই অংশগুলি, যেখানে বক্তা উপদেশমূলক প্রসঙ্গ ত্যাগ ক'রে তাঁর স্বদেশবাসীদের কতকগুলি আধ্যাত্মিক অবস্থার সুনিপুণ বর্ণনা দিচ্ছিলেন। ধর্মীয় ও দার্শনিক (এবং অবশ্যই আধ্যাত্মিক) প্রসঙ্গেই এই প্রাচ্যদেশীয় ভ্রাতা সর্বাপেক্ষা হৃদয়-গ্রাহী এবং যখন তিনি প্রকৃতির মহৎ ও সহজ নৈতিক নিয়মের বিবেক-সম্মত কর্তব্যের কথা বলছিলেন, তখন তাঁর নিয়ন্ত্রিত কোমল কণ্ঠস্বর (যা তাঁর জাতির বৈশিষ্ট্য) এবং তাঁর রোমাঞ্চকর ভঙ্গি অনেকটা একজন প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির মতোই মনে হচ্ছিল। শ্রোতাদের নিকট কোন নৈতিক সত্য উপস্থাপনের সময় ছাড়া তাঁর বক্তৃতায় সুস্পষ্ট চিন্তাশীলতা প্রকাশ পায়, কিন্তু নৈতিক সত্য উপস্থাপনের সময় তাঁর বাগ্মিতায় চরমোৎকর্ষ দেখা যায়।

তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন, ভারতে নৈতিকতার মান পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচুতে। তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন বিশপ নিন্‌ডে (Bishop Ninde)। সানন্দচিত্তে বিবেকানন্দের পরিচয় প্রদান ক'রে তিনি ভারতের আশ্চর্য বস্তু সম্বন্ধে ও সেখানকার শিক্ষিত শ্রেণীর বুদ্ধির উৎকর্ষের কথা উল্লেখ করেন। পাগড়ি-মাথায় উজ্জ্বল আলখাল্লা-পরা এবং বুদ্ধিদীপ্ত-চক্ষুবিশিষ্ট সেই শ্যামবর্ণ ভদ্রমহোদয় যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন সকলের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এক মনোমুগ্ধকর মূর্তি। বিশপের সহৃদয় বাক্যের জন্য তিনি তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন

এবং তাঁর স্বদেশের জাতিভেদ, লোকের আচার-ব্যবহার ও ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হলেন ঃ

মূলতঃ উত্তরভারতে চারটি ভাষা এবং দক্ষিণভারতে চারটি, কিন্তু ধর্ম উভয়ত্র এক। ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে পাঁচ ভাগের চার ভাগই হিন্দু এবং এই হিন্দু জাতিটি কিছুটা অদ্ভুত। ধর্মীয় রীতি অনুসারে হিন্দু সব কাজ করে; ধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে সে আহার করে, প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করে, ধর্মের নির্দেশ অনুসারে সে সৎকর্ম করে এবং অসৎ কাজও করে ধর্মভাবে।

এই সময়ে বক্তা তাঁর ভাষণের শ্রেষ্ঠ নৈতিক সার কথাটি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ঃ তাঁর স্বদেশবাসীদের বিশ্বাস—সকল স্বার্থশূন্য কাজই সৎ এবং সকল স্বার্থপরতাই অসৎ। অতএব হিন্দুর মতে নিজের জন্য গৃহনির্মাণ স্বার্থপরতা; হিন্দু গৃহনির্মাণ করে ঈশ্বরোপাসনা এবং অতিথিসেবার জন্য। নিজের জন্য আহার্য-রন্ধন স্বার্থপরতা; তাই সে রন্ধন করে দরিদ্রসেবার জন্য; যদি কোন ক্ষুধার্ত আগন্তুক প্রার্থী আসে, তবে আগে তার সেবা ক'রে অবশেষে সে নিজে আহার্য গ্রহণ করে—এই ভাবটি দেশের সর্বত্র বিরাজ করছে। যে কেউ খাদ্য ও আশ্রয়ের প্রার্থী হোক না কেন, সব দরজাই তার জন্য খোলা থাকবে।

জাতিভেদ-প্রথার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। লোকের বৃত্তি বংশগত —একজন ছুতোর-মিস্ত্রীর ছেলে ছুতোর হয়েই জন্মায়; স্বর্ণকারের ছেলে স্বর্ণকার, কারিগরের ছেলে কারিগর, এবং পুরোহিতের ছেলে পুরোহিত। তবে এই সামাজিক দোষ-ত্রুটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের, এ প্রায় এক হাজার বছর ধরে চলে আসছে মাত্র; কালের এই পরিমাণ ভারতে খুব দীর্ঘ ব'লে বিবেচিত হয় না, যেমন মনে করা হয় এদেশে বা অন্য সকল দেশে।

দু-রকমের দান বিশেষভাবে সমাদৃত—শিক্ষাদান এবং প্রাণদান। কিন্তু শিক্ষাদানই অগ্রাধিকার লাভ করে। একজন মানুষের জীবন রক্ষা করা খুব ভাল; তাকে শিক্ষাদান করা তার চেয়েও ভাল। অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা দেওয়া গর্হিত কাজ এবং যে-ব্যক্তি ব্যবসার সামগ্রীর মতো শিক্ষার বিনিময়ে কাঞ্চন গ্রহণ করে, তার উপর ধিক্কার বর্ষিত হয়। সরকার মাঝে মাঝে শিক্ষকদের সাহায্য ক'রে থাকেন। তার ফলে তথাকথিত সভ্যদেশগুলিতে যে-পরিবেশ বজায় আছে, এখানে নৈতিক ফলাফল তার চেয়ে শুভকর হয়েছে।

বক্তা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জিজ্ঞাসা ক'রে বেড়িয়েছেন, সভ্যতার সংজ্ঞা কি? প্রশ্নটি তিনি আরও বহু দেশে জিজ্ঞাসা করেছেন। কখনও উত্তর পেয়েছেন, 'আমরাই হলাম সভ্যতার মাপকাঠি!' তিনি সবিনয়ে জানান—শব্দটির সংজ্ঞা সম্বন্ধে তাঁর মত অন্য রকম। কোন জাতি হয়তো প্রাকৃতিক শক্তিকে বশীভূত করতে পারে, জনহিতকর প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির প্রায় সমাধান ক'রে ফেলতে পারে, তথাপি এ-কথা তাদের বোধগম্য নাও হতে পারে যে, যে-ব্যক্তি নিজেকে জয় করার শিক্ষালাভ করেছে, সেই ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই সর্বোৎকৃষ্ট সভ্যতা পরিস্ফুট। পৃথিবীর যে-কোন দেশের চেয়ে এই পরিবেশটি ভারতে অধিক বর্তমান, কারণ সেখানে বস্তুগত পরিবেশ আধ্যাত্মিক পরিবেশের অধীন এবং প্রত্যেকেই সকল প্রাণীর মধ্যে আত্মার প্রকাশ দেখতে সচেষ্ট এবং প্রকৃতিকেও একই ভাবে দেখে। এখানেই দেখা যায়—ভাগ্যের নির্দয় পরিহাসকে অবিচল ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করার মতো ধীর মনোভাব; এই অবস্থায় অন্য যে-কোন জাতির চেয়ে এখানে অধিকতর আধ্যাত্মিক শক্তি ও জ্ঞানের উন্মেষ ঘটেছে। এই দেশ ও জাতির ভেতর থেকে একটি অফুরন্ত স্রোতের ধারা বয়ে চলেছে, যা দেশ-বিদেশের বহু চিন্তাশীল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এরা সহজেই ঘাড় থেকে পার্থিব বোঝা ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ২৬০ অব্দে যে প্রাচীন রাজা আদেশ করেছিলেন, 'আর কোন রক্তপাত বা কোন যুদ্ধ করা চলবে না' এবং যিনি সৈনিকের বদলে পাঠিয়েছিলেন একদল শিক্ষক, তিনি জ্ঞানীর মতো কাজই করেছিলেন, যদিও বাস্তবতার দিক থেকে দেশকে তার ফলে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয়েছে। কিন্তু বল-প্রয়োগকারী বর্বর জাতিগুলির অধীনতা স্বীকার করলেও ভারতবাসীর আধ্যাত্মিকতা চিরকাল বেঁচে আছে এবং কারও সাধ্য নেই, তা কেড়ে নেয়। নিষ্ঠুর ভাগ্যের আঘাত সহ্য করার মতো খ্রীষ্টসুলভ নম্রতা ভারতের মানুষের আছে, এবং সেই সঙ্গে তাদের আত্মা উজ্জ্বলতর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। এরূপ দেশে 'ভাব-প্রচারের' জন্য কোন খ্রীষ্টান মিশনরীর প্রয়োজন নেই, কারণ ভারতের ধর্ম মানুষকে ধীর, মধুর, বিবেচক এবং মনুষ্য-পশু-নির্বিশেষে ভগবানের সৃষ্ট সকল প্রাণীর প্রতি প্রীতিসম্পন্ন ক'রে তোলে। নৈতিকতার দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র কিংবা পৃথিবীর যে-কোন দেশ অপেক্ষা ভারত উচ্চে। মিশনরীরা

যদি কেবল সেখানকার পবিত্র বারি পান করতে বা সেই মহান্ জাতির উপর বহু পবিত্র জীবনের কী অপূর্ব প্রভাব পড়েছে, তা দেখতে যান, তবেই ভাল করবেন।

তারপর বক্তা বিবাহের রীতিনীতি ও প্রাচীনকালে যখন সহশিক্ষা-প্রথার প্রচলন ছিল, তখন নারীদের যে-সকল স্থযোগ-স্থবিধা দেওয়া হ'ত, তার বর্ণনা করেন। ভারতের ঋষিদের লেখায় প্রত্যাদিষ্ট নারীর অপূর্ব চিত্র পাওয়া যায়। খ্রীষ্টধর্মে প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিরা সকলেই পুরুষ, কিন্তু ভারতের পূতচরিত্র নারীগণ ধর্মগ্রন্থসমূহে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার ক'রে আছেন। গৃহস্থদের উপাসনার অঙ্গ পাঁচটি; তার মধ্যে একটি অধ্যয়ন-অধ্যাপনা। আর একটি হ'ল মূক প্রাণীর সেবা, এই উপাসনাটি আমেরিকানদের পক্ষে বোঝা শক্ত। ইওরোপীয়দের পক্ষেও এই ভাবটি উপলব্ধি করা সহজ নয়। অন্যান্য জাতি পাইকারী হারে প্রাণী হত্যা করে এবং নিজেরাও পরস্পর হানাহানি ক'রে মরে, রক্তের সমুদ্রে তারা বাস করে।

একজন ইওরোপীয় বলেছিল, ভারতবাসীরা যে প্রাণী হত্যা করে না, তার কারণ তারা মনে করে, প্রাণীদের মধ্যে তাদের পূর্বপুরুষের আত্মা আছে। পশুর স্তর থেকে যারা বেশী দূর অগ্রসর হয়নি, তাদের পক্ষেই এ-ধরনের যুক্তি সাজে। এটা আসলে ভারতের এক শ্রেণীর নাস্তিকের উক্তি—এ-ভাবে তারা বেদের 'অহিংসা ও পুনর্জন্মবাদের' দোষ দর্শন ক'রে থাকে। এ-রকম ধর্মীয় মতবাদ কোনকালে ছিল না। এটা জড়বাদী বিশ্বাস। মূক প্রাণীর উপাসনার একটি উজ্জ্বল চিত্র বক্তা তুলে ধরেন।

ভারতের অপূর্ব বিশিষ্ট অতিথি-পরায়ণতা একটি গল্পের মাধ্যমে তিনি চিত্রিত করেন। একদা দুর্ভিক্ষের দরুন এক ব্রাহ্মণকে—তাঁর স্ত্রী, পুত্র এবং পুত্রবধূসহ কিছুকাল অনাহারে কাটাতে হয়। গৃহস্বামী খাদ্যের অন্বেষণে বাইরে গিয়ে সামান্য পরিমাণ ছাতু সংগ্রহ ক'রে আনেন; বাড়িতে এসে তিনি তা চার ভাগে ভাগ করেন এবং যখন সেই ছোট্ট পরিবারটি আহার করতে যাচ্ছে, এমন সময় দরজায় করাঘাত শোনা গেল। আগন্তুক একজন ক্ষুধার্ত অতিথি। ভাগগুলি তখন অতিথির সামনে দেওয়া হ'ল এবং সে ক্ষুন্নিবৃত্তি ক'রে চলে গেল, আর এদিকে অতিথি-সেবাপরায়ণ সেই চারজন মৃত্যু বরণ ক'রল। আতিথেয়-তার পবিত্র নামে ভারতে যা আশা করা যায়, এই গল্পটি তারই আদর্শ-রূপে বলা হয়ে থাকে।

সুনিপুণ বাগ্মিতার সঙ্গে বক্তা তাঁর ভাষণ শেষ করেন। তাঁর বক্তব্য আগাগোড়া সহজ সরল, কিন্তু যখনই তিনি কোন চিত্র-বর্ণনায় রত হন, তখন তা অপূর্ব কাব্যের মতো শোনায়, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পূর্বদেশীয় ভ্রাতা প্রকৃতির সৌন্দর্য কত গভীর ও নিবিড়-ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর অপরিমিত আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ শ্রোতাগণ অনুভব করেন, কারণ তা চেতন ও অচেতন সকল বস্তুর প্রতি ভালবাসারূপে এবং সমন্বয়ের ঐশী বিধান ও কল্যাণকর অভিপ্রায়ের বিচিত্র কার্যরীতির গভীরে প্রবেশ করবার প্রখর অন্তর্দৃষ্টিরূপে স্বতঃপ্রকাশিত।

ভারতের মানুষ

১৯০০ খৃঃ ১৯শে মার্চ, সোমবার 'ওকল্যাণ্ড এন্‌কোয়ারার'-পত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য সহ বক্তৃতাটির সারমর্ম প্রকাশিত।

সোমবার রাত্রে স্বামী বিবেকানন্দ নূতন পর্যায়ে 'ভারতের মানুষ' সম্পর্কে যে-ভাষণ দেন, তা শুধু সে-দেশের লোকের সম্বন্ধে তথ্য-বর্ণনার জন্যই নয়, এরূপ কোন উদ্দেশ্য না নিয়েও তাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সংস্কার-সম্পর্কে যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্যই মনোজ্ঞ হয়েছিল। বস্তুতঃ বালবিধবা, নারী-পীড়ন এবং ভারতীয়দের বিরুদ্ধে এরূপ নানা বর্বরতার অভিযোগের আলোচনা শুনে শুনে তিনি স্পষ্টতই অনেকটা বিরক্ত হয়েছেন এবং উত্তরে পালটা অভিযোগ করার কিছুটা প্রবণতা তাঁর মধ্যে দেখা যায়।

ভাষণের প্রারম্ভে তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট ভারতবাসীর জাতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো ভারতে ঐক্যের বন্ধন হ'ল ধর্ম ভাষা বা গোষ্ঠি (race) নয়। ইওরোপে গোষ্ঠি (race) নিয়েই জাতি (nation)। কিন্তু এশিয়ায়—যদি ধর্ম এক হয়, তবে বিভিন্ন বংশোদ্ভূত এবং বিভিন্ন ভাষা-ভাষীদের নিয়ে এক একটি জাতি গড়ে ওঠে।

উত্তরভারতের মানুষকে চারটি বৃহত্তর শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, কিন্তু উত্তর-ভারতের তুলনায় দক্ষিণভারতের ভাষাগুলি এতই স্বতন্ত্র যে, কোন সম্পর্কই খুঁজে পাওয়া যায় না। উত্তরভারতের লোকরা মহান্ আর্যজাতিসম্ভূত—যা থেকে পিরেনিজ পর্বতমালার (Pyrenees) বাস্‌ক জাতি (Basques) এবং ফিন্‌জাতি (Finns) ভিন্ন সমগ্র ইওরোপের মানুষ উদ্ভূত ব'লে অনুমিত হয়। দক্ষিণ-ভারতের আদিম অধিবাসিগণ প্রাচীন মিশর বা সেমিটিক জাতির সমগোত্রীয়। ভারতবর্ষে পরস্পরের ভাষা-শিক্ষার অসুবিধার কথা বোঝাতে গিয়ে স্বামীজী বলেন যে, যখন তাঁর দক্ষিণভারতে যাবার সুযোগ হয়েছিল, তখন সংস্কৃত-জানা মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে বাদ দিয়ে তাঁকে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ইংরেজীতেই কথা বলতে হ'ত।

জাতিভেদ-প্রথার আলোচনাতেই বক্তৃতার অনেকাংশ নিয়োজিত হয়। এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা ক'রে স্বামীজী বলেনঃ প্রথাটি অবশ্যই এখন খারাপ দিকে যাচ্ছে, পূর্বে অসুবিধার চেয়ে সুবিধাই ছিল বেশী, অপকারিতার চেয়ে উপকারিতাই ছিল বেশী। সংক্ষেপে বলা চলে, পুত্র সর্বক্ষেত্রে পিতার বৃত্তি গ্রহণ করবে—এই রীতি থেকেই এর উৎপত্তি। কালক্রমে এই বৃত্তিগত সম্প্রদায় বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং প্রত্যেক শ্রেণী নিজ নিজ গণ্ডির মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ হয়। এই প্রথা মানুষকে যেমন বিভক্ত করেছে, তেমনি আবার সম্মিলিতও করেছে, কারণ এক শ্রেণী বা জাতিভুক্ত ব্যক্তি তার স্বজাতিকে প্রয়োজনের সময় সাহায্য করতে দায়বদ্ধ, এবং যেহেতু কোন ব্যক্তিই তার নিজের শ্রেণী বা জাতির গণ্ডির উর্ধ্বে উঠতে পারে না, সে-জন্য অন্যান্য দেশের মানুষের মধ্যে সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রাধান্য বিস্তারের যে-সংগ্রাম দেখতে পাওয়া যায়, হিন্দুদের মধ্যে তা দেখা যায় না।

জাতিভেদের সবচেয়ে মন্দ দিক হ'ল এই যে, এতে প্রতিযোগিতা দমিত থাকে এবং প্রতিযোগিতার অভাবই বাস্তবিক পক্ষে ভারতের রাজনীতিক অধঃপতন ও বিদেশী জাতি কর্তৃক ভারত-বিজয়ের কারণ।

বহু-আলোচিত বিবাহ-ব্যাপারে হিন্দুরা সমাজতান্ত্রিক; সমাজের কল্যাণের কথা চিন্তা না ক'রে যুবক-যুবতীর পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটা তারা মোটেই ভাল ব'লে মনে করে না, কারণ যে-কোন দুটি মানুষের কল্যাণের চেয়ে সমাজের কল্যাণ অবশ্যই বড়। 'আমি জেনীকে

ভালবাসি এবং জেনী আমাকে ভালবাসে—অতএব আমাদের এই বিবাহ করতে হবে'—এ-যুক্তির কোন সঙ্গত কারণ নেই।

বালবিধবাদের শোচনীয় অবস্থার যে-চিত্র আঁকা হয়ে থাকে, তার সত্যতা অস্বীকার ক'রে তিনি বলেন যে, ভারতে সাধারণভাবে বিধবাদের বিস্তর প্রতিপত্তি, কারণ সে-দেশে সম্পত্তির বড় অংশ বিধবাদের করায়ত্ত। বস্তুতঃ বিধবারা এমন একটা স্থান অধিকার ক'রে আছে যে, মেয়েরা এবং হয়তো পুরুষরাও পরজন্মে 'বিধবা' হবার জন্য সম্ভবতঃ প্রার্থনাও ক'রে থাকে!

বালবিধবা বা যে-সব মেয়ে বিবাহের পূর্বেই মৃত বালকদের সঙ্গে বাগ্‌দত্তা, তাদের প্রতি করুণা-প্রদর্শন সাজতো তখনই, যদি বিবাহই জীবনের একমাত্র বা মূল উদ্দেশ্য হ'ত। কিন্তু হিন্দু চিন্তাধারা অনুসারে বিবাহ বরং একটি কর্তব্য, কোন বিশেষ অধিকার বা সুযোগ নয়; এবং বালবিধবাদের পুনর্বিবাহে অনধিকার বিশেষ একটা কষ্টকর ব্যাপার নয়।

ভারত কি তমসাচ্ছন্ন দেশ?

ডেট্রয়েট শহরে একটি ভাষণের বিবরণী ১৮৯৪ খৃঃ ৫ই এপ্রিল তারিখের 'বোস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট' নামক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য সহ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে:

সম্প্রতি স্বামী বিবেকানন্দ ডেট্রয়েট শহরে আসিয়া বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। সর্বশ্রেণীর নরনারী তাঁহার ভাষণ শুনিতে আসিত, বিশেষতঃ ধর্মযাজকগণ তাঁহার অভিমতের অকাট্য যুক্তিজাল দ্বারা অতিশয় আকৃষ্ট হইতেন। শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা এত বেশী হইয়াছিল যে, একমাত্র স্থানীয় নাট্যশালাটিতেই তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হইত। তিনি অতি বিশুদ্ধ ইংরেজী বলেন, দেখিতে যেমন সুপুরুষ, তাঁহার স্বভাবও তেমনই সুন্দর। ডেট্রয়েট শহরের সংবাদপত্রগুলি তাঁহার বক্তৃতার বিবরণী প্রকাশ করিবার জন্য যথেষ্ট স্থান দিয়াছে।

'ডেট্রয়েট ইভনিং নিউজ' পত্রিকা একদিনের সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলেন: বেশির ভাগ লোকই মনে করিবেন যে, গত সন্ধ্যায় নাট্যশালায় প্রদত্ত বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ এই নগরে প্রদত্ত অন্য বক্তৃতা অপেক্ষা অনেক অধিক দক্ষতা

প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যথার্থ এবং বিকৃত খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া শ্রোতৃবর্গকে স্পষ্টভাষায় জানাইয়া দেন, কোন্ অর্থে তিনি নিজেকে একজন খ্রীষ্টান বলিয়া মনে করেন এবং কোন্ অর্থে করেন না। তিনি যথার্থ ও বিকৃত হিন্দুধর্মের মধ্যেও পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া বুঝাইয়া দেন। প্রকৃত অর্থেই তিনি নিজেকে হিন্দু মনে করেন। তিনি সর্বপ্রকার সমালোচনার সীমা অতিক্রম করিয়াই বলিতে পারিয়াছিলেন ঃ

আমরা যীশুর প্রকৃত বার্তাবহদের চাই। তাঁহারা দলে দলে হাজারে হাজারে ভারতে আসুন, যীশুর মহৎ জীবন আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরুন এবং আমাদের সমাজের গভীরে তাহার ভাব অনুস্যূত করিতে সহায়তা করুন। যীশুকে তাঁহারা ভারতের প্রত্যেক গ্রামে, প্রতি প্রান্তে প্রচার করুন।

যখন কোন ব্যক্তি মুখ্য বিষয়ে এতখানি নিশ্চয়, তখন তিনি আর যাহা বলুন না কেন, তাহা গৌণ বিষয়ের বিশদ উল্লেখমাত্র। যাঁহারা এতদিন যাবৎ গ্রীনল্যাণ্ডের তুষারাচ্ছন্ন পার্বত্যদেশে এবং ভারতের প্রবালাকীর্ণ সমুদ্রতটে আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আচার ও জীবন-নীতির ব্যাপারে একজন পৌত্তলিক ধর্মযাজকের এই উপদেশ-বর্ষণ এক দারুণ অপমানকর দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল। অপমান-বোধ অধিকাংশ সংশোধনের পক্ষে অপরিহার্য। খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তকের মহিমান্বিত জীবন-সম্পর্কে আলোচনার পর—সুদূর বিদেশী জাতিগুলির সম্মুখে যাঁহারা খ্রীষ্ট-জীবনের প্রতিনিধিত্ব করেন বলিয়া নিজেদের ঘোষণা করেন, তাঁহাদের নিকট ঐরূপ উপদেশ দিবার অধিকার তাঁহার জন্মিয়াছিল; এবং তাঁহার উপদেশ অনেকাংশে সেই নাজারেথবাসী যীশুখ্রীষ্টের উক্তির মতোই শুনাইতেছিল ঃ

'তোমার অর্থপেটিকায় স্বর্ণ রৌপ্য বা তাম্র সংগ্রহ করিও না, পরিধানের নিমিত্ত পোশাক ও জুতার সংখ্যা বৃদ্ধি করিও না, এমন কি নিজের নিমিত্ত একখানি ভ্রমণ-যষ্টিও সংগ্রহ করিও না; কারণ প্রত্যেক শ্রমিকই তাহার আহার্য পাইবার অধিকারী।'

যাঁহারা বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পূর্বেই ভারতীয় ধর্ম-সাহিত্যের সহিত কিছুমাত্র পরিচিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রতীচ্যদেশীয়গণের সকল প্রকার কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে, এমন কি ধর্মাচরণের ক্ষেত্রেও ব্যবসায়ের মনোভাব—যাহাকে

বিবেকানন্দ ‘দোকানদারি মনোবৃত্তি’ আখ্যা দিয়াছেন, তাহার প্রতি প্রাচ্য-দেশীয়গণের ঘৃণার কারণ বুঝিতে পারিবেন।

বিষয়টি ধর্মপ্রচারকদের পক্ষে আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। যাঁহারা পৌত্তলিক প্রাচ্য জগৎকে ধর্মান্তরিত করিতে চান, পার্থিব জগতের সাম্রাজ্য এবং বৈভবকে ঘৃণাসহকারে পরিহারপূর্বক তাঁহাদিগকে নিজ-প্রচারিত ধর্মানুযায়ী জীবন যাপন করিতে হইবে।

ভ্রাতা বিবেকানন্দ নৈতিক দিক হইতে ভারতকে সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশ বলিয়া মনে করেন। পরাধীনতা সত্ত্বেও ভারতের আধ্যাত্মিকতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ডেট্রয়েটে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতা-সম্পর্কে প্রকাশিত কয়েকটি বিবরণীর অংশবিশেষ এখানে প্রদত্ত হইল:

নিরহঙ্কার-ভাবই পুণ্য এবং সকল প্রকার অহংভাবই পাপ—এই মর্মে ভারতীয়দের যে-বিশ্বাস বর্তমান, এইখানে তাহা উল্লেখ করিয়া বক্তা তাঁহার আলোচনার মূল নৈতিক সুরটি ধ্বনিত করেন। গত সন্ধ্যার বক্তৃতায় উক্ত ভাবেরই প্রাধান্য অনুভূত হয় এবং ইহাকেই তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম বলা যাইতে পারে।

হিন্দু বলেন, নিজের জন্য গৃহ নির্মাণ করা স্বার্থপরতার কাজ, সেই জন্য তিনি উহা ঈশ্বরের পূজা ও অতিথিসেবার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেন। নিজের উদর-পূর্তির জন্য আহার্য প্রস্তুত করা স্বার্থপরতার কাজ, সুতরাং দরিদ্রনারায়ণ-সেবার জন্য আহার্য প্রস্তুত করা হয়। ক্ষুধার্ত অতিথির আবেদন পূর্ণ করিবার পর হিন্দু স্বয়ং অন্নগ্রহণে প্রবৃত্ত হন। এই মনোভাব দেশের সর্বত্র প্রকট। যে-কোন ব্যক্তি গৃহস্থের নিকট আসিয়া আহার ও আশ্রয় প্রার্থনা করিতে পারে এবং সকল গৃহের দ্বারই তাহার জন্য উন্মুক্ত থাকে।

জাতিভেদ-প্রথার সহিত ধর্মের কোনও সম্পর্ক নাই। কোন ব্যক্তি তাহার বৃত্তি প্রাপ্ত হয়—উত্তরাধিকারসূত্রে; সূত্রধার সূত্রধার-রূপেই জন্মগ্রহণ করে, স্বর্ণকার স্বর্ণকার-রূপেই, শ্রমিক শ্রমিক-রূপেই এবং পুরোহিত পুরোহিত-রূপেই;

দুই প্রকার দান বিশেষ প্রশংসার্হ, বিদ্যাদান আর প্রাণদান। বিদ্যাদানের স্থান সর্বাগ্রে। অপরের জীবন রক্ষা করা উত্তম কর্ম, বিদ্যাদান অধিকতর উত্তম কর্ম। অর্থের বিনিময়ে শিক্ষাদান পাপ, পণ্যের ন্যায় অর্থের বিনিময়ে যিনি বিদ্যা বিক্রয় করেন, তিনি নিন্দার্হ। সরকার মধ্যে মধ্যে এই-সকল শিক্ষাদাতাকে

সাহায্য প্রদান করেন এবং তাহার নৈতিক ফল তথাকথিত কোন কোন সুসভ্য দেশে যে-ব্যবস্থা বর্তমান, তাহা অপেক্ষা উত্তম।

বক্তা এ-দেশের সর্বত্র সভ্যতার সংজ্ঞা-সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছেন। এ-প্রশ্ন তিনি অন্যান্য দেশেও করিয়াছেন। অনেক সময়ই উত্তরের মর্ম হইত: আমরা যাহা, তাহাই সভ্যতা। তিনি উক্ত সংজ্ঞা মানিয়া লইতে পারেন নাই।

তাঁহার মতে: কোন জাতি জলে স্থলে এমন কি সমস্ত পঞ্চভূতের উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারে এবং জীবনের হিত-সংক্রান্ত সমস্যাগুলির আপাত সমাধান করিতে পারে, তথাপি সভ্যতা ব্যক্তি-জীবনে বাস্তব হইয়া উঠে না। যে আপন আত্মাকে জয় করিতে পারিয়াছে, সভ্যতার পরাকাষ্ঠা তাহারই মধ্যে পরিস্ফুট। জগতে অন্য দেশ অপেক্ষা ভারতেই এইরূপ অবস্থা অধিক দৃষ্ট হয়—কারণ সেখানে ঐহিক বিষয় গৌণ, আধ্যাত্মিকতার সহায়কমাত্র। ভারতীয়গণ প্রাণসত্তায় উজ্জীবিত সকল বস্তুর মধ্যে আত্মার বিকাশ দর্শন করেন, এবং প্রকৃতি-সম্বন্ধে জ্ঞান তাঁহারা এই দৃষ্টিকোণ হইতেই অর্জন করেন। সুতরাং অদম্য ধৈর্যের সহিত কঠিনতম দুর্ভাগ্য সহ্য করিবার মতো ধীর প্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য দেশবাসী অপেক্ষা অধিকতর শক্তি ও জ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা ভারতে রহিয়াছে। সেইজন্য সেখানে এমন একটি জাতি আছে, যাহাদের নিরবচ্ছিন্ন জীবনধারা দূরদূরান্তের চিন্তানায়কদের আকৃষ্ট করিয়াছে এবং তাহাদের স্কন্ধ হইতে পীড়াদায়ক সাংসারিক বোঝা লাঘব করিতে আহ্বান জানাইয়াছে।

এই বক্তৃতার মুখবন্ধে বলা হয় যে, বক্তাকে বহু প্রশ্ন করা হইয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলির উত্তর তিনি ব্যক্তিগতভাবে দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তিনটি প্রশ্নের উত্তর তিনি বক্তৃতা-মঞ্চ হইতেই দিলেন। এই তিনটিকে নির্বাচন করিবার কারণ ক্রমশঃ জানা যাইবে। এই তিনটি প্রশ্ন হইল: (১) ভারতবাসীরা কি তাহাদের সন্তানদের কুমীরের মুখে সমর্পণ করে? (২) তাহারা কি নিজেদের জগন্নাথের রথচক্রের নিম্নে নিক্ষেপ করে? (৩) তাহারা কি বিধবাদের মৃত স্বামীর সহিত একত্র অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর তিনি সেই স্বরে দিলেন, যে-স্বরে একজন আমেরিকাবাসী বিদেশে ভ্রমণকালে—নিউ ইয়র্কের রাস্তায় রাস্তায় রেড-ইণ্ডিয়ানরা যথেচ্ছ ঘুরিয়া বেড়ায় কিনা, অথবা ইওরোপে আজও অনেকে বিশ্বাস করেন—এরূপ উপকথা-

সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন! স্বামী বিবেকানন্দের নিকট উক্ত প্রথম প্রশ্নটি অত্যন্ত হাস্যকর এবং উত্তর-দানের অযোগ্য বলিয়াই মনে হইয়াছে।

যখন কতিপয় সদাশয় অথচ অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে তিনি এই প্রশ্নের সম্মুখীন হন, 'কি কারণে কেবলমাত্র বালিকাদের কুমীরের মুখে সমর্পণ করা হয়?'—তখন তিনি বিদ্রূপ করিয়া উত্তর দেন, 'বোধ হয় তাহারা অধিকতর নরম ও কোমল বলিয়া, এবং সেই তমসাচ্ছন্ন দেশের জলাশয়সমূহের অধিবাসিগণ দন্তদ্বারা সহজেই তাহাদের চর্বণ করিতে পারিবে বলিয়া এইরূপ করা হয়।'

জগন্নাথ-সম্পর্কিত গল্প সম্বন্ধে বক্তা জগন্নাথ-পুরীর পবিত্র নগরের প্রাচীন রথযাত্রা-উৎসব বর্ণনা করিয়া এই মন্তব্য করেন যে, সম্ভবতঃ রথের রজ্জু ধরিবার ও টানিবার আগ্রহাতিশয্যে কিছুসংখ্যক পুণ্যকামী ব্যক্তি পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকিবে। এই ধরনের কিছু দুর্ঘটনা অতিরঞ্জিত হইয়া এমন বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে যে, অন্যান্য দেশের সহৃদয় ব্যক্তিগণ তাহা শ্রবণ করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন।

বিধবাদের অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করিবার কথা বিবেকানন্দ অস্বীকার করেন, এবং সত্য তথ্য উদ্ঘাটিত করিয়া বলেন, হিন্দু বিধবাগণ অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতেন স্বেচ্ছায়।

যে অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটিয়াছে, সেখানে মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা, যাঁহারা সর্বকালে আত্মহত্যার বিরোধী, তাঁহারা বিধবাদের উক্ত কার্য হইতে বিরত হইবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন; এবং যে-সকল ক্ষেত্রে সাধ্বী বিধবাগণ লোকান্তরে স্বামীর সহগামী হইবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই এই অগ্নিপরীক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ যদি তাঁহারা হস্ত-দুইখানি অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া দগ্ধ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ঐকান্তিক বাসনা-পূরণে আর কোন বাধা দেওয়া হইত না। কিন্তু ভারতই একমাত্র দেশ নয়, যেখানে নারী প্রেমবশতঃ স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার অনুগমন করিয়া অমরলোকে গমন করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে পৃথিবীর সকলদেশেই কিছু নারী প্রাণবিসর্জন করিয়াছে। 'যে-কোন দেশেই এই ধরনের আবেগ বিরল, এবং ভারতবর্ষেও ইহা 'অন্যান্য দেশের মতোই নিত্যকার সাধারণ ব্যাপার নয়।

বক্তা পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন, ভারতবাসীরা নারীগণকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করেন না, এবং তাঁহারা কখনও 'ডাইনী' হত্যা করেন নাই।

বক্তার শেষোক্ত শ্লেষটি অতি তীব্র। এই হিন্দু সন্ন্যাসীর দার্শনিক মতবাদ বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন এখানে নাই, শুধু এইটুকু বলিলেই হইবে যে, ইহার সাধারণ ভিত্তি হইল—অনন্তের উপলব্ধির জন্য আত্মার যে-প্রয়াস তাহারই উপর। একজন পণ্ডিত হিন্দু এ-বৎসর লাওয়েল ইনস্টিট্যুটের পাঠক্রমের উদ্বোধন করেন। শ্রীযুক্ত মজুমদার যাহার সূচনা করিয়াছিলেন, ভ্রাতা বিবেকানন্দ যোগ্যতার সহিত তাহারই উপসংহার করিলেন।

এই নূতন পর্যটকের ব্যক্তিত্ব অধিক আকর্ষণীয়, যদিও হিন্দু দর্শনের মতানুযায়ী ব্যক্তিত্বকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয়। ধর্ম-মহাসম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ বিবেকানন্দকে কার্যসূচীর শেষের দিকে রাখিতেন, যাহাতে শ্রোতাগণ তাঁহার ভাষণ শুনিবার জন্য অধিবেশনের শেষ পর্যন্ত বসিয়া থাকেন। বিশেষ করিয়া কোন গরম দিনে যখন কোন বক্তা দীর্ঘ নীরস বক্তৃতা আরম্ভ করিতেন, এবং শ্রোতাগণ দলে দলে সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন, তখন সম্মেলনের সভাপতি উঠিয়া ঘোষণা করিয়া দিতেন, সমাপ্তিসূচক স্বস্তিবাচনের পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিবেন ; তখনই শ্রোতারা শান্ত হইত। চার সহস্র নরনারী অসহ্য গরমে পাখা ব্যজন করিতে করিতে স্মিতমুখে ও সাগ্রহে বিবেকানন্দের পনরো মিনিট বক্তৃতা শুনিবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপর বক্তাদের বক্তৃতা-কালে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতেন। সভাপতি সর্বাপেক্ষা উত্তম বস্তুটিকে শেষে পরিবেশন করিবার পুরাতন রীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন।

হিন্দু ও খ্রীষ্টান

১৮৯৪ খৃঃ ২১শে ফেব্রুআরি ডেট্রয়েটে প্রদত্ত 'Hindus and Christians' বক্তৃতার অনুবাদ।

বিভিন্ন দর্শনের তুলনায় দেখা যায়, হিন্দুদর্শনের প্রবণতা ধ্বংস করা নয়, বরং প্রত্যেক বিষয়ে সমন্বয় করা। যদি ভারতে নতুন কোন ভাব আসে, আমরা তার বিরোধিতা করি না, বরং তাকে আত্মসাৎ ক'রে নিই, অন্যান্য ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে নিই, কারণ আমাদের দেশের সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণই প্রথম এই পদ্ধতি শিখিয়ে গেছেন। শ্রীভগবান এই অবতারেই প্রথম প্রচার ক'রে গেছেন, 'আমি ঈশ্বরের অবতার, আমিই বেদাদি গ্রন্থের প্রেরয়িতা, আমিই সকল ধর্মের উৎস।' তাই আমরা কোন ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি না।

খ্রীষ্টানদের সঙ্গে আমাদের একটি বিষয়ে বড়ই পার্থক্য, এটি আমাদের কেউ কোন দিন শেখায়নি। সেটি হচ্ছে যীশুর রক্ত দিয়ে মুক্তি, অথবা একজনের রক্তদ্বারা নিজেকে শুদ্ধ হ'তে হবে। ইহুদীদের মতো বলিদান-প্রথা আমাদেরও আছে। আমাদের এই বলি বা উৎসর্গ-প্রথার সহজ অর্থ: আমি কিছু খেতে যাচ্ছি, কিছু অংশ ঈশ্বরকে নিবেদন না করাটা ভাল নয়। তাই আমি আমার খাদ্য ঈশ্বরকে নিবেদন করি; সহজে সংক্ষেপে এই হ'ল ভাবটি। তবে ইহুদীর ধারণা উৎসর্গীকৃত মেষটির উপর তার পাপরাশি চলে যাবে, আর সে পাপমুক্ত হবে। এই 'সুন্দর' ভাবটি আমাদের দেশে বিকাশ লাভ করেনি, তার জন্যে আমি আনন্দিত। অন্যের কথা বলতে পারি না, তবে আমি কখনও এই ধরনের বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ চাই না। যদি কেউ এসে আমাকে বলে, 'আমার রক্তের বিনিময়ে মুক্ত হও', তাকে ব'লব, 'ভাই, চলে যাও, বরং আমি নরকে যাব। আমি এমন কাপুরুষ নই যে, একজন নিরপরাধ ব্যক্তির রক্ত নিয়ে স্বর্গে যাব। আমি নরকে যাবার জন্য প্রস্তুত।' ঐ ধরনের বিশ্বাস আমাদের দেশে উদ্ভূত হয়নি। আমাদের দেশের অবতার বলেছেন: যখনই পৃথিবীতে অসদ্‌ভাব ও দুর্নীতি প্রবল হবে, তখনই তিনি আসবেন তাঁর সন্তানদের সাহায্য করতে, এবং তিনি যুগে যুগে দেশে দেশে এই কাজ ক'রে আসছেন। পৃথিবীর যেখানেই

দেখবে অসাধারণ কোন পবিত্র মানব মানুষের উন্নতির জন্যে চেষ্টা করছেন, জেনো—তাঁর মধ্যে ভগবানই রয়েছেন।

অতএব বুঝতে পারছ, কেন আমরা কোন ধর্মের সঙ্গে লড়াই করি না। আমরা কখনও বলি না, আমাদের ধর্মই মুক্তির একমাত্র রাস্তা। যে কোন মানুষ সিদ্ধাবস্থা লাভ করতে পারে; তার প্রমাণ? প্রত্যেক দেশেই দেখি পবিত্র সাধু পুরুষ রয়েছেন, আমার ধর্মে জন্মগ্রহণ করুন বা না করুন—সর্বত্র সদ্‌ভাবাপন্ন নরনারী দেখা যায়। অতএব বলা যায় না, আমার ধর্মই মুক্তির একমাত্র পথ। 'অসংখ্য নদী যেমন বিভিন্ন পর্বত থেকে বেরিয়ে একই সমুদ্রে তাদের জলধারা মিশিয়ে দেয়, তেমনি বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভূত হয়ে তোমারই কাছে আসে'—এটি ভারতে ছোট ছেলেদের প্রতিদিনের একটি প্রার্থনার অংশ। যারা প্রতিদিন এই ধরনের প্রার্থনা করে, তাদের পক্ষে ধর্মের বিভিন্নতা নিয়ে মারামারি করা একেবারেই অসম্ভব। এ তো গেল দার্শনিকদের কথা, এঁদের প্রতি আমাদের খুবই শ্রদ্ধা, বিশেষ ক'রে সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; তার কারণ, তাঁর অপূর্ব উদারতা দ্বারা তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সকল দর্শনের সমন্বয় করেছেন।

ঐ যে মানুষটি মূর্তির সামনে প্রণাম করছে, ও কিন্তু তোমরা যে ব্যাবিলন বা রোমের পৌত্তলিকতার কথা শুনেছ, তার মতো নয়। এ হিন্দুর এক বিশেষত্ব। মূর্তির সামনে মানুষটি চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করে, 'সোঽহম্, তিনিই আমার স্বরূপ; আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই; আমার পিতা নেই, মাতা নেই; আমি দেশকালে সীমাবদ্ধ নই; আমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। সোঽহম্, সোঽহম্; আমি কোন পুস্তকের বাঁধনে বাঁধা পড়িনি! কোন তীর্থের বা কোন কিছুর বন্ধন আমার নেই! আমি সৎস্বরূপ, আমি আনন্দস্বরূপ, সোঽহম্, সোঽহম্।' বার বার এই কথা উচ্চারণ ক'রে সে বলে, 'হে ঈশ্বর, আমার মধ্যে তোমাকে আমি অনুভব করতে পারছি না, বড় হতভাগ্য আমি।'

বই-পড়া জ্ঞানের ওপর ধর্ম নির্ভর করে না। ধর্ম আত্মাই, ধর্ম ঈশ্বর, শুধু বই-পড়া জ্ঞান বা বক্তৃতা-শক্তির দ্বারা ধর্ম লাভ হয় না। সব চেয়ে বিদ্বান্ ব্যক্তিকে বলো—আত্মাকে আত্মা-রূপে চিন্তা করতে, তিনি পারবেন না। আত্মার সম্বন্ধে তুমি একটা কল্পনা করতে পারো, তিনিও পারেন। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত আত্মস্বরূপে চিন্তা অসম্ভব। ঈশ্বর-তত্ত্ব যতই শোনো না

কেন—তুমি একজন বড় দার্শনিক, আরও বড় ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞ হ'তে পারো—তবু একটি হিন্দু বালক বলবে 'ওর সঙ্গে ধর্মের কিছু সম্বন্ধ নেই। আত্মাকে আত্ম-স্বরূপে চিন্তা করতে পারো?' তা হ'লে সকল সংশয়ের শেষ, তা হ'লেই মনের সব বাঁকাচোরা সোজা হয়ে যাবে। জীবাত্মা (মানুষ) যখন পরমাত্মার (ঈশ্বরের) সম্মুখীন হয়, তখনই সব ভয় শূন্যে মিলিয়ে যায়, সব সন্দিগ্ধ চিন্তা চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়।

পাশ্চাত্যের বিচারে একজন অদ্ভুত বিদ্বান্ হ'তে পারেন, তবু তিনি হয়তো ধর্ম বিষয়ে 'অ, আ, ক, খ' না জানতে পারেন। আমি তাঁকে তাই ব'লব। জিজ্ঞাসা ক'রব, 'আপনি কি আত্মাকে আত্মা ব'লে ভাবতে পারেন? আপনি কি আত্ম-বিষয়ক বিজ্ঞানে পারদর্শী? আপনি জড়ের ঊর্ধ্বে নিজ আত্মাকে বিকশিত করেছেন? যদি তা না ক'রে থাকেন, তা হ'লে তাঁকে ব'লব, 'আপনার ধর্ম লাভ হয়নি, যা হয়েছে তা শুধু কথা, শুধু বই, শুধু বৃথা গর্ব!'

আর ঐ 'হতভাগ্য' হিন্দুটি মূর্তির সামনে বসে দেবতার সঙ্গে তাদাত্ম্য চিন্তা করবার চেষ্টা ক'রে শেষে বলে, 'হে ঈশ্বর, পারলাম না তোমায় আত্মস্বরূপে ধারণা করতে, অতএব এই সাকার মূর্তিতেই তোমায় চিন্তা করি।' তখন সে চোখ খোলে, ঈশ্বরের রূপ প্রত্যক্ষ করে, প্রণাম ক'রে বার বার প্রার্থনা করে। প্রার্থনার শেষে আবার বলে, 'হে ঈশ্বর, আমায় ক্ষমা করো, তোমার এই অসম্পূর্ণ পূজার জন্য।'

তোমরা কেবল শুনে আসছ, হিন্দুরা পাথর পূজা করে। তাদের অন্তরের প্রকৃতি সম্বন্ধে তোমরা কি ভাবো? এই দেখ, আমি হচ্ছি ইতিহাসে প্রথম হিন্দু সন্ন্যাসী, যে সমুদ্র পেরিয়ে এই পাশ্চাত্য দেশে এসেছে। এসে অবধি শুনছি, তোমাদের সমালোচনা, তোমাদের ঐ-সব কথা। তোমাদের সম্বন্ধে আমার দেশের লোকের ধারণা কি? তারা হাসে আর বলে, 'ওরা শিশু; প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ওরা বড় হ'তে পারে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জিনিস ওরা তৈরি করতে পারে, কিন্তু ধর্ম-ব্যাপারে ওরা একেবারে শিশু!' এই হ'ল তোমাদের সম্বন্ধে আমার দেশের লোকের ধারণা।

একটি কথা তোমাদের ব'লব, কোন নিষ্ঠুর সমালোচনা করছি না! তোমরা কতকগুলি মানুষকে শিক্ষিত কর, খেতে দাও, পরতে দাও, মাইনে দাও—কি কাজের জন্য? তারা আমার দেশে এসে আমার পূর্বপুরুষদের অভিসম্পাত

করে, আমার ধর্মকে গাল দেয়, আমার দেশের সব কিছুকে মন্দ বলে। তারা মন্দিরের ধার দিয়ে যেতে যেতে বলে, 'এই পৌত্তলিকের দল, তোরা নরকে যাবি!' তারা কিন্তু মুসলমানদের একটিও কথা বলতে সাহস করে না, জানে—এখনি খাপ থেকে তলোয়ার বেরিয়ে পড়বে! হিন্দু বড় নিরীহ, সে একটু হাসে, চলে যাবার সময় ব'লে যায়, 'মূর্খেরা যা বলবার বলুক।' এই হ'ল তাদের ভাব। তোমরা, যারা গালাগাল দেবার জন্যে মানুষকে শিক্ষিত করো, তারা আমার সামান্য সমালোচনায় আঁতকে উঠে চীৎকার করো, 'সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত আমাদের ছুঁয়োনা, আমরা আমেরিকান। আমরা দুনিয়া সুদ্ধ লোকের সমালোচনা ক'রব, গাল দেব, শাপ দেব, যা খুশি ব'লব, কিন্তু আমাদের ছুঁয়োনা, আমরা বড় স্পর্শকাতর—লজ্জাবতী লতা।'

তোমরা যা খুশি করতে পারো; আমরাও যে-ভাবে আছি, সে-ভাবেই সন্তুষ্ট আছি। একটা বিষয়ে আমরা তোমাদের থেকে ভাল আছি, আমরা আমাদের ছেলেদের এই অদ্ভুত তথ্য গেলাই না যে—পৃথিবীতে সব পবিত্র, শুধু মানুষই খারাপ! তোমাদের ধর্মপ্রচারকেরা যখন আমাদের সমালোচনা করে, তারা যেন মনে রাখে—সমস্ত ভারতবাসী যদি দাঁড়িয়ে ওঠে এবং ভারত-সমুদ্রের তলায় যত মাটি আছে, সব যদি পাশ্চাত্য দেশগুলির প্রতি ছুঁড়তে থাকে, তা হলেও তোমরা আমাদের প্রতি যা করে থাকো, তার কোটি ভাগের এক ভাগও করা হবে না। কেন, কি জন্য? আমরা কি কোন দিন কোথাও ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছি--কাউকে ধর্মান্তরিত করবার জন্যে? আমরা তোমাদের বলি, 'তোমার ধর্মকে স্বাগত জানাচ্ছি, কিন্তু আমাকে আমার ধর্ম নিয়ে থাকতে দাও।' তোমরা ব'লে থাকো—তোমাদের ধর্ম প্রসারশীল, তোমরা আক্রমণ-ধর্মী। কিন্তু কত জনকে নিতে পেরেছ তোমার মতে? পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ চীনা, তারা বৌদ্ধ; তারপর আছে জাপান, তিব্বত, রাশিয়া, সাইবেরিয়া, বর্মা, শ্যাম। শুনতে হয়তো ভাল লাগবে না, কিন্তু জেনে রেখো—এই যে খ্রীষ্টনীতি, এই ক্যাথলিক চার্চ, সবই বৌদ্ধধর্ম থেকে নেওয়া। কি ভাবে এটা হয়েছিল? এক ফোঁটা রক্তপাত না ক'রে। এত ডম্ফাই তোমাদের, কিন্তু বলো তো—তলোয়ার-ছাড়া খ্রীষ্টান ধর্ম কোথায় সফল হয়েছে? সারা পৃথিবীর মধ্যে একটি জায়গা দেখাও তো! খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাস মন্থন ক'রে আমাকে একটি দৃষ্টান্ত দাও, আমি দুটি চাই না। আমি জানি—তোমাদের পূর্বপুরুষেরা কি ক'রে

ধর্মান্তরিত হয়েছিল। তাদের সম্মুখে দুটি বিকল্প ছিল, হয় ধর্মান্তর-গ্রহণ, নয় মৃত্যু—এই তো! যতই গর্ব কর, মুসলমানদের থেকে তোমরা কি ভাল করতে পারো? 'আমরাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ!' কেন? 'কারণ আমরা অপরকে হত্যা করতে পারি।' আরবরা তাই বলেছিল, তারাও ঐ বড়াই করেছিল, কোথায় তারা আজ? আজও তারা বেদুইন! রোমানরাও ঐ কথা ব'লত, কোথায় তারা?

'শান্তিস্থাপনকারীরাই ধন্য, তারাই পৃথিবী ভোগ করবে।' আর ঐ সব অহঙ্কারের নীতি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে। ওগুলি বালির ওপর নির্মিত। বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারে না। স্বার্থপরতার ভিত্তির ওপর যা কিছু রচিত, প্রতিযোগিতা যার প্রধান সহায়, ভোগ যার লক্ষ্য, আজ নয় কাল তার ধ্বংস হবেই। এ জিনিস মরবেই।

ভ্রাতৃবৃন্দ, যদি বাঁচতে চাও, যদি চাও তোমাদের জাতি বেঁচে থাকুক, তবে বলি শোন—খ্রীষ্টের কাছে ফিরে যাও। তোমরা খ্রীষ্টান নও; জাতি-হিসাবে তোমরা খ্রীষ্টান নও। ফিরে চল খ্রীষ্টের কাছে। ফিরে চল তাঁর কাছে—যাঁর মাথা গোঁজবার জায়গাটুকুও ছিল না, 'পাখিদের বাসা আছে, পশুদেরও গর্ত আছে, কিন্তু মানব-পুত্রের (যীশুর) এমন একটি জায়গা ছিল না—যেখানে তিনি মাথা রেখে বিশ্রাম করেন।' তোমাদের ধর্ম প্রচারিত হচ্ছে বিলাসের নামে। কি দুর্দৈব! উলটে ফেলো এ নীতি, যদি বাঁচতে চাও! (ধর্ম-ব্যাপারে) এ দেশে যা কিছু শুনেছি, সব কপটতা। যদি এই জাতি বাঁচতে চায়, তবে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। 'ঈশ্বর এবং ধন-দেবতা (ম্যামন)-কে একই সঙ্গে সেবা করতে পারবে না।' এই সব সম্পদ্—সব খ্রীষ্ট থেকে? খ্রীষ্ট এ-সব অশাস্ত্রীয় কথা অস্বীকার করতেন। ধন-দৌলত থেকে যে সম্পদ্-উন্নতি আসে, তা অনিত্য—ক্ষণস্থায়ী! প্রকৃত নিত্যত্ব রয়েছে ঈশ্বরে! যদি পারো এই দুটি—এই সম্পদের সঙ্গে খ্রীষ্টের আদর্শ—মেলাতে, তবে খুবই ভাল। যদি না পারো, তবে বরং সম্পদ্ ছেড়ে দাও, খ্রীষ্টের কাছেই ফিরে চল। খ্রীষ্টশূন্য প্রাসাদে বাস করা অপেক্ষা ছেঁড়া কম্বল গায়ে দিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে বাস করার জন্য প্রস্তুত হও।

ভারতে খ্রীষ্টধর্ম

১৮৯৪, ১১ই মার্চ, প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণী—'ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেসে' প্রকাশিত :

গতরাত্রে ডেট্রয়েট অপেরা হাউসে বিবেকানন্দ এক বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে বক্তৃতা করেন। এখানে তিনি খুবই আন্তরিক অভ্যর্থনা পেয়েছেন এবং অপূর্ব বাগ্মিতাপূর্ণ এক ভাষণ দিয়েছেন। পুরা আড়াই ঘণ্টা তিনি বলেন।

জাপান ও চীনে মিশনরীদের কাজ কর্ম সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু জানি না, কিন্তু ভারতবর্ষে তাদের সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। এই দেশের লোকেরা মনে করে, ভারতবর্ষ একটি বিরাট পতিত ভূখণ্ড, সেখানে আছে অনেক জঙ্গল আর কয়েকটি সভ্য ইংরেজ।

ভারতবর্ষ আয়তনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক এবং লোকসংখ্যা ত্রিশ কোটি। সে-দেশ সম্বন্ধে অনেক গল্প বলা হয়, এবং সে-গুলি অস্বীকার ক'রে ক'রে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। খ্রীষ্টানরা যখন কোন নতুন দেশে গিয়েছে, তখন তারা সেখানকার অধিবাসীদের যেমন নির্মূল করার চেষ্টা করেছে, ভারতের প্রথম বিজেতা আর্যগণ ভারতের আদি অধিবাসীদের সেরূপ নির্মূল করার চেষ্টা করেননি ; বরং তাঁদের প্রয়াস ছিল কি ক'রে পশুপ্রকৃতি মানুষদের উন্নত করা যায়।

স্পেন-দেশের লোকেরা সিংহলে এসেছিল খ্রীষ্টধর্ম নিয়ে। তারা ভেবেছিল—পৌত্তলিকদের নিধন ক'রে তাদের মন্দির ভেঙে ফেলার জন্য ঈশ্বর তাদের আদেশ দিয়েছেন। বৌদ্ধদের কাছে তাদের ধর্মগুরুর এক ফুট লম্বা একটি দাঁত ছিল, স্পেনের লোকেরা সেটা সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, কয়েক হাজার লোককে হত্যা করে এবং মাত্র কয়েক কুড়ি লোককে ধর্মান্তরিত করে।

পোর্তুগীজেরা এসেছিল পশ্চিম ভারতে। হিন্দুরা ঈশ্বরের ত্রিমূর্তিতে বিশ্বাসী এবং সেই পবিত্র বিশ্বাসে প্রণোদিত হয়ে তারা একটি মন্দির গড়েছিল। আক্রমণকারীরা মন্দিরটি দেখে বললে, 'এ শয়তানের সৃষ্টি', সুতরাং এই অপূর্ব

কীর্তিটি বিনাশ করার জন্য তারা একটি কামান নিয়ে এসে মন্দিরের একটা অংশ ধ্বংস ক'রল। ক্রুদ্ধ জনসাধারণ তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত ক'রে দিল।

প্রথম দিকে মিশনরীরা দেশ অধিকার করার চেষ্টা করেছে, এবং বলপ্রয়োগে সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করার চেষ্টায় বহু লোককে হত্যা করেছে এবং কিছু লোককে ধর্মান্তরিত করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের জীবন রক্ষার জন্য খ্রীষ্টান হয়েছে। পোর্তুগীজদের তরবারির ভয়ে ধর্মান্তরিতদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বুই জনই বাধ্য হয়েছে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে, এবং তারা ব'লত, 'আমরা খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমরা নিজেদের খ্রীষ্টান বলতে বাধ্য হয়েছি।' ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মও শীঘ্রই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের এক অংশ অধিকার ক'রে ব'সল; সুযোগের সদ্ব্যবহারের অভিপ্রায়ে তারা মিশনরীদের দূরেই রেখেছিল। হিন্দুরাই প্রথম মিশনরীদের স্বাগত জানায়, ব্যবসায়ে ব্যস্ত ইংরেজরা নয়। পরবর্তী কালের প্রথম মিশনরীদেব কয়েকজনের প্রতি আমার খুব শ্রদ্ধা আছে। তাঁরা ছিলেন যীশুর যথার্থ সেবক; তাঁরা ভারতবাসীদের নিন্দা করেননি বা তাদের সম্পর্কে জঘন্য মিথ্যা কথা রটাননি। তাঁরা ছিলেন ভদ্র ও সহৃদয়। ইংরেজরা যখন ভারতের প্রভু হয়ে ব'সল, তখন থেকেই মিশনরীদের উদ্যম নিস্তেজ হ'তে আরম্ভ করে—এই অবস্থাই ভারতে মিশনরীদের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম দিকের একজন মিশনরী ডক্টর লঙ্ এ-দেশের মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। নীল-উৎপাদনকারীদের দ্বারা ভারতে যে-অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার বর্ণনা-সম্বলিত একটি ভারতীয় নাটকের তিনি অনুবাদ করেছিলেন। তার ফল হয়েছিল কি? ইংরেজরা তাঁকে জেলে পুরেছিল। এ-সব মিশনরী দেশের মঙ্গল সাধন করেছেন, কিন্তু তাঁদের যুগ কেটে গেছে। সুয়েজ খাল বহু অমঙ্গলের পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছে।

এখনকার মিশনরীরা বিবাহিত এবং বিবাহিত বলেই তাদের কাজ ব্যাহত হয়। মিশনরী জনসাধারণ সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তাদের ভাষায় কথা কইতে পারে না, সেইজন্য তাকে বাস করতে হয় একটি ছোটখাট শ্বেতকায় কলোনিতে। বিবাহিত বলেই এরূপ করতে সে বাধ্য হয়। বিবাহিত না হ'লে সে গিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বাস করতে পারত এবং প্রয়োজন হ'লে

মাটিতে শুতেও পারত। সুতরাং ভারতে তার স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গী খোঁজবার জন্য ইংরেজী ভাষাভাষীদের মধ্যেই সে বাস করে। মিশনরী প্রচেষ্টা ভারতবর্ষের অন্তরাত্মাকে কিছুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। অধিকাংশ মিশনরীই তাদের কাজের অযোগ্য। আমি একজনও মিশনরী দেখিনি, যে সংস্কৃত জানে। কোন দেশের মানুষ ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ব্যক্তি সেই দেশের লোকেদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে কি ক'রে? আমি কারও উপর দোষারোপ করছি না, তবে এ-কথা সত্য যে, খ্রীষ্টানরা এমন লোকদের মিশনরী ক'রে পাঠায়, যাদের মোটেই যোগ্যতা নেই। এটা দুঃখের বিষয় যে, প্রকৃত সন্তোষজনক ফল কিছুই হচ্ছে না, অথচ কিছু লোককে ধর্মান্তরিত করার জন্য টাকা খরচ করা হচ্ছে।

মুষ্টিমেয় যারা ধর্মান্তরিত হয়, তারা মিশনরীদের চারদিকে ঘোরে এবং তাদের ওপর নির্ভর ক'রে জীবিকা অর্জন করে। যে-সকল ধর্মান্তরিতকে ভারতে চাকরিতে বহাল রাখা হয় না, তারা আবার খ্রীষ্টধর্মও ত্যাগ করে। সংক্ষেপে সমগ্র ব্যাপারটা হ'ল এই। ধর্মান্তরিত করার রকমটাও একেবারে হাস্যোদ্দীপক। মিশনরীদের আনীত টাকা তারা গ্রহণ করে। শিক্ষার দিকটা বিবেচনা করলে মিশনরীদের প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলি সন্তোষজনক; কিন্তু ধর্মের ব্যাপার সম্পূর্ণ আলাদা। হিন্দুরা তীক্ষ্ণবুদ্ধি; তারা বঁড়শিতে ধরা না দিয়ে টোপটা খেয়ে নেয়! তাদের আশ্চর্য সহনশীলতা! একদা কোন মিশনরী বলেছিল, 'গোটা ব্যাপারটায় সবচেয়ে বড় অসুবিধে ঐখানেই; আত্মসন্তুষ্ট লোকেদের কখনও ধর্মান্তরিত করা সম্ভব নয়।'

আর মহিলা মিশনরীরা কোন কোন বাড়ি গিয়ে মেয়েদের বাইবেল সম্পর্কে কিছু শিক্ষা দেন এবং কি ক'রে বুনতে হয়—তাও শেখান; এজন্য তাঁরা মাসে চার শিলিং ক'রে পান। ভারতের মেয়েরা কখনও ধর্মান্তরিত হবে না। স্বদেশের নাস্তিকতা ও সংশয়বাদই মিশনরীদের অন্য দেশে যেতে প্ররোচিত করছে। এদেশে এসে আমি বহু উদার প্রকৃতির পুরুষ ও নারীকে দেখে বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু ধর্মমহাসভার পর এক বিখ্যাত প্রেসবিটেরিয়ান সংবাদপত্র একটি তীব্র আক্রমণাত্মক রচনা দ্বারা আমাকে সংবর্ধনা করেছিল। সম্পাদক এটাকে বলেন— 'উৎসাহ'। মিশনরীরা জাতীয়তাকে বিসর্জন দেয় না বা দিতে পারে না, তারা মোটেই উদার নয়; অতএব ধর্মান্তরিত করার মাধ্যমে তাদের দ্বারা কিছুই সাধিত হয় না; অবশ্য নিজেদের মধ্যে সামাজিক মেলামেশায় তাদের সময় বেশ ভালই

কাটে। ভারতবর্ষের প্রয়োজন খ্রীষ্টের কাছ থেকে সাহায্য, খ্রীষ্ট-বিরোধীর কাছ থেকে নয়; এ-সকল মিশনরী খ্রীষ্টের মতো নয়। খ্রীষ্টের আদর্শ অনুযায়ী তারা আচরণ করে না; তারা বিবাহিত, ভারতে গিয়ে তারা আরামের ঘর বাঁধে এবং সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যেরা ভারতে এলে প্রভূত কল্যাণ সাধন করতেন, যেমন বহু হিন্দু সাধক ক'রে থাকেন; কিন্তু এ-সব মিশনরীর সেই চারিত্রিক পবিত্রতা নেই। হিন্দুরা সানন্দে খ্রীষ্টানদের খ্রীষ্টকে স্বাগত জানাবে, কারণ তাঁর জীবন ছিল পবিত্র ও সুন্দর; কিন্তু তারা অজ্ঞ, মিথ্যাচারী ও আত্মপ্রবঞ্চক ব্যক্তিদের অনুদার উক্তিগুলি গ্রহণ করতে পারে না বা করবে না।

প্রত্যেক মানুষ অপর মানুষ থেকে পৃথক্। এই পার্থক্য না থাকলে মানুষের মনের অধঃপতন হ'ত। বিভিন্ন ধর্ম না থাকলে একটি ধর্মও টিকে থাকত না। খ্রীষ্টানের প্রয়োজন তার নিজের ধর্মের, হিন্দুরও তেমনি প্রয়োজন নিজ ধর্মের। বৎসরের পর বৎসর 'ধর্মগুলি' পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করেছে। যে-সকল ধর্ম গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে-গুলি আজও বেঁচে আছে। খ্রীষ্টানরা ইহুদীদের ধর্মান্তরিত করতে পারলো না কেন? কেনই বা তারা পারসীকদের খ্রীষ্টান করতে পারলো না? মুসলমানদের তারা ধর্মান্তরিত করতে পারেনি কেন? চীন ও জাপানের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয়নি কেন? বৌদ্ধ ধর্মই প্রথম প্রচারশীল ধর্ম এবং বৌদ্ধদের সংখ্যা যে-কোন ধর্মাবলম্বীর সংখ্যার দ্বিগুণ। তারা তরবারির সাহায্যে প্রচার করেনি। মুসলমানরা সবচেয়ে বেশী হিংসার পথ অবলম্বন করেছে। তিনটি বৃহৎ প্রচারশীল ধর্মের মধ্যে তাদের সংখ্যাই সবচেয়ে কম। মুসলমানদেরও একসময় প্রতিপত্তির দিন এসেছিল।

প্রতিদিনই শোনা যায়—খ্রীষ্টান-জাতি রক্তপাতের দ্বারা দেশ অধিকার করছে। কোন মিশনরী এর প্রতিবাদে একটা কথা বলেছে? অতি রক্তপিপাসু জাতিগুলি কেন এমন একটি ধর্মকে গৌরবান্বিত করবে, যা কখনও খ্রীষ্টের ধর্ম নয়? ইহুদী ও আরবেরাই ছিল খ্রীষ্টধর্মের জন্মদাতা; খ্রীষ্টানেরা তাদের কিভাবেই না নির্যাতন করেছে! ভারতে খ্রীষ্টানদের যাচাই করা হয়ে গেছে এবং ওজনে তারা কম পড়েছে। আমি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করতে চাই না, অপরে তাদের কি চোখে দেখে, খ্রীষ্টানদের তাই দেখাতে চাই। যে-সকল মিশনরী নরকের আগুনের কথা প্রচার কর্‌ছে, সকলে তাদের ভয়ের চোখে

দেখে। তরবারি ঘুরিয়ে তরঙ্গের পর তরঙ্গের মতো মুসলমানরা ভারতে এসেছে, কিন্তু আজ তারা কোথায়?

সকল ধর্মের উপলব্ধির শেষ সীমা হচ্ছে একটি আধ্যাত্মিক সত্তার উপলব্ধি। কোন ধর্মই তার বেশী শিক্ষা দিতে পারে না। প্রত্যেক ধর্মেই সার সত্য আছে এবং এই অমূল্য সম্পদের একটি বাহ্য আধার আছে। ইহুদীর ধর্মগ্রন্থে বা হিন্দুর ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস করাটা গৌণ ব্যাপার। পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলির পরিবর্তন ঘটে, আধার পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু মূল সত্য একই থেকে যায়। মূল সত্যগুলি অভিন্ন হওয়ার ফলে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিরা সেগুলিই ধরে থাকেন। যদি একজন খ্রীষ্টানকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তার ধর্মের মূল সত্য কি, তা হ'লে সে উত্তর দেবে, 'প্রভু যীশুর উপদেশ'। বাকি অধিকাংশই বাজে। তবে অসার অংশটিও নিরর্থক নয়; এর দ্বারাই আধার নির্মিত হয়। ঝিনুকের খোলাটি আকর্ষণীয় নয়, কিন্তু এর ভিতরেই থাকে মুক্তা। হিন্দু কখনও যীশুর জীবন-চরিত্র আক্রমণ ক'রে কিছু বলবে না; যীশুর 'শৈলোপদেশ' সে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু ক-জন খ্রীষ্টান হিন্দু-ঋষিদের উপদেশের কথা জানে বা শুনেছে? তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করে। জগতের একটি ক্ষুদ্র অংশ খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে খ্রীষ্টধর্ম বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত ছিল। এই হ'ল প্রকৃতির নিয়ম। ধর্মজগতের এই মহান্ ঐকতান থেকে একটি মাত্র যন্ত্র কেন গ্রহণ কর? এই অপূর্ব ঐকতান চলতে থাকুক। পবিত্র হও। কুসংস্কার পরিত্যাগ কর এবং প্রকৃতির আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ্য কর। কুসংস্কারই ধর্মের উপর আধিপত্য করে। সকল ধর্মই ভাল, কারণ মূল সত্য সর্বত্র এক। প্রত্যেক মানুষকে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ করতে হবে। কিন্তু এই ব্যষ্টিগুলি নিয়েই গড়ে ওঠে পূর্ণাঙ্গ সমষ্টি। এই চমৎকার পরিবেশ এখনই রয়েছে; এই অপূর্ব সৌধ নির্মাণের জন্য প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসেরই কিছু না কিছু দেবার আছে।

যীশুখ্রীষ্টের চরিত্রের সৌন্দর্য যে-হিন্দু দেখতে পায় না, তাকে আমি করুণার পাত্র ব'লে মনে করি। হিন্দু-খ্রীষ্টকে যে-খ্রীষ্টান শ্রদ্ধা করে না, তাকেও আমি করুণা করি। মানুষ যত বেশি নিজের দিকে দৃষ্টি দেয়, প্রতিবেশীর দিকে দৃষ্টি তার তত কমে যায়। যারা অপরকে ধর্মান্তরিত ক'রে বেড়ায় এবং অপরের আত্মাকে পরিত্রাণ করার জন্য খুব বেশী ব্যস্ত, তারাই বহু ক্ষেত্রে নিজেদের আত্মাকে ভুলে যায়। একজন মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,

'ভারতীয় নারীরা আরও উন্নত নয় কেন?' বিভিন্ন যুগে বর্বর আক্রমণকারীরাই অনেক পরিমাণে এর জন্য দায়ী এবং ভারতবাসী নিজেরাও আংশিকভাবে এর জন্য দায়ী। এ দেশের বল্‌নাচ ও উপন্যাসের ভক্ত মেয়েদের চেয়ে আমাদের দেশের মেয়েরা বরাবরই অনেক ভাল। যে-দেশে নিজের সভ্যতা সম্বন্ধে এত দম্ভ, সেই দেশে আধ্যাত্মিকতা কোথায়? আমি তো দেখতে পাই না। 'ইহকাল' এবং 'পরকাল'—এই কথাগুলি তো শিশুদের ভয় দেখানোর জন্যে। এইখানেই সব-কিছু। ঈশ্বর নিয়ে জীবন যাপন, তাঁর ভাব নিয়েই বিচরণ—এইখানে এই শরীরেই! সকল স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে; সমস্ত কুসংস্কার দূর ক'রে দিতে হবে। ভারতে এখনও এ-রকম মানুষ আছে। এদেশে সে-রকম মানুষ কোথায়? আপনাদের প্রচারকেরা 'স্বপ্নবিলাসীদের' সমালোচনা করে; এখানে আরও কিছু বেশী 'স্বপ্নবিলাসী' থাকলে এদেশের মানুষ সমৃদ্ধিশালী হ'তে পারত। এখানে যদি কেউ যীশুখ্রীষ্টের উপদেশ আক্ষরিকভাবে পালন করে, তবে তাকে ধর্মোন্মত্ত বলা হবে। স্বপ্নবিলাস এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর দাম্ভিকতা—এই দুয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। গুণগ্রাহী মধুমক্ষিকা ফুলের সন্ধান করে; হৃদয়-পদ্ম বিকশিত কর। সমগ্র জগৎ ঈশ্বরভাবে পূর্ণ, পাপে পূর্ণ নয়। আমরা যেন পরস্পরকে সাহায্য করি। আমরা যেন পরস্পরকে ভালবাসি। বৌদ্ধদের একটি সুন্দর প্রার্থনা: সকল সাধু-সন্তকে প্রণাম, সকল মহাপুরুষকে প্রণাম; জগতের সকল পবিত্র নরনারীকে প্রণাম!

ভারতে শিল্পচর্চা

স্যান ফ্র্যানসিস্কো শহরে অবস্থিত ওয়েণ্ড সভাগৃহে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞান সম্পর্কে বক্তৃতা করিবেন—এই মর্মে শ্রোতাদের সমক্ষে তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দেওয়া হয়। স্বামীজীর বক্তৃতার কিছু অংশ:

বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে দেখা যায়, প্রথমে শাসন-যন্ত্র সব সময়েই পুরোহিত-গণের অধিকারে ছিল। সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডারেরও উৎস ছিল পুরোহিতশ্রেণী। অতঃপর পুরোহিতগণের নিকট হইতে শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া ক্ষত্রিয় অথবা রাজশক্তির শাসন প্রবর্তিত হয় এবং সামরিক শাসন প্রাধান্য লাভ করে। সর্বদাই এইরূপ ঘটিয়াছে। পরিশেষে ভোগবিলাসের কবলে পড়িয়া জনসাধারণ অধঃপতিত হয় এবং অধিকতর শক্তিশালী ও বর্বর জাতির অধীন হইয়া যায়।

সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ইতিহাসের আদিকাল হইতে ভারতবর্ষ 'জ্ঞানের দেশ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ কখনও অন্যজাতিকে জয় করিবার অভিপ্রায়ে অভিযানে বাহির হয় নাই। এই দেশের অধিবাসিগণ কোনদিনই যোদ্ধা নয়। আপনাদের—পাশ্চাত্যদের মতো তাহারা কখনও মাংস ভক্ষণ করে না, কারণ মাংসই যোদ্ধা সৃষ্টি করে; প্রাণীর রক্ত আপনাদের চঞ্চল করিয়া তোলে এবং আপনারা কিছু একটা করিবার ইচ্ছা করেন।

এলিজাবেথের সময়কার ইংলণ্ডের সহিত ভারতের তুলনা করুন। আপনাদের জাতির পক্ষে সেটি কি অন্ধকার-যুগই ছিল, আর আমরা তখনও কত জ্ঞানে উন্নত ছিলাম! এংলো-স্যাক্সন জাতির কলাবিদ্যাচর্চার যোগ্যতা এ পর্যন্ত খুবই কম। তাহাদের উত্তম কাব্য আছে—দৃষ্টান্তরূপে বলা যাইতে পারে, সেক্সপীয়রের অমিত্রাক্ষর ছন্দ কি অপূর্ব! শুধু ছন্দের মিল ঘটানোই কিছু নয়। ছন্দের মিলই সর্বাপেক্ষা উন্নত রুচির বস্তু নয়।

ভারতবর্ষে বহুযুগ পূর্বে সঙ্গীত পূর্ণ সপ্ত-স্বরে, এমন কি অর্ধ-ও চতুর্থাংশ স্বরে বিকশিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ অতীতে সঙ্গীত, নাটক ও ভাস্কর্যে অগ্রণী ছিল। বর্তমানে যাহা কিছু করা হইতেছে, সবই অনুকরণের চেষ্টা মাত্র। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য মানুষের প্রয়োজন কত অল্প—এই প্রশ্নের উপরই বর্তমান ভারতের সব কিছু নির্ভর করে।

ভারতের নারী

১৯০০, ১৮ই জানুআরি ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত প্যাসাডেনায় সেক্সপীয়র ক্লাব হাউসে প্রদত্ত বক্তৃতা।

স্বামী বিবেকানন্দ: কেহ কেহ আমার বক্তৃতার পূর্বে 'হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে, আবার কেহ কেহ বক্তৃতার পরে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রশ্ন করিতে চান। কিন্তু আমার প্রধান অসুবিধা এই যে, আমি জানি না, আমাকে কি বিষয়ে বক্তৃতা দিতে হইবে। তবে হিন্দুদর্শন, হিন্দুজাতি, হিন্দুদের ইতিহাস বা সাহিত্য-সংক্রান্ত যে-কোন বিষয়ে ভাষণ দিতে আমি প্রস্তুত। মহিলা ও মহোদয়গণ, আপনারা কোন বিষয় প্রস্তাব করিলে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইব।

প্রশ্ন: স্বামীজী, আমেরিকাবাসীরা অত্যন্ত প্রয়োগকুশল জাতি, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি জিজ্ঞাসা করি, হিন্দুদর্শনের কোন্ বিশেষ নীতি বা মতবাদটি আমরা জীবনে কাজে লাগাইব, আর খ্রীষ্টধর্ম আমাদের জন্য যাহা করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা ঐ নীতি আর কতটুকু বেশী কী করিবে?

স্বামীজী: ইহা নির্ণয় করিয়া দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। ইহা আপনাদের উপর নির্ভর করে। হিন্দুদর্শনের ভিতর গ্রহণযোগ্য এবং জীবন গঠনের সহায়ক কিছু যদি পান, তবে তাহা আপনাদের গ্রহণ করা উচিত। আপনারা দেখিতেছেন, আমি মিশনরী নই এবং কাহাকেও আমার ভাবানুযায়ী মত পরিবর্তন করিতে বলি না। আমার নীতি এই—সব ভাবই ভাল এবং মহান্। আপনাদের কোন কোন ভাব ভারতবর্ষের কিছু লোকের উপযোগী হইতে পারে, আবার আমাদের কতকগুলি ভাব এই দেশের কিছু লোকের উপযোগী হইতে পারে; সুতরাং ভাবগুলি সারা পৃথিবীতে অবশ্যই ছড়াইতে হইবে।

প্রশ্ন: আপনাদের দর্শনের ফলাফল আমরা জানিতে চাই। আপনাদের ধর্ম ও দর্শন কি আপনাদের নারীজাতিকে আমাদের নারীজাতি অপেক্ষা উন্নততর করিয়াছে?

স্বামীজী: ইহা বড়ই ঈর্ষাসূচক প্রশ্ন। আমি আমাদের মেয়েদের ভাল মনে করি এবং এদেশের মেয়েদেরও ভাল মনে করি।

প্রশ্ন : বেশ তো, আপনি কি আপনার দেশের মেয়েদের কথা—তাহাদের রীতিনীতি, শিক্ষা এবং পরিবারে তাহাদের স্থান সম্বন্ধে বলিবেন?

স্বামীজী : নিশ্চয়ই, এগুলি সম্বন্ধে আমি খুব আনন্দের সহিত বলিব। তাহা হইলে আজ আপনারা ভারতীয় নারী সম্বন্ধেই জানিতে ইচ্ছুক, দর্শন বা অন্য বিষয় নয়, ঠিক তো?

বক্তৃতা

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, আমার অনেক কিছু অপূর্ণতা আপনাদের সহ্য করিতে হইবে, কারণ আমি এমন এক সাধকসম্প্রদায়ভুক্ত, যাহারা বিবাহ করে না। অতএব নারীর সহিত মাতা, জায়া, কন্যা ও ভগিনী প্রভৃতি সম্পর্কে অপরের জ্ঞান যতটা পূর্ণ, আমার ততটা না হওয়াই স্বাভাবিক। তারপর স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষ একটি বিশাল মহাদেশ—কেবল একটি দেশ নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির তুলনায় ইওরোপের জাতিগুলি পরস্পরের নিকটতর এবং অধিকতর সাদৃশ্য-বিশিষ্ট। আপনারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিতে পারিবেন, যদি বলি যে, সমগ্র ভারতবর্ষে আটটি বিভিন্ন ভাষা আছে। ঐগুলি বিভিন্ন ভাষা—আঞ্চলিক ভাষামাত্র নয় এবং প্রত্যেকেরই স্বকীয় সাহিত্য আছে। এক হিন্দীই দশ কোটি লোকের ভাষা, বাংলা প্রায় ছয় কোটি লোকের, ইত্যাদি।

যে-কোন দুইটি ইওরোপীয় ভাষার মধ্যে যতটা প্রভেদ, তাহা অপেক্ষা চারিটি উত্তর-ভারতীয় ভাষা ও দক্ষিণ-ভারতীয় ভাষার মধ্যে প্রভেদ অধিকতর। প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; আপনাদের ভাষা ও জাপানী ভাষার মধ্যে যতখানি পার্থক্য, এইগুলির মধ্যেও ততখানি পার্থক্য। আপনারা জানিয়া আশ্চর্য হইবেন যে, যখন আমি দক্ষিণ ভারতে যাই, সেখানে সংস্কৃত বলিতে পারে—এমন লোকের দেখা না পাওয়া পর্যন্ত আমাকে ইংরেজীতেই কথা বলিতে হয়।

অধিকন্তু ভারতের বিভিন্ন জাতির আচার, রীতি, আহার, পরিচ্ছদ এবং চিন্তাধারাতেও অনেক পার্থক্য আছে। ইহার উপর আবার বর্ণভেদ আছে; প্রত্যেকটি বর্ণ যেন একটি স্বতন্ত্র জাতিবিশেষ। যদি কেহ ভারতবর্ষে বহুদিন বাস করে, তবেই একজনের চালচলন দেখিয়া বলিতে পারিবে, লোকটি কোন্ বর্ণভুক্ত। আবার বর্ণগুলির ভিতরও বিভিন্ন আচরণ ও প্রথা বিদ্যমান।

বর্ণগুলি প্রত্যেকে স্বতন্ত্র, মিশুক নয়; অর্থাৎ এক বর্ণ অন্য বর্ণের সহিত সামাজিকভাবে মিলিবে, কিন্তু একত্র পানাহার করিবে না বা পরস্পর বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবে না। এই সব ব্যাপারে তাহারা স্বতন্ত্র। পরস্পরের সহিত আলাপ এবং বন্ধুত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু এই পর্যন্তই।

ধর্মপ্রচারক বলিয়া অন্যান্য পুরুষ অপেক্ষা সাধারণভাবে ভারতীয় নারীকে জানিবার বেশী সুযোগ আমাদেরই। ধর্মপ্রচারককে একস্থান হইতে অন্য স্থানে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে হয়, ফলে সমাজের সকল স্তরের সহিত তাঁহার সংযোগ। উত্তর-ভারতেও মহিলারা পুরুষদের সম্মুখে বাহির হন না, সেখানেও ধর্মের জন্য তাঁহারা বহুক্ষেত্রে এই নিয়ম ভঙ্গ করেন এবং আমাদের প্রবচন শুনিতে ও আমাদের সহিত ধর্মালোচনা করিতে কাছে আসেন। ভারতীয় নারী-সম্বন্ধে আমি সব কিছুই জানি, এরূপ বলা আমার পক্ষে বিপজ্জনক। সুতরাং আমি আপনাদের সম্মুখে আদর্শটি উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিব। প্রত্যেক জাতির পুরুষ বা স্ত্রীর ভিতরে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একটি আদর্শের রূপায়ণ ঘটে। ব্যষ্টি একটি আদর্শের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম। জাতি এই সব ব্যষ্টির সমষ্টিমাত্র, এবং জাতিও একটি মহান্ আদর্শের প্রতীক। ঐ আদর্শের উদ্দেশ্যেই জাতি অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং ইহা যথার্থ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে যে, একটি জাতিকে বুঝিতে হইলে প্রথমে ঐ জাতির আদর্শকে অবশ্যই বুঝিতে হইবে। কারণ প্রত্যেক জাতির একটি নিজস্ব মাপকাঠি আছে এবং সেইটি ছাড়া অন্য কিছুর দ্বারা উহার মান নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

সর্বপ্রকার উন্নতি, অগ্রগতি, কল্যাণ কিংবা অবনতি—সবই আপেক্ষিক। ইহা একটি নির্দিষ্ট মানকে সূচিত করে; কোন মানুষকে বুঝিতে হইলে পূর্ণত্ব সম্বন্ধে তাহার স্বকীয় মানের পরিপ্রেক্ষিতে তাহাকে বুঝিতে হইবে। জাতিগত জীবনে এইটি স্পষ্টতরভাবে দেখিতে পাইবেন। এক জাতি যাহা ভাল বলিয়া মনে করে, অন্য জাতি তাহা ভাল নাও বলিতে পারে। আপনাদের দেশে জ্ঞাতি-ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ খুবই সঙ্গত, কিন্তু ভারতে ঐরূপ বিবাহ আইন-বিরুদ্ধ। শুধু তাই নয়, উহাকে অতি ভয়ানক নিষিদ্ধ যৌন-সংসর্গ মনে করা হয়। এ দেশে বিধবা-বিবাহ সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। ভারতে উচ্চবর্ণের নারীর দুইবার বিবাহ চরম মর্যাদাহানিকর। অতএব দেখিতেছেন,

আমরা এত বিভিন্ন ভাবের ভিতর দিয়া কাজ করি যে, একটি জাতিকে অপর জাতির মানদণ্ডের দ্বারা বিচার করা উচিত হইবে না, ইহা সম্ভবও নয়। অতএব একটি জাতি তাহার সামনে কোন্ আদর্শকে রাখিয়াছে, তাহা জানা আমাদের কর্তব্য। বিভিন্ন জাতির প্রসঙ্গে প্রথমেই আমরা একটা ধারণা করিয়া বসি যে, সকল জাতির নৈতিক নিয়মাবলী ও আদর্শ এক। যখন অপরকে বিচার করিতে যাই, তখন ধরিয়া লই যে, আমরা যাহা ভাল বলিয়া মনে করি, তাহা সকলের পক্ষেই ভাল হইবে। আমরা যাহা করি, তাহাই উচিত কর্ম; আমরা যাহা করি না, অপরে তাহা করিলে ঘোর নীতিবিরুদ্ধ হইবে। সমালোচনার উদ্দেশ্যে আমি এ-কথা বলিতেছি না, কেবল সত্যকে আপনাদের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া ধরিতেছি। যখন শুনি পদতল সঙ্কুচিত করার জন্য পাশ্চাত্য নারীরা চীনা মেয়েদের ধিক্কার দেয়, তখন তাহারা চিন্তা করে না তাহাদের আঁটসাঁট কাঁচুলি ব্যবহার জাতির অধিকতর ক্ষতি করিতেছে। ইহা একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। আপনারা অবশ্যই জানেন, কর্সেট ব্যবহারে শরীরের যতটা ক্ষতি হইয়াছে বা হইতেছে, পদতল সঙ্কুচিত করায় তার লক্ষ ভাগের এক ভাগও ক্ষতি হয় না। কারণ প্রথমোক্ত উপায়ে শরীরের বিভিন্ন অংশ স্থানচ্যুত হয় এবং মেরুদণ্ডটি সাপের মতো বাঁকিয়া যায়। যদি মাপ নেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ বক্রতা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। দোষ দেখাইবার জন্য নয়, শুধু অবস্থাটি বুঝাইবার জন্য বলিতেছি। আপনারা অন্য দেশের নারীদের অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন এবং তাহারা আপনাদের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে না বলিয়া তাহাদের ব্যবহারে আপনারা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হন। ঠিক একই কারণে অন্যান্য জাতির নারীরাও আপনাদের কথা ভাবিয়া শিহরিত হয়।

সুতরাং দুই পক্ষের ভিতরই একটা ভুলবোঝাবুঝি আছে। একটা সাধারণ মিলনভূমি, একটা সর্বজনীন বোধের ক্ষেত্র ও একটা সাধারণ মানবতা আছে, যাহা আমাদের কর্মের ভিত্তি হইবে। আমাদের সেই পূর্ণ ও নির্দোষ মানবপ্রকৃতি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যাহা এখন শুধু আংশিকভাবে এখানে ওখানে কাজ করিতেছে। পূর্ণত্বের চরম বিকাশ একটি মানুষে সম্ভব নয়। আপনি একটি অংশকে রূপ দিন, আমিও আমার সাধ্যমত সামান্যভাবে আর একটি অংশ রূপায়িত করি। এখানে একজন একটি ক্ষুদ্র অংশ গ্রহণ করে, অন্যত্র আর একজন আর একটি অংশ গ্রহণ করে। পূর্ণত্ব হইল এই সমস্ত

অংশের সমষ্টিরূপ। ব্যষ্টির ক্ষেত্রে যেমন, জাতির ক্ষেত্রেও সেইরূপ। প্রত্যেক জাতিকেই একটি ভূমিকা অভিনয় করিতে হয়; প্রত্যেক জাতিকে মানব স্বভাবের একটি দিক বিকশিত করিতে হয়; এবং আমাদিগকে ঐই সমস্তই একসঙ্গে গ্রথিত করিতে হইবে। সম্ভবতঃ সুদূর ভবিষ্যতে এমন এক জাতির উদ্ভব হইবে, যে-জাতির ভিতর বিভিন্ন জাতিদ্বারা অর্জিত বিস্ময়কর পূর্ণতা প্রকাশিত হইবে এবং উহা আর একটি নূতন জাতিরূপে দেখা দিবে। এই জাতির মতো একটি জাতির কথা মানুষ এখনও কল্পনা করিতে পারে নাই। এইটুকু বলা ছাড়া কাহারও সমালোচনা করিয়া আমার বলিবার কিছু নাই। জীবনে ভ্রমণ বড় কম করি নাই। সর্বদা আমার চক্ষু খুলিয়া রাখিয়াছি এবং যতই আমি ঘুরি, ততই আমার মুখ বন্ধ হইয়া যায়, সমালোচনা করিতে আর পারি না।

এখন 'ভারতীয় নারী'র প্রসঙ্গ। ভারতে জননীই আদর্শ নারী। মাতৃভাবই প্রথম ও শেষ কথা। 'নারী'-শব্দ হিন্দুর মনে মাতৃত্বকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। ভারতে ঈশ্বরকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করা হয়। আমাদের শৈশবে প্রতিদিন প্রাতঃকালে একপাত্র জল লইয়া মায়ের কাছে রাখিতে হয়। তিনি তাঁহার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উহাতে ডুবাইয়া দেন এবং আমরা ঐ জল পান করি।

পাশ্চাত্যে নারী জায়া। সেখানে জায়ারূপেই নারীত্বের ভাবটি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। ভারতের সাধারণ মানুষের কাছে—নারীত্বের সমগ্র শক্তি মাতৃত্বে ঘনীভূত হইয়াছে। পাশ্চাত্যে স্ত্রীই গৃহকর্ত্রী, ভারতীয় গৃহে কর্ত্রী জননী। পাশ্চাত্যে গৃহে যদি মা আসেন, তবে তাঁহাকে (ছেলের) স্ত্রীর অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। ঘরকরনা স্ত্রীর। মা সর্বদা আমাদের গৃহেই বাস করেন। স্ত্রীকে তাঁহার অধীনে থাকিতেই হইবে। ভাবের এই সব প্রভেদ আপনারা লক্ষ্য করুন।

আমি কেবল তুলনার প্রস্তাব করিতেছি। প্রকৃত তথ্য উল্লেখ করিতেছি, যাহাতে আমরা দুইদিকের তুলনা করিতে পারি। এই তুলনাটি করুন: যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন, 'স্ত্রীরূপে ভারতীয় নারীর স্থান কোথায়?' এই প্রশ্নে ভারতবাসী প্রতিপ্রশ্ন করিবে, 'জননীরূপে মার্কিন মহিলার মর্যাদা কি? সেই সর্বমহিমময়ী, যিনি আমায় এই শরীর দিয়াছেন তিনি কোথায়? নয় মাস যিনি আমাকে তাঁর শরীরে ধারণ করিয়াছেন, তিনি কোথায়? কোথায়

তিনি, যিনি আমার প্রয়োজন হইলে বার বার জীবন দিতে প্রস্তুত? কোথায় তিনি, আমার প্রতি যাঁহার স্নেহ অফুরন্ত—তা আমি যতই দুষ্ট ও হীনপ্রকৃতি হই না কেন? কোথায় সেই জননী—আর কোথায় স্ত্রী, যে নারী স্বামীর দ্বারা সামান্য অবহেলিত হইলে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আদালতের আশ্রয় লয়? অহো মার্কিন মহিলাবৃন্দ, আপনাদের ভিতর কোথায় সেই জননী? আপনাদের দেশে তাঁহাকে আমি খুঁজিয়া পাই না। আপনাদের দেশে আমি এমন পুত্র দেখি নাই, যাহার কাছে জননীর স্থান সর্বপ্রথম। যখন আমরা দেহত্যাগ করি, তখনও আমরা চাই না যে, আমাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা আমাদের জননীর স্থান গ্রহণ করে। ধন্য আমাদের জননী! যদি মায়ের পূর্বে আমাদের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আবার মায়ের কোলেই মাথা রাখিয়া আমরা মরিতে চাই। কোথায় নারী? 'নারী' কি এমনই একটি শব্দ, যাহা কেবল স্থূল দেহের সঙ্গে যুক্ত? হিন্দু-মন সেই সব আদর্শকে ভয় করে, যেগুলি অনুসারে দেহ দেহেই আসক্ত হইবে। না, না! নারী, দেহ-সংক্রান্ত কোন কিছুর সহিত তুমি যুক্ত হইবে না। তোমার নাম চিরকালের জন্য পবিত্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। 'মা'-নাম ছাড়া এমন কি শব্দ আছে, যাহাকে কোনপ্রকার কামভাব স্পর্শ করিতে পারে না, কোনপ্রকার পশুভাব যাহার নিকটে আসিতে পারে না? এই মাতৃত্বই ভারতবর্ষের আদর্শ।

আমি এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত, যাহারা অনেকটা আপনাদের রোমান ক্যাথলিক চার্চের ভিক্ষুক সাধুদের মতো। অর্থাৎ আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করিতে হয়, জনসাধারণ যখন চায়, তখন ধর্মকথা শুনাইতে হয়। যেখানে আশ্রয় পাই, সেখানে ঘুমাই। আমাদিগকে এই-ধরনের জীবনপদ্ধতি অনুসরণ করিতে হয়। আমাদের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের নিয়ম এই যে, প্রত্যেক নারীকে এমন কি ক্ষুদ্র বালিকাকেও 'মা' সম্বোধন করিতে হয়। ইহাই আমাদের প্রথা। পাশ্চাত্যে আসিয়াও আমার পুরাতন অভ্যাস ছাড়িতে পারি নাই। মহিলাদের 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিলে দেখিতাম, তাঁহারা অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। প্রথম প্রথম ইহার কারণ বুঝিতে পারি নাই। পরে কারণ আবিষ্কার করিলাম। বুঝিলাম 'মা' হইলে তাঁহারা যে 'বুড়ী' হইয়া যাইবেন। ভারতে নারীর আদর্শ মাতৃত্ব—সেই অপূর্ব, স্বার্থশূন্য, সর্বংসহা, নিত্য ক্ষমাশীলা জননী।

জায়া জননীর পশ্চাতে থাকেন—ছায়ার মতো। স্ত্রীকে মায়ের জীবন অনুকরণ করিতে হইবে। ইহাই তাহার কর্তব্য। জননীই প্রেমের আদর্শ, তিনিই পরিবারকে শাসন করেন, সমগ্র পরিবারটির উপর তাঁহার অধিকার। ভারতে সন্তান যখন কোন অন্যায় কাজ করে, পিতা তখন তাহাকে প্রহার করেন এবং মাতা সর্বদা পিতা ও সন্তানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়ান। আর এ দেশে ঠিক তাহার বিপরীত। এ দেশে মায়ের কাজ ছেলেকে মারধোর করা, এবং বেচারী বাবাকে মধ্যস্থ হইতে হয়। লক্ষ্য করুন—আদর্শের পার্থক্য। বিরূপ সমালোচনা হিসাবে আমি ইহা বলিতেছি না। আপনারা যাহা করেন তাহা ভালই, কিন্তু যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের যাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহাই আমাদের পথ। মাতা সন্তানকে অভিশাপ দিতেছেন—ইহা আপনারা কখনও শুনিতে পাইবেন না। মা সর্বদাই ক্ষমা করেন। 'আমাদের স্বর্গস্থ পিতা'র পরিবর্তে আমরা নিরন্তর বলি 'মা'। মাতৃভাব এবং মাতৃ-শব্দ হিন্দু-মনে চিরদিন অনন্ত প্রেমের সহিত জড়িত। আমাদের এই মরজগতে মায়ের ভালবাসাই ঈশ্বর-প্রেমের নিকটতম। মহাসাধক রামপ্রসাদ বলিয়াছেন : করুণা কর, জননি, আমি দুষ্ট ; কিন্তু 'কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনও নয়।'

ঐ দেখ হিন্দু জননী। পুত্রবধূ আসে তাঁর কন্যারূপে। বিবাহ হইলে কন্যা পরগৃহে চলিয়া যায়, বিবাহ করিয়া পুত্র আর একটি কন্যা ঘরে আনে এবং পুত্রবধূ কন্যার শূন্যস্থান পূরণ করে। পুত্রবধূকে সেই রাজ-রাজেশ্বরীর অর্থাৎ স্বামীর মাতার শাসন-ব্যবস্থার ভিতর মানাইয়া লইতে হইবে। আমি তো সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী কখনও বিবাহ করে না। মনে করুন, আমি যদি বিবাহ করিতাম, এবং আমার স্ত্রী যদি আমার মায়ের অসন্তোষের কারণ হইত, তাহা হইলে আমিও স্ত্রীর উপর বিরক্ত হইতাম। কেন? আমি কি আমার মাকে পুজা করি না? সুতরাং মায়ের পুত্রবধূও কেন তাঁহাকে পুজা করিবে না? যাঁহাকে আমি পুজা করি, আমার স্ত্রী তাঁহাকে কেন পুজা করিবে না? কে সে, যে আমার সহিত রূঢ় ব্যবহার করিয়া আমার মাকেও শাসন করিবে? তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে, যতক্ষণ না তাহার নারীত্ব পরিপূর্ণ হয়। এই মাতৃত্বই নারীত্বকে পূর্ণ করে ; মাতৃত্বই নারীর নারীত্ব। এই মাতৃত্ব পর্যন্ত তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে, ইহার পরই সে সমান অধিকার লাভ করে। তাই হিন্দুর নিকট মাতৃত্বই নারী-জীবনের চরম লক্ষ্য। কিন্তু অহো! আদর্শের কি

বিস্ময়কর প্রভেদ দেখিতেছি! আমার জন্মের জন্য আমার পিতামাতা বৎসরের পর বৎসর কত পুজা ও উপবাস করিয়াছিলেন! প্রত্যেক সন্তানের জন্মের পুর্বে মাতাপিতা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন। আমাদের মহান্ স্মৃতিকার মনু আর্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'প্রার্থনার ফলে যাহার জন্ম, সেই আর্য'। প্রার্থনা ব্যতীত যে-শিশুর জন্ম হয়, মনুর মতে সে অবৈধ সন্তান। সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিতে হয়। অভিশাপ মস্তকে লইয়া যে-সব শিশু এই জগতে আসে, যেন এক অসতর্ক মুহূর্তে হঠাৎ আসিয়া পড়ে, কারণ তাহার আসা রোধ করিতে পারা যায় নাই। এইরূপ সন্তানদের নিকট কি আশা করিতে পারা যায়? মার্কিন জননীগণ, আপনারা ইহা চিন্তা করিয়া দেখুন। আপনাদের অন্তরের অন্তস্তলে ভাবিয়া দেখুন, আপনারা কি প্রকৃত নারী হইতে প্রস্তুত? এখানে কোন জাতি বা দেশের প্রশ্ন নাই, স্বজাতি-গৌরব-বোধের মিথ্যা ভাবালুতা নাই। দুঃখ-কষ্ট-জর্জরিত জগতে আমাদের এই মরজীবনে গর্ববোধ করিতে কে সাহস করে? ঈশ্বরের এই অনন্ত শক্তির নিকট আমরা কতটুকু? তথাপি আপনাদের আজ আমি এই প্রশ্ন করিতে চাই, ভবিষ্যৎ সন্তানটির জন্য কি আপনারা সকলে প্রার্থনা করেন? মাতৃত্বলাভ করিয়া কি আপনারা ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ? মাতৃত্বের জন্য কি আপনারা নিজেদের শুদ্ধ পবিত্র মনে করেন? নিজেদের মনকে জিজ্ঞাসা করুন। যদি আপনারা ঐরূপ না বোধ করেন, তবে আপনাদের বিবাহ মিথ্যা, মিথ্যা আপনাদের নারীত্ব; আপনাদের শিক্ষা কুসংস্কার মাত্র। আর প্রার্থনা ব্যতীত যদি আপনাদের সন্তান হইয়া থাকে, তবে তাহারা মানবজাতির অভিশাপ হইবে।

আমাদের সম্মুখে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ উপস্থিত হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করুন। মাতৃত্ব হইতে বিরাট দায়িত্ব আসে। মাতৃত্বই ভিত্তি, আরম্ভ। আচ্ছা, মাকে এইরূপ পুজা করিতে হইবে কেন? কারণ আমাদের শাস্ত্র শিক্ষা দেয়, সন্তান ভাল বা মন্দ হইবে, তাহা স্থিরীকৃত হয় গর্ভবাসকালীন প্রভাবের দ্বারা। লক্ষ লক্ষ বিদ্যালয়ে যান, লক্ষ লক্ষ পুস্তক পড়ুন, পৃথিবীর সব পণ্ডিতের সঙ্গ করুন—এগুলির প্রভাব অপেক্ষা জন্মকালীন শুভসংস্কারের প্রভাব বেশী। শুভ বা অশুভ উদ্দেশ্য লইয়াই আপনার জন্ম। শিশু জন্মগ্রহণ করে—হয় দেবতারূপে, নয় দানবরূপে—শাস্ত্র এই কথাই ঘোষণা করে। শিক্ষা এবং আর সবকিছু পরে আসে, ঐগুলি অতি তুচ্ছ। যে-ভাব লইয়া আপনার জন্ম হইয়াছে, তাহাই

আপনার ভাব। অস্বাস্থ্য লইয়া যাহার জন্ম, পাইকারী হারে গোটাকয়েক ঔষধের দোকান খাইলেও সে কি সারাজীবন সুস্থ থাকিতে পারিবে? দুর্বল রুগ্‌ণ পিতামাতা, যাহাদের রক্ত দূষিত, তাহাদের সন্তান কয় জন সুস্থ ও সবল? একজনও নয়! প্রবল শুভ বা অশুভ সংস্কার লইয়া হয় দেবতা, নয় দানবরূপে আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি। শিক্ষা বা আর সব কিছু অতি তুচ্ছ।

আমাদের শাস্ত্র এইরূপ বলে: গর্ভকালীন প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ কর। জননীকে কেন পূজা করিতে হয়? কারণ তিনি নিজেকে পবিত্র করিয়াছেন। পবিত্রতা-স্বরূপিণী হইবার জন্য তিনি দুশ্চর তপস্যা করিয়াছেন। আপনারা স্মরণ রাখিবেন, ভারতবর্ষে কোন নারী কোন পুরুষকে দেহ দান করার কথা ভাবিতেই পারেন না, দেহ তাঁহার নিজস্ব। যাহাকে দাম্পত্য অধিকারের পুনরুদ্ধার বলে, ইংরেজরা সমাজ-সংস্কার হিসাবে বর্তমানে ভারতবর্ষে তাহা প্রবর্তন করিয়াছে; কিন্তু কোন ভারতবাসীই ঐ আইনের সুযোগ গ্রহণ করিবে না। পুরুষ যখন নারীর দেহ-সম্পর্কে আসে, তখন নারী কত না প্রার্থনা ও ব্রতদ্বারা ঐ মিলন-পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করে! কারণ যে-পথে শিশুর আগমন, তাহা যে স্বয়ং ঈশ্বরের পবিত্রতম প্রতীক। ইহা স্বামী-স্ত্রীর মিলিত শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা, যে-প্রার্থনা আর একটি প্রচণ্ড ভাল অথবা মন্দ শক্তির সম্ভাবনাযুক্ত একটি জীবকে এই জগতে লইয়া আসিতেছে। ইহা কি একটা হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার? ইহা কি শুধু ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি? ইহা কি দেহের পাশবিক সুখসম্ভোগ? হিন্দু বলে 'না, না, সহস্রবার না।'

কিন্তু এইটির অনুগামী আর একটি ভাব আছে। সর্বংসহা সর্বক্ষমাশীলা জননীর প্রতি ভালবাসার আদর্শ লইয়া আমাদের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। জননীকে যে পূজা করা হয়, তাহার উৎস এইখানেই। আমাকে পৃথিবীতে আনিবার জন্য তিনি তপস্বিনী হইয়াছিলেন। আমি জন্মাইব বলিয়া তিনি বৎসরের পর বৎসর তাঁহার শরীর-মন, আহার-পরিচ্ছদ, চিন্তা-কল্পনা পবিত্র রাখিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি পূজনীয়া। তারপর আমরা কোন্ ভাবটি পাই? মাতৃত্বের সহিত সংযুক্ত হইয়া আছে জায়াভাব।

আপনারা—পাশ্চাত্যদেশের লোকেরা—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপরায়ণ। আমি এই কাজটি করিতে চাই, যেহেতু আমি এটি পছন্দ করি। আমি সকলকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিব। কেন? আমার খুশি। আমি নিজের পরিতৃপ্তি চাই, সেইজন্য

আমি এই নারীটিকে বিবাহ করিব। কেন? আমি তাহাকে পছন্দ করি। এই নারী আমাকে বিবাহ করিয়াছে। কেন? সে আমাকে পছন্দ করে। এইখানেই ইহার পরিসমাপ্তি। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সে আর আমি—এই দুইজনেই আছি, আমি তাহাকে এবং সে আমাকে বিবাহ করিয়াছে। ইহাতে কাহারও কোন ক্ষতি নাই, আর কাহারও কোন দায়িত্ব নাই। আপনাদের শ্রীমান্ ও শ্রীমতীরা বনে গিয়া তাহাদের রুচিমত জীবন যাপন করিতে পারে। কিন্তু তাহাদের যখন সমাজে বাস করিতে হয়, তখন তাহাদের বিবাহ আমাদের শুভাশুভের সহিত জড়িত একটা গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার। তাহাদের সন্তানগণ অগ্নিসংযোগকারী, হত্যাকারী দস্যু, পরস্বাপহারী, মদ্যপ, জঘন্যাচারী ও ক্রূরকর্মা—সাক্ষাৎ দানব হইতে পারে।

এখন ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি কি? ইহা বর্ণভিত্তিক বিধান। আমার জন্ম—বর্ণ বা জাতির জন্য, তাহার জন্যই আমার জীবন। অবশ্য আমার নিজের কথা বলিতেছি না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার ফলে আমরা জাতি-বর্ণের বহির্ভূত। যাহারা সমাজে বাস করে, আমি তাহাদের কথা বলিতেছি। কোন বর্ণে জন্ম বলিয়া সেই বর্ণের ধর্মানুযায়ী আমাকে সমস্ত জীবন যাপন করিতেই হইবে। অর্থাৎ আপনাদের দেশের আধুনিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, পাশ্চাত্য মানব আজন্ম স্বাতন্ত্র্যবাদী, আর হিন্দু সমাজতান্ত্রিক, পুরাপুরি সমাজতান্ত্রিক। সেইজন্য শাস্ত্র বলে যে, যদি পুরুষকে তাহার মনের মতো যে-কোন নারীকে বিবাহ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং নারীকেও তাহার মনের মতো যে-কোন পুরুষকে বিবাহ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তখন কি হয়? তুমি প্রেমে পড়। মেয়েটির পিতা হয়তো উন্মাদ বা যক্ষ্মারোগী। মেয়েটি হয়তো একটি পাঁড়-মাতাল ছেলের মুখ দেখিয়া মুগ্ধ হইল। সমাজবিধি কি বলে? ধর্মের অনুশাসনে এই-সব বিবাহ অবৈধ। মদ্যপায়ী, ক্ষয়রোগী, উন্মাদ প্রভৃতির সন্তানদিগকে বিবাহ করিতে দেওয়া হইবে না। ধর্ম বলে, বিকলাঙ্গ কুব্জ বিকৃতবুদ্ধি জড়বৎ ব্যক্তিদের বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ।

কিন্তু মুসলমানরা আরব হইতে ভারতবর্ষে আসিল, তাহাদের আছে আরবী আইন, আর আরবের মরুভূমির আইন আমাদের উপর জোর করিয়া চাপানো হইল। ইংরেজরা আসিল তাঁহাদের আইন লইয়া। যতদূর সাধ্য তাহাও

আমাদের উপর চালু করিল। আমরা পরাজিত জাতি। ইংরেজ যদি বলে, কাল তোমার ভগ্নীকে বিবাহ করিব, আমরা কি করিতে পারি?

আমাদের সমাজ-বিধানে বলে, পরস্পরের মধ্যে রক্ত-সম্পর্কের দূরত্ব যতই থাকুক না কেন, এক জ্ঞাতিগোত্রের ভিতর বিবাহ অবৈধ। কারণ ঐরূপ বিবাহের দ্বারা জাতির অধোগতি হয়, বংশ লোপ পায়। কিছুতেই এ ধরনের বিবাহ হইতে পারে না এবং এইখানেই এ প্রসঙ্গ থামিয়া যায়। সুতরাং আমার বিবাহ-ব্যাপারে আমার নিজের কোন মত নাই, আমার ভগ্নীর বিবাহ-ব্যাপারে তাহারও মতামত কিছু নাই। জাতি-বর্ণের অনুশাসনের দ্বারা সব কিছু নির্ধারিত হয়।

অনেক সময় আমাদের দেশে শৈশবেই বিবাহ দেওয়া হয়। কেন? সমাজের আদেশ। পুত্র-কন্যাদের সম্মতি ছাড়াই যদি তাহাদের বিবাহ দিতে হয়, তাহা হইলে প্রেমের উন্মেষের পূর্বেই শৈশবে বিবাহ দেওয়া উচিত। যদি তাহারা পৃথক্‌ভাবে বড় হয়, তাহা হইলে বালকের হয়তো অন্য আর একটি বালিকাকে ভাল লাগিতে পারে এবং বালিকাও হয়তো আর একটি বালককে পছন্দ করিতে পারে। ফলে একটা মন্দ কিছু ঘটিতে পারে। সেইজন্য সমাজ বলে যে, ঐখানেই উহা বন্ধ করিয়া দাও। আমার ভগিনী বিকলাঙ্গ সুশ্রী বা কুশ্রী, তাহা আমি গ্রাহ্যই করি না, সে আমার ভগিনী—ইহাই যথেষ্ট। সে আমার ভ্রাতা—এইটুকু জানিলেই আমার যথেষ্ট হইল। সুতরাং তাহারা পরস্পরকে ভালবাসিবে। আপনারা বলিতে পারেন, অনেকখানি আনন্দ হইতে তাহারা বঞ্চিত। পুরুষের পক্ষে একটি নারীর প্রেমে পড়ার এবং নারীর পক্ষে একজন পুরুষের প্রেমে পড়ার কি অপূর্ব হৃদয়াবেগ, সে আনন্দ হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়। ইহা তো ভ্রাতা-ভগ্নীর ভালবাসার মতো। যেন ভালবাসিতে তাহারা বাধ্য। ভাল, তাহাই হউক। কিন্তু হিন্দু বলে, 'আমরা সমাজতান্ত্রিক। একটি পুরুষ বা নারীর বিশেষ আনন্দের জন্য আমরা শত শত লোকের মস্তকে দুঃখের বোঝা চাপাইতে চাই না।'

তাহাদের বিবাহ হইয়া যায়। স্বামীর সহিত বধূ স্বামীর ঘরে আসে—ইহাকেই বলা হয় 'দ্বিতীয় বিবাহ'। শৈশবকালীন বিবাহকে বলা হয় 'প্রথম বিবাহ' এবং ঐ সময়ে তাহারা পৃথক্‌ভাবে তাহাদের নিজ নিজ গৃহে মেয়েদের সঙ্গে, পিতামাতার সঙ্গে বাস করে। যখন তাহাদের বয়স হয়, তখন 'দ্বিতীয়

বিবাহ, নামক আর একটি অনুষ্ঠান করা হয়। তারপর তাহারা একসঙ্গে বাস করিতে থাকে, কিন্তু পিতামাতার সহিত একত্র একই বাড়িতে। বধূ যখন জননী হয়, তখন তাহার পরিবারটুকুর সর্বেসর্বা হইবার সময় আসে।

এখন আর একটি অদ্ভুত ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার কথা বলিব। আমি এইমাত্র আপনাদিগকে বলিয়াছি যে, প্রথম দুই তিন বর্ণের ভিতর বিধবারা আর বিবাহ করিতে পারে না ; ইচ্ছা থাকিলেও পারে না। অবশ্য অনেকের নিকট ইহা একটি কঠোরতা। অস্বীকার করা যায় না যে, বহু বিধবাই ইহা পছন্দ করে না, কারণ বিবাহ না করার অর্থ হইল ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করা ; অর্থাৎ তাহারা কখনই মাছ-মাংস খাইবে না, মদ্য পান করিবে না এবং শ্বেতবস্ত্র ছাড়া অন্য কোন বস্ত্র পরিবে না, ইত্যাদি। এ জীবনে বহু বিধি-নিষেধ আছে। আমরা সন্ন্যাসীর জাতি, সর্বদাই তপস্যা করিতেছি এবং তপস্যা আমরা ভালবাসি। মেয়েরা কখনও মাংস খায় না। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন আমাদের কষ্ট করিয়া পানাহারে সংযম অভ্যাস করিতে হইত, মেয়েদের পক্ষে ইহা কষ্টকর নয়। আমাদের মেয়েরা মনে করে, মাংস খাওয়ার কথা চিন্তা করিলেও মর্যাদাহানি হয়। কোন কোন বর্ণের পুরুষরা মাংস খায়, কিন্তু মেয়েরা কখনও খায় না। তথাপি বিবাহ না করিতে পাওয়া যে অনেকের পক্ষে কষ্ট—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

কিন্তু আমাদিগকে আবার মূলে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ভারতীয়েরা গভীরভাবে সমাজতান্ত্রিক। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, প্রত্যেক দেশের উচ্চ বর্ণের ভিতর পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা নারীর সংখ্যা বহুগুণে অধিক। ইহার কারণ কি ? কারণ উচ্চবর্ণের নারীরা বংশানুক্রমে আরামে জীবন যাপন করেন। 'তাঁহারা পরিশ্রম করেন না, সুতাও কাটেন না, তথাপি সলোমন তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদেও তাঁহাদের মতো ভূষিত হন নাই।'[১] আর বেচারী পুরুষেরা, তাহারা মাছির মতো মরে। ভারতবর্ষে আরও বলা হয়, মেয়েদের প্রাণ বড়ই কঠিন, সহজে যায় না। পরিসংখ্যানে দেখিবেন যে, মেয়েরা অতিক্রুতহারে পুরুষের সংখ্যা অতিক্রম করে। অবশ্য বর্তমানে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদেরই মতো কঠোর পরিশ্রম করে বলিয়া ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। উচ্চবর্ণের নারী-

১ New Testament : St Matthew—VI. 29, 30.

সংখ্যা নিম্নবর্ণের অপেক্ষা অধিক। তাই নিম্নবর্ণের অবস্থা ঠিক বিপরীত। নিম্নবর্ণের স্ত্রী-পুরুষ সকলে কঠিন পরিশ্রম করে। স্ত্রীলোকদের আবার একটু বেশী খাটিতে হয়, কারণ তাহাদের ঘরের কাজও করিতে হয়। এই বিষয়ে আমার কোন চিন্তাই আসিত না, কিন্তু আপনাদেরই একজন মার্কিন পর্যটক মার্ক টোয়েন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: হিন্দু-আচার সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সমালোচকরা যাহাই বলুক না কেন, আমি ভারতবর্ষে কোথাও দেখি নাই যে, লাঙ্গল টানিবার বলদের সঙ্গে বা গাড়ি টানিবার কুকুরের সঙ্গে স্ত্রীলোক জুতিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইওরোপের কোন কোন দেশে যেমন করা হয়।

ভারতবর্ষে কোন স্ত্রীলোক বা বালিকাকে জমি চাষ করিতে দেখি নাই। রেলগাড়ি ধরিয়া দুই পাশে দেখিয়াছি যে, রোদে-পোড়া পুরুষ ও বালকেরা খালি গায়ে জমি চষিতেছে; কিন্তু একটি স্ত্রীলোকও চোখে পড়ে নাই। দুই ঘণ্টা রেল ভ্রমণের মধ্যে মাঠে কোন স্ত্রীলোক বা বালিকাকে কাজ করিতে দেখি নাই। ভারতবর্ষে নিম্নতম বর্ণের মেয়েরাও কোন কঠিন শ্রমসাধ্য কাজ করে না। অন্যান্য জাতির সমপর্যায়ের মেয়েদের তুলনায় তাহাদের জীবন অপেক্ষাকৃত আরামের; হলকর্ষণ তাহারা কখনই করে না।

এইবার দেখ। নিম্নবর্ণে পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকদের অপেক্ষা অধিক। এখন কি আশা কর? পুরুষের সংখ্যা অধিক বলিয়া নারী বিবাহ করিবার অধিকতর সুযোগ পায়।

বিধবাদের বিবাহ না হওয়া প্রসঙ্গে: প্রথম দুই বর্ণের ভিতর স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতিমাত্রায় অধিক; এইজন্যই এই উভয় সঙ্কট—একদিকে বিধবাদের পুনর্বিবাহ না হওয়া জনিত সমস্যা ও দুঃখ, অন্যদিকে বিবাহযোগ্যা কুমারীদের স্বামী না পাওয়ার সমস্যা। কোন্ সমস্যাটির আমরা সম্মুখীন হইব—বিধবা-সমস্যা অথবা বয়স্কাকুমারী-সমস্যা? এই দুইটির মধ্যে একটি লইতেই হইবে। এখন আসুন, 'ভারতীয় মন সমাজতান্ত্রিক'—সেই মূল ভাবটিতে ফিরিয়া যাই। সমাজতান্ত্রিক ভারতবাসী বলে, 'দেখ, আমরা বিধবা-সমস্যাটিকে ছোট মনে করি। কেন? কারণ তাহাদের সুযোগ মিলিয়াছিল। তাহারা বিবাহিত হইয়াছিল। যদিও তাহারা সুযোগ হারাইয়াছে, তথাপি একবার তো তাহাদের ভাগ্যে বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং এখন শান্ত হও এবং সেই ভাগ্যহীনা কুমারীদের কথা চিন্তা কর—যাহারা বিবাহ করিবার সুযোগ একবারও পায়

নাই।' ঈশ্বর, তোমাদের মঙ্গল করুন। অক্স্‌ফোর্ড স্ট্রীটের একদিনের একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। তখন বেলা দশটা হইবে, শত সহস্র মহিলা বাজার করিতেছেন। এই সময়ে একজন ভদ্রলোক, বোধ হয় তিনি মার্কিন, চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'হায় ভগবান! ইহাদের মধ্যে কয়জন স্বামী পাইবে!' সেইজন্য ভারতীয় মন বিধবাদিগকে বলে, 'ভাল কথা, তোমাদের তো সুযোগ মিলিয়াছিল, তোমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য সত্যই আমরা খুবই দুঃখিত; কিন্তু আমরা নিরুপায়। আরও অনেকে যে (বিবাহের জন্য) অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে।' অতঃপর এই সমস্যার সমাধানে ধর্মের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে; হিন্দুধর্ম একটি সান্ত্বনার ভাব লইয়াই আসে। কারণ আমাদের ধর্ম শিক্ষা দেয়, বিবাহ একটা মন্দ কাজ, ইহা শুধু দুর্বলের জন্য। আধ্যাত্মিক সংস্কারসম্পন্ন নারী বা পুরুষ আদৌ বিবাহ করেন না। সুতরাং ধর্মপরায়ণা নারী বলেন, 'ঈশ্বর আমাকে ভাল সুযোগই দিয়াছেন, সুতরাং আমার আর বিবাহের প্রয়োজন কি? ভগবানের নাম করিব, তাঁহার পূজা করিব।' মানুষকে ভালবাসিয়া কি লাভ? অবশ্য ইহা সত্য যে, সকলেই ভগবানে মন দিতে পারে না। কাহারও কাহারও পক্ষে ইহা একেবারেই অসম্ভব। তাহাদের দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু তাহাদের জন্য অপর বেচারীরা কষ্ট পাইতে পারে না। আমি সমস্যাটিকে আপনাদের বিচারের উপর ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু আপনারা জানিয়া রাখুন, ইহাই হইল ভারতীয় মনের চিন্তাধারা।

অতঃপর নারীর দুহিতারূপে আসা যাক। ভারতীয় পরিবারে কন্যা একটি অতি কঠিন সমস্যা। কন্যা এবং বর্ণ-জাতি—এই দুইটি মিলিয়া হিন্দুকে সর্বস্বান্ত করে, কারণ কন্যার বিবাহ একই বর্ণের ভিতর দিতেই হইবে, এবং বর্ণের ভিতরও আবার ঠিক একই প্রকার বংশমর্যাদার পাত্রের সহিত বিবাহ দিতে হইবে। সেইজন্য বেচারী পিতাকে কন্যার বিবাহের জন্য অনেক সময় ভিখারী হইয়া যাইতে হয়। পাত্রের পিতা পুত্রের জন্য বিরাট পণ দাবি করেন, এবং কন্যার পিতাকে কন্যার বর সংগ্রহ করিবার জন্য যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিতে হয়। সেইজন্য হিন্দুর জীবনে কন্যা যেন একটি কঠিন সমস্যা। মজার কথা ইংরেজীতে কন্যাকে বলা হয় 'ডটর', সংস্কৃতে উহার প্রতিশব্দ 'দুহিতা'। ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই যে, প্রাচীনকালের পরিবারে কন্যারা গো দোহন করিতে অভ্যস্ত ছিল

এবং 'দুহিতা' শব্দটি দোহন করা অর্থে 'দুহ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'দুহিতা'র প্রকৃত অর্থ হইতেছে দোহনকারিণী। পরে 'দুহিতা' শব্দটির একটি নূতন অর্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। দোহনকারিণী—দুহিতা পরিবারের সমস্ত 'দুগ্ধ' দোহন করিয়া লইয়া যায়, ইহাই হইল দ্বিতীয় অর্থ।

ভারতীয় নারী যে-সকল বিভিন্ন সম্পর্কে সম্বদ্ধ, সেগুলি বর্ণনা করিলাম। আমি আপনাদের পুর্বে বলিয়াছি যে, হিন্দুসমাজে জননীর স্থান সর্বোচ্চ, তাঁহার পর জায়া এবং ইঁহাদের পর কন্যা। এই পর্যায়ের ক্রম অত্যন্ত দুরূহ ও জটিল। বহু বৎসর সে-দেশে বাস করিয়াও কোন বিদেশী ইহা বুঝিতে পারেন না। উদাহরণ-স্বরূপ, আমাদের ভাষায় ব্যক্তিবাচক 'সর্বনামে'র তিনটি রূপ আছে। ঐগুলি অনেকটা 'ক্রিয়া'র মতো কাজ করে। একটি খুবই সম্মানসূচক, দ্বিতীয়টি মধ্যম এবং সর্বনিম্নটি অনেকটা ইংরেজীর দাউ (thou) ও দী (thee)-র মতো। শিশু এবং ভৃত্যদের সম্পর্কে শেষেরটি প্রয়োগ করা হয়। মধ্যমটি সমান সমান লোকের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং দেখিতেছেন যে, আত্মীয়তার সর্বপ্রকার জটিল সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সর্বনামগুলি ব্যবহার করিতে হয়। উদাহরণ-স্বরূপ, আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে আজীবন আমি 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করি, কিন্তু তিনি কখন আমাকে 'আপনি' বলিবেন না, তিনি আমাকে 'তুমি' বলিবেন, ভুলক্রমেও তিনি আমাকে 'আপনি' বলিবেন না; যদি বলেন, তাহাতে অমঙ্গল বুঝিতে হইবে।

গুরুজনদের প্রতি ভালবাসা বা শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে হইলে সেইরূপ, সর্বদা ঐপ্রকার ভাষাতেই করিতে হইবে। পিতামাতাকে তো দূরের কথা, বড় ভাই বা বোনকেও 'তু', 'তুম্' বা 'তুমি' বলিয়া ডাকিতে আমার সাহসই হইবে না। আর মাতাপিতার নাম ধরিয়া আমরা কখনই ডাকি না। যখন আপনাদের দেশের প্রথা জানিতাম না, তখন একটি খুবই মার্জিত-রুচি পরিবারে পুত্রকে জননীর নাম ধরিয়া ডাকিতে দেখিয়া আমি গভীরভাবে মর্মাহত হইয়াছিলাম। যাহা হউক, পরে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। বুঝিলাম, ইহাই এ-দেশের রীতি। কিন্তু আমাদের দেশে আমরা কখনই পিতামাতার উপস্থিতিতে তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করি না। এমন কি তাঁহাদের সামনেও 'প্রথম পুরুষের বহুবচনে' উল্লেখ করি। এইরূপে আমরা দেখি যে, ভারতীয় নারী-পুরুষের সমাজ-জীবনে এবং সম্পর্কের তারতম্যে জটিলতম জাল বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের দেশে

গুরুজনদের সম্মুখে কেহ স্ত্রীর সহিত কথা বলে না। একাকী যখন অপর কেহ থাকে না বা শুধু ছোটরা থাকে, তখনই স্ত্রীর সহিত কথাবার্তা বলা যায়। যদি আমি বিবাহ করিতাম, তাহা হইলে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রীর সামনে স্ত্রীর সহিত কথা বলিতাম, কিন্তু বড় বোন বা পিতামাতার সম্মুখে বলিতাম না। ভগ্নীদের নিকট তাহাদের স্বামী সম্বন্ধে কোন কথা আমি বলিতে পারি না। ভাবটি এই যে, আমরা সন্ন্যাস-কেন্দ্রিক জাতি। এই একটি ভাবের উপর সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থার দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে। বিবাহকে একটা অপবিত্র, একটা নিম্ন পর্যায়ের ব্যাপার বলিয়া মনে করা হয়। সেইজন্য প্রেমের বিষয় লইয়া কোন আলোচনা কখনও করা চলিবে না। মা, ভাই, বোন বা অপর কাহারও সামনে আমি কোন উপন্যাস পড়িতে পারি না। তাঁহারা আসিলে উপন্যাসটি বন্ধ করিয়া দিই।

পান-ভোজনের ব্যাপারেও এই একই রীতি। আমরা গুরুজনদের সম্মুখে আহার করি না। শিশু বা সম্পর্কে ছোট না হইলে কোন পুরুষের সম্মুখে আমাদের মেয়েরা কখনও আহার করে না। মেয়েরা বলে, 'মরিয়া যাইব, তবু স্বামীর সম্মুখে কিছু চিবাইতে পারিব না।' মাঝে মাঝে ভাই ও বোনেরা একত্রে খাইতে বসিতে পারে। ধরুন আমি এবং আমার ভগ্নী একসঙ্গে খাইতেছি, এমন সময় ভগ্নীর স্বামী দরজার গোড়ায় আসিয়া পড়িল—তাহা হইলে তখনই ভগ্নী খাওয়া বন্ধ করিয়া দিবে, আর স্বামী-বেচারা সরিয়া পড়িবে।

যে-সব প্রথা আমাদের দেশের একান্ত নিজস্ব, সেইগুলি আমি বলিলাম। ইহাদের ভিতর কতকগুলি আমি অন্যান্য দেশেও লক্ষ্য করিয়াছি। আমি কখনও বিবাহ করি নাই। বধূসম্বন্ধীয় জ্ঞান আমার সম্পূর্ণ নয়। মাতা এবং ভগ্নী যে কি, তাহা আমি জানি; অপরের বধূ আমি দেখিয়াছি মাত্র, তাহা হইতে যেটুকু জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই আপনাদের বলিলাম।

শিক্ষা এবং সংস্কৃতি নির্ভর করে পুরুষের উপর; অর্থাৎ যেখানে পুরুষেরা উচ্চসংস্কৃতিসম্পন্ন, সেখানে মেয়েরাও ঐরূপ হইবে। যেখানে পুরুষদের সংস্কৃতি নাই, সেখানে মেয়েদেরও নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুপ্রথা-অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামীণ ব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল। স্মরণাতীত কাল হইতে সমস্ত ভূমি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছিল। আপনাদের ভাষায় এগুলি ছিল সরকারের। জমির উপর কাহারও কোন ব্যক্তিগত অধিকার নাই। ভারতবর্ষে রাজস্ব জমি

হইতে আসে, কারণ প্রত্যেকে সরকার হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি ভোগ করে। এই জমি একটি গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পত্তি, এবং পাঁচ দশ কুড়ি বা একশ-টি পরিবার একত্র ঐ জমি দখলে রাখিতে পারে। সমস্ত জমি তাহারাই নিয়ন্ত্রণ করে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব তাহারা সরকারকে দেয় এবং একটি চিকিৎসক এবং শিক্ষককে ভরণপোষণ করে, ইত্যাদি।

আপনাদের ভিতর যাঁহারা হারবার্ট স্পেন্সার পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মনে আছে, তিনি তাঁহার শিক্ষাপদ্ধতিকে 'মঠপদ্ধতি' বলিয়াছেন। ইহা ইওরোপে প্রয়োগ করা হইয়াছে, কোথাও কোথাও সাফল্যমণ্ডিতও হইয়াছিল। এই পদ্ধতি অনুসারে গ্রামে একজন শিক্ষক থাকিবেন, তাঁহার ভার ঐ গ্রামকে লইতে হইবে। আমাদের এই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অতি সাধারণ। কারণ আমাদের পদ্ধতিও অত্যন্ত সরল। প্রত্যেক বালক একটি ছোট মাদুরের আসন লইয়া আসে। তালপাতাতে লেখা আরম্ভ হয়, কারণ কাগজের দাম অনেক। প্রত্যেকটি বালক তাহার আসন বিছাইয়া বসে, দোয়াত ও পুস্তক সঙ্গে লইয়া আসে এবং লিখিতে আরম্ভ করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সামান্য পাটীগণিত, কিছু সংস্কৃত ব্যাকরণ, একটু ভাষা ও হিসাব—এই শিক্ষা দেওয়া হয়।

বাল্যকালে এক বৃদ্ধ আমাদের নীতিবিষয়ক একটি ক্ষুদ্র পুস্তক মুখস্থ করাইয়াছিলেন, উহার একটি শ্লোক এখনও আমার মনে আছে: 'গ্রামের জন্য পরিবার, স্বদেশের জন্য গ্রাম, মানবতার জন্য স্বদেশ এবং জগতের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিবে।'[১] এইরূপ অনেক শ্লোক ঐ পুস্তকে আছে। আমরা ঐগুলি মুখস্থ করি, এবং শিক্ষক ব্যাখ্যা করিয়া দেন, পরে ছাত্রও ব্যাখ্যা করে। বালক-বালিকারা একত্রই এইগুলি শিক্ষা করে। ক্রমে তাহাদের শিক্ষা পৃথক হইয়া যায়। প্রাচীন সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রধানতঃ ছাত্রদের জন্যই ছিল। ছাত্রীরা কদাচিৎ সেখানে যাইত। কিন্তু কিছু ব্যতিক্রমও ছিল।

বর্তমানকালে ইওরোপীয় ধরনে উচ্চ শিক্ষার উপর অধিকতর ঝোঁক দেখা দিয়াছে। মেয়েরাও এই উচ্চ শিক্ষালাভ করুক—এই দিকেই জনমত প্রবল হইতেছে। অবশ্য ভারতবর্ষে এমন লোকও আছে, যাহারা মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা

---

১ ত্যজেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥—মহাভারত, উদ্যোগ-পর্ব, ৩৭।১৭

চায় না; কিন্তু যাহারা চায়, তাহারাই জয়লাভ করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় আজও ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং আমেরিকায় হার্ভার্ড ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার মেয়েদের জন্য রুদ্ধ। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ বৎসরেরও অধিক হইল, নারীদের জন্য উহার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। আমার মনে আছে, যে বৎসর আমি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, সেই বৎসর কয়েকটি ছাত্রীও ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য একই মান, একই পাঠ্যসূচী ছিল এবং পরীক্ষায় ছাত্রীরা বেশ ভালই করিয়াছিল। মেয়েদের শিক্ষা-ব্যাপারে আমাদের ধর্ম বাধা দেয় না। এইরূপে মেয়েদের শিক্ষা দিতে হইবে, এইভাবে তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, প্রাচীন পুস্তকে আমরা আরও দেখি—ছেলে ও মেয়েরা উভয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিতেছে, কিন্তু পরবর্তী কালে সমস্ত জাতির শিক্ষাই অবহেলিত হইয়াছে। বৈদেশিক শাসনে কি আর আশা করা যায়? বিদেশী বিজেতারা আমাদের কল্যাণ করিবার জন্য তো আসে নাই। তাহারা ধনসম্পদ চায়। আমি বারো বৎসর কঠোর অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পাশ করিয়াছি; কিন্তু আমার দেশে আমি মাসে পাঁচ ডলারও উপার্জন করিতে পারি না। ইহা কি আপনারা বিশ্বাস করিবেন? ইহাই প্রকৃত অবস্থা। বিদেশী-প্রবর্তিত শিক্ষায়তনগুলির উদ্দেশ্য—বহুসংখ্যক কেরানী, পোস্টমাস্টার, তারচালক (টেলিগ্রাফ অপারেটর) প্রভৃতি তৈয়ারি করিয়া অল্প অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনের উপযোগী একদল কর্মদক্ষ ক্রীতদাস পাওয়া। ইহাই হইল এই শিক্ষার স্বরূপ।

ফলে, বালক-বালিকাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইতেছে। আমাদের দেশে করিবার অনেক কিছু আছে। যদি আপনারা আমাকে ক্ষমা করেন, এবং অনুমতি দেন, তাহা হইলে আপনাদেরই একটি প্রবাদ বাক্য আমি বলি, 'হংসীর যাহা খাদ্য, হংসেরও খাদ্য তাই'।[১]

বিদেশী মহিলারা হিন্দু মেয়েদের কঠোর জীবন দেখিয়া কত চীৎকার করেন, কাঁদেন, কিন্তু হিন্দু পুরুষদের কঠোর জীবনের উপর আপনাদের কোনই দৃষ্টি নাই। আপনাদের চোখের জল কৃত্রিম। ছোট ছোট বালিকাদের বিবাহ হয়

১ 'What is sauce for the goose is sauce for the gander.'

কাহাদের সহিত? একজনকে যখন বলা হইল যে, বৃদ্ধদের সহিত এই বালিকাদের বিবাহ হয়, তখন সে বলিয়া উঠিল, 'যুবকেরা তাহা হইলে কি করে? কি আশ্চর্য! বালিকাদের কি কেবল বৃদ্ধদের সহিতই বিবাহ দেওয়া হয়?' আমরা যে বৃদ্ধ হইয়াই জন্মগ্রহণ করি—বোধ হয় আমাদের দেশের সব লোকই ঐরূপ।

আত্মার মুক্তি ভারতবর্ষের আদর্শ। জগৎটা কিছুই নয়। উহা একটা দৃশ্য মাত্র, একটা স্বপ্ন। এই জীবন কোটি কোটি জীবনের মতো একটি। সমস্ত প্রকৃতিই মায়া, একটা ছায়া, ছায়ার আগার। ইহাই হইল ভারতীয় জীবন-দর্শন। শিশুরা জীবনকে অভিনন্দিত করে, ইহাকে মধুর ও সুন্দর বলিয়া মনে করে। কিন্তু কয়েক বছর পরেই যেখান হইতে তাহারা শুরু করিয়াছিল, তাহাদিগকে সেখানেই ফিরিয়া আসিতে হইবে। কাঁদিতে কাঁদিতে জীবন আরম্ভ হইয়াছিল, কাঁদিতে কাঁদিতেই জীবন শেষ হইবে। যৌবন-মত্ত জাতিরাও ভাবে যে, তাহারা যাহা খুশি তাহাই করিতে পারে। তাহারা মনে করে, আমরাই পৃথিবীর অধিপতি—দেবতা, ভগবানের চিহ্নিত জাতি। তাহারা ভাবে: সমগ্র জগৎকে শাসন করিবার, ঈশ্বরের পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার, তাহাদের যাহা ইচ্ছা করিবার, পৃথিবীকে ওলট-পালট করিবার আদেশপত্র সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর যেন তাহাদিগকে দিয়াছেন; হত্যা ও লুণ্ঠন করিবার ছাড়পত্র তাহারা পাইয়াছে। ভগবান তাহাদিগকে এই-সব স্বাধীনতা দিয়াছেন, শিশু বলিয়াই তাহারা এইসব অপকর্ম করে। তাই সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্যের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাদের কত মহিমা ও বর্ণচ্ছটা! কিন্তু তাহারা বিস্মৃতির গর্ভে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। হয়তো ধ্বংসস্তূপেই সেগুলি বিরাট!

পদ্মপত্রে জলের ফোঁটা যেমন টলমল করিয়া মুহূর্তে পড়িয়া যায়, তেমনি এই নশ্বর জীবন। যেদিকেই আমরা তাকাই, সেইদিকেই দেখি ধ্বংস। আজ যেখানে অরণ্য, এক সময়ে সেখানেই ছিল বড় বড় নগরীমণ্ডিত শক্তিশালী সাম্রাজ্য। ভারতীয় মানসের ইহাই হইল প্রধানতম চিন্তা ও মূল সুর। আমরা জানি, আপনাদের পাশ্চাত্য জাতির শিরায় তরুণ রক্ত প্রবাহিত। আমরা জানি, মানুষের মতো জাতিরও সুদিন আসে। কোথায় গ্রীস? কোথায় রোম? সেদিনের সেই শক্তিধর স্পেন কোথায়? কে জানে এই-সব পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ভারতের কি হইতেছে? এইরূপেই জাতির জন্ম হয় এবং কালে তাহাদের ধ্বংস হয়; এইভাবেই তাহাদের উত্থান ও পতন। যাহাদের দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনীকে

জগতের কোন শক্তি প্রতিরোধ করিতে পারে নাই, যাহারা তোমাদের ভাষায় সেই ভয়াবহ 'টাটার' শব্দটি রাখিয়া গিয়াছে, সেই মুঘল আক্রমণকারীকে হিন্দু শৈশবেই জানে। হিন্দু তাহার পাঠ শিক্ষা করিয়াছে। আজিকার শিশুদের মতো সে প্রলাপ বকিতে চায় না। হে পাশ্চাত্য জাতি! তোমাদের যাহা বলিবার তাহা বলো। এখন তো তোমাদেরই দিন। বর্তমানকাল শিশুদের প্রলাপ বকিবার কাল। আমরা যাহা শিখিবার, তাহা শিখিয়াছি। এখন আমরা মৌন। তোমাদের কিছু ধনসম্পদ হইয়াছে, তাই তোমরা আমাদিগকে অবজ্ঞা কর। ভাল, এখন তোমাদেরই দিন। বেশ বেশ, শিশু তোমরা, আধ-আধ কথা বলো—ইহাই হইল হিন্দুর মনোভাব।

অসার ফেনায়িত বাক্যের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না। এমন কি মেধাশক্তির সহায়েও তিনি লভ্য নন। বাহুবলেও তাঁহাকে লাভ করা যায় না। পরমেশ্বর তাঁহারই কাছে আসেন, যিনি বস্তুর গোপন উৎসটি জানেন, যিনি অপর সব কিছুই নশ্বর বলিয়া জানিয়াছেন; আর কাহারও নিকট তিনি আসেন না। যুগ-যুগান্তের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষ শিক্ষা পাইয়াছে। ভারত এখন ভগবানের অভিমুখী। ভারতবর্ষ অনেক ভুল করিয়াছে। তাহার উপর অনেক জঞ্জালের বোঝা স্তূপীকৃত হইয়াছে। তাহাতে কি হইয়াছে? আবর্জনা-পরিষ্কারে, নগর-পরিষ্কারে কি হয়? উহা কি জীবন দেয়? যাহাদের সুন্দর প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদেরও মৃত্যু হয়। আর প্রতিষ্ঠানের কথা না বলাই ভাল। ক্ষণভঙ্গুর এই পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠানগুলি—পাঁচদিন লাগে তাহাদের গড়িতে, আর ষষ্ঠ দিবসে তাহারা ধ্বংস হইয়া যায়। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি একটিও একাদিক্রমে দুই শত বৎসর টিকিয়া থাকিতে পারে না। আর আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। হিন্দু বলে, 'হ্যাঁ, আমরা প্রাচীন জাতিগুলির মৃত্যুর সাক্ষী, নূতন জাতিগুলিরও মৃত্যু দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছি। কারণ আমাদের আদর্শ ইহসংসারের নয়, ঊর্ধ্বলোকের। তোমার যাহা আদর্শ, তুমি সেইরূপই হইবে; আদর্শ যদি নশ্বর হয়, পৃথিবী-কেন্দ্রিক হয়, জীবনও সেইরূপ হইবে। আদর্শ যদি জড় হয়, তবে তোমরাও জড় হইবে। দেখ! আমাদের আদর্শ আত্মা। সে-ই একমাত্র সৎ-পদার্থ। আত্মা ছাড়া অন্য কিছুই নাই এবং আমরা আত্মারই মতো চিরজীবী।

হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা

চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর সাফল্য-সংবাদে আনন্দিত মাদ্রাজ-বাসীদের অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে (১৮৯৪) লিখিত।

মাদ্রাজ-বাসী স্বদেশী, স্বধর্মাবলম্বী ও বন্ধুগণ,—

হিন্দুধর্ম প্রচারকার্যের জন্য আমি যতটুকু যাহা করিয়াছি, তাহা যে তোমরা আদরের সহিত অনুমোদন করিয়াছ, তাহাতে আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম। এই আনন্দ, আমার নিজের বা সুদূর বিদেশে আমার প্রচারকার্যের ব্যক্তিগত প্রশংসার জন্য নয়। আমার আহ্লাদের কারণ—তোমরা হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানে আনন্দিত, তাহাতে ইহাই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যদিও হতভাগ্য ভারতের উপর দিয়া কতবার বৈদেশিক আক্রমণের ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, যদিও শত শতাব্দী ধরিয়া আমাদের নিজেদের উপেক্ষায় এবং আমাদের বিজেতাগণের অবজ্ঞায় প্রাচীন আর্যাবর্তের মহিমা স্পষ্টই ম্লান হইয়াছে, যদিও শত শত শতাব্দীব্যাপী বন্যায় হিন্দুধর্মরূপ সৌধের অনেকগুলি মহিমময় স্তম্ভ, অনেক সুন্দর সুন্দর খিলান ও অনেক অপূর্ব ভিত্তিপ্রস্তর ভাসিয়া গিয়াছে, তথাপি উহার ভিত্তি অটলভাবে এবং উহার সন্ধিপ্রস্তর অটুটভাবে বিরাজমান; যে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর হিন্দুজাতির ঈশ্বরভক্তি ও সর্বভূতহিতৈষণারূপ অপূর্ব কীর্তিস্তম্ভ স্থাপিত, তাহা পূর্ববৎ অটুট ও অবিচলিতভাবে বর্তমান।

ভারতে ও সমগ্র জগতে যাঁহার বাণী প্রচারের ভারপ্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছি, তাঁহার অতি অনুপযুক্ত দাস আমি। তোমরা তাঁহাকে আদরপূর্বক গ্রহণ করিয়াছ; তোমরা তোমাদের স্বাভাবিক অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তাঁহাতে এবং তাঁহার উপদেশে সেই মহতী আধ্যাত্মিক বন্যার প্রথম অস্ফুট ধ্বনি শুনিয়াছ, যাহা নিশ্চয়ই অনতিবিলম্বে দুর্দমনীয় বেগে ভারতে উপনীত হইবে, অনন্ত শক্তিস্রোতে যাহা কিছু দুর্বল ও দোষযুক্ত, সব ভাসাইয়া দিবে আর হিন্দু-জাতির শতশতাব্দীব্যাপী নীরব সহিষ্ণুতার পুরস্কারস্বরূপ, তাহাদিগকে অতীত অপেক্ষা উজ্জ্বলতর গৌরবমুকুটে ভূষিত করিয়া তাহাদের বিধিনির্দিষ্ট অধিকারদান স্বরূপ, উচ্চপদবীতে উন্নীত করিবে এবং সমগ্র মানবজাতি সম্বন্ধে উহার যে কার্য অর্থাৎ আধ্যাত্মিক প্রকৃতিসম্পন্ন মানবজাতির বিকাশ, তাহাও সম্পাদন করিবে।

দাক্ষিণাত্যবাসী তোমাদের নিকট আর্যাবর্তবাসিগণ বিশেষভাবে ঋণী, কারণ ভারতে আজ যে-সকল শক্তি সক্রিয়, তাহাদের অধিকাংশেরই মূল দাক্ষিণাত্য। শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকারগণ, যুগপ্রবর্তনকারী আচার্যগণ, যথা—শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্ব, ইঁহারা সকলেই দাক্ষিণাত্যে জন্মিয়াছিলেন। যে মহাত্মা শঙ্করের নিকট, জগতের প্রত্যেক অদ্বৈতবাদীই ঋণী; যে মহাত্মা রামানুজের স্বর্গীয় স্পর্শ পদদলিত পারিয়াগণকেও আলওয়ারে পরিণত করিয়াছিল; সমগ্র ভারতে শক্তিসঞ্চারকারী আর্যাবর্তের সেই একমাত্র মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুবর্তিগণও যে মহাত্মা মধ্বের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই জন্মস্থান দাক্ষিণাত্য। বর্তমানকালেও বারাণসীধামের শ্রেষ্ঠ গৌরব-স্বরূপ মন্দিরসমূহে দাক্ষিণাত্যবাসীরই প্রাধান্য, তোমাদের ত্যাগই হিমালয়ের সুদূরবর্তী চূড়াস্থিত পবিত্র দেবালয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। অতএব মহা-পুরুষগণের পূতশোণিতে পূরিতধমনী, তথাবিধ আচার্যগণের আশীর্বাদে ধন্যজীবন, তোমরা যে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সর্বপ্রথম বুঝিবে ও আদরপূর্বক গ্রহণ করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে!

দাক্ষিণাত্যই চিরদিন বেদবিদ্যার ভাণ্ডার, সুতরাং তোমরা বুঝিবে যে, হিন্দুধর্ম-আক্রমণকারী অজ্ঞ সমালোচকগণের পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদসত্ত্বেও এখনও শ্রুতিই হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মেরুদণ্ডস্বরূপ।

জাতিবিদ্যাবিৎ বা ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের নিকট বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগের মূল্য যতই হউক, 'অগ্নিমীলে', 'ইষেত্বোর্জে ত্বা', 'শন্নোদেবীর-ভীষ্টয়ে'[১] প্রভৃতি বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ বেদীযুক্ত বিভিন্ন যজ্ঞে নানাবিধ আহুতি দ্বারা প্রাপ্য ফলসমূহ যতই বাঞ্ছনীয় হউক, সমুদয়ই এ সব কিছুরই একমাত্র ফল ভোগ। আর কেহই কখন এগুলি মোক্ষজনক বলিয়া তর্কে প্রবৃত্ত হয় নাই। সুতরাং আধ্যাত্মিকতা ও মোক্ষমার্গের উপদেশক জ্ঞানকাণ্ড, যাহা আরণ্যক বা শ্রুতিশির বলিয়া কথিত হয়, তাহাই ভারতে চিরকাল শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছে, এবং চিরকাল করিবে।

একমাত্র যে ধর্মের সর্বজনীন উপযোগিতা, তৎপ্রচারিত 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' ব্রহ্মের অবিকল প্রতিবিম্ব-স্বরূপ সনাতন ধর্মের নানা মতমতান্তর-

১ এই তিনটি যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ ও অথর্ববেদের প্রথম শ্লোকের অংশ।

রূপ গোলকধাঁধায় দিগ্‌ভ্রান্ত এবং পূর্বভ্রান্তসংস্কারবশবর্তী হইয়া উহার মর্মবোধে অক্ষম, জড়বাদসর্বস্ব জাতির নিকট ঋণসূত্রে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিকতার মানদণ্ড অবলম্বন করিয়া অন্ধকারে অন্বেষণপরায়ণ, আধুনিক হিন্দুযুবক বৃথাই তাহার পূর্বপুরুষগণের ধর্ম বুঝিতে চেষ্টা করে এবং হয় ঐ চেষ্টা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া ঘোর অজ্ঞেয়বাদী হইয়া পড়ে, অথবা স্বাভাবিক ধর্মভাবের প্রেরণায় পশুজীবনযাপনে অসমর্থ হইয়া প্রাচ্যগন্ধী বিবিধ পাশ্চাত্য জড়বাদের নির্যাস অসাবধানে পান করে, এবং শ্রুতির এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল করে: পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাহন্ধাঃ।[১] তাঁহারাই কেবল বাঁচিয়া যান, যাঁহাদের আত্মা সদ্‌গুরুর জীবনপ্রদ স্পর্শবলে জাগ্রত হয়।

ভগবান্ ভাষ্যকার ঠিকই বলিয়াছেন:

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥[২]

পরমাণু, দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অপূর্ব সিদ্ধান্তপ্রসূ বৈশেষিকদের সূক্ষ্ম বিচারসমূহই হউক, অথবা নৈয়ায়িকদের জাতিদ্রব্যগুণসমবায় প্রভৃতি বস্তুসম্বন্ধীয় অপূর্ব বিচারাবলীই হউক, অথবা পরিণামবাদের জনকস্বরূপ সাংখ্য-দিগের তদপেক্ষা গভীরতর চিন্তাগতিই হউক, অথবা এই বিভিন্নরূপ বিশ্লেষণা-বলীর সুপক্ব ফলস্বরূপ ব্যাসসূত্রই হউক, মনুষ্য-মনের এই সকল বিবিধ সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের একমাত্র ভিত্তি শ্রুতি। এমন কি বৌদ্ধ বা জৈনদিগের দার্শনিক গ্রন্থাবলীতেও শ্রুতির সহায়তা পরিত্যক্ত হয় নাই, আর অন্ততঃ কতকগুলি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে এবং জৈনদের অধিকাংশ গ্রন্থে শ্রুতির প্রামাণ্য সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে; তবে তাঁহারা শ্রুতির কোন কোন অংশকে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া 'হিংসক' শ্রুতি আখ্যা দেন—এবং সেগুলির প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। বর্তমান কালেও স্বর্গীয় মহাত্মা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীও এবম্বিধ মত পোষণ করিতেন।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, প্রাচীন ও বর্তমান সমুদয় ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীর কেন্দ্র কোথায়, যদি কেহ নানাবিধ শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট হিন্দুধর্মের প্রকৃত মেরুদণ্ড কি, জানিতে চান, তবে অবশ্য ব্যাসসূত্রকেই এই কেন্দ্র, এই মেরুদণ্ড বলিয়া দেখাইতে হইবে।

---

১ কঠোপনিষদ্ ২ বিবেকচূড়ামণি

হিমাচলস্থিত অরণ্যানীর হৃদয়স্তম্ভকারী গাম্ভীর্যের মধ্যে স্বর্ণদীর গভীর ধ্বনিমিশ্রিত অদ্বৈতকেশরীর অস্তি-ভাতি-প্রিয়রূপ[১] বজ্রগম্ভীর রবই কেহ শ্রবণ করুন, অথবা বৃন্দাবনের মনোহর কুঞ্জসমূহে 'পিয়া পীতম্' কূজনই শ্রবণ করুন, বারাণসীধামের মঠসমূহে সাধুদিগের গভীর ধ্যানেই যোগদান করুন, অথবা নদীয়া-বিহারী শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের উদ্দাম নৃত্যেই যোগদান করুন, বড়গেলে তেঙ্গেলে[২] প্রভৃতি শাখাযুক্ত বিশিষ্টাদ্বৈতমতাবলম্বী আচার্যগণের পাদমূলেই উপবেশন করুন, অথবা মাধ্ব সম্প্রদায়ের আচার্যগণের বাক্যই শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করুন, গৃহী শিখদিগের 'ওয়া গুরুকি ফতে'-রূপ[৩] সমরবাণীই শ্রবণ করুন, অথবা উদাসী ও নির্মলাদিগের গ্রন্থসাহেবের[৪] উপদেশই শ্রবণ করুন, কবীরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে সৎসাহেব[৫] বলিয়া অভিবাদনই করুন, অথবা সখীসম্প্রদায়ের ভজনই শ্রবণ করুন, রাজপুতানার সংস্কারক দাদূর অদ্ভুত গ্রন্থাবলী বা তাঁহার শিষ্য রাজা সুন্দরদাস ও তাঁহা হইতে ক্রমশঃ নামিয়া 'বিচার-সাগরে'র বিখ্যাত রচয়িতা নিশ্চলদাসের গ্রন্থই (ভারতে গত তিন শতাব্দী ধরিয়া যত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই বিচারসাগর-গ্রন্থের প্রভাব ভারতীয় জনসমাজে সর্বাপেক্ষা অধিক) পাঠ করুন, এমন কি আর্যাবর্তের ভাঙ্গী মেথরগণকে তাঁহাদের লালগুরুর উপদেশ বিবৃত করিতেই বলুন—তিনি দেখিবেন, এই আচার্যগণ ও সম্প্রদায়সমূহ সকলেই সেই ধর্মপ্রণালীর অনুবর্তী, শ্রুতি যাহার প্রামাণ্য গ্রন্থ, গীতা যাহার ভগবদ্বক্ত্রবিনিঃসৃত টীকা, শারীরক ভাষ্য[৬] যাহার প্রণালীবদ্ধ বিবৃতি আর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যগণ হইতে লালগুরুর মেথর শিষ্যগণ পর্যন্ত ভারতের সমুদয় বিভিন্ন সম্প্রদায় যাহার বিভিন্ন বিকাশ।

অতএব দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত এবং আরও কতকগুলি অনতিপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাযুক্ত এই প্রস্থানত্রয়[৭] হিন্দুধর্মের প্রামাণ্য গ্রন্থস্বরূপ, প্রাচীন নারাশংসীর[৮] প্রতিনিধিস্বরূপ পুরাণ উহার উপাখ্যানভাগ এবং বৈদিক ব্রাহ্মণভাগের প্রতিনিধি-স্বরূপ তন্ত্র উহার কর্মকাণ্ড।

১ সৎ, চিৎ, আনন্দ
২ দাক্ষিণাত্যের দুই সম্প্রদায়
৩ গুরুজীর জয়
৪ নানকপন্থীদের ধর্মগ্রন্থ
৫ পূজনীয় সাধু
৬ শ্রীশঙ্করপ্রণীত বেদান্তভাষ্য
৭ উপনিষদ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্র
৮ সংহিতা

পূর্বোক্ত প্রস্থানত্রয় সকল সম্প্রদায়েরই প্রামাণ্য গ্রন্থ, কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায়ই পৃথক্ পৃথক্ পুরাণ ও তন্ত্রকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, তন্ত্রগুলি বৈদিক কর্মকাণ্ডেরই একটু পরিবর্তিত আকারমাত্র, আর কেহ উহাদের সম্বন্ধে হঠাৎ একটা অসম্বদ্ধ সিদ্ধান্ত করিবার পূর্বেই তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণভাগ, বিশেষতঃ অধ্বর্যু-ব্রাহ্মণভাগের সহিত মিলাইয়া তন্ত্র পাঠ করিতে পরামর্শ দিই ; তাহা হইলে তিনি দেখিবেন, তন্ত্রে ব্যবহৃত অধিকাংশ মন্ত্রই অবিকল ব্রাহ্মণ হইতে গৃহীত। ভারতবর্ষে তন্ত্রের প্রভাব কিরূপ, জিজ্ঞাসা করিলে বলা যাইতে পারে, শ্রৌত বা স্মার্ত কর্ম ব্যতীত হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমুদয় প্রচলিত কর্মকাণ্ডই তন্ত্র হইতে গৃহীত, আর উহা শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই উপাসনাপ্রণালীকে নিয়মিত করিয়া থাকে।

অবশ্য আমি এ কথা বলি না যে, সকল হিন্দুই সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের ধর্মের এই-সকল মূল সম্বন্ধে অবগত আছেন। অনেকে—বিশেষতঃ নিম্নবঙ্গে—এই সম্প্রদায় ও প্রণালীসমূহের নাম পর্যন্ত শুনেন নাই ; কিন্তু জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, পূর্বোক্ত তিন প্রস্থানের উপদেশানুসারে সকল হিন্দুই চলিয়াছেন।

অপর দিকে যেখানেই হিন্দীভাষা কথিত হয়, তথাকার অতি নীচজাতি পর্যন্ত নিম্নবঙ্গের অনেক উচ্চতম জাতি অপেক্ষা বৈদান্তিক ধর্ম সম্বন্ধে অধিক অভিজ্ঞ।

ইহার কারণ কি ?

মিথিলাভূমি হইতে নবদ্বীপে আনীত শিরোমণি গদাধর জগদীশ প্রভৃতি মনীষিগণের প্রতিভায় সযত্নে লালিত ও পরিপুষ্ট, কোন কোন বিষয়ে সমগ্র জগতের অন্যান্য সমুদয় প্রণালী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অপূর্ব সুনিবদ্ধ বাক্শিল্পে রচিত তর্কপ্রণালীর বিশ্লেষণস্বরূপ বঙ্গদেশীয় ন্যায়শাস্ত্র হিন্দুস্থানের সর্বত্র শ্রদ্ধার সহিত পঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বেদের চর্চায় বঙ্গবাসীর যত্ন ছিল না, এমন কি, কয়েক বর্ষ মাত্র পূর্বে পতঞ্জলির মহাভাষ্য[১] পড়াইতে পারেন, এমন কেহ বঙ্গদেশে ছিলেন না বলিলেই হয়। একবার মাত্র এক মহতী প্রতিভা

১ পাণিনি-ব্যাকরণের ভাষ্য ; বেদার্থশিক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক।

সেই 'অবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদক'[১] জাল ছেদন করিয়া উত্থিত হইয়াছিলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। একবার মাত্র বঙ্গের আধ্যাত্মিক তন্দ্রা ভাঙিয়াছিল; কিছু দিনের জন্য উহা ভারতের অপরাপর প্রদেশের ধর্মজীবনের সহভাগী হইয়াছিল।

একটু বিস্ময়ের বিষয় এই, শ্রীচৈতন্য একজন ভারতীর নিকট সন্ন্যাস লইয়াছিলেন, সুতরাং ভারতী[২] ছিলেন বটে, কিন্তু মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীই প্রথম তাঁহার ধর্মপ্রতিভা জাগ্রত করিয়া দেন।

বোধহয় বঙ্গদেশের আধ্যাত্মিকতা জাগাইতে পুরীসম্প্রদায় বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

শ্রীচৈতন্য ব্যাসসূত্রের যে ভাষ্য লিখেন, তাহা হয় নষ্ট হইয়াছে, না হয় এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তাঁহার শিষ্যেরা দাক্ষিণাত্যের মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিলেন। ক্রমশঃ রূপ-সনাতন ও জীবগোস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণের আসন বাবাজীগণ অধিকার করিলেন। তাহাতে শ্রীচৈতন্যের মহান্ সম্প্রদায় ক্রমশঃ ধ্বংসাভিমুখে যাইতেছিল, কিন্তু আজকাল উহার পুনরুজ্জীবনের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। আশা করি, শীঘ্রই উহা আপন লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করিবে।

সমুদয় ভারতেই শ্রীচৈতন্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। যেখানেই ভক্তিমার্গ পরিজ্ঞাত, সেখানেই লোকে তাঁহার বিষয় সাদরে চর্চা করে ও তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। আমার বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, সমুদয় বল্লভাচার্য-সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য-প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের সংশোধিত শাখা মাত্র। কিন্তু তাঁহার তথাকথিত বঙ্গীয় শিষ্যগণ জানেন না, তাঁহার প্রভাব এখনও কিভাবে সমগ্র ভারতে সক্রিয়। কি করিয়াই বা জানিবেন? শিষ্যগণ গদিয়ান হইয়াছেন, কিন্তু তিনি নগ্নপদে ভারতের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়া ফিরিতেন, আচণ্ডালকে অনুনয় করিতেন, যাহাতে তাহারা ভগবান্‌কে ভালবাসে।

যে অদ্ভুত ও অশাস্ত্রীয় কুলগুরুপ্রথা বিশেষভাবে বঙ্গদেশেই প্রচলিত, তাহাও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ধর্মজীবন হইতে বঙ্গদেশের পৃথক্ থাকিবার আর একটি কারণ। সর্বপ্রধান কারণ এই যে, বঙ্গদেশ এখন পর্যন্ত ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ও ভাণ্ডারস্বরূপ মহান্ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের জীবন হইতে শক্তি লাভ করে নাই।

১ ন্যায়ে ব্যবহৃত শব্দদ্বয়   ২ শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের একটি

বঙ্গের উচ্চবর্ণেরা ত্যাগ ভালবাসেন না, তাঁহাদের ঝোঁক ভোগের দিকে। তাঁহারা কেমন করিয়া আধ্যাত্মিক বিষয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিবেন? 'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।'[১] অন্যপ্রকার কিরূপে সম্ভব?

অপর দিকে ক্রমান্বয়ে অনেক সুদূরবিস্তারি-প্রভাবসম্পন্ন মহা মহা ত্যাগী আচার্যগণ সমুদয় হিন্দীভাষী ভারতের মধ্যে বেদান্তের মত প্রতি গৃহে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের রাজত্বকালে ত্যাগের যে মহিমা প্রচারিত হয়, তাহাতে অতি নিম্নশ্রেণীর লোকেও বেদান্ত-দর্শনের উচ্চতম উপদেশ পর্যন্ত শিক্ষা পাইয়াছে। যথোচিত গর্বের সহিত পঞ্জাবের কৃষকবালিকা বলিয়া থাকে, তাহার চরকা পর্যন্ত 'সোঽহম্ সোঽহম্' ধ্বনি করিতেছে। আর আমি হৃষীকেশের জঙ্গলে সন্ন্যাসিবেশধারী ত্যাগী মেথর-দিগকে বেদান্ত পাঠ করিতে দেখিয়াছি। অনেক গর্বিত অভিজাত ব্যক্তিও তাঁহাদের পদতলে বসিয়া আনন্দের সহিত উপদেশ পাইতে পারেন। কেনই বা না এইরূপ হইবে? 'অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং'—নীচ জাতির নিকট হইতেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম গ্রহণ করিবে।

অতএব উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাববাসীরা বঙ্গদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজের অধিবাসিগণ অপেক্ষা ধর্মবিষয়ে অধিক শিক্ষিত। দশনামী, বৈরাগী, পন্থী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ত্যাগী পরিব্রাজকগণ প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে ধর্মভাব লইয়া যাইতেছেন; মূল্য এক টুকরা রুটিমাত্র। আর তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কি মহৎ ও নিঃস্বার্থচরিত্র! স্বাধীন বা কাচুপন্থী সম্প্রদায়ের (যাঁহারা নিজেদের কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না) একজন সন্ন্যাসী আছেন। তাঁহারই চেষ্টায় সমগ্র রাজপুতানায় শত শত বিদ্যালয় ও দাতব্য আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। তিনি জঙ্গলের ভিতর হাসপাতাল খুলিয়াছেন, হিমালয়ের দুর্গম গিরিনদীর উপরে লৌহসেতু নির্মাণ করাইয়াছেন, কিন্তু তিনি কখন মুদ্রা স্পর্শ করেন না; তাঁহার একখানি কম্বল ছাড়া সাংসারিক সম্বল আর কিছুই নাই, এইজন্য তাঁহাকে লোকে 'কম্ব্লী স্বামী' বলিয়া ডাকে—তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া আহার সংগ্রহ করেন। তাঁহাকে কখন একাদিক্রমে একই বাড়িতে পুরা ভিক্ষা করিতে দেখি নাই, পাছে গৃহস্থের কোন ক্লেশ হয়। আর এরূপ সাধু—তিনি একা

পাঠান্তর: 'ত্যাগেনৈকেন—'ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি লাভ করা যায়।

নহেন, এরূপ শত শত সাধু রহিয়াছেন। তোমরা কি মনে কর, যত দিন এই ভূদেবগণ ভারতে জীবিত থাকিয়া তাঁহাদের দেবচরিত্ররূপ দুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা সনাতন ধর্মকে রক্ষা করিতেছেন, তত দিন এই প্রাচীন ধর্মের বিনাশ হইবে?

এই দেশে (আমেরিকায়) পাদরিগণ বৎসরের মধ্যে মাত্র ছয় মাস প্রতি রবিবার দুই ঘণ্টা ধর্মপ্রচারের জন্য ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ—এমন কি নব্বই হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন পাইয়া থাকেন। আমেরিকাবাসিগণ তাঁহাদের ধর্মরক্ষার জন্য কত লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন, আর বাঙালী যুবকগণ শিক্ষা পাইয়াছেন, 'কম্বলী স্বামী'র ন্যায় দেবতুল্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ব্যক্তিগণ অলস ভবঘুরে মাত্র! 'মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ'[১]—আমার ভক্তদের যাহারা ভক্ত, তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত, এই আমার মত।

একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত লও—একজন অতি অজ্ঞ বৈরাগীর কথা ধর। তিনি যখন কোন গ্রামে গমন করেন, তিনিও তুলসীদাস বা চৈতন্যচরিতামৃত হইতে যাহা জানেন, অথবা দাক্ষিণাত্যে হইলে আলওয়ারদিগের নিকট যাহা শিখিয়াছেন, তাহা শিখাইতে চেষ্টা করেন। ইহা কি কিছু উপকার করা নয়? আর এই সমুদয়ের বিনিময়ে তাঁহার প্রাপ্য এক টুকরা রুটি ও একখণ্ড কৌপীন। ইঁহাদিগকে নির্দয়ভাবে সমালোচনা করিবার পূর্বে ভ্রাতৃগণ, চিন্তা কর, তোমরা তোমাদের স্বদেশবাসীর জন্য কি করিয়াছ, যাহাদের ব্যয়ে তোমরা শিক্ষা পাইয়াছ, যাহাদিগকে শোষণ করিয়া তোমাদের পদগৌরব রক্ষা করিতে হয়, এবং 'বাবাজীগণ কেবল ভবঘুরে মাত্র' এই শিক্ষার জন্য তোমাদের শিক্ষকগণকে বেতন দিতে হয়।

আমাদের কতকগুলি স্বদেশী বঙ্গবাসী হিন্দুধর্মের এই পুনরুত্থানকে হিন্দুধর্মের 'নূতন বিকাশ' বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা উহাকে 'নূতন' আখ্যা দিতে পারেন। কারণ হিন্দুধর্ম সবেমাত্র বাঙলা দেশে প্রবেশ করিতেছে; এখানে এতদিন ধর্ম বলিতে কেবল আহার বিহার ও বিবাহ-সম্বন্ধীয় কতকগুলি দেশাচারমাত্রকেই বুঝাইত।

রামকৃষ্ণ-শিষ্যগণ হিন্দুধর্মের যে-ভাব সমগ্র ভারতে প্রচার করিতেছেন, তাহা সংশাস্ত্রের অনুমোদিত কি না, এই ক্ষুদ্র পত্রে সেই গুরুতর প্রশ্ন বিচার

১ আদিপুরাণ

করিবার স্থান নাই। তবে আমি আমাদের সমালোচকগণকে কয়েকটি সঙ্কেত দিব, যাহাতে তাহারা আমাদের মত আরও ভালরূপে বুঝিতে পারে।

প্রথমতঃ আমি কখন এরূপ তর্ক করি নাই যে, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের গ্রন্থ হইতে হিন্দুধর্মের যথার্থ ধারণা হইতে পারে, যদিও তাঁহাদের কথা 'অমৃত-সমান' এবং যাঁহারা উহা শুনেন, তাঁহারা 'পুণ্যবান্'। হিন্দুধর্ম বুঝিতে হইলে বেদ ও দর্শন পড়িতে হইবে এবং সমুদয় ভারতের প্রধান প্রধান ধর্মাচার্য এবং তাঁহাদের শিষ্যগণের উপদেশাবলী জানিতে হইবে।

ভ্রাতৃগণ, যদি তোমরা গৌতমসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বাৎস্যায়ন-ভাষ্যের আলোকে 'আপ্ত'[1] সম্বন্ধে গৌতমের মতবাদ পাঠ কর, শবর ও অন্যান্য ভাষ্যকার-গণের সাহায্যে যদি মীমাংসকগণের মত আলোচনা কর, 'অলৌকিক প্রত্যক্ষ' ও 'আপ্ত' সম্বন্ধে এবং সকলেই 'আপ্ত' হইতে পারে কি না এবং এইরূপ আপ্তদিগের বাক্য বলিয়াই যে বেদের প্রামাণ্য, এই-সকল বিষয়ে তাঁহাদের মত যদি অধ্যয়ন কর, যদি তোমাদের মহীধরকৃত যজুর্বেদভাষ্যের উপক্রমণিকা দেখিবার অবকাশ থাকে, তবে তাহাতে দেখিবে মানবের আধ্যাত্মিক জীবন ও বেদের নিয়মাবলী সম্বন্ধে আরও সুন্দর সুন্দর বিচার আছে। তাঁহারা তাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বেদ অনাদি অনন্ত।

'সৃষ্টির অনাদিত্ব' মত সম্বন্ধে বক্তব্য এই, ঐ মত কেবল হিন্দুধর্মের নয়, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মেরও একটি প্রধান ভিত্তি।

এখন—ভারতীয় সমুদয় সম্প্রদায়কে মোটামুটি জ্ঞানমার্গী বা ভক্তিমার্গী বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। যদি তোমরা শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত শারীরক-ভাষ্যের উপক্রমণিকা পাঠ কর, তবে দেখিবে সেখানে জ্ঞানের 'নিরপেক্ষতা' সম্পূর্ণভাবে বিচার করা হইয়াছে, আর এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ব্রহ্মানুভূতি ও মোক্ষ কোনরূপ অনুষ্ঠান, মত, বর্ণ, জাতি বা সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করে না। যে-কোন ব্যক্তি 'সাধনচতুষ্টয়'সম্পন্ন, সেই ইহার অধিকারী। সাধনচতুষ্টয় সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধিকর কতকগুলি অনুষ্ঠানমাত্র।

ভক্তিমার্গ সম্বন্ধে বক্তব্য এই, বাঙালী সমালোচকগণও বেশ জানেন যে, ভক্তিমার্গের কোন কোন আচার্য বলিয়াছেন, মুক্তির জন্য জাতি বা লিঙ্গে কিছু

[1] প্রাপ্ত, পাইয়াছেন—যিনি আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

আসিয়া যায় না, এমন কি মনুষ্যজন্ম পর্যন্ত আবশ্যক নয়; একমাত্র প্রয়োজন—ভক্তি।

জ্ঞান ও ভক্তি সর্বত্র নিরপেক্ষ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। সুতরাং কোন আচার্যই এরূপ বলেন নাই যে, মুক্তিলাভে কোন বিশেষ মতাবলম্বীর, বিশেষ বর্ণের বা বিশেষ জাতির অধিকার। এ বিষয়ে 'অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ'[১]—এই বেদান্তসূত্রের উপর শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্বকৃত ভাষ্য পাঠ কর।

সমুদয় উপনিষদ্ অধ্যয়ন কর, এমন কি সংহিতাগুলির মধ্যে কোথাও অন্যান্য ধর্মে মোক্ষের যে সঙ্কীর্ণ ভাব আছে, তাহা পাইবে না। অপর ধর্মের প্রতি সহানুভূতির ভাব সর্বত্রই রহিয়াছে, এমন কি অধ্বর্যুবেদের সংহিতা-ভাগের চত্বারিংশৎ অধ্যায়ের তৃতীয় বা চতুর্থ শ্লোকে আছে—(যদি আমার ঠিক স্মরণ থাকে) 'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাং'।[২] এই ভাব হিন্দুধর্মের সর্বত্র রহিয়াছে। যতদিন কেহ সামাজিক নিয়ম পালন করিয়া চলিয়াছে, ততদিন ভারতে কেহ কি কখন নিজ ইষ্টদেবতা নির্বাচনের জন্য, নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী হইবার জন্য নিগৃহীত হইয়াছে? সামাজিক নিয়মভঙ্গের অপরাধে সমাজ যে-কোন ব্যক্তিকে শাসন করিতে পারেন, কিন্তু কোন ব্যক্তি, এমন কি অতি নীচ পতিত পর্যন্ত কখন হিন্দুধর্মমতে মুক্তির অনধিকারী নয়। এই দুইটি একসঙ্গে মিশাইয়া গোল করিও না। ইহার উদাহরণ দেখ। মালাবারে একজন চণ্ডালকে একজন উচ্চবর্ণের লোকের সঙ্গে এক রাস্তায় চলিতে দেওয়া হয় না, কিন্তু সে মুসলমান বা খ্রীষ্টান হইলে তাহাকে অবাধে সর্বত্র যাইতে দেওয়া হয়, আর এই নিয়ম একজন হিন্দুরাজার রাজ্যে কত শতাব্দী ধরিয়া রহিয়াছে! ইহা একটু অদ্ভুত রকমের বোধ হইতে পারে, কিন্তু অতিশয় প্রতিকূল অবস্থার ভিতরও অপরাপর ধর্মের প্রতি হিন্দুধর্মের সহানুভূতির ভাবও ইহাতে প্রকাশিত হইতেছে।

হিন্দুধর্ম এই এক বিষয়ে জগতের অন্যান্য ধর্ম হইতে পৃথক্, এই একটি ভাব প্রকাশ করিতে সাধুগণ সংস্কৃতভাষার সমুদয় শব্দরাশি প্রায় নিঃশেষিত করিয়াছেন যে, মানুষকে এই জীবনেই ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে হইবে, এবং অদ্বৈতবাদ আর একটু অগ্রসর হইয়া বলেন যে, 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'—এ কথা খুব যুক্তি-সঙ্গতও বটে।

---

১ বেদান্তসূত্র, ৩।৪।৩৬ ২ গীতাতেও আছে, ৩।২৬

এই মতের ফলস্বরূপ প্রেরণার অতি উদার ও মহৎ ভাব আসিতেছে—ইহা শুধু বৈদিক ঋষিগণ বলিয়াছেন, তাহা নয়; শুধু বিদুর, ধর্মব্যাধ[১] ও অপরাপর প্রাচীন মহাপুরুষেরা ইহা বলিয়াছেন, তাহা নয়, কিন্তু সেদিন সেই দাদুপন্থী সম্প্রদায়ভুক্ত ত্যাগী নিশ্চলদাসও নির্ভীকভাবে তাঁহার 'বিচারসাগর' গ্রন্থে ঘোষণা করিয়াছেন:

যো ব্রহ্মবিদ্ ওই ব্রহ্ম, তাকু বাণী বেদ।
সংস্কৃত ঔর ভাষামে করত ভ্রমকি ছেদ॥

—যিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনিই ব্রহ্ম; তাঁহার বাক্যই বেদ। সংস্কৃত অথবা দেশীয় যে-কোন ভাষায় তিনি বলুন না কেন, তাহাতেই লোকের অজ্ঞান দূর হয়।

অতএব দ্বৈতবাদ অনুসারে ঈশ্বরকে লাভ করা এবং অদ্বৈতবাদমতে ব্রহ্ম-ভাবাপন্ন হওয়াই বেদের সমুদয় উপদেশের লক্ষ্য, এবং অন্য যাহা কিছু শিক্ষা বেদে আছে, তাহা সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার সোপানমাত্র। ভগবান্ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যের এই মহিমা যে, তিনি নিজ প্রতিভাবলে ব্যাসের ভাবগুলি অপূর্ব-ভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

নিরপেক্ষ সত্য হিসাবে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য; আপেক্ষিক সত্য হিসাবে এই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতে বা ভারতের বাহিরে সকল ধর্মসম্প্রদায়ই সত্য! তবে কোন কোনটি অপরগুলি অপেক্ষা উচ্চতর, এই মাত্র। মনে কর, কোন ব্যক্তি বরাবর সূর্যাভিমুখে যাত্রা করিল। প্রতি পদক্ষেপে সে সূর্যের নূতন নূতন দৃশ্য দেখিবে। যতদিন না সে প্রকৃত সূর্যের নিকট পৌঁছিতেছে, ততদিন তাহার কাছে সূর্যের আকার দৃশ্য ও বর্ণ প্রতিমুহূর্তে নূতন হইতে থাকিবে। প্রথমে সূর্যকে সে একটি বৃহৎ গোলকের ন্যায় দেখিয়াছিল। তারপর উহার আকৃতি ক্রমশঃ বড় হইতেছিল। প্রকৃত সূর্য বাস্তবিক কখন তাঁহার প্রথমদৃষ্ট গোলকের মতো বা পরে দৃষ্ট সূর্যসমূহের মতো নয়। তথাপি ইহা কি সত্য নয় যে, সেই যাত্রী বরাবর সূর্যই দেখিতেছিল, সূর্য ব্যতীত অন্য কিছুই দেখে নাই? এইরূপে সমুদয় সম্প্রদায়ই সত্য; কোনটি প্রকৃত সূর্যের নিকটে, কোনটি বা দূরে! সেই প্রকৃত সূর্যই আমাদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

---

১ মহাভারত, বনপর্ব।

আর যখন এই সত্য নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেষ্টা একমাত্র বেদ—অন্যান্য ঐশ্বরিক ধারণা যাঁহারই ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ দর্শনমাত্র, যখন 'সর্বলোকহিতৈষিণী শ্রুতি' সাধকের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মে যাইবার সমুদয় সোপানগুলি দিয়া লইয়া যান, আর অন্যান্য ধর্ম যখন ইহাদের মধ্যে এক একটি রুদ্ধগতি ও স্থিতিশীল সোপান মাত্র, তখন জগতের সমুদয় ধর্ম এই নামরহিত, সীমারহিত, নিত্য বৈদিক ধর্মের অন্তর্ভুক্ত।

শত শত জীবন ধরিয়া চেষ্টা কর, অনন্তকাল ধরিয়া তোমার অন্তরের অন্তস্তল অনুসন্ধান করিয়া দেখ, তথাপি এমন কোন মহৎ ধর্মভাব আবিষ্কার করিতে পারিবে না, যাহা এই আধ্যাত্মিকতার অনন্ত খনির ভিতর পূর্ব হইতেই নিহিত নাই।

তথাকথিত হিন্দু-পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে বক্তব্য এই, প্রথমে গিয়া দেখ ইহা কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিতেছে; প্রথমে জানো, উপাসকগণ কোথায় প্রথমে উপাসনা করেন—মন্দিরে, প্রতিমায় অথবা দেহমন্দিরে।

প্রথমে নিশ্চয় করিয়া জানো, তাহারা কি করিতেছে (শত-করা নিরানব্বই জনের অধিক নিন্দুকই এ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ), তখন বেদান্তদর্শনের আলোকে উহা আপনিই ব্যাখ্যাত হইয়া যাইবে।

তথাপি এ কর্মগুলি অবশ্য-কর্তব্য নয়। বরং 'মনু' খুলিয়া দেখ—উহা প্রত্যেক বৃদ্ধকে চতুর্থাশ্রম (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিতে আদেশ করিতেছে, এবং তাহারা উহা গ্রহণ করুক বা না করুক, তাহাদিগকে সমুদয় কর্ম অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে।

সর্বত্রই ইহা পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে যে, এই সমুদয় কর্ম জ্ঞানে সমাপ্ত হয়—'জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে'।[১]

এই-সকল কারণে অন্যান্য দেশের অনেক ভদ্রলোক অপেক্ষা একজন হিন্দু-কৃষকও অধিক ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন। আমার বক্তৃতায় ইওরোপীয় দর্শন ও ধর্মের অনেক শব্দ ব্যবহারের জন্য কোন বন্ধু সমালোচনাচ্ছলে অনুযোগ করিয়াছেন। সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে পারিলে আমার পরম আনন্দ হইত। উহা অপেক্ষাকৃত সহজ হইত, কারণ সংস্কৃত ভাষাই ধর্মভাব প্রকাশের একমাত্র সঠিক

১ গীতা, ৪।৩৩

বাহন। কিন্তু বন্ধুটি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য নরনারীগণ আমার শ্রোতা ছিলেন। যদিও কোন ভারতীয় খ্রীষ্টান মিশনরী বলিয়াছিলেন, হিন্দুরা তাহাদের সংস্কৃতগ্রন্থের অর্থ ভুলিয়া গিয়াছে, মিশনরীগণই উহার অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, তথাপি আমি সেই সমবেত বৃহৎ মিশনরীমণ্ডলীর মধ্যে একজনকেও দেখিতে পাইলাম না, যিনি সংস্কৃত ভাষায় একটি পঙ্‌ক্তি পর্যন্ত বুঝেন ; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বেদ, বেদান্ত ও হিন্দুধর্মের যাবতীয় পবিত্র শাস্ত্র সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া বড় বড় গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

আমি কোন ধর্মের বিরোধী—এ কথা সত্য নয়। আমি ভারতীয় খ্রীষ্টান মিশনরীদের বিরোধী—এ কথাও সত্য নয়। তবে আমি আমেরিকায় তাঁহাদের টাকা তুলিবার কতকগুলি উপায়ের প্রতিবাদ করি।

বালকবালিকাদের পাঠ্য-পুস্তকে অঙ্কিত ঐ চিত্রগুলির অর্থ কি ? চিত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে—হিন্দুমাতা তাহার সন্তান গঙ্গায় কুমীরের মুখে নিক্ষেপ করিতেছে। জননী কৃষ্ণকায়া, কিন্তু শিশুটি শ্বেতাঙ্গরূপে অঙ্কিত ; ইহার উদ্দেশ্য শিশুগণের প্রতি অধিক সহানুভূতি আকর্ষণ ও অধিক চাঁদাসংগ্রহ। একটি ছবিতে একজন পুরুষ তাহার স্ত্রীকে একটি কাষ্ঠস্তম্ভে বাঁধিয়া নিজ হস্তে পুড়াইতেছে ; স্ত্রী যেন ভূত হইয়া তাহার স্বামীর শত্রুগণকে পীড়ন করিবে, ঐপ্রকার ছবির অর্থ কি ? বড় বড় রথ রাশি রাশি মানুষকে চাপিয়া মারিয়া ফেলিতেছে—এ-সকল ছবির অর্থ কি ? সেদিন এখানে (আমেরিকায়) ছেলেদের জন্য একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে একজন পাদরি ভদ্রলোক তাঁহার কলিকাতা-দর্শনের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, তিনি দেখিয়াছেন—কলিকাতার রাস্তায় একখানি রথ কতকগুলি ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তির উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

মেমফিস নগরে আমি একজন পাদরি ভদ্রলোককে প্রচারকালে বলিতে শুনিয়াছি, ভারতের প্রত্যেক পল্লীগ্রামে ক্ষুদ্র শিশুদের কঙ্কালপূর্ণ একটি করিয়া পুষ্করিণী আছে।

হিন্দুরা খ্রীষ্টশিষ্যগণের কি করিয়াছেন যে, প্রত্যেক খ্রীষ্টান বালকবালিকাকেই হিন্দুদিগকে দুষ্ট, হতভাগা ও পৃথিবীর মধ্যে ভয়ানক দানব বলিয়া ডাকিতে শিক্ষা দেওয়া হয় ?

বালকবালিকাদের রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার এক অংশই এই :

খ্রীষ্টান ব্যতীত অপর সকলকে—বিশেষতঃ হিন্দুকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেওয়া, যাহাতে তাহারা শৈশবকাল হইতেই খ্রীষ্টান মিশনে চাঁদা দিতে শিখে।

সত্যের খাতিরে না হইলেও অন্ততঃ তাঁহাদের সন্তানগণের নীতির খাতিরেও খ্রীষ্টান মিশনরীগণের আর এরূপ ভাবের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। বালকবালিকাগণ যে বড় হইয়া অতি নির্দয় ও নিষ্ঠুর নরনারীতে পরিণত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? কোন প্রচারক—যতই অনন্ত নরকের যন্ত্রণা এবং প্রজ্বলিত অগ্নি ও গন্ধকের বর্ণনা করিতে পারেন, গোঁড়াদিগের মধ্যে তাঁহার ততই অধিক প্রতিপত্তি হয়। আমার কোন বন্ধুর একটি অল্পবয়স্কা দাসীকে 'পুনরুত্থান' সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচার শ্রবণের ফলে বাতুলালয়ে পাঠাইতে হইয়াছিল। তাহার পক্ষে জ্বলন্ত গন্ধক ও নরকাগ্নির মাত্রাটি কিছু অতিরিক্ত হইয়াছিল।

আবার মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত, হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে লিখিত গ্রন্থগুলি দেখ। যদি কোন হিন্দু খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে এরূপ এক পঙ্ক্তি লেখেন, তাহা হইলে মিশনরীগণ প্রতিহিংসায় বিষোদ্গার করিতে থাকেন।

স্বদেশবাসিগণ, আমি এই দেশে এক বৎসরের অধিক কাল রহিয়াছি। আমি ইঁহাদের সমাজের প্রায় সকল অংশই দেখিয়াছি। এখন উভয় দেশের তুলনা করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি, মিশনরীরা পৃথিবীর সর্বত্র বলিয়া বেড়ান, আমরা শয়তান; প্রকৃতপক্ষে আমরা শয়তান নই, আর তাঁহারাও নিজেদের দেবদূত বলিয়া দাবি করেন, তাঁহারাও দেবদূত নন। মিশনরীগণ হিন্দুবিবাহ-প্রণালীর দুর্নীতি, শিশুহত্যা ও অন্যান্য দোষের কথা যত কম বলেন, ততই ভাল। এমন অনেক দেশ থাকিতে পারে, যেখানকার বাস্তব চিত্রের সমক্ষে মিশনরীগণের অঙ্কিত হিন্দুসমাজের সমুদয় কাল্পনিক চিত্র নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। কিন্তু বেতনভুক্ নিন্দুক হওয়া আমার জীবনের লক্ষ্য নয়। হিন্দুসমাজ সম্পূর্ণ নির্দোষ, এ দাবি আর কেহ করে করুক, আমি কখন করিব না। এই সমাজের যে-সকল ত্রুটি অথবা শত শতাব্দ-ব্যাপী দুর্বিপাকবশে ইহাতে যে-সকল দোষ জন্মিয়াছে, সে সম্বন্ধে আর কেহই আমা অপেক্ষা বেশী জানে না। বৈদেশিক বন্ধুগণ, যদি তোমরা যথার্থ সহানুভূতির সঙ্গে সাহায্য করিতে আসো, বিনাশ যদি তোমাদের উদ্দেশ্য না হয়, তবে তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা।

কিন্তু যদি এই অবসন্ন পতিত জাতির মস্তকে অনবরত—সময়ে অসময়ে

ক্রমাগত গালি বর্ষণ করিয়া স্বজাতির নৈতিক শ্রেষ্ঠতা দেখানো তোমাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমি স্পষ্টই বলিতে পারি, যদি একটু ন্যায়পরতার সহিত এই তুলনা করা হয়, তবে হিন্দুগণ—নীতিপরায়ণ জাতি হিসাবে জগতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অনেক উচ্চ আসন পাইবেন।

ভারতে ধর্মকে কখন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় নাই। কোন ব্যক্তিকেই তাহার ইষ্টদেবতা, সম্প্রদায় বা আচার্য মনোনয়নে বাধা দেওয়া হয় নাই; সুতরাং ধর্মের এখানে যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, অন্য কোথাও সেরূপ হইতে পায় নাই।

অপরদিকে আবার ধর্মের ভিতর এই নানাভাব বিকাশের জন্য একটি স্থির-বিন্দুর আবশ্যক হইল—সমাজ এই স্থিরবিন্দুরূপে গৃহীত হইল। ইহার ফলে সমাজ কঠোরশাসনে পূর্ণ ও একরূপ অচল হইয়া দাঁড়াইল। কারণ স্বাধীনতাই উন্নতির একমাত্র সহায়ক।

পাশ্চাত্য দেশে কিন্তু সমাজ ছিল বিভিন্ন ভাব বিকাশের ক্ষেত্র এবং স্থিরবিন্দু ছিল ধর্ম। প্রতিষ্ঠিত চার্চের সহিত একমত হওয়াই ইওরোপীয় ধর্মের মূলমন্ত্র ছিল, এমন কি এখনও আছে; আর যদি কোন সম্প্রদায় প্রচলিত মত হইতে কিছু স্বতন্ত্র হইতে যায়, তাহা হইলেই তাহাকে অজস্র শোণিত-পাতের মধ্য দিয়া অতি কষ্টে একটু সুবিধা লাভ করিতে হয়। ইহার ফল একটি মহৎ সমাজসংহতি, কিন্তু তাহাতে যে ধর্ম প্রচলিত, তাহা অতি স্থূল জড়বাদের উপর কখনও উঠে নাই।

আজ পাশ্চাত্য দেশ নিজের অভাব বুঝিতেছে। এখন পাশ্চাত্যে উন্নত ঈশ্বরতত্ত্বান্বেষিগণের মূলমন্ত্র হইয়াছে—'মানুষের যথার্থ স্বরূপ ও আত্মা'। সংস্কৃত-দর্শন-অধ্যয়নকারী-মাত্রেই জানেন, এ হাওয়া কোথা হইতে বহিতেছে, কিন্তু যতক্ষণ না ইহা নব জীবন সঞ্চার করিতেছে, ততক্ষণ ইহাতে কিছুই আসিয়া যায় না।

ভারতে আবার নূতন নূতন অবস্থার সংঘর্ষে সমাজ-সংহতির নূতন সামঞ্জস্য-বিধান বিশেষ আবশ্যক হইতেছে। গত শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ ধরিয়া ভারত সমাজসংস্কার-সভায় ও সমাজসংস্কারকে পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু হায়! ইহার মধ্যে সব কয়টিই বিফল হইয়াছে। ইঁহারা সমাজসংস্কারের রহস্য জানিতেন না। ইঁহারা প্রকৃত শিক্ষণীয় বিষয় শিখেন নাই। ব্যস্ততাবশতঃ তাঁহারা

আমাদের সমাজের যত দোষ, সব ধর্মের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। বন্ধুর গায়ে মশা বসিয়াছে দেখিয়া সেই গল্পের মানুষটি যেমন দারুণ আঘাতে মশার সঙ্গে বন্ধুকেও মারিয়া ফেলে, সেইরূপ তাঁহারা সমাজের দোষ সংশোধন করিতে গিয়া সমাজকেই একেবারে ধ্বংস করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এ-ক্ষেত্রে তাঁহারা অটল অচল গাত্রে আঘাত করিয়াছিলেন, শেষে উহার প্রতিঘাতবলে নিজেরাই ধ্বংস হইয়াছেন। যে-সকল মহামনা নিঃস্বার্থ পুরুষ এইরূপ বিপথে চালিত চেষ্টায় অকৃতকার্য হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ধন্য! আমাদের নিশ্চেষ্ট সমাজরূপ নিদ্রিত দৈত্যকে জাগরিত করিতে সংস্কারোন্মত্ততার এই বৈদ্যুতিক আঘাতের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল।

আসুন, আমরা ইঁহাদের শুভকামনা করিয়া ইঁহাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা লাভবান্ হই। তাঁহারা এটুকু শিক্ষা করেন নাই, ভিতর হইতে বিকাশ আরম্ভ হয়, বাহিরে তাহারই পরিণতি হয়; তাঁহারা শিক্ষা করেন নাই, সমুদয় ক্রমবিকাশ পূর্ববর্তী কোন ক্রমসঙ্কোচের পুনর্বিকাশ মাত্র। তাঁহারা জানিতেন না, বীজ উহার চারিপাশের পঞ্চভূত হইতে উপাদান সংগ্রহ করে বটে, কিন্তু বৃক্ষ নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী হইয়া থাকে। যতদিন না হিন্দুজাতি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং এক নূতন জাতি তাহার স্থান অধিকার করে, ততদিন প্রাচ্যে প্রতীচ্যে যতই চেষ্টা কর না কেন, জীবিত থাকিতে ভারত কখনও ইওরোপ হইতে পারে না।

ভারত কি বিলুপ্ত হইবে, যে-ভারত সমুদয় মহত্ত্ব নীতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রাচীন জননী, যে-ভূমিতে সাধুগণ বিচরণ করিতেন, যে-ভূমিতে ঈশ্বরপ্রতিম ব্যক্তিগণ এখনও বাস করিতেছেন? হে ভ্রাতৃগণ, এথেন্সের সেই জ্ঞানী মহাত্মার[১] লণ্ঠন লইয়া তোমাদের সঙ্গে এই বিস্তৃত জগতের প্রত্যেক নগর, গ্রাম, অরণ্য অন্বেষণে যাইতে রাজি আছি, যদি কোথাও এমন লোক পাও তো দেখাও। এ কথা ঠিক যে, ফল দেখিয়াই গাছ চেনা যায়। ভারতের প্রত্যেক আমগাছের তলায় পতিত ঝুড়ি ঝুড়ি কীটদষ্ট, অপক্ব আম কুড়াও এবং তাহাদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে একশতটি করিয়া গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ রচনা কর। তথাপি তুমি একটি আমেরও সঠিক বর্ণনা লিখিতে পারিবে না। গাছ হইতে

১ ডায়োজিনিস—Diogenes.

একটি সুপক্ক সরস সুমিষ্ট আম পাড়িয়া লও, তবেই তুমি আমের সকল তত্ত্ব অবগত হইবে।

এইভাবে এই ঈশ্বরকল্প মানবগণই হিন্দুধর্ম কি, তাহা প্রকাশ করেন। এই জাতি শতাব্দী দ্বারা কৃষ্টির পরিমাপ করে, যে জাতিরূপ বৃক্ষ সহস্র বর্ষ ধরিয়া ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াও অনন্ত তারুণ্যের অক্ষয় তেজে এখনও গৌরবান্বিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এই দেবমানবদের জীবন দেখিলেই সেই জাতির স্বরূপ, শক্তি ও সম্ভাবনার বিষয় জানা যায়।

ভারত কি মরিয়া যাইবে? তাহা হইলে জগৎ হইতে সমুদয় আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হইবে; চরিত্রের মহান্ আদর্শসকল বিলুপ্ত হইবে, সমুদয় ধর্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির ভাব বিলুপ্ত হইবে, সমুদয় ভাবুকতা বিলুপ্ত হইবে; তাহার স্থলে দেবদেবীরূপে কাম ও বিলাসিতা যুগ্ম রাজত্ব চালাইবে; অর্থ—সে পূজার পুরোহিত; প্রতারণা, পাশববল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা—তাহার পূজাপদ্ধতি আর মানবাত্মা তাহার বলি। এ অবস্থা কখন হইতে পারে না। কর্মশক্তি হইতে সহ্যশক্তি অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। ঘৃণাশক্তি হইতে প্রেমশক্তি অনন্তগুণে অধিক শক্তিমান্। যাঁহারা মনে করেন হিন্দুধর্মের বর্তমান পুনরুত্থান কেবল দেশহিতৈষিতা-প্রবৃত্তির একটি বিকাশমাত্র, তাঁহারা ভ্রান্ত।

প্রথমতঃ আসুন, এই অপূর্ব ব্যাপার কি, তাহা আমরা বুঝিবার চেষ্টা করি।

ইহা কি আশ্চর্য নয় যে, একদিকে যেমন আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রবল আক্রমণে পাশ্চাত্য গোঁড়া ধর্মগুলির প্রাচীন দুর্গসমূহ ধূলিসাৎ হইতেছে, একদিকে যেমন বর্তমান বিজ্ঞানের হাতুড়ির আঘাত—বিশ্বাস অথবা চার্চসমিতির সংখ্যাধিক্যের সম্মতিই যাহার মূল, সেই-সকল ধর্মমতরূপ কাচপাত্রকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, একদিকে যেমন আক্রমণশীল আধুনিক চিন্তার ক্রমবর্ধমান স্রোতের সহিত নিজেদের মিলাইতে গিয়া পাশ্চাত্য ধর্মমতসকল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেছে, একদিকে যেমন অপর সমুদয় ধর্মপুস্তকের মূলগ্রন্থগুলি হইতে আধুনিক চিন্তার ক্রমবর্ধমান তাড়নায় যথাসম্ভব বিস্তৃত ও উদার অর্থ বাহির করিতে হইয়াছে, আর তাহাদের অধিকাংশই ঐ চাপে ভগ্ন হইয়া অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ভাণ্ডারে রক্ষিত হইয়াছে, একদিকে যেমন অধিকাংশ পাশ্চাত্য চিন্তাশীল ব্যক্তি চার্চের সঙ্গে সমুদয় সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া অশান্তিসাগরে ভাসিতেছেন, অপর দিকে তেমনি যে-সকল ধর্ম সেই বেদরূপ জ্ঞানের মূলপ্রস্রবণ হইতে প্রাণপ্রদ

বারি পান করিয়াছে অর্থাৎ কেবল হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মই পুনরুজ্জীবিত হইতেছে ?

অশান্ত পাশ্চাত্য নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী কেবল গীতা বা ধম্মপদেই স্বীয় আশ্রয় পাইতেছেন—যেখানে তাঁহাদের মন নিশ্চিন্ত হইতে পারে।

অদৃষ্টচক্র ঘুরিয়া গিয়াছে। আর যে হিন্দু নৈরাশ্যের অশ্রুপরিপ্লুতনেত্রে তাহার প্রাচীন বাসভবন শত্রুপ্রদত্ত অগ্নিতে বেষ্টিত দেখিতেছিল, এখন বর্তমান চিন্তার প্রখর আলোকে ধূম অপসারিত হইবার পর সে দেখিতেছে, তাহার গৃহই একমাত্র নিজ শক্তিতে দণ্ডায়মান ; অপরগুলি সব—হয় ধ্বংস হইয়াছে, নয় হিন্দু আদর্শ অনুযায়ী পুনর্গঠিত হইতেছে। হিন্দু এখন অশ্রুমোচন করিয়া দেখিতে পাইতেছে, যে-কুঠার সেই 'ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখ অশ্বত্থের' মূলদেশ কাটিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা বাস্তবিক অস্ত্রচিকিৎসকের শল্যের কার্যই করিয়াছে।

সে দেখিতেছে—তাহার ধর্মরক্ষার জন্য তাহার শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করিবার বা অন্য কোনরূপ কপটতা করিবার আবশ্যকতা নাই। শুধু তাই নয়, শাস্ত্রের দুর্বল অংশগুলিকে সে দুর্বল বলিতে পারে, কারণ ঐগুলি অরুন্ধতী-দর্শনন্যায়মতে নিম্নাধিকারিগণের জন্য বিহিত। সেই প্রাচীন ঋষিগণকে ধন্যবাদ, যাঁহারা এরূপ সর্বব্যাপী সদাবিস্তারশীল ধর্মপদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন, যে-পদ্ধতি জড়রাজ্যে যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং যাহা কিছু হইবে, সে-সবই সাদরে গ্রহণ করিতে পারে। হিন্দু সেইগুলিকে নূতনভাবে বুঝিতে শিখিয়াছে এবং আবিষ্কার করিয়াছে, যে-আবিষ্কারগুলি প্রত্যেক সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র ধর্মসম্প্রদায়ের পক্ষে এত ক্ষতিকর হইয়াছে, সেগুলি তাহার পূর্বপুরুষগণের ধ্যানলব্ধ তুরীয় ভূমি হইতে আবিষ্কৃত সত্যসমূহের—বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ভূমিতে পুনরাবিষ্কার মাত্র।

এই কারণেই তাহাকে কোন ভাবই ত্যাগ করিতে হইবে না, অথবা তাহাকে অন্য কোথাও কিছু খুঁজিতেও হইবে না। যে অনন্ত ভাণ্ডার সে উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছে, তাহা হইতে কিয়দংশ লইয়া নিজ কাজে লাগাইলেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। তাহা সে করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ক্রমশঃ আরও করিবে। ইহাই কি বাস্তবিক এই পুনরুত্থানের কারণ নয় ?

বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমাদিগকে বিশেষভাবে আহ্বান করিয়া বলিতেছি :

ভ্রাতৃগণ! লজ্জার বিষয় হইলেও ইহা আমরা জানি যে, বৈদেশিকগণ যে-সকল প্রকৃত দোষের জন্য হিন্দুজাতিকে নিন্দা করেন, সেগুলির কারণ আমরা। আমরাই ভারতের অন্যান্য জাতির মস্তকে অনেক অনুচিত গালি-বর্ষণের কারণ। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমরা ইহা বুঝিতে পারিয়াছি, আর তাঁহার আশীর্বাদে আমরা যে শুধু নিজেদেরই শুদ্ধ করিব, তাহা নয়, সমুদয় ভারতকেই সনাতনধর্ম-প্রচারিত আদর্শানুসারে জীবন গঠন করিতে সাহায্য করিতে পারিব। প্রথমে এস, ক্রীতদাসের কপালে প্রকৃতি সর্বদাই যে ঈর্ষা-তিলক অঙ্কন করেন, তাহা মুছিয়া ফেলি। কাহারও প্রতি ঈর্ষান্বিত হইও না। সকল শুভকর্মব্রতীকেই সাহায্য করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকো। ত্রিলোকের প্রত্যেক জীবের উদ্দেশে শুভেচ্ছা প্রেরণ কর।

এস, আমাদের ধর্মের এক কেন্দ্রীভূত সত্য—যাহা হিন্দু বৌদ্ধ জৈন সকলেরই সাধারণ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য, তাহারই ভিত্তিতে দণ্ডায়মান হই। সেই কেন্দ্রীভূত সত্য : এই অজ অনন্ত সর্বব্যাপী অবিনাশী মানবাত্মা, যাঁহার মহিমা স্বয়ং বেদ প্রকাশ করিতে অক্ষম, যাঁহার মহিমার সমক্ষে অনন্ত সূর্য চন্দ্র তারকা নক্ষত্রপুঞ্জ ও নীহারিকামণ্ডলী বিন্দুতুল্য। প্রত্যেক নরনারী, শুধু তাহাই নয়, উচ্চতম দেবতা হইতে তোমাদের পদতলে ঐ কীট পর্যন্ত সকলেই ঐ আত্মা—হয় উন্নত, নয় অবনত। প্রভেদ—প্রকারগত নয়, পরিমাণগত।

আত্মার এই অনন্ত শক্তি জড়ের উপর প্রয়োগ করিলে জাগতিক উন্নতি হয়, চিন্তার উপর প্রয়োগ করিলে মনীষার বিকাশ হয় এবং নিজেরই উপর প্রয়োগ করিলে মানুষ দেবতা হইয়া যায়।

প্রথমে এস, আমরা দেবত্ব লাভ করি, পরে অপরকে দেবতা হইতে সাহায্য করিব। 'নিজে সিদ্ধ হইয়া অপরকে সিদ্ধ হইতে সহায়তা কর'—ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র হউক। মানুষকে পাপী বলিও না ; তাহাকে বলো, তুমি ব্রহ্ম। যদি বা কেহ শয়তান থাকে, তথাপি ব্রহ্মকেই স্মরণ করা আমাদের কর্তব্য—শয়তানকে নয়।

ঘর যদি অন্ধকার হয়, তবে সর্বদা 'অন্ধকার, অন্ধকার' বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলে অন্ধকার দূর হইবে না, বরং আলো আনো। জানিয়া রাখো—যাহা কিছু অভাবাত্মক, যাহা কিছু পূর্ববর্তী ভাবগুলিকে ভাঙিয়া ফেলিতেই নিযুক্ত, যাহা কিছু কেবল দোষদর্শনাত্মক, তাহা চলিয়া যাইবেই যাইবে, যাহা কিছু

ভাবাত্মক, যাহা কিছু গঠনমূলক, যাহা কোন একটি সত্য স্থাপন করে, তাহাই অবিনাশী, তাহাই চিরকাল থাকিবে। এস, আমরা বলিতে থাকি, 'আমরা সৎস্বরূপ, ব্রহ্ম সৎস্বরূপ, আর আমরাই ব্রহ্ম, শিবোঽহম্ শিবোঽহম্'—এই বলিয়া চলো—অগ্রসর হই। জড় নয়, চৈতন্যই আমাদের লক্ষ্য। যে কোন বস্তুর নামরূপ আছে, তাহাই নামরূপাতীত সত্তার অধীন। শ্রুতি বলেন, ইহাই সনাতন সত্য। আলো আনো, অন্ধকার আপনি চলিয়া যাইবে। বেদান্তকেশরী গর্জন করুক, শৃগালগণ তাহাদের গর্তে পলায়ন করিবে। চারিদিকে ভাব ছড়াইতে থাকো; ফল যাহা হইবার, হউক। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ একত্র রাখিয়া দাও, উহাদের মিশ্রণ আপনা-আপনিই হইবে। আত্মার শক্তি বিকশিত কর; উহার শক্তি ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া দাও; যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা আপনিই আসিবে।

তোমার অন্তর্নিহিত ব্রহ্মভাব বিকশিত কর, আর সব কিছুই উহার চারিদিকে সুসমঞ্জসভাবে মিলিত হইবে। বেদে বর্ণিত ইন্দ্রবিরোচনসংবাদ[১] স্মরণ কর। উভয়েই তাঁহাদের ব্রহ্মত্ব সম্বন্ধে উপদেশ পাইলেন। কিন্তু অসুর বিরোচন নিজের দেহকেই ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন, কিন্তু দেবতা বলিয়া ইন্দ্র বুঝিতে পারিলেন, আত্মাকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। তোমরা সেই ইন্দ্রের সন্তান; তোমরা সেই দেবগণের বংশধর। জড় কখন তোমাদের ঈশ্বর হইতে পারে না, দেহ কখন তোমাদের ঈশ্বর হইতে পারে না।

ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া—সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ-সহায়ে; অর্থের শক্তিতে নয়, ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে। বলিও না, তোমরা দুর্বল; বাস্তবিক সেই আত্মা সর্বশক্তিমান্। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য চরণস্পর্শে যে মুষ্টিমেয় যুবকদলের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তাহারা আসাম হইতে সিন্ধু, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত তাঁহার উপদেশামৃত প্রচার করিয়াছে। তাহারা পদব্রজে ২০,০০০ ফুট ঊর্ধ্বে হিমালয়ের তুষাররাশি অতিক্রম করিয়া তিব্বতের রহস্য ভেদ করিয়াছে। তাহারা চীরধারী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছে। কত অত্যাচার তাহাদের উপর

১ ছান্দোগ্যোপনিষদের শেষাংশ (৮ম, ৭-১২) দ্রষ্টব্য।

দিয়া গিয়াছে—এমন কি তাহারা পুলিসের দ্বারা অনুসৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, অবশেষে যখন গভর্নমেণ্ট বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছেন; তাহারা নির্দোষ তখন তাহারা মুক্তিলাভ করিয়াছে।

এখন তাহারা বিংশতিজন মাত্র। কালই তাহাদের সংখ্যা দুই সহস্রে পরিণত কর। হে বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ, তোমাদের দেশের জন্য ইহা প্রয়োজন, সমুদয় জগতের জন্য ইহা প্রয়োজন। তোমাদের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মশক্তি জাগাইয়া তোল; সেই শক্তি তোমাদিগকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা শীত-উষ্ণতা—সব কিছু সহ্য করিতে সমর্থ করিবে। বিলাসপূর্ণ গৃহে বসিয়া, সর্বপ্রকার সুখ-সম্ভোগে পরিবেষ্টিত থাকিয়া একটু সখের ধর্ম করা অন্যান্য দেশের পক্ষে শোভা পাইতে পারে, কিন্তু ভারতের অন্তরে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর প্রেরণা বর্তমান। ভারত সহজেই প্রতারণা ধরিয়া ফেলে। তোমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। মহৎ হও। স্বার্থত্যাগ ব্যতীত কোন মহৎ কার্যই সাধিত হইতে পারে না। পুরুষ স্বয়ং জগৎ সৃষ্টি করিবার জন্য স্বার্থত্যাগ করিলেন, নিজেকে বলি দিলেন। তোমরা সর্বপ্রকার আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য, নাম-যশ অথবা পদ—এমন কি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া মানবদেহের শৃঙ্খলদ্বারা এমন একটি সেতু নির্মাণ কর, যাহার উপর দিয়া লক্ষ লক্ষ লোক এই জীবনসমুদ্র পার হইয়া যাইতে পারে।

যাবতীয় কল্যাণ-শক্তিকে মিলিত কর। তুমি কোন্ পতাকার নিম্নে থাকিয়া যাত্রা করিতেছ, সেদিকে লক্ষ্য করিও না। তোমার পতাকা নীল সবুজ বা লোহিত, তাহা গ্রাহ্য করিও না; সমুদয় রঙ মিশাইয়া প্রেমের শুভ্রবর্ণের তীব্র জ্যোতি প্রকাশ কর। আমাদের প্রয়োজন—কার্য করিয়া যাওয়া; ফল যাহা, তাহা আপনি হইবে। যদি কোন সামাজিক নিয়ম তোমার ব্রহ্মত্বলাভের প্রতিকূল হয়, আত্মার শক্তির সম্মুখে তাহা টিকিতে পারিবে না। ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাহা দেখিতে পাইতেছি না, দেখিবার জন্য আমার আগ্রহও নাই। কিন্তু আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, আমাদের সেই প্রাচীনা জননী আবার জাগিয়া উঠিয়া পুনর্বার নবযৌবনশালিনী ও পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে মহিমান্বিতা হইয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছেন। শান্তি ও আশীর্বাণীর সহিত তাঁহার নাম সমগ্র জগতে ঘোষণা কর।

[সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪, বস্টন]

কর্ম ও প্রেমে চিরকাল তোমাদেরই
বিবেকানন্দ

তথ্যপঞ্জী

ভারতে বিবেকানন্দ

[দর্শন ও দার্শনিক সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় ২য় খণ্ডে দ্রষ্টব্য]

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

৫ ৬ শ্যেনাঙ্কিত বিজয়পতাকা : শ্যেনাঙ্কিত পতাকা বিজয় ও সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার দ্যোতক। রোমবাসিগণ সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে ব্যাঘ্র, অশ্ব, ভল্লুক প্রভৃতির মূর্তি-অঙ্কিত পতাকা বা Standard বহন করিত। মোরিয়াস্ (Morius) দ্বিতীয়বার কনসাল হইয়া শ্যেনাঙ্কিত (Eagle) পতাকা প্রবর্তন করেন।

৮ ক্যাপিটোলাইন গিরি (Mons Capitolinus) : রোমনগর সাতটি পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে রোমবাসীদের কুলদেবতা জুপিটারের মন্দির যে-পাহাড়ের উপর ছিল—তাহারই নাম ক্যাপিটোলাইন। এখানেই রোমের শাসনকেন্দ্র অবস্থিত ছিল।

১৬ মনু : জগতের অধীশ্বর-পদের নাম। মনুর সংখ্যা চৌদ্দ, যথা—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ প্রভৃতি। এখন বৈবস্বত-মনুর অধিকার চলিয়াছে, ইহার পর অষ্টম মনু সাবর্ণির কাল।

আপস্তম্বের পরেই মনুস্মৃতি প্রাচীন ভারতের ধর্মশাস্ত্র-বিষয়ে প্রধান গ্রন্থ। কয়েকজন ঋষি স্বায়ম্ভুব মনুকে সকল বর্ণের ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে অনুরোধ করিলে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, সেইগুলি উক্ত গ্রন্থে ভৃগু কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

৬ ৮ চীন-জাপান যুদ্ধ : কোরিয়াতে জাপান কর্তৃক স্বীয় প্রভাব বিস্তৃতির চেষ্টা এবং চীন কর্তৃক তথায় সার্বভৌম অধিকার সংরক্ষণের সঙ্কল্প হইতে এই দুই দেশের মধ্যে ১৮৯৪ খৃঃ এই যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে চীন পরাস্ত হয় এবং ১৮৯৫ খৃঃ শিমোনাসেকির সন্ধি অনুসারে কোরিয়াতে জাপানের অধিকার স্থাপিত হয়।

২৩ রৌপ্য-সমস্যা : পূর্বে আমেরিকায় স্বর্ণ ও রৌপ্য এই উভয় ধাতুর মুদ্রা (Bimetallic Standard) প্রচলিত ছিল। ১৮৭৩ খৃঃ কংগ্রেস রৌপ্য-মুদ্রার প্রচলন বাতিল করে। ফলে দেশে মুদ্রা-

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

স্বল্পতা দেখা দেয়। দেশের কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণী দুঃখ-দুর্দশার চাপে অবাধ রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন দাবী করে। এই সময় স্বামীজী আমেরিকায় ছিলেন; মিস হেলকে লিখিত তাঁহার পত্র (১. ১১. ৯৬) দ্রষ্টব্য।

৮ ১০ শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮—১৮৬০): জার্মানির এক বণিক-পরিবারে শোপেনহাওয়ার-এর জন্ম। তাঁহার দর্শনকে দুঃখ ও নৈরাশ্যবাদের দর্শন বলা চলে। তাঁহার মতে ইচ্ছাশক্তিই সর্বস্ব।

১১ 'বেদের এক প্রাচীন অনুবাদ…পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন।' মোগল সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকোহ্ পারসী ভাষায় উপনিষদের অনুবাদ করান। সুজাউদ্দৌল্লার রাজসভার ফরাসী রেসিডেণ্ট-অনূদিত এই গ্রন্থটির নাম 'ঔপনেখত্'। বিখ্যাত পর্যটক, জেন্দাবেস্তার আবিষ্কর্তা আঁকেতিল দুপেরোঁ উহা ল্যাটিনে অনুবাদ করেন। শোপেনহাওয়ার এই অনুবাদ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হন। তিনি এই মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হন।

৯ ২৮ ক্রমোন্নতিবাদ (Evolution): এক জাতির প্রাণী প্রয়োজনের খাতিরে ও পরিবেশের প্রভাবে ক্রমশঃ উন্নততর প্রাণীতে পরিণত হইতেছে—চার্লস ডারুইনের এই মত।

২৯ শক্তির নিত্যতা (Conservation of Energy): ইহা পদার্থ-বিজ্ঞানের একটি মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে শক্তি নিয়ত রূপান্তরিত হইতেছে, কিন্তু উহার সামগ্রিক পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি নাই।

১১ ২০ 'বেবিলনবাসিগণ বলিত…'—প্রাচীন বেবিলনের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার নাম Marduk। তাঁহারই অপর নাম Asaru। পরবর্তী কালে গ্রীকগণ তাঁহাকে সূর্যের সহিত অভিন্নভাবে দেখিত। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তিনিই গ্রহরাজ। Merodak, Maradonchas, Maradakos, Mardokas, Marachach প্রভৃতি তাঁহারই নামান্তর।

১৪ ১৩ কাবা: মক্কার প্রধান মন্দির। এখানে গেব্রিয়েল-প্রেরিত একখণ্ড কৃষ্ণ প্রস্তর আছে। এই প্রস্তরখণ্ড মুসলমানগণের নিকট পরম পবিত্র। তাঁহারা ইহার অভিমুখে ফিরিয়া উপাসনা করেন।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

২৪ ৯ 'রাজা নহুষ মৃত্যুর পর ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন'—নহুষ ছিলেন চন্দ্রবংশীয় আয়ু রাজার পুত্র। পুণ্যবান্ ও বীর্যশালী নহুষ আত্মসংযম অভ্যাস করেন। ইন্দ্র যখন বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া মিথ্যাচারের জন্য জলমধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন দেবতা ও মহর্ষিরা নহুষকে দেবরাজ করিয়া দেন।

৪৭ ১৭ 'যিনি শৈবদের শিব…'—উদয়নাচার্য-কৃত একটি শ্লোক :

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥

৫১ ১ 'পাশ্চাত্য জগৎ মুষ্টিমেয় শাইলকের শাসনে পরিচালিত হইতেছে'—'শাইলক' ইংরেজ কবি শেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকে বর্ণিত এক নিষ্ঠুর কুসীদজীবী ইহুদী,—এখানে ধনকুবের।

৫৪ ১৯ রামানুজ : ১০২৭ খৃঃ মাদ্রাজ হইতে ২৬ মাইল দূরে শ্রীপেরেমবুদুর গ্রামে জন্ম। পুর্বনাম শ্রীলক্ষ্মণ দেশিক। বোধায়নবৃত্তি অবলম্বনে তিনি শ্রীভাষ্য রচনা করেন এবং জীবনের ষাট বৎসর শ্রীরঙ্গমে থাকিয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য ব্যতীত তিনি ভগবদ্গীতার ভাষ্য, বেদান্তসার, বেদান্ত-সংগ্রহ ও বেদান্তদীপ নামে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্মমত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

৬৯ ১৩ যোগ্যতমের উদ্বর্তন (Survival of the fittest): চার্লস ডারুইন (১৮০৯-৮২) তাঁহার অভিব্যক্তিবাদে (Theory of Evolution) প্রচার করিয়াছেন যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে জীবকুল নিয়ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। কেবল যাহারা সংগ্রামে যোগ্যতম, তাহারাই টিঁকিয়া থাকে। (এই মতের বিস্তারিত সমালোচনা ৯ম খণ্ডে ১২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৭৪ ২১ সেমাইট জাতি : সাধারণতঃ মধ্যপ্রাচ্য ও আরব জাতিগুলিকে বুঝায়। সেম (Genesis. X-21) ইহাদের আদি পুরুষ। ইহুদী, আরেমীয়, ফিনিসীয়, আরব ও আসিরীয় জাতিগুলি ইহার অন্তর্গত।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

৮১ ১৫ বংশানুক্রমিক সংক্রমণ (Hereditary transmission): —আধুনিক পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেকটি মানুষের স্বভাব দুইটি স্রোতের প্রবাহে গঠিত। একটি বংশানুক্রমিক এবং অপরটি পরিবেশের প্রভাব (Environmental influence)। হিন্দুরা কিন্তু 'সংস্কার' এবং পূর্বজন্মে বিশ্বাসী।

৯৪ ১৭ থিওজফিক্যাল সোসাইটি (Theosophical Society): —সোয়েডেনবার্গ, শেলিং প্রভৃতি যশস্বী মনীষিগণ কর্তৃক এই থিওজফি মতবাদ ইওরোপে প্রবর্তিত হয়। অবশ্য রাশিয়ান মহিলা ম্যাডাম ব্লাভাটাস্কী ও ইংরেজ অফিসার কর্নেল অলকট-এর প্রচেষ্টাতেই এই আন্দোলনটি শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং তাঁহাদের প্রচেষ্টায় ১৮৭৫ খৃঃ নিউইয়র্কে একটি থিওজফিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হয়। ভারতে মিসেস এনি বেস্যাণ্ট, মিঃ জজ্, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি এই মতের উৎসাহী প্রচারক ছিলেন।

৯৭ ৯ কুথুমি ও মোরিয়ার: থিওজফিস্ট সোসাইটির রহস্যবিদ্ দুইজন 'মহাত্মা'।

৯৮ ৩ 'আমার একজন স্বদেশবাসী⋯'—ব্রাহ্মসমাজের নেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলিয়াছিলেন, খ্রীষ্ট ভারতে আসিয়াছেন।

২৪ 'যমায় ধর্মরাজায়⋯চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ'—তর্পণকালে পঠিত দুইটি শ্লোকের আদি ও অন্ত উদ্ধৃত। যম, চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি কায়স্থদের আদি পুরুষরূপে খ্যাত এবং সর্বপূজ্য। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন; হেয় বা হীন নন—ইহাই তাৎপর্য।

২৯ 'আমার জাতি হইতেই⋯বৈজ্ঞানিকের অভ্যুদয় হইয়াছে'। আচার্য ব্রজেন্দ্র শীল, রমেশচন্দ্র দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, আচার্য জগদীশ বসুর কথাই স্বামীজী এখানে বলিতেছেন। ধর্মমত যাহাই হউক, উল্লিখিত মনীষিগণ কায়স্থ-কুলোদ্ভব—এ কথা বলাই এখানে স্বামীজীর উদ্দেশ্য।

১০২ ১৮ 'আমেরিকায় দাস-ব্যবসায় রহিত করিবার জন্য যে যুদ্ধ হইয়াছিল'—ইহা American Civil War নামে প্রসিদ্ধ; ১৮৬১ খৃঃ হইতে

পৃষ্ঠা পংক্তি

১৮৬৩ খৃঃ পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। ১৮৬০ খৃঃ দাসপ্রথাবিরোধী আব্রাহাম লিঙ্কন্ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার পর উক্ত কুপ্রথার সমর্থক দক্ষিণাঞ্চলীয় রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং এই অন্তর্যুদ্ধের সূচনা হয়। তখন লিঙ্কন্ দাসপ্রথার উচ্ছেদ ঘোষণা করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, 'This nation cannot remain halt free and half slave'। ভিকসবার্গ এবং গেটিসবার্গের যুদ্ধে দক্ষিণাঞ্চলীয় রাষ্ট্রসংঘ (The Confedarate States) পরাজিত হইবার পর দাসপ্রথার সমর্থকগণ হতাশ হইয়া পড়েন। তাঁহাদের সেনাধ্যক্ষ রবার্ট্ লী ১৮৬৫ খৃঃ আত্মসমর্পণ করিলে আইনতঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথা দূরীভূত হয়।

১০৩ ১৬ 'সেই জলমগ্ন বালক ও দার্শনিকের গল্পে'—ঈশপের শিক্ষামূলক গল্পটির তাৎপর্য : নিমজ্জমান ব্যক্তিকে আগে জল হইতে তুলিবার ব্যবস্থা করা উচিত; তারপর যুক্তি-তর্ক সহায়ে বুঝানো যাইতে পারে—সাঁতার না জানিয়া বেশী জলে যাওয়া ঠিক নয়, ইত্যাদি। পূর্বেই যদি বুঝাইতে যাওয়া হয়, তবে তাহাকে আর রক্ষা করা যাইবে না। বক্তৃতা নিষ্ফল হইবে।

১০৮ ১৪ শঙ্কর (৭-৮ শতক): কেরলে কালাডি গ্রামে শঙ্করের জন্ম। আট বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া তিনি গোবিন্দপাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহারই আদেশে অদ্বৈতভাবমূলক 'ভাষ্য' রচনা করিয়া সারা ভারতে প্রচার করেন। দশনামী বৈদান্তিক সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা।

১৫ নানক (১৪৬৯-১৫৩৮): পঞ্জাবে লাহোরের অনতিদূরে তালওয়ান্দি গ্রামে এক ক্ষত্রিয়-পরিবারে নানক জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধর্মপরায়ণ ছিলেন। সুলতানপুরের নিকট রোহরী নামক এক অরণ্যে সাধনা করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি শিখ-ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার মতে গুরুর আশ্রয়লাভ এবং নামসাধনই ভগবান-লাভের উপায়। তাঁহার পরে দশম গুরু গোবিন্দসিংহের সময়ে শিখধর্ম প্রাধান্য লাভ করে।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

১০৮ ১৫ চৈতন্য (১৪৮৫—১৬০৩) : নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও মাতা শচীদেবী। তাঁহার বাল্যনাম ছিল নিমাই। গয়াধামে ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন, পরে কেশব ভারতী তাঁহাকে সন্ন্যাস দেন। তিনি প্রেমধর্ম প্রচার করেন।

" কবীর (১৩৯৮—১৪৯৮) : প্রাচীন মতে বারাণসীর এক মুসলমান জোলার ঘরে কবীরের জন্ম। অনেকের মতে তিনি রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত রামানন্দ স্বামীর এক ব্রাহ্মণ শিষ্যের বিধবা কন্যার সন্তান। উত্তর কালে তিনি এক অসাম্প্রদায়িক ধর্মমত প্রচার করেন।

" দাদু (১৫৪৪—১৬০৩) : আমেদাবাদের এক দরিদ্র মুসলমান চর্মকারের গৃহে দাদুর জন্ম। তিনি কবীরের পুত্র বা শিষ্য কামালের শিষ্য। তিনিও অসাম্প্রদায়িক প্রেম ও ভক্তির ধর্ম প্রচার করিতেন। শোনা যায়, সম্রাট আকবরও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন।

১১৭ ১৩ রাজা ভর্তৃহরি : মালবেশ্বর গন্ধর্ব সেনের পুত্র। রাজকার্যে কখনই তাঁহার মন ছিল না। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যশোধর্মকে রাজ্য দিয়া তিনি সন্ন্যাসীর বেশে তপস্যায় চলিয়া যান। তাঁহার রচিত কাব্য শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক 'ত্রিশতক' নামে প্রসিদ্ধ।

১৩০ ১৮ পরিত্রাণ (Salvation) ও মুক্তি : এ দুটি এক জিনিস নয়। 'পরিত্রাণ' দ্বৈতবাদী ধর্মগুলির পাপবাদের সহিত জড়িত। 'মুক্তি' আত্মার প্রতীয়মান বন্ধন-ভাবের সমাপ্তি।

২৫ পূর্বানুকৃতি (Atavism = Breeding back) : অনেক ক্ষেত্রে প্রাণীদের মধ্যে পূর্বপুরুষ বা আদিম স্তরের লক্ষণ দেখা যায়। ইহা যেন ক্রমবিকাশের বিপরীত—ক্রমসঙ্কোচ।

১৪৭ ১৮ বাৎস্যায়ন (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতক) —'কামসূত্রে'র রচয়িতা, 'ন্যায়সূত্রে'র ভাষ্যকার ; উভয়ে একই ব্যক্তি কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও মতে অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য বা চাণক্যেরই ছদ্মনাম 'বাৎস্যায়ন'।

২১ 'এক প্রাচীন ঋষি তাঁহার পুত্রকে'—ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।১) শ্বেতকেতুর উপাখ্যানই এখানে উদ্দিষ্ট।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

১৫১ ২ ব্রহ্মসূত্র: ব্যাসদেব কর্তৃক গ্রথিত। উপনিষদের সার কথা চার অধ্যায়ে ১৬ পাদে ৫৫৫টি সূত্রে সংক্ষেপে বিষয় ও যুক্তি অনুসারে সন্নিবেশিত। ইহাকে বেদান্তসূত্র বা যুক্তি-প্রস্থানও বলে।

১৬০ ১১ 'শঙ্করের পূর্ববর্তী আচার্যগণ'—গৌড়পাদ এবং গোবিন্দপাদ প্রভৃতি।

২৫ 'কোন মহাপুরুষের কৃপায়'—শ্রীমৎ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সহিত নবদ্বীপেই বিশ্বম্ভরের (শ্রীচৈতন্য) প্রথম পরিচয় হয়। পরে গয়ায় তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

১৭০ ২২ 'বৌদ্ধধর্ম যাহার বিদ্রোহী সন্তান'—বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম হইতেই উদ্ভূত। কিন্তু হিন্দুর বেদ ও ঈশ্বর অস্বীকার করে বলিয়া বৌদ্ধধর্মকে বিদ্রোহী সন্তান বলা হইয়াছে।

১৮২ ২৪ 'এক মহান প্রকাণ্ড 'ঊর্ধ্বমূলম্' বৃক্ষ'—গীতায় (১৫।১) 'ঊর্ধ্বমূল' বৃক্ষ বলিতে ব্রহ্মকেই বুঝায়-তাঁহা হইতে এই সংসারের শাখা-প্রশাখা প্রসৃত। উপমার উদ্দিষ্ট ভাব—অবনত ভারত আধ্যাত্মিক ভাব অবলম্বন করিয়াই উন্নত হইতেছে।

১৯৮ ২৮ 'আগামী পঞ্চাশ বৎসর···আরাধ্য দেবতা হউন'—
ইহা লক্ষণীয় যে, স্বামীজী ১৮৯৭ খৃঃ এই উক্তি করেন এবং তাহার ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পরে ১৯৪৭ খৃঃ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে।

২০৩ ৯ 'বাল্যাবস্থায় একবার ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছিলাম'—কলেজের ছাত্রাবস্থায় পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী শিক্ষার ফলে মনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ জাগ্রত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাতের পর তাঁহার সকল সংশয় দূরীভূত হয়।

২০৪ ১ গরীবখানায় (poor-house): পাশ্চাত্য দেশে বহু স্থলে ভিক্ষাবৃত্তি আইনতঃ দণ্ডনীয়। দরিদ্র বেকারদের সরকারী অর্থে পরিচালিত গরীবখানায় আশ্রয় দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানেও আইনের হৃদয়হীনতা দরিদ্রদের অন্যায়ভাবে অর্থোপার্জনে প্ররোচিত করে। গরীবখানা দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান নয়।

২১২ 'যাঁহারা বলেন ভারতের বাহিরে ধর্মপ্রচারের জন্য আমিই প্রথম সন্ন্যাসী গিয়াছি'—বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের আধ্যাত্মিক

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

ভাবধারা পৃথিবীর নানা দেশে প্রবাহিত হইয়াছে। সম্রাট অশোক মিশর, গ্রীস প্রভৃতি দেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন।

২২১ ২৫ আচার্যপ্রবর মধ্বমুনি (১১-১২ শতক খৃঃ): দাক্ষিণাত্যের বেলিগ্রামে জন্ম, বাল্যনাম বাসুদেব। শুদ্ধানন্দ বা অচ্যুত প্রেক্ষাচার্য তাঁহার দীক্ষাগুরু। গুরুদত্ত নাম পূর্ণপ্রজ্ঞ, সংসার ত্যাগ করিয়া 'আনন্দতীর্থ' নামে পরিচিত হন। মধ্বাচার্যের বেদান্তভাষ্যই 'পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শন' নামে প্রসিদ্ধ। তিনি জীব ও ঈশ্বরের পৃথক্ সত্তা স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহাকে দ্বৈতবাদী দার্শনিক বলা হয়। 'তত্ত্ববিবেক' নামে একটি গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করেন।

২২২ ১০ বিজ্ঞানভিক্ষু: সাংখ্যদর্শনের বিখ্যাত টীকাকার। তিনি ব্রহ্মসূত্রেরও এক নূতন ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

২৭ বোধায়ন: (খৃঃ পূঃ ১ম শতব্দ)—বোধায়ন দাক্ষিণাত্যের বেদান্তের 'কৃতকোটি' নামক বিশিষ্টাদ্বৈতপর বৃত্তি প্রণয়ন করেন। বোধায়নের গ্রন্থ পাওয়া যায় না। যে-সকল আচার্যের মতানুসারে শ্রীভাষ্য লিখিত, তাঁহাদের মধ্যে বোধায়ন প্রধান।

২২৪ ৬-৭ 'জগদীশ, গদাধর ও শিরোমণির নাম'—জগদীশ তর্কালঙ্কার (১৬-১৭ শতক) নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক, পিতা যাদবচন্দ্র। ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের শিষ্য। তিনি রঘুনাথ শিরোমণির 'তত্ত্বচিন্তা-মণিদীধিতির টিপ্পনী', গণেশ উপাধ্যায়ের 'অনুমানময়ূখে'র ভাষ্য, প্রশস্তপাদের ভাষ্যের 'সূক্তি' নামে টীকা রচনা করেন। 'শব্দশক্তি-প্রকাশিকা' শব্দখণ্ডের মৌলিক গ্রন্থ। জগদীশের টীকা 'জাগদীশী'। গদাধর ভট্টাচার্য (১৬৫০ খৃঃ): নৈয়ায়িক। জন্মস্থান বগুড়া জেলা; পিতা জীবনাচার্য। নবদ্বীপে ও পরে মিথিলায় অধ্যয়ন করেন। গুরুর মৃত্যু হওয়ায় উপাধি না লইয়াই অধ্যাপনা সুরু করেন। ইনি নব্যতন্ত্রের গ্রন্থসমূহের পাণ্ডিত্যপূর্ণ 'গাদাধরী টীকা' রচনা করেন। রঘুনাথ শিরোমণি: নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ইঁহার পাণ্ডিত্যের ও আদর্শ জীবনযাত্রার অনেক গল্প বঙ্গদেশে মুখে মুখে প্রচারিত। 'দীধিতি' ইঁহার প্রধান রচনা।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

২২৫ ৩ আল্লোপনিষদ—

১৮ 'যাস্কের নিরুক্ত······'—নিরুক্ত ষড়্‌বেদাঙ্গের অন্যতম গ্রন্থ। বৈদিক দুরূহ শব্দগুলির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ প্রদর্শনই নিরুক্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। বর্তমানে কেবল যাস্কের নিরুক্তই পাওয়া যায়। ডক্টর লক্ষ্মণস্বরূপ ইহা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন।

২২৬ ১৬ মিল্টন ও দান্তেঃ জন্ মিল্টন (Milton) (১৬০৮-১৬৭৪)—Paradise Lost নামক বিখ্যাত ইংরেজী মহাকাব্যের রচয়িতা। দান্তে (Alighieri Dante) (১২৬৫-১৩২১) বহুভাষান্তরিত Divina Commedia নামক বিখ্যাত ল্যাটিন কাব্যের রচয়িতা।

২৩১ ২৩ পতঞ্জলি (খৃঃ পুঃ ২য় শতক): পাণিনি ব্যাকরণের সূত্রবৃত্তির উপর কাত্যায়ন-কৃত বার্তিকের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিয়া পতঞ্জলি 'মহাভাষ্য' রচনা করেন। যোগদর্শনের সূত্রকারের নামও পতঞ্জলি, তবে উভয়ে একই ব্যক্তি কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে।

২৩২ ১৩ 'প্রকৃতির পরিবর্তন হয় বাক্যটি স্ব-বিরোধী'। এখানে 'প্রকৃতি' অর্থে স্ব-ভাব। এই স্ব-ভাব বা স্বরূপ অপরিবর্তনীয়।

২৩৩ ১০ 'চৈতন্যদেবও দাক্ষিণাত্যের সম্প্রদায়বিশেষভুক্ত ছিলেন'—যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে দশনামী সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরী তাঁহার মন্ত্রগুরু ও কেশব ভারতী সন্ন্যাসের গুরু, তথাপি দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতের নিকটতা লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলা হইয়াছে।

২৩৮ ১৯ 'কাণ্টের দর্শন'—ইম্যানুয়েল কাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪) হিউমের সন্দেহবাদ খণ্ডন করিয়া 'সবিচারবাদ' (Criticism) প্রবর্তন করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক চিন্তা প্রভাবিত করেন।

২১ অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর (১৮২৯-১৯০০): জার্মান পণ্ডিত ১৮৪৬ খৃঃ ইংলণ্ডে আমন্ত্রিত হইয়া ঋগ্‌বেদের ইংরেজী অনুবাদ সম্পাদনে ব্রতী হন। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক। স্বামীজীর সহিত দেখা হয় মে, ১৮৯৬।—৭ম খণ্ডে ব্যক্তিপরিচয় এবং ৬ষ্ঠ ও ১০ম খণ্ডে স্বামীজীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

২৩৯ ১৯ হেগেল (১৭৭০-১৮৩১): জার্মান দার্শনিক কাণ্টের দর্শনের পরিণতি হেগেলের দর্শনে। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ১৮১৮ খৃঃ হইতে। তাঁহার মতে তাঁহার দর্শনে সকল দর্শনের সারভাগ আছে। তিনি দ্বন্দ্বাত্মক (Dialectic) বিচারের প্রবর্তক। পক্ষ, প্রতিপক্ষ ও উভয়ের সামঞ্জস্য এই পদ্ধতির সারকথা।

২৪১ ২৪ 'বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বল্লভাচার্য সম্প্রদায়'—শুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রচারক শ্রীবল্লভাচার্য-প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের মতে মায়াশক্তি ব্রহ্মের অধীন, ব্রহ্ম স্বয়ং মায়া-সম্পর্করহিত। এই অর্থে ব্রহ্ম শুদ্ধ অদ্বৈত। তবে তাঁহারা ব্রহ্মের সাকার বিগ্রহ স্বীকার করেন। 'পোষণং তদনুগ্রহঃ' (শ্রীমদ্‌ভাগবত ২।১০) অর্থাৎ ভগবানের অনুগ্রহেই জীবের যথার্থ পোষণ বা পুষ্টি—এই ভাবটি অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সাধনা, তাই তাঁহাদের অন্য নাম 'পুষ্টি সম্প্রদায়'। ইঁহাদের সাধনায় সখ্য ও কান্তাভাবের প্রাধান্য। বিখ্যাত হিন্দী বৈষ্ণব কবিকুল 'অষ্টছাপ' এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

২৪২ ২৯ কুলগুরুপ্রথা: বঙ্গদেশে কোন কোন বংশ পুরুষানুক্রমে অপর কয়েকটি বংশের গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই প্রথাকে কুলগুরুপ্রথা বলা হয়।

২৪৭ ৩ 'ভূকেন্দ্রিক (Geocentric) ও সূর্যকেন্দ্রিক (Heliocentric) মত'—পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া সূর্য চন্দ্র ও গ্রহসকল আবর্তিত হইতেছে, এই প্রাচীন ধারণা ভূকেন্দ্রিক; এবং সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া গ্রহসমূহ ঘুরিতেছে, কেপলার ও গ্যালিলিওর এই মত অনুসারে সৌরজগৎ সূর্যকেন্দ্রিক।

২৫০ ২১ শতপথ ব্রাহ্মণ: শত অধ্যায়ে বেদের অংশবিশেষ; ইহা শুক্ল যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ এবং মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব দুই শাখায় বিভক্ত। মাধ্যন্দিনে ১৪ কাণ্ড ও শত অধ্যায়ে আছে। এই জন্য ইহার নাম 'শতপথ ব্রাহ্মণ'। বিভিন্ন অধ্যায়ে ঐতিহাসিক রাজগণের উল্লেখ আছে।

২৫৯ ১৬ 'তরবারি-বলে......' হজরত মহম্মদের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই খলিফা-পদের অধিকার লইয়া শিয়া-সুন্নীর বিরোধ উপস্থিত হয়।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

এইরূপে খাওয়ারিজ নামক তৃতীয় দলেরও উদ্ভব হয়। উম্মাইদ খলিফাগণের সময় আরও দুইটি বিভিন্ন মতাবলম্বী দলের আবির্ভাব হয়। আধুনিক কালে মুসলমানগণের মধ্যে অন্ততঃ তিনটি বিভিন্ন দলের উদ্ভব হইয়াছে, যথা—ওয়াহাবি, বাবি এবং আহ্‌মাদিয়া।

২৬২ ২০ 'মুশার দশটি আদেশ'—মিশরে ক্রীতদাসের মতো জীবনযাপন হইতে মুক্ত করিয়া হজরত মুশা (Moses) ইহুদীগণকে যখন প্রতিশ্রুত ভূমি প্যালেস্টাইনের অভিমুখে আনিতেছিলেন, তখন পথে সিনাই পর্বতে তিনি ভগবানের নিকট দশটি আদেশ লাভ করেন। ইহুদীদের (তৎপ্রসূত অন্যান্য ধর্মেরও) নৈতিক জীবনযাপনের ভিত্তিস্বরূপ এই দশটি আদেশ :

আমি তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের প্রভু।

১ আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন ঈশ্বর থাকিবে না।

২ কোন মূর্তি গড়িবে না, বা সেগুলির সম্মুখে নত হইবে না।

৩ ঈশ্বরের নাম বৃথা লইবে না।

৪ বিশ্রামের দিন মনে রাখিবে, সেদিনটি পবিত্রভাবে কাটাইবে।

৫ পিতামাতাকে সম্মান করিবে।

৬ হত্যা করিবে না। ৭ ব্যভিচার করিবে না।

৮ চুরি করিবে না। ৯ মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না।

১০ প্রতিবেশীর গৃহ পত্নী দাসদাসী বা কোন পদার্থে লোভ করিবে না।—'Ten Commandments' (Old Test. Deut. 5 : 6-21)

২৬৭ ২ 'এই সেই ব্রহ্মাবর্ত'—মনু বলিয়াছেন, সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর অন্তর্বর্তী দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে কথিত।—মনুসংহিতা, ২।১৭

২৭৮ ২৮ 'শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কপিল'—ষড়দর্শনের অন্তর্গত সাংখ্যসূত্রের রচয়িতা, তাঁহার মতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব। সাংখ্যমতে জগৎ প্রকৃতি (জড়) হইতে উদ্ভূত। এই দর্শনের তিনখানি প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যায় : 'তত্ত্বসমাস-সূত্র', 'সাংখ্যপ্রবচন-সূত্র' ও ঈশ্বর কৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা'।

২৮২ ১ গুরু গোবিন্দসিংহ (১৬৬২—১৭০৮): শিখগণের দশম এবং শেষ গুরু। তাঁহার পিতা নবম গুরু তেগ বাহাদুর ১৬৭৫ খৃঃ ঔরঙ্গজেবের আদেশে নিহত হইলে তিনি গুরুপদবী লাভ করেন। শিখজাতির সংগঠন সাধন করিয়া তাহাদিগকে 'খালসা' অর্থাৎ পবিত্র শিষ্যসংঘে পরিণত করেন। তিনি মুঘলগণের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করেন; সবহিন্দের মুসলমান শাসনকর্তার হস্তে তাঁহার দুই পুত্র নিহত হয়। নিঃসন্তান গুরুগোবিন্দ ১৭০৮ খৃঃ দাক্ষিণাত্যে নান্দের নামক স্থানে পাঠান আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারান।

৩০৮ ২২ ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ: বৌদ্ধ সিদ্ধান্তে 'অহম্' এই প্রকার ক্ষণিক জ্ঞান ব্যতীত চিরস্থির আত্মার সত্তা স্বীকার করা হয় না। এই অহং-জ্ঞানের নাম আলয়-বিজ্ঞান। পূর্বজাত অহং-জ্ঞান পরক্ষণে আর একটি অহং-জ্ঞান জন্মাইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। এইভাবে সরিৎ-প্রবাহের ন্যায় 'অহম্ অহম্ অহম্' এইরূপ আলয়-বিজ্ঞানের প্রবাহ চিরনির্বাণ না হওয়া পর্যন্ত চলিতে থাকে। ইহাকেই 'ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ' বলে এবং এই প্রবাহই ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীর আত্মা, ইহার অতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কিছু নাই। তাঁহাদের মতে সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক, কোন বস্তুরই পূর্বপরক্ষণ-সম্বন্ধ বা স্থায়িত্ব নাই। —(বেদান্তদর্শন, অদ্বৈতবাদ, ৩য় খণ্ড)—ডঃ আশুতোষ শাস্ত্রী।

৩২১ ৩ ত্রিপিটক: বুদ্ধের নির্বাণলাভের পর তাঁহার উপদেশাবলী শিষ্যগণ কর্তৃক সংগৃহীত এবং পরে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়। এই গ্রন্থ 'ত্রিপিটক' নামে পরিচিত। ইহার তিনটি অংশ: 'সূত্রপিটকে' বুদ্ধদেব কথাচ্ছলে ধর্মোপদেশ দিতেছেন, 'বিনয়পিটকে' বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পালনীয় নিয়মাদি শিখাইয়াছেন এবং 'অভিধর্মপিটকে' আছে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব। সূত্রপিটক পাঁচ ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক অংশ 'নিকায়' নামে পরিচিত। সুবিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ 'ধম্মপদ' সূত্রপিটকের পঞ্চম নিকায়ে নিবদ্ধ।

৩৩৬ ২ 'সে ব্যক্তি আর্মেনিয়া বা অন্য কোন স্থান হইতে'—ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সুরু করিয়া অস্ট্রিয়া হুঙ্গারি ও তুর্ক সাম্রাজ্য হইতে রাজনৈতিক ও ধর্মসংক্রান্ত কারণে বহু নির্যাতিত ব্যক্তি

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

নিজেদের দেশ হইতে পলায়ন করিয়া আমেরিকায় আসিতে থাকে। তাহারা সেখানে আশ্রয় এবং গণতান্ত্রিক সমানাধিকার লাভ করিয়া আমেরিকার নাগরিকে পরিণত হয়।

৩৪৩ ১৫ পিথাগোরাস (খৃঃ পূঃ ৫৪০): স্যামস্ (Samos) দ্বীপে জন্ম। তিনি কেবল একজন বড় দার্শনিকই ছিলেন না. গণিতশাস্ত্র-প্রণয়নেও তাঁহার দান অনেক। দর্শনশাস্ত্রের উপর গণিতের প্রভাবের মূলেও তিনি। বৃহত্তর গ্রীসের সামাজিক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য তিনি একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন তাঁহার দর্শনে ভারতীয় প্রভাব আছে।

১৫ সক্রেটিস (খৃঃ পূঃ ৪৬৯): গ্রীসের এথেন্স নগরে সক্রেটিসের জন্ম। যুবকদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়াই দেশের উন্নতিসাধনের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করিতেন। কথোপকথনের মাধ্যমে তিনি লোকশিক্ষা দিতেন। তাঁহার মতে জ্ঞান ও ধর্ম অভিন্ন। প্রচলিত কুসংস্কার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচারকার্যের ফলে রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ তাঁহার নামে অভিযোগ করে, এবং বিচারের ফলে তাঁহাকে 'হেমলক' বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হয়।

১৫ প্লেটো (খৃঃ পূঃ ৪২৭-৩৪৭): সক্রেটিসের শিষ্য, এরিস্টটলের গুরু। এথেন্সে 'একাডেমি'র প্রতিষ্ঠাতা। অভিজাত ব্যক্তিদের সন্তান-দিগকে গণিত দর্শন ও রাজনীতি শিক্ষা দিতেন। আদর্শবাদী দার্শনিক। (২য় খণ্ডে দার্শনিক-পরিচিতি দ্রষ্টব্য)

১৫ 'ইজিপ্টের নিওপ্লেটোনিকগণ'—সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটলের পরে গ্রীকদর্শনের চিন্তাস্রোতে ভাঁটা পড়ে। প্রায় পাঁচশত বৎসর পরে মিশরদেশে প্লটিনাস (২০৫-২৭০ খৃঃ) নামে এক দার্শনিক পুনরায় যে দর্শনচিন্তার সূত্রপাত করেন, তাহা 'নিওপ্লেটনিজ্‌ম্' বলিয়া পরিচিত। ইহাতে প্রাচ্যদর্শন ও গ্রীকদর্শনের সংমিশ্রণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

২০ দারাশেকো: শাজাহান ও মমতাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র; পিতার প্রিয়পাত্র ছিলেন। রাজ্যাধিকারের যুদ্ধে, ঔরঙ্গজেবের নিকট

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

পরাজিত হইয়া সিন্ধুদেশাভিমুখে পলায়ন করেন; পরে ধৃত হইয়া 'বিধর্মী' অভিযোগে মোল্লাদের বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন'। প্রপিতামহ আকবরের ন্যায় তিনি সকল ধর্মকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। স্থফী-মত তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। তিনি পারস্য-ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত ও উপনিষদের অনুবাদ করান।

৩৪৪ ১ অধ্যাপক ডয়সন (১৮৪৫-১৯১৯): প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক, সংস্কৃত ভাষায় স্থপণ্ডিত পল ডয়সন কীল (Kiel) বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক থাকা কালে স্বামীজী তাঁহার সহিত দেখা করেন। এ-বিষয়ে স্বামীজীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—১০ম খণ্ডে।

৩৫১ ১৬ মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৮৫৬-১৯৩৬): এটর্নি, লেখক; বেলুড়মঠের ট্রাস্টডীড প্রভৃতি রচনায় সাহায্য করেন।

৩৫৮ ২৩ 'তাঁহারা হাঁচি-টিকটিকির পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা'—পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ সনাতন হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতাদের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি বলা হইয়াছে, এইরূপ অনুমান হয়।

৩৬২ ১২ 'কুমারিল ভট্ট একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন' খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, সে-যুগের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া তিনি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। মীমাংসা-দর্শনের উপর তাঁহার রচিত ভাষ্য বিখ্যাত।

ভারত-প্রসঙ্গে

৩৭৭ ১৩ অর্ধবানর: স্থমাত্রাতে নয়, নিকটবর্তী যবদ্বীপে অতি প্রাচীন মানুষের করোটি ও অস্থি পাওয়া গিয়াছে। তাহার লক্ষণ মানুষের মতো হইলেও বানরের সঙ্গে কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। তাই স্বামীজী এটিকে অর্ধবানর-জাতীয় বলিয়াছেন।

১৩ ডলমেন (Dolmen): মৃতদেহ বা মৃতের অস্থিকে মাটিতে পুঁতিয়া উপরে বৃহৎ আকারের পাথর দিয়া নানাপ্রকারের সমাধি রচনা করা হইত। কখনও পাথরগুলিকে শুধু খাড়াভাবে দাঁড় করানো হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে তিন চারখানি বড় পাথরের

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

পাটাকে ছোট্ট ঘরের মতো সাজাইয়া উপরে এক খণ্ড বড় পাটা ছাদের মতো ঢাকা দেওয়া হইত। শেষেরটি 'ডলমেন' নামে অভিহিত হয়। ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্যে বহু স্থানে ডলমেন পাওয়া যায়। এগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের বলিয়া অনুমান হয়।

১৪ চকমকি পাথরের অস্ত্র (Flint implement): চকমকি-জাতীয় পাথরের তৈরী অস্ত্র ভারতের নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই চকমকি পাথরে তৈরী। ধাতু-ব্যবহারের পূর্বে মানুষ এইরূপ পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করিত।

১৮ নেগ্রিটো কোলেরিয়ান (Negrito-Kolarian): আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে খর্বকায় কৃষ্ণবর্ণ কোঁকড়া-চুলবিশিষ্ট নেগ্রিটো জাতির বাস। কোলভাষাভাষী মুণ্ডা, সাঁওতাল, জুয়াঙ্গ, শবর প্রভৃতিকে নেগ্রিটোদের মতোই ভারতের আদিম অধিবাসী বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহাদেরই কোলারিয়ান বলা হইয়াছে।

২১ ইয়ুংচি: এটি Yue-chi হইবে। ইউয়েচি জাতি মধ্য-এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চল হইতে খৃঃ পূঃ ২য় শতকে হুনদের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া ভারতের অভ্যন্তরে আসে। ইহারা মঙ্গোলজাতির অন্তর্গত।

২২ সীথিয়ান (Scythian): আরাল সমুদ্রের আশপাশে ওক্সাস নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল একসময়ে শগ্‌ডিনিয়া বা শাকদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। এখানকার অধিবাসীদের নাম শক। ইহাদের সূর্য-উপাসক পুরোহিতদের 'মগ' বলা হইত। ভারতে এই মগ-পুরোহিতগণ ব্রাহ্মণজাতির অন্তর্ভুক্ত হন। (তুলনীয়: 'Magi'—N.T.)

২৩ স্ক্যাণ্ডেনেভীয় দস্যুগণ (Viking): নরওয়ে ও সুইডেনের জল-দস্যুগণ পূর্বকালে (খৃঃ ৮-১০ শতকে) ভাইকিং নামে পরিচিত ছিল। ইহারা ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং জার্মানির উত্তরেও প্রভাব বিস্তার করে।

৩৭৯ ১২ করোটিতত্ত্বগত (Craniological): একজাতির সহিত অন্য-জাতির পার্থক্য—দেহের গঠনে অনেক সময়ে পরিলক্ষিত হয়। কেহ দীর্ঘকায়, কেহ খর্ব; কেহ গৌরবর্ণ, কেহ কৃষ্ণবর্ণ। মাথার

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

খুলি বা করোটি কাহারও গোলাকার, কাহারও বা কতকটা ডিমের আকৃতিবিশিষ্ট ; অর্থাৎ লম্বায় যত, চওড়ায় তাহা অপেক্ষা কম।

৩৯৬ ১০ মিঃ জাস্টিস রানাডে (১৮৪২-১৯০১): মহাদেও গোবিন্দ রানাডে—নাসিক জেলার একটি ক্ষুদ্র গ্রামে এক চিতপাবন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি.এ. পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্রদের অন্যতম। ১৮৯৩ খৃঃ বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারক নিযুক্ত হন। পশ্চিম ভারতে সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের উদ্যোক্তা। বাল্যবিবাহ, বিধবাদের মস্তকমুণ্ডন প্রভৃতির বিরোধিতা এবং বিধবাবিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষা প্রভৃতির সমর্থন করা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। প্রার্থনা সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

৪০৪ ১৮ 'খৃষ্টপূর্ব ২৬০ অব্দে যে প্রাচীন রাজা'—স্পষ্টতই সম্রাট অশোক।

৪১৩ ২ 'ডাইনী' হত্যা: মধ্যযুগে ইওরোপের সকল দেশেই জনসাধারণ শয়তান-আশ্রিত ব্যক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত। ১৪৮৪ খৃঃ পোপ অষ্টম ইনোসেণ্ট (Innocent VIII) এক আদেশে বলেন, ডাইনীদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা পোপের চক্ষে অপরাধ। বহু নিরীহ কুরূপা বৃদ্ধা এ-কারণে ডাইনী বলিয়া সন্দেহের পাত্রী হইত, এবং তাহাদিগকে বিনা বিচারে ডুবাইয়া, ফাঁসি দিয়া বা পুড়াইয়া মারা হইত। ফ্রান্সের জোয়ান অব আর্ক (Joan of Arc)-কেও এইভাবে ডাইনী বলিয়া পুড়াইয়া মারা হয়।

৪১৮ ৭ 'শান্তিস্থাপনকারীরাই ধন্য ইত্যাদি—' শৈলোপদেশে খ্রীষ্টের উক্তি: Blessed are the peace-makers : for they shall be the children of God.—N.T. St. Matthew : Ch V

৪১৯ ৬ 'শাসনযন্ত্র সব সময়েই পুরোহিতগণের অধিকারে ছিল'—এ-বিষয়ে বিশেষ আলোচনার জন্য স্বামীজীর 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—এই গ্রন্থাবলীর ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৩১।

৪২০ ১৯ 'স্পেন দেশের লোকেরা সিংহলে এসেছিল খ্রীষ্টধর্ম নিয়ে।' সিংহলে বিদেশীদের প্রথম অবতরণ খৃঃ ১৫০৫, অধিকার ১৫২০-২৫।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

৪১০ ২৪ 'পোতুর্গিজেরা এসেছিল পশ্চিম ভারতে'—পোতুর্গিজরা গোয়া দখল করে খৃঃ ১৫২০, ফেব্রুআরি।

২৪ 'ঈশ্বরের ত্রিমূর্তি'—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের প্রতীক ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। বোম্বাই-এর নিকট এলিফ্যাণ্টা গুহার ত্রিমূর্তি বিখ্যাত।

৪২১ ১৪ 'পরিবর্তী কালের প্রথম মিশনরীদের কয়েকজন'—সম্ভবতঃ কেরী, মার্শম্যান প্রভৃতি।

১৯ 'একজন মিশনরী ডাঃ লঙ্‌'—দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত 'নীলদর্পণ' নাটক ১৮৫৮ খৃঃ প্রকাশিত হয়। ইহাতে বিদেশী নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার এবং চাষীদের বিদ্রোহের কাহিনী বর্ণিত হয়। ১৮৬১ খৃঃ রেভারেণ্ড লঙ্‌ (Rev. Dr. Walter Long) 'নীলদর্পণ' নাটকের একটি ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। সেই সময়ে মনে করা হইত—ডাঃ লঙ্‌ই এই অনুবাদ করিয়াছেন। এখন জানা গিয়াছে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার অনুবাদক। এই পুস্তকের জন্য নীলকরদের অত্যাচার-কাহিনী দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। অনুবাদের জন্য লঙ্‌ সাহেবের কারাবাস হয়।

২৫ 'এখানকার মিশনরীরা বিবাহিত'—প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মপ্রচারকদের কথাই এখানে বলা হইতেছে।

৪২৪ ১৩ যীশুর 'শৈলোপদেশ' : New Testament-এর অন্তর্গত 'Sermon on the Mount', ম্যাথু (৫-৭) ; ল্যুক (৬ : ২০-৪৯)। ইহারই মধ্যে যীশুখ্রীষ্টের শিক্ষার সার বিস্তারিতভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। বাহ্যাচারের পরিবর্তে আন্তরিক আচরণের কথা তিনি বলেন ; ভয়ের পরিবর্তে প্রেমের দৃষ্টি হইতে তিনি পুরাতন ধর্মই নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করেন।

৪৩৮ মার্ক টোয়েন : মার্কিন ঔপন্যাসিক এবং রম্যরচনাকার। মার্ক টোয়েন—ছদ্মনাম ; প্রকৃত নাম Samuel Langhorne Clemens (১৮৩৫-১৯১০)। প্রথম জীবনে ছাপাখানার কাজ করেন, পরে নাবিকের জীবনযাপন করেন। মিসিসিপি নদীতে নাবিকেরা জলের গভীরতা পরীক্ষা করিবার জন্য 'Mark One,

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

Mark Twain' এই ধরনের ধ্বনি করিত। প্রসিদ্ধ রচনা The Innocents Abroad (1869), The Adventures of Tom Sawyer (1876) ইত্যাদি। এক সফরে তিনি ভারতবর্ষে আসেন; তাঁহার রচনাবলীতে এদেশের জীবনযাত্রা সম্পর্কে কৌতুকপূর্ণ কিন্তু গভীর সহানুভূতিসূচক মন্তব্য করেন।

৪৪৭ ৩ শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব: শঙ্কর অদ্বৈতবাদের, রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের এবং মধ্বাচার্য দ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহারা বেদান্তদর্শনের উপর ভাষ্য লিখিয়াছেন।

৬ 'পারিয়াগণও আলওয়ারে পরিণত'—দাক্ষিণাত্যের অস্পৃশ্য নীচ জাতিবিশেষকে 'পারিয়া' বলে। 'আলওয়ার' শব্দের অর্থ ভক্ত। আলওয়ারগণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। রামানুজাচার্য উচ্চনীচ সকলকে সমভাবে তাঁহার সম্প্রদায়ে আকর্ষণ করেন।

১৮-১৯ বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ: চতুর্বেদের প্রত্যেকটিতে তিনটি করিয়া অংশ আছে। যথা—(১) ভিন্ন ভিন্ন দেবগণের উদ্দেশ্যে স্তোত্রাত্মক মন্ত্রসমূহের নাম 'সংহিতা'; (২) এই-সকল মন্ত্র কোন্ যজ্ঞে কিরূপে প্রযোগ করিতে হইবে, তাহার বর্ণনাত্মক বেদভাগের নাম 'ব্রাহ্মণ'; (৩) অরণ্যে ঋষিগণদ্বারা আলোচিত তত্ত্বসমূহের নাম 'আরণ্যক'। উপনিষৎ-সমূহ এই আরণ্যকের অন্তর্গত।

৪৪৮ ১০ ভগবান্ ভাষ্যকার: ভাষ্য যদিও অনেকেই লিখিয়াছেন, 'ভগবান্ ভাষ্যকার' বলিতে শ্রীশঙ্করাচার্যকেই বুঝায়।

১৩ দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু: দ্ব্যণুক—দুই অণুর সম্মিলিত অবস্থা। ত্রসরেণু—তিনটি দ্ব্যণুকের সম্মিলিত অবস্থা। (—বৈশেষিক দর্শনে)

১৪ নৈয়ায়িকদিগের জাতিদ্রব্যগুণসমবায়: ন্যায়দর্শনমতে দ্রব্য নয়টি, যথা—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, দিক্, কাল, আত্মা, মন। জাতি—কতকগুলি বস্তুর সাধারণ ধর্ম, যাহা দ্বারা শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে, যেমন—পশুত্ব, মনুষ্যত্ব। ন্যায়দর্শনে গুণ বলিতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার,

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

অদৃষ্ট ও শব্দ এই কয়টিকে বুঝায়। সমবায়—যেমন ঘট ও যে-মৃত্তিকায় উহা নির্মিত, উভয়ের মধ্যে সমবায়-সম্বন্ধ।

৪৪৯ ২ 'অদ্বৈতকেশরীর অস্তিভাতিপ্রিয়রূপ'— অদ্বৈতবাদরূপ সিংহ অর্থাৎ সর্বমতশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদ। অস্তি, ভাতি ও প্রিয়=সৎ, চিৎ, আনন্দ। এই তিনটি শব্দ বেদান্তগ্রন্থ 'পঞ্চদশী'তে ব্যবহৃত।

৩ 'পিয়া পীতম্': 'প্রিয়া ও প্রিয়তম'—ভাবুক বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনের কুঞ্জে বিহঙ্গগীতির মধ্যে এই ধ্বনি শুনিতে পান—অর্থ, রাধাকৃষ্ণ।

৫-৬ বড়গেলে তেঙ্গেলে: দাক্ষিণাত্যের দুই সম্প্রদায়; প্রথমটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত শাস্ত্র অর্থাৎ প্রাচীন বেদ বেদান্ত প্রভৃতি ও আধুনিক শ্রীভাষ্য প্রভৃতিকে অধিক প্রামাণিক মনে করে; দ্বিতীয়টি 'দিব্যপ্রবন্ধ' নামক তামিল ভাষায় রচিত গ্রন্থের বিশেষ পক্ষপাতী।

১০ উদাসী ও নির্মলাদিগের গ্রন্থসাহেব: উদাসী ও নির্মলা দুইটি নানকপন্থী সম্প্রদায়। প্রথমটি নানকের পুত্র শ্রীচাঁদ কর্তৃক স্থাপিত; দ্বিতীয়টি গুরুগোবিন্দ-স্থাপিত।

গ্রন্থসাহেব—নানকপন্থীদের ধর্মগ্রন্থ। ইহাতে নানক হইতে গুরু-গোবিন্দ পর্যন্ত দশগুরুর উপদেশ লিখিত আছে। শিখেরা এই গ্রন্থকে দেবতার ন্যায় পূজা করিয়া থাকেন। 'সাহেব' শব্দের অর্থ মাননীয়।

৪৫০ ২১ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ: ২২৪ পৃষ্ঠার তথ্যটীকা দ্রষ্টব্য।

৪৫১ ১ 'অবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদক': ন্যায়ে ব্যবহৃত শব্দদ্বয়—'অবচ্ছিন্ন' শব্দের অর্থ বিশিষ্ট, যাহা সীমাবদ্ধ করা হয়, 'অবচ্ছেদকের' অর্থ—যে বিশিষ্ট করে।

১১ রূপসনাতন ও জীবগোস্বামী; রূপসনাতন শ্রীচৈতন্যদেবের প্রসিদ্ধ শিষ্য ও ভক্ত—তৎপ্রবর্তিত বৈষ্ণবভাবের সাধক। জীবগোস্বামী ইঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র বৈষ্ণবদর্শনের অন্যতম পথিকৃৎ।

৪৫২ ১৬ দশনামী: শঙ্করাচার্যের শিষ্যগণ দশটি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের নামে পরিচিত। এগুলিকে 'দশনামী' বলে, যথা—গিরি, পুরী, ভারতী, বন, অরণ্য, পর্বত, সাগর, তীর্থ, সরস্বতী, আশ্রম।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

৪৫২ ১৬ বৈরাগী, পন্থী : বৈষ্ণবসাধুগণকে বৈরাগী বলে। পন্থী, যথা—কবীরপন্থী, নানকপন্থী প্রভৃতি।

১৭ বল্লভাচার্য সম্প্রদায় : ২৪১ পৃষ্ঠায় তথ্যটীকা দ্রষ্টব্য।

২৫ কম্‌লী স্বামী : স্বামীজীর সমসাময়িক একজন সন্ন্যাসী। স্বামীজী বহুস্থানে এই মহাত্মার ত্যাগ ও সেবাভাবের সুখ্যাতি করিয়াছেন। ইনি কাচুপন্থী অর্থাৎ কোন বিশেষ সম্প্রদায়-ভুক্ত নন। 'কালী কম্বলী' নামেও খ্যাত ; কালো একখানা কম্বলই ছিল তাঁহার সম্বল, ধনীদের বলিয়া তিনি হিমালয়ের দুর্গম তীর্থপথে স্থানে স্থানে 'ধরমশালা' নির্মাণ করান।

৪৫৩ ১৩ তুলসীদাস : স্বনামখ্যাত সাধু সাধক ও কবি। ইঁহার রচিত রামায়ণ 'রামচরিতমানস' হিন্দীভাষাভাষিগণ অতি ভক্তিপূর্বক পাঠ করিয়া থাকেন। ইঁহার দোঁহাগুলিও গভীর উপদেশপূর্ণ।

৪৫৪ ৯ 'আপ্ত' : যিনি পাইয়াছেন—যিনি আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন।

২৪ সাধন চতুষ্টয় : বেদান্ত সাধনার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন—(১) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ; ব্রহ্ম নিত্য ও জগৎ অনিত্য—এই তত্ত্বের বিচার। (২) ইহামুত্রফলভোগবিরাগ—সাংসারিক সুখে ও পারলৌকিক স্বর্গাদিভোগে বিতৃষ্ণা। (৩) শমাদি ষট্ সম্পত্তি : শম—চিত্তসংযম, দম—ইন্দ্রিয় সংযম, উপরতি—চিত্তবৃত্তির উপশম, তিতিক্ষা—প্রতীকার-চেষ্টাশূন্য হইয়া সমুদয় দুঃখসহন, শ্রদ্ধা—গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাস, সমাধান - ব্রহ্মে চিত্তের একাগ্রতা। (৪) মুমুক্ষুত্ব—মোক্ষলাভের জন্য প্রবল ইচ্ছা। দ্রষ্টব্য বেদান্ত সূত্র, ১।১।১ শারীরক ভাষ্য, এবং বিবেকচূড়ামণি (১৯-২৮)।

৪৫৫ ৫ 'অন্তরা চাপি তু, তদ্দৃষ্টে' - বেদান্তসূত্র, ৩।৪।৩৬। ইহার অর্থ : শাস্ত্রে দেখা যায়, অনেক ব্যক্তি কোন আশ্রম-বিশেষ অবলম্বন না করিয়াও, দুই আশ্রমের মধ্যবর্তী হইয়াও জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন।

৪৫৬ ২ ধর্মব্যাধ : মহাভারত বনপর্ব দ্রষ্টব্য। কর্মযোগ-প্রসঙ্গে 'কর্তব্য কি ?' অধ্যায়ে স্বামীজী ধর্মব্যাধের গল্পটি সবিস্তারে বলিয়াছেন।

৪৫৭ ১৮ চতুর্থাশ্রম : সন্ন্যাস-আশ্রম ; অন্য তিনটি—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

৪৫৮ ১২ 'হিন্দুমাতার তাহার সন্তানগণকে গঙ্গায় কুম্ভীরের মুখে নিক্ষেপ সম্পর্কীয় চিত্র'— মেরী লুই বার্কের New Discoveries of Swami Vivekananda in America গ্রন্থের ১৩০ পৃঃ সম্মুখের চিত্র এবং পরপৃষ্ঠার কবিতাটি দ্রষ্টব্য।

৪৫৯ ৯ পুনরুত্থান-সম্প্রদায়ঃ যাঁহারা খ্রীষ্টধর্মের প্রাচীন মতসমূহ পুনঃ-স্থাপনের জন্য (Revivalist preaching) প্রচার করেন।

৪৬১ ২২ 'এথেন্সের সেই জ্ঞানী মহাত্মার লণ্ঠন…' —গ্রীক দার্শনিক ডায়োজিনিস 'সিনিক' (Cynic)-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি মনে করিতেন, জগতে প্রকৃত সাধু ব্যক্তি অতি অল্প। এই ভাবটি প্রকাশ করিবার জন্য তিনি দিনের বেলায়ও লণ্ঠন জ্বালাইয়া শহর ঘুরিতেন; চারিদিকে অন্ধকার, যেন কিছু খুঁজিতেছেন।

১৮ 'আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রবল আক্রমণ'—বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে ব্যক্তি-নির্ভর এবং পুরাণ-নির্ভর ধর্মগুলিতে লোকের বিশ্বাস কমিতেছে, কিন্তু শ্রুতিযুক্তিঅনুভূতি-নির্ভর বেদান্ত ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিতেছে।

৪৬৩ ১৫-১৬ অরুন্ধতীদর্শনন্যায়মতঃ আকাশের উত্তরভাগে সপ্তর্ষিমণ্ডলে অরুন্ধতী একটি অতি ক্ষুদ্র নক্ষত্র—কাহাকেও ঐ নক্ষত্র দেখাইতে হইলে প্রথমে উহার নিকটবর্তী উজ্জ্বলতর বশিষ্ঠ-নক্ষত্র দেখাইতে হয়। তাহাতে দৃষ্টিস্থির হইলে তবে অরুন্ধতী দেখা যায়। সেইরূপ ধর্মের বা দর্শনের সূক্ষ্মভাব বুঝিতে হইলে প্রথমে স্থূলভাব আয়ত্ত করিতে হয়।

৪৬৫ ২৫ '২০,০০০ ফুট ঊর্ধ্বে হিমালয়ের…মুক্তিলাভ করিয়াছে'—এখানে স্পষ্টতই স্বামীজী প্রিয় গুরুভ্রাতা অখণ্ডানন্দের কথা বলিতেছেন। দ্রষ্টব্য—স্বামী অখণ্ডানন্দ-জীবনী পৃঃ ৫৮-৬২।

নির্দেশিকা